উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৬৪

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ॥০

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬০তম বর্ষ

(১৩৬৪-মাঘ হইতে ১৩৬৫-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক
স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা

প্রতি সংখ্যা আট আনা

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

মাঘ-১৩৬৪ হইতে পৌষ-১৩৬৫

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখক-লেখিকা		বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	...	ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি রূপায়ণে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ	৫৮৫
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ		সকল ধর্মের মিলন-ভূমি (ভাষণ)	২৩০
		মনুষ্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত (ঐ)	২৮৯
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	...	'জাতিরূপেণ সংস্থিতা' (কবিতা)	৫৮০
শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়'	.	'জগৎ মিথ্যা'র শাস্ত্রপ্রমাণ	২৫৯
শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী		শেষের গান (কবিতা) ...	৭০১
শ্রীমতী সুধা সেন	.	মহাপ্রভু-চরণে রূপ-সনাতন	৪২৫
শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	৭০
শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়	.	ঘোরাও চক্র তোমার (ঐ)	৪১৬
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	..	শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শীপূজা ..	৩২৩
		শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ .	৬৩৭
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য		শ্রীমদ্ভাগবত-নীরাজন	২৮
শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায় ..		মিনতি (কবিতা)	১৪২
সৈয়দ হোসেন হালিম		নবজন্ম (ঐ) ..	৩০১

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যান্য :	শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি পত্র	
	রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণ	৬৩
	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (জীবন-কথা)	১৫৯
	আচার্য যদুনাথ সরকার (ঐ)	৩২৮
	স্বামী দেবাত্মানন্দের দেহত্যাগ	৪৪৩
	রামকৃষ্ণ-'কথামৃতে' শ্রীশ্রীকালীতত্ত্ব (সংকলন)	৫৫১
	স্বামী নির্বেদানন্দের দেহাবসান	৬০৮
শ্লোকানুবাদ :	অনিমেষ দৃষ্টি	৫৪৫
	'আমাদের শুভ বুদ্ধি দাও'	২২৫
	'ইহাই সনাতন ধর্ম'	১৬৯
	'তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ'	৬৯৩
	'তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ'	৩৩৭
	প্রাণের মহিমা .	৬০১
	সাধুর স্বভাব	২৮১

উদ্বোধনের উদ্দেশ্য

স্বামী বিবেকানন্দ

সুদূরবস্থিত বিভিন্ন পর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর * মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়, এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর-সম্প্রসারিত এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহা-জাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর শাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহা-জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্ম তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তি-প্রধান, যবনের প্রাণ শক্তি-প্রধান, একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা, একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ', একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী, একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত, একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতা-প্রাণ, একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ, একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।

* * * *

যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না, যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা, চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরা-বিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ

*[ভারতীয় ও গ্রীক কৃষ্টি—তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা]

নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম-কীর্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

* * * *

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্ত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়, ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে অসাধারণ—সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্ত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল —তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

* * * *

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধি বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য-প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে, কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ। আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর, হে বলস্বরূপ আমাদিগকে বলবান কর।

('উদ্বোধনের প্রস্তাবনা' হইতে সংকলিত)

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের হীরক-জয়ন্তী বর্ষ

'উদ্বোধন' ৬০তম বর্ষে পদার্পণ করিল। মানব-জীবনের দৈর্ঘ্যবিচারে ইহা বার্ধক্যের পর্যায়ে, কিন্তু পত্রিকার জীবনে বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সংঘের মুখপত্রের পক্ষে—যাহার সম্মুখে এখনও শতাব্দীর পর শতাব্দী রহিয়াছে তাহার পক্ষে—৬০ বৎসর উদ্যোগ-পর্বেরই সমতুল।

সাড়ম্বরে না হউক—ভাবসম্ভারে আমরা যেন 'উদ্বোধনে'র হীরক-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করিতে পারি। দশ বৎসর পূর্বে 'সুবর্ণ-জয়ন্তী'র স্মৃতি এখনও আমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

আজ আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করিব—কখন ও কি পরিবেশের মধ্যে স্বামীজী এই পত্রিকার উদ্বোধন করেন, এবং কেনই বা 'উদ্বোধন' নাম-করণ করেন।

১৮৯৮ ডিসেম্বরে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পরই স্বামীজীর নির্দেশে এ যুগের নূতন বাণী প্রচারের যন্ত্ররূপে ১৮৯৯, ১৪ই জানুআরি 'উদ্বোধন'—প্রথমে পাক্ষিকরূপে আত্ম-প্রকাশ করে, দশম বৎসর হইতে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

কঠোপনিষদ্ স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহারই অন্তর্গত মহামন্ত্র 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ওঠ জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া জ্ঞান লাভ কর,—এই মহাবাণীকেই স্বামীজী উদ্বোধনের প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, এই বাণীই উদ্বোধনের মর্মবাণী। স্বামীজী-প্রবর্তিত ইংরেজী পত্রিকার নাম 'প্রবুদ্ধ ভারত', বাংলা পত্রিকার নাম 'উদ্বোধন', ইহা হইতে স্পষ্টই প্রকটিত হয় 'বুধ্' ধাতুর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ। 'বুধ্' জ্ঞানে—'বুধ্' জাগরণে।

উদ্বোধনের বাণী তাই জাগরণের বাণী। জাগরণ শৃঙ্খলমুক্তির সাধনার জন্য, জাগরণ—যুগ-যুগব্যাপী পরাধীনতার পরনির্ভরতার অলস তমো-নিদ্রা হইতে, জাগরণ—জন্মজন্মব্যাপী স্বার্থ-সীমায়িত ভোগসুখাতুর সংসার-মোহ-নিদ্রা হইতে, জাগরণ—সর্বপ্রকার হীনতা নীচতা সংকীর্ণতা স্বার্থপরতা হইতে, যাহা কিছু মানুষকে অমানুষে পরিণত করিয়াছে—তাহা হইতে। সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির সাধনাই স্বামীজীর সাধনা, 'মুক্তিই আত্মার সঙ্গীত' ইহাই তাঁহার বাণী। শান্ত সংযত বলিষ্ঠ ভাষায় মহাজাগরণের বাণী প্রচার করাই 'উদ্বোধনে'র জীবন-ব্রত।

'উদ্বোধনে'র বাণী ত্যাগ ও সেবার বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দ কেহই—ধ্বংস করিতে আসেন নাই, গঠন করিতে আসিয়া-ছিলেন, বিধ্বস্ত মানব-মনকে সুগঠিত সংগঠিত করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, ত্যাগ তাঁহার ভাবের ভিত্তি—সেবায় তাহার বিস্তৃতি। ত্যাগ—শুধু কামনা বাসনা ও সংসারাসক্তি ত্যাগেই সীমা-বদ্ধ নয়, মতুয়ার বুদ্ধি বা মতের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগের উপরই গড়িয়া উঠিতেছে উদার ধর্ম-সমন্বয়ের ভাব। সেবা শুধু প্রতিবেশীকেই নয়, সেবা শুধু প্রাথমিক অভাব অভিযোগ দূরীকরণই নয়, 'প্রীতিঃ পরমসাধনম্'—এই প্রীতি-সঞ্জাত সেবা-বুদ্ধি-সহায়ে দূর করিতে হইবে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অভাব, প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে মানুষকে মনুষ্যত্বে, নতুবা অন্য সব প্রচেষ্টা বিফল—ভস্মে ঘৃতাহুতি। মানুষ যাহাতে 'মান-হুঁশ' হয়, যাহাতে তাহার চৈতন্য জাগ্রত

হয়,—অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়—তাহার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের উদ্দেশ্য।

৬০তম বর্ষের প্রথম প্রভাতে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমরা নূতন বৎসরের কার্য আরম্ভ করিতেছি। পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ এই মহাব্রতে যোগদান করিয়া আমাদের সংকল্প-সিদ্ধির সহায় হউন।

বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা

আমরা পরিকল্পনার যুগে বাস করিতেছি। পঞ্চবার্ষিক দশবার্ষিক পরিকল্পনার সহিতই আমরা পরিচিত, কিন্তু আর একটি পরিকল্পনা—যাহা আমরা জানিয়াও জানি না—যাহা অদৃশ্য থাকিয়া বায়ুর মতোই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রাণ-ধারণে সহায়তা করিতেছে—যাহা সূর্যের আলোর মতো নিজে অদৃশ্য থাকিয়াও জগৎ প্রকাশিত করিতেছে—যাহা ইতিহাসের অলক্ষ্যেই শুরু হইয়াছিল—তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, আমরা বিবেকানন্দ-পরিকল্পনার কথা বলিতেছি।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের উর্ধ্বমুখী মন ধ্যানলোকে চলিয়াছে জ্যোতির্ময় 'অখণ্ডের ঘরে'—যেখানে সপ্ত ঋষি ধ্যানমগ্ন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান 'নর'-ঋষিকে স্নেহের আহ্বানে ডাকিয়া ধ্যান হইতে জাগাইয়া জ্যোতির্ময় শিশুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে'। ধ্যান-ব্যুত্থিত ঋষির নয়ন হইতে জ্যোতির্ধারা নির্গত হইয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।' শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট মনেই উদ্ভাসিত বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা।

* * *

কাশীপুরে শেষ-শয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ, পার্শ্বে দণ্ডায়মান নরেন্দ্র—আত্মসমাহিত ধ্যানের ভিখারী। তিরস্কারচ্ছলে শিক্ষা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভেবেছিলাম—বিশাল বটবৃক্ষের মতো হয়ে হাজার হাজার লোককে শান্তির ছায়া দিবি, তা না তুইও মুক্তির ভিখারী, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর?' শ্রীগুরুর আশীর্বাদে নরেন্দ্র গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনারত—মা ওর মনে একটু মায়া ঢুকিয়ে দাও, ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করাতে হবে।

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়—লোককল্যাণ-বাসনা লইয়া উর্ধ্বতম ধ্যান-লোক হইতে নামিতে লাগিল প্রবুদ্ধ মন। রূপায়িত হইতে শুরু করিল শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা।

শ্রীগুরুর দেহত্যাগের পর গুরুভ্রাতাগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজকের বেশে বাহির হইলেন ভারততীর্থ দর্শনে—কাশী-বৃন্দাবন, তপোভূমি হিমালয়ের পর রাজপুতানা গুজরাট ও পশ্চিম ভারত অতিক্রম করিয়া তিনি উপনীত হইলেন ভারতের দক্ষিণ সীমায়, কন্যা-কুমারিকায়। হিমালয়ে যে ধ্যান তাঁহার হয় নাই—সমগ্র ভারতভূমি দর্শনের পর সেই গভীর ধ্যানে তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল—ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতের জ্ঞান-গরিমা, বর্তমানের অভাবনীয় অধঃপতন—ভবিষ্যতের অতুলনীয় মহিমা।

বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা সূক্ষ্মরেখার লাঞ্ছনে একটি চিত্ররূপ পরিগ্রহ করিল বিবেকানন্দ-মনে। স্বামীজী বুঝিলেন—কি তাঁহাকে করিতে হইবে, বুঝিলেন, কি বিরাট দায়িত্ব তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছেন—দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল পূজারী। একটি অধঃপতিত আত্মবিস্মৃত জাতিকে টানিয়া তুলিতে হইবে, আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইতে হইবে, ধর্মদ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে নূতন উদার যুগোপযোগী ধর্ম প্রচার করিতে হইবে। ভারতের সনাতন ধর্মকে পুনশ্চ বেদান্তের উপর

প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সর্বোপরি স্বরূপ-বিস্মৃত মানবকে সচেতন করিতে হইবে তাহার চৈতন্যময় আনন্দময় সত্তা সম্বন্ধে।

*　　*　　*

ব্যুত্থিত বিবেকানন্দ উত্তরমুখী হইলেন, সমাজমুখী হইলেন। মাদ্রাজে আসিয়াই তিনি তাঁহার নূতন উদার শক্তিপূর্ণ ভাবধারা যুবকদের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মধ্যে পাইল এমন একজন আচার্য যাঁহাকে তাহারা খুঁজিতেছিল—যিনি একাধারে উদার ও গভীর, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও দর্শনে সমান পণ্ডিত, যিনি ক্ষুরধারবুদ্ধি সত্ত্বেও অনুভূতি-কোমল হৃদয়-সম্পন্ন।

দক্ষিণ-ভারতে নব ভাবধারার সূচনার পরই অন্তরের অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে যাইতে হইল বর্তমান সভ্যতার নবতম রঙ্গভূমি আমেরিকায়। ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রাচীনতম ধর্মের নূতনতম ব্যাখ্যা করিয়া, এক উদার ভাববন্যায় তিনি আমেরিকাকে প্লাবিত করিলেন। ইংলণ্ডে আহূত হইয়া বিজ্ঞানের ভাষায় বেদান্তের যে ভাব তিনি প্রচার করিলেন—তাহাই এ যুগের নবতম ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি।

পাশ্চাত্ত্যে ধর্মপ্রচারের ফলে ধর্মপ্রাণ ভারতের মনে তুমুল প্রতিক্রিয়া হইবে, এই আঘাতে মূর্ছাপন্ন ভারত জাগিয়া উঠিবে—তাই অধুনা তমোগুণাপন্ন ভারতে ধর্মপ্রচার অপেক্ষা রজোগুণসম্পন্ন পাশ্চাত্ত্যে সত্ত্বগুণাশ্রিত বেদান্তজ্ঞান বিতরণ করিলে একই সঙ্গে পৃথিবীর উভয় খণ্ডের কল্যাণ সাধিত হইবে—ইহাই ছিল বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।

১৮৯৭ জানুআরিতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী দেখিলেন—বহুযুগ-নিদ্রিত ভারত জাগিতেছে, প্রভাতী সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। ভারতে পদার্পণ করিয়া মাদ্রাজে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করিলেন তাঁহার পরিকল্পনা। সেখানে 'My Plan of Campaign' বক্তৃতায় তিনি বলিলেন, 'ভারতের প্রাচীন আচার্যগণের ভাব অনুসরণ করাই আমার পরিকল্পনা।…সংস্কারকগণকে বলিতে চাই—আমি তাঁহাদের অপেক্ষা বড় সংস্কারক, তাঁহারা চান ছোটখাট সংস্কার, আমি চাই শাখামূল সবশুদ্ধ সংস্কার। তাঁহাদের পদ্ধতি ধ্বংস, আমার পদ্ধতি গঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি বিকাশে বিশ্বাসী।' তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন—'সর্বপ্রথম যে কাজে আমাদের মনোযোগ প্রয়োজন—তাহা এই যে —উপনিষদ্ শাস্ত্র ও পুরাণে যে সকল আশ্চর্যতম সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে সেইগুলি পুঁথি হইতে, মঠ-মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে এবং সারাদেশে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাই আমার পরিকল্পনা—ভারতে কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যুবকদের এই সত্যের প্রচারকরূপে শিক্ষিত করিতে হইবে, তাহারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইহা প্রচার করিবে।… আমাদের প্রয়োজন শক্তির, আত্মবিশ্বাসী হও। মানুষ-গড়ার ধর্মই আজ একান্ত প্রয়োজন।'

ইহাই সংক্ষেপে নিজমুখে ব্যক্ত তাঁহার অপূর্ব পরিকল্পনা। ইহার পরবর্তী অধ্যায় কলিকাতায় —অভিনন্দন প্রভৃতির পর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, যাহার স্মারক-লিপিতে সমগ্র পরিকল্পনা রূপায়িত :

এই সংঘের উদ্দেশ্য—মানব-কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ও তদীয় জীবনে প্রদর্শিত সত্য প্রচার করা এবং অপর সকলকে ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঐগুলি কর্মজীবনে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

এই মিশনের কর্তব্য—সকল ধর্মকে এক সনাতন ধর্মেরই নানা রূপ জানিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের যে সাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন—যথোপযুক্তভাবে সেই কার্য পরিচালনা করা।

ইহার কার্য পদ্ধতি :

(ক) এমন সব শিক্ষক শিক্ষিত করিতে হইবে যাহারা জনগণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখাইতে সমর্থ।

(খ) শিল্প এবং কলাকেও উৎসাহিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাবগুলি যে ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রকটিত হইয়াছে—সেই ভাবে প্রচার করিতে হইবে।

(গ) ভারতীয় বিভাগের কাজ : ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা-প্রসারচিকীর্ষু গৃহস্থকে শিক্ষিত করিতে হইবে—যাহাতে তাঁহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন।

(ঘ) বৈদেশিক কার্য-বিভাগ : সংঘের শিক্ষিত সন্ন্যাসীকে ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হইবে—তাহাতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্বন্ধ নিকটতর হইবে এবং পারস্পরিক বোঝা-পড়াও ভাল হইবে।

(ঙ) মিশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও মানবকল্যাণমূলক, রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমানে ভারত জাগিয়া উঠিতেছে বিবেকানন্দ-কণ্ঠে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে :

মানুষকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া পশু-মানবকে দেবমানবে পরিণত করা—বিধি-নির্দিষ্ট এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমার জননী জন্মভূমি—মহারাণীর মতই ধীর পদবিক্ষেপে ঐ আবার অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্গে বা মর্ত্যে—এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহার গতি রোধ করিতে পারে।

স্বামীজীর পত্রাংশ

এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না, একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি; লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা, আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু'পা দিয়ে দলেছি।

মনে কর,......যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা—ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়—তা হ'লে কালে মঙ্গল হ'তে পা'রে কি না। (এ সমস্ত প্ল্যান আমি এটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না) ফল কথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain. গরীবেরা এত গরীব, যে তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নাই।

We as a nation have lost our individuality, and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses*.........

এটি করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা, গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি ১০।১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম,......তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজকার করব, ক'রে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realisation of this one aim of my life

যেমন আমাদের দেশে Social virtue-র (সামাজিক গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে Spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের Spirituality (অধ্যাত্মজ্ঞান) দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কতদিনে সিদ্ধকাম হব জানি না,......। নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত) ক'রব or die in the attempt (অথবা ঐ চেষ্টায় ম'রব)। কিমধিকমিতি।

চিকাগো-১৯শে মার্চ, ১৮৯৪

বিবেকানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্ — আলমোড়া
২২. ১ ১৬

প্রিয় বিহারীবাবু,

অনেক দিন পরে গতকল্য আপনার একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আপনার পিতার লোকান্তর গমনের কথা শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামীর পত্রে অবগত হইয়াছিলাম। লিখি লিখি করিয়া আপনাকে এতদিন পত্র লিখিতে পারি নাই। * * *

আশ্চর্য দর্শনের উল্লেখ করিয়া আপনি আমাকেও বিস্মিত করিয়াছেন। আমার মনে হয় ঐ সুন্দর 'আলোর কায়া' কোন দেবযোনি-বিশেষ হইবেন, আপনাকে আপনার মৃত পিতার উত্তম গতি হইয়াছে, ইহা জানাইবার জন্য কৃপা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অমানব পুরুষ পথপ্রদর্শনের জন্য আসিয়া থাকেন এবং সুকৃতিবান্ পুরুষকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট লোকে লইয়া যান—ইহা বেদান্ত-শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে। অথবা উহা আপনার পিতৃদেবের সূক্ষ্ম শরীর, তাহাও হইতে পারে। যাহাই হউক আপনি নিঃসন্দেহ খুব ভাগ্যবান্, এমন অপূর্ব দর্শন লাভ করিয়াছেন।

আমাদের স্বামীজী বলিতেন যে, যদি কেহ ভূতযোনি দর্শন করিয়া থাকে, তাহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা একজন মহাপণ্ডিত বা সাধারণ সাধক হইতে অনেক অধিক। কারণ পরলোক সম্বন্ধে ভূত-দ্রষ্টার নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে। পণ্ডিত বা সাধকের জ্ঞান পুস্তক-মধ্যেই মাত্র বদ্ধ রহিয়াছে। অলৌকিক দর্শনের এমনই বিশেষত্ব, আর আপনি তো দেব-দর্শন করিয়াছেন। কারণ 'আলোর কায়া' দেবতাদেরই হইয়া থাকে। এ দর্শন কখনই বিফল হইবে না, জানিবেন।

পিতাকে হারাইয়া আপনার পুরাতন পুত্রশোক উদ্দীপিত হইয়াছে দেখিয়া মহামায়ার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইলাম। আপনি এত বিচারবান্ শাস্ত্রদর্শী ও সাবহিত ও তথাপি চিত্তে শোকস্মৃতির উদয় হইয়া ক্ষণকালের জন্যও অভিভূতের ন্যায় হইতে হইয়াছে। ঠাকুর পুত্রশোকের দৃষ্টান্তে বলিতেন যে, রাবণ-বধের পর লক্ষ্মণ রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া শ্রীরামের বাণের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন যে, রামের বাণের কি শক্তি, উহা রাবণের অস্থি ভেদ করিয়াছে। তাহাতে রাম বলিয়াছিলেন যে, 'ভাই উহা আমার বাণ নহে, উহা রাবণের পুত্রশোক'—পুত্রশোকের এমনি প্রভাব যে, উহা অস্থি পর্যন্ত জর্জরিত করে। তবে আপনি প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন, আপনার রক্ষা তিনিই করিবেন।

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—ইহা কবি-কল্পনা বা প্ররোচক বাক্য নহে, ইহা শ্রীভগবদ্‌বাক্য। ভক্ত প্রারব্ধভয়ও রাখেন না, কারণ ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, যেখানে শূল আঘাত হইবার কথা, প্রভুর কৃপায় তাহা সামান্য কণ্টকমাত্রে পর্যবসিত হয়।

গিরিশবাবুর কি অদ্ভুত জ্ঞান-বিকাশ ও দূরদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যথার্থ কবিই ছিলেন। চিত্ত যত শুদ্ধ হয় ততই ঐ কথাই বিশেষ উপলব্ধ হয় যে, আর কোথাও কিছু নাই, সমস্তই আপনার মধ্যে। ভগবান-দর্শনে প্রতিবন্ধ মাত্র মনের মলিনতা।

'ছাড়ি যদি দাগা বাজি, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি'।

ঠাকুর বলতেন, সরলতা হলেই জানবে ভগবান সন্নিকট। অনেক জন্মের তপস্যা দান ধ্যান প্রভৃতি থাকলে তবে মানুষ সরল হয়। সরল হলেই তো সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যত প্যাঁচ ততই গোল। ততই ভগবান দূরে। 'দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ'।

এ কেবল সারল্য ও কাপট্যের ভেদে হইয়া থাকে। শুধু Ethics—আপনার কোন কাজেই আসবে না, যদি হৃদয় সরল না হয়। ঐ পোড়া Ethics-এর কত মানে কত ব্যাখ্যা কত মতভেদ বেরুবে, এখন যদি সোজাসুজি না উহা বুঝি। ঐ আসল কথা বলিয়াছেন—'নিতান্ত-নির্মলঃ শান্তঃ' হওয়া চাই। সেটা ঐ 'দাগাবাজি ছাড়া'। মেয়েলি কথায় বলে—'স্বামীর নাম সকলেই জানে, কেবল লজ্জায় বলে না মাত্র।' কথাটা একেবারে ঠিক। আমাদের কিসে ধরে রেখেছে, ভগবানকে পেতে দিচ্ছে না—তা কি আমরা জানি না? খুব জানি, সর্বদা না হোক সময় সময় ঠিক জানতে পারি। কিন্তু জানলে কি হবে—আসক্তি প্রবল ব'লে আমরা জেগে ঘুমুই, জাগি না।

একটা বেশ গল্প আছে। কোনও রাজা একদিন হঠাৎ সভা মধ্যে বলে ফেলল যে, আমায় যে মুড়ি কেমন ক'রে হয় বুঝিয়ে দিতে পারবে, আমি তাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব দেব। রাজা সভা শেষ ক'রে যখন অন্দরে গেলেন, রাণী বললেন যে, তুমি আজ কি বোকামি করেছ, অর্ধেক রাজ্য এইবার গেল। রাজা বললেন, ক্ষেপি কেন ভাবছ? দেখবে এখন কি হয়। পরদিন অনেকে রাজাকে বোঝালে মুড়ি এইরূপে হয়, কিন্তু রাজা বললেন, উঁহুঁ আমি বুঝতে পারলুম না। তারপর কেউ চাল এনে যেমন ক'রে মুড়ি তৈয়ার করে সেইরূপ ক'রে সব তাঁর সামনে ক'রে বেশ বুঝিয়ে দিলে যে এইরূপে মুড়ি তৈয়ার হয়। কিন্তু রাজার সেই এক কথা, উঁহুঁ বুঝলাম না। মানে কি? 'বুঝেছি', বললে অর্ধেক রাজত্ব যে যায়। তাই বুঝেও বলতে হচ্ছে বুঝলাম না। আমাদের সকলেরই হয়েছে তাই। বুঝলে যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাই জেগে ঘুমুতে হয়। ঐ যা বলেছেন এ দুর্দিনে তাঁর পাদপদ্ম আঁকড়ে ধরে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় আর নাই। "মামেকং শরণম্ ব্রজ"—এই হ'ল একমাত্র উপায়।

আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তবে 'জীবনে মরণে বাপি' তিনিই এক অবলম্বন, কৃপা ক'রে এই বুদ্ধি যদি রাখিয়ে দেন, তাহা হইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকিবে না। সীতাপতি কানাই প্রভৃতি সকলে ভাল আছে। আপনি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনার কুশল সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা*

স্বামী নির্বাণানন্দ

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)কে আমার প্রথম দর্শন করার সৌভাগ্য হয়। এই সেবাশ্রম একটি হাসপাতাল। রাস্তাঘাট থেকে অসহায় দুঃস্থ রোগী কুড়িয়ে এনে এখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীরা নারায়ণজ্ঞানে এই সব রোগীদের সেবা ও শুশ্রূষা ক'রে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এইরূপ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি সাধু হওয়ার জন্য কাশী সেবাশ্রমে যোগদান করি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরও দু'জন শিষ্য—স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকেও এইখানে প্রথম দর্শন করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই তিনজন শিষ্যকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে, তাঁদের ভেতর একটা জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিকতা সব সময় বিরাজ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীমহারাজকে দর্শন করার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পত্রবিনিময় ছিল। সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি আমার নিকট একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং আরও নানা সূত্র থেকে তাঁর সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল। তাঁর সকরুণ অপার্থিব—ঠাকুরের ভাষায় ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি—যেন ডিমে তা দিচ্ছে, তেজোদীপ্ত সহাস্য বদন এবং সহজ সরল বালকভাবের কোমল মাধুর্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

সেবাশ্রমের শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সব সময় মনে হ'ত কখন মহারাজের নিকট যাব। কর্তব্য কর্ম সেরে সুযোগ-সুবিধা পেলেই মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎভাবে একটু সেবা করার জন্য তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকতুম। তিনি দয়া ক'রে কখনও খাবার তৈরী করতে, কখনও বা গা-হাত-পা টিপে দিতে বলতেন। অল্প সময়ের জন্য হলেও এই সেবার অধিকার পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতুম এবং বিপুল আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতুম। এইভাবে কিছুদিন সেবা করার পর আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল যে, এই আনন্দময় মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করা একান্তই আবশ্যক, নতুবা ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু বুঝবার বা ধারণা করবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

কিছুদিন কাশীতে বাস করার পর মহারাজ অন্যত্র চলে গেলে তাঁর সঙ্গ লাভ করার জন্য তখন প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি। অন্তরের প্রার্থনায় ভগবান সব সময়েই সাড়া দেন, তিনি সে বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন, "মহারাজ যেখানে থাকেন, তার চারপাশে তিনি এমন একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেন যে—তার মধ্যে যে কেউ যাবে, তাকেই সেইভাবে ভাবিত হ'তে হবে।" কতলোক জীবনের নানারূপ কঠিন সমস্যা নিয়ে মহারাজের নিকট আসত, কিন্তু তাঁকে দর্শন করার পর আর কেউ কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ ক'রত না। তাঁর সান্নিধ্যে আপনাথেকেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এবং সকলেই তাদের অহমিকা-বিজড়িত স্বাধীন সত্তা ও জাগতিক সুখদুঃখের স্মৃতি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে একটা অপার্থিব নিবিড় আনন্দ অনুভব ক'রত।

* প্যারিস রামকৃষ্ণ বেদান্তকেন্দ্রে প্রদত্ত ভাষণ

ঠাকুর রাখালকে লক্ষ্য ক'রে ভক্তদের নিকট বলেছেন, 'এইসব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক, ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়েই জন্মেছে'। মহারাজ জাগতিক ব্যাপারের বহু উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় ভাব-রাজ্যে নিরন্তর বিচরণ করতেন। ঠাকুরের নির্দেশমত স্বামীজী এই সঙ্ঘের ভার তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর তিনি সঙ্ঘকে সুপরিচালিত করার জন্য দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সঙ্ঘ দিন দিন পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। সঙ্ঘ-পরিচালনায় নিরত ব্যাপৃত থাকলেও তাঁকে দেখে মনে হ'ত না যে তিনি এত কাজে জড়িত আছেন। কর্মজনিত আশার উন্মাদনা, বিষাদের রেখা, নেতৃত্বের অভিমান ও কর্তৃত্ব-প্রকাশের চেষ্টা তাঁর ভিতর কখনও প্রকাশ পায়নি। এই সকলের বহু উর্ধ্বে এক শান্তিময় রাজ্যে তিনি অবস্থান করতেন। বনেই হোক বা লোকালয়েই হোক, মহারাজ খুব সাদাসিধেভাবে জীবন যাপন করতেন, কিন্তু যেখানেই থাকতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন 'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে' সেইরূপ কত সাধু ভক্ত পাপী তাপী তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। এই আনন্দময় পুরুষের সঙ্গলাভে সকলেই নতুন ভাবে, নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত। যারা একবার তাঁর নিকট আসত, তারা মহারাজের পবিত্র প্রেম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেত। দর্শন এবং স্পর্শন-মাত্রে অপরের মন উচ্চ ভূমিতে তুলে দিয়ে তিনি তাদের জীবনের গতি পরিবর্তন ক'রে দিতে পারতেন। দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই এ কথা সহজে বোঝা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর গৃহী ভক্ত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঠাকুরের মহাসমাধির কয়েক বৎসর পর তিনি একটি এস্টেটে ম্যানেজারের কার্যভার গ্রহণ করেন। এর পর অনেক দিন আর ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, একদিন হঠাৎ গঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়, তিনি পূর্বের ন্যায় আপন র বোধে কথাবার্তা বলে তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন। মহারাজ তখন মঠে ছিলেন। বহুকাল পরে দেবেনবাবুকে দেখে তিনি খুব আদরযত্ন করেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দেবেনবাবু চলে গেলে মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে বললেন, "ওহে গঙ্গাধর, তোমার দেবেন কি হয়ে গেছে হে! তার চালচলন, হাবভাব, সব যে বদলে গেছে। ঠাকুরকে এবং আমাদের সব ভুলে গেল নাকি?'

এর কিছুদিন পর দেবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে গঙ্গাধর মহারাজ সরলভাবে মহারাজের সব কথা তাঁকে বলেন। মহারাজের এই কথাগুলি শুনে তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া আসে এবং মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে একদিন মঠে আসেন। আমি তখন মহারাজের ঘরের দরজার সামনে বসে ছিলুম। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কোথায়? আমি বললুম, আপনি একটু বসুন, মহারাজ ঘরে আছেন—খবর দিচ্ছি।

দেবেনবাবুকে দেখে মনে হ'ল তাঁর ভেতরে খুব অশান্তি—যেন স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না—মহারাজের ঘর থেকে বেরুতে দেরি হচ্ছে দেখে ছটফট করছিলেন। তারপর "কই হে আসছেন না?" বলেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। মহারাজ তখন বেরুবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। দেবেনবাবুকে দেখে তাঁর বুকে হাত দিয়ে খানিক-ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "কি হয়েছে দেবেনবাবু? সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠাকুরকে স্মরণ করুন।" এর পরেই দেবেনবাবুর আমূল পরিবর্তন দেখলুম। মহারাজকে প্রণাম ক'রে বললেন, "মহারাজ, আমার সব অশান্তি দূর হয়ে গেছে।

আমি কি হয়ে গেছলুম। আপনার আশীর্বাদ ও দয়ায় আমার দুঃখ-দ্বন্দ্ব এখন আর কিছুই নেই।" মহারাজ দেবেনবাবুকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে প্রসাদ দিতে বললেন। সেদিন অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে তিনি ফিরে গেলেন। তারপর দেবেনবাবু প্রায়ই মহারাজের নিকট আসতেন।

মহারাজের অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে "ধর্ম-প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ" পুস্তক যখন ছাপা হয়, তখন দেবেনবাবুকে মহারাজের একটি ছোট জীবনী লিখতে অনুরোধ করি। প্রবন্ধ আনতে গেলে, প্রথম দিক থেকে তিনি এই অংশটি পড়ে শোনান: "যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন, মহারাজ অমিত-ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত, কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত—তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে অন্তর্নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বোঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন।" তারপর বললেন, "মহারাজের নিকট যেদিন যাই, সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে? তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় স্পন্দন অনুভব করলাম এবং আমার পূর্বের সেই ভগবদনুরাগ ও ব্যাকুলতা ফিরে এল—শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার সব স্মৃতি জেগে উঠল। তার ফলে আমার জীবনের গতি ফিরে গেল।"

মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের তাৎপর্যের ওপর খুব জোর দিতেন। তিনি অনেক সময় আমাদের বলতেন, "ঠাকুর যুগাবতাররূপে এসে-ছিলেন। যুগাবতার যখন আসেন, তখন শক্তির বিকাশ হয়। তখন সাধারণের পক্ষে ভগবান লাভ করা সহজসাধ্য হয়, সামান্য একটু খাটলেই, একটু সাধন ভজন করলেই মানুষের চৈতন্য হয়।"

একদিন তিনি কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশায়কে বলছেন, "দেখুন মাষ্টার মশায়, ঠাকুর এবার এসে জীবলোকে এবং শিবলোকে একটি Bridge (ব্রীজ) তৈরী করেছেন। এখন দেখুন তো সাধারণের পক্ষে ভগবান লাভ করা কত সহজসাধ্য হয়েছে।" আমাদের সম্বোধন ক'রে বলতেন, "তোমরা এ সুবর্ণ সুযোগ হারিও না, উঠে পড়ে লেগে যাও। এই সুযোগ হারালে পরে খুব পরিতাপ করতে হবে। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতিমূর্তি, সেই আদর্শে জীবন গড়ে তোল। যারা হাসপাতালে কাজ করছ, তারাও নিষ্কাম কর্ম অভ্যাসের দ্বারা সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে ও সত্য বস্তু লাভ করতে পারবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "রাখাল আমার ছেলে—মানসপুত্র"। দক্ষিণেশ্বরে পিতাপুত্রের অপূর্বলীলা—যাঁরা কথামৃত বা তাঁর জীবনী পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন। তাঁর শরীর যাওয়ার পরেও যে তাঁদের এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল, নিম্নে বর্ণিত ঘটনা থেকে তা বুঝতে পারা যায়।

বলরাম-মন্দিরে একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মহারাজ যখন বিশ্রাম করতে যাবেন, তখন একজন বিধবা মহিলা তার ভাইকে সঙ্গে ক'রে মহারাজকে দর্শন করতে আসে। আমি মহারাজের ঘরের দরজার পাশে একটি বেঞ্চিতে বসে ছিলুম। সেই ভদ্রমহিলা আমাকে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে, "রাখাল মহারাজ কোথায়? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে

চাই,—শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।" আমি বললুম, "এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে না। তিনি এখন বিশ্রাম করতে যাবেন।" আমার কথা শুনে মহিলাটি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আমি তার সেই ভাব দেখে মহারাজকে গিয়ে তার কথা জানালুম। তিনি খুব স্নেহভরে আমায় বললেন, "দেখ, খাওয়া-দাওয়ার পরে, এই বুড়ো বয়সে আর কথাবার্তা বলতে পারি না। ঘণ্টা দুই বাদে আসতে বলো।" এই কথা শুনে মহিলাটি নীরবে অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। পরে কাতরস্বরে আমায় বলে, "দেখুন, আমি শুধু প্রণাম করে চলে যাব—এরূপ একটু ব্যবস্থা আমায় ক'রে দিন।" তার এই ব্যাকুল ভাব দেখে পুনরায় মহারাজকে গিয়ে জানালুম, "শরৎ মহারাজ এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন, শুধু একবার প্রণাম ক'রে যেতে চায়।" এইবার শরৎ মহারাজের নাম করাতে আর কোনরূপ আপত্তি না ক'রে বললেন, "বেশ যদি শুধু প্রণাম ক'রে যায়, তা হ'লে আসতে বল।"

সে তখন খুব আনন্দে সন্ত্রস্তভাবে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করল। প্রণত অবস্থায় মহিলাটি ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁদতে লাগল। মহারাজও হঠাৎ নির্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন। আমার তখন মহারাজকে দেখে মনে হ'ল, তিনি কোন এক ভাবরাজ্যে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভাব একটু প্রশমিত হ'লে সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওঠ মা ওঠ, কি হয়েছে বল।" মহিলাটি তখনও কাঁদছিল। মহারাজের স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ভাবাবেগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারছিল না। পরে মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, "ইনিই আমায় আপনার নিকট আসতে আদেশ করেছেন।" তার এই কথা শুনে চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, বলতো মা?"

মহিলাটি তখন নিঃসঙ্কোচে বলতে লাগল: "আমার চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিয়ে হয়, শ্বশুর বাড়ী বহরমপুর। বিয়ের অল্প কিছু দিন পরেই স্বামী মারা যান। তখন ভগবানের নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, 'ঠাকুর, সারাটা জীবন কি ক'রে কাটাব? তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও।' প্রায় এক বৎসর পর একদিন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'দুঃখ করো না, বাগবাজারে আমার ছেলে রাখাল আছে, তার নিকট যাও—সে তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।' কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কে রাখাল, তখন কিছুই জানি না। আমি কি ক'রেই বা একলা বাগবাজারে যাব?

"শ্বশুর-বাড়ীর কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি। আমার মা থাকেন কলকাতায় টালিগঞ্জে। শ্বশুর-বাড়ী থেকে অনুমতি নিয়ে মার কাছে এসে সব বললুম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে জানতেন। তাঁর কাছে খবর নিয়ে আমার ভাইকে সঙ্গে ক'রে বাগবাজারে যাই। সেখানে খোঁজ খবর করে উদ্বোধন-কার্যালয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বলতে তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে মহারাজ আমায় ডেকে বললেন, "দেখ, এই মেয়েটি এখনও উপবাসী রয়েছে। এর একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।" ইতিমধ্যে তার দীক্ষাদি হয়ে গেছে। মহারাজের আদেশ পেয়ে তাকে বলরামবাবুদের অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম এবং কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললুম। মেয়েটি যখন মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাকে দেখে মনে হ'ল সেই শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার লেশমাত্রও তার ভিতরে নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখালরাজের কৃপা-কটাক্ষে এমন একটা কিছু ঘটেছিল—যার ফলে সে এখন আনন্দে ভরপুর।

এর পর সে প্রায়ই মহারাজকে দর্শন করতে আসত। মহারাজের মহাসমাধির পর দু'এক বার তাকে মঠে আসতে দেখেছি, তারপর বহুকাল তার আর কোন খোঁজ খবর জানতুম না। প্রায় ২০ বৎসর পরে খোঁজ নিয়ে বেলুড় মঠে একবার সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তখন তার গেরুয়া-পরিহিত সন্ন্যাসিনীর বেশ। এ দীর্ঘকাল কোথায় ছিল—জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "মহারাজের নির্দেশে কাশী, বৃন্দাবন এবং হরিদ্বারে তপস্যায় কাটিয়েছি। তাঁর কৃপায় বেশ আনন্দেই বৎসরগুলি কেটে গেছে। এখন কলকাতায় টালিগঞ্জে থাকি।" তার তপস্যাপূত শান্ত পবিত্র জীবন, বিনয়নম্র ব্যবহার এবং অল্প কথাবার্তায় আমার ধারণা হয়েছিল যে, সত্যের কিছু সন্ধান না পেলে এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এর প্রায় তিন বৎসর পর তার শরীরত্যাগ হয়। এই তপস্বিনীর শরীরত্যাগ এক বিস্ময়কর ঘটনা। হঠাৎ একদিন তার পেটের অসুখ করে, কয়েকবার দাস্ত হয়। সেইদিনই তার সঙ্গিনী মেয়েদের (শিষ্যাদের) সকলকে সম্বোধন ক'রে বলে, "আগামী পরশু আমার নশ্বর দেহের অবসান ঘটবে, তোমরা ভয় পেওনা—দুঃখ করো না।" এই নিদারুণ কথাগুলি শুনে সকলে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে গেল। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়, ধীরে ধীরে সেই নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'ল। সেদিন পূর্বাহ্নে ইষ্ট ও গুরুর নাম স্মরণ করতে করতে সেই তপস্বিনী তার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ ক'রল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁর মানসপুত্রের মধ্যে এই যে লীলা—সাধারণের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব।

গিরিশচন্দ্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দর্শনের নানা সত্য, পুরাতত্ত্ব পুরাণের
নানা তথ্যচয়—
সামাজিক জীবনের সংগ্রামের দ্বন্দ্ব-দ্বেষ
জয়-পরাজয়,
স্বদেশের আশা-স্বপ্ন— সবে তুমি দিয়ে গেলে
নব রস-রূপ,
এ জাতির মনে প্রাণে অঙ্গীভূত তব দান
ওগো নাট্যভূপ !
তোমারে ভুলিবে কেবা ? তোমার স্বদেশ-সেবা
কেবা যাবে ভুলে ?
নবলব্ধ স্বাধীনতা পুষ্পিতা শ্যামলা লতা
আছ তার মূলে।
জয়পত্রে সাজি'
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল জঁয় কবি এলো তব
কল্পনার বাজী।
এ যুগের তপোভূমে উদ্গীত হইল যেথা
নব সামবেদ,
কে ভুলিবে গঙ্গাতীরে এ যুগের মহাসত্র—
তব অশ্বমেধ !

অগ্নিগর্ভ বাণী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

'মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ'—শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বর একজন আছেন—যাঁকে জানলে সব জানা হয়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়,—যাঁকে না জানলে, না পেলে কিছুই জানা হয় না, কিছুই পাওয়া হয় না—জীবনে অতৃপ্তির, অশান্তির ভাব দূরীভূত হয় না। বলতে পারেন, এ জীবনে ঈশ্বরলাভ ক'জনের আর হয়, কোটির মধ্যে একজনেরও হয় কি না সন্দেহ। অতএব অন্ধকার কিংবা আলেয়ার পিছনে ছুটে লাভ কি? লাভ নিশ্চয়ই আছে, আর বস্তুটিও আলেয়া নয়। প্রমাণ? প্রমাণ—মহাপুরুষদিগের জীবন ও বাণী, প্রমাণ, প্রত্যেকের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। অন্ধকারে পথ চলতে গিয়েও পথিক ক্রমশঃ বুঝতে পারে পূব দিকে যাচ্ছে, না পশ্চিমদিকে—আলোর রাজ্যে অথবা অন্ধকারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে তাঁর পানে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, লক্ষ্য বহু দূরে থাকলেও লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছি—এই ধারণা মনে এবং প্রাণে সঞ্চারিত হয়। এগিয়ে যাও। রূপোর খনি দেখে থেমে যেও না, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। সম্মুখে সোনার খনি, হীরার খনি, জহরতের খনি, আরো কত কি।

'ঈশ্বর-লাভ জীবনের উদ্দেশ্য'—এ কথা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত থাকলে সংসারের অনেক গোল-যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর এ কথাটি মন থেকে সরিয়ে রাখলে গোলযোগ বাড়তেই থাকে। আজ চারদিকেই হিংসাদ্বেষ, রেষারেষি, মারামারি। কেউ বলছেন—আন্তর্জাতিক পুলিশ নিযুক্ত কর, কিংবা আন্তর্জাতিক সৈন্যদল সাজাও, কেউ বলছেন—আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বে-আইনী ঘোষণা ক'রে দাও, কেউ বলছেন সবগুলো দেশ এক শাসনাধীনে আনো। কেউ বলছেন—রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ মীমাংসার জন্য বৈঠকের পদ্ধতিই সর্বোত্তম, কেউ বলছেন—Moral Re-armament (নৈতিক অস্ত্রশস্ত্র)। কেউ বলছেন পঞ্চশীল, কেউ ব্যবস্থা দিচ্ছেন ইউনেস্কো, কেউ বা অলিম্পিক, তবেই পৃথিবীব্যাপী প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে। সব রকম চেষ্টাই হচ্ছে, অথচ ফল কিছুই হচ্ছে না। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', গরম বাতচিৎ—লেগেই রয়েছে।

অপর একটা দিক থেকেও দেখুন। অন্যের ভাল করবার জন্যে অনেকে উঠে পড়ে লেগেছেন। 'অনুন্নত দেশ', 'অনুন্নত জাতি', 'অনুন্নত সমাজ'—এগুলোকে টেনে তুলতে হবে। কেউ পিছনে পড়ে থাকতে পারবে না। যাঁরা অগ্রবর্তী, তাঁরা পশ্চাদ্বর্তীদের ডেকে বলছেন, 'আমরা যা বলি তাই কর, আমাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি নাও, সাজ-সরঞ্জাম নাও, অস্ত্রশস্ত্র নাও, বিশেষজ্ঞ নাও, নিয়ে চট্‌পট্ ক'রে উন্নত হও, আর দেখ, সব সময়ে আমাদের দলে থাকবে,—ঐ ওদের দলে যেও না।" দেশের ভিতরেও যাঁরা সব-জান্তা, ক্ষমতার আসনে আসীন, আর পরার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ—তাঁরাও সমাজকে উন্নত করবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। দেশে-দেশেই পাঁচসালা, সাতসালা 'পরিকল্পনা,' 'যোজনা', 'উদ্যোগ'। টেনে হিঁচড়ে সবাইকে উপরে তুলতে হবে। এক নক্সা শেষ হয়ে আরেক নক্সা শুরু হয়, 'যোজনা'র ভার বেড়েই চলে,—কিন্তু কোথায় ঋদ্ধি, কোথায় শান্তি, কোথায় তুষ্টি, কোথায় সন্তোষ?

পরের ভাল করবে বলে কোমর বেঁধে

লেগেছ। বেশ কথা। কিন্তু ভালটা কি,—তা কি জানতে পেরেছ, না ভেবে দেখেছ? অপরের ভাল দূরের কথা—নিজের পক্ষে কোন্‌টা ভাল তাই কি বুঝতে পারি? বুঝতে গেলে অহমিকা ছাড়তে হয়। আমি সব জেনে ফেলেছি—নিজের দেশের ও নিজের সমাজের ত কথাই নাই—অজানা এবং বহু দূরবর্তী দেশের পক্ষে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা করণীয় তাও ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছি,—এই যে বুদ্ধি, এটা মতুয়ার বুদ্ধি, এটা শুধু অহমিকা, অজ্ঞান, দম্ভ, দর্প, মোহ থেকে এর উৎপত্তি। এর ফলেই একদিকে গর্বিত, শক্তিমদে মত্ত, লোভী, ক্রূর, দলবদ্ধ মুষ্টিমেয় লোক, এদের হাতে জীওন-কাঠি মরণ কাঠি—অপর দিকে কোটি কোটি লোক নিরুপায়, অপপ্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত অপচেষ্টার কুফল-ভোগী।

ইউরোপ থেকেই এই ব্যাধি আমাদের দেশে এসেছে, এতে সন্দেহ নাই, আর মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করাতেই ইউরোপে এত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। Aldous Huxley (হাক্সলি) দুঃখ ক'রে বলছেন, ইউরোপে জীবন কর্মচঞ্চল বটে, কিন্তু নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহীন। বিজ্ঞান শিখিয়েছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট যন্ত্র, তার আভ্যন্তরীণ অন্ধশক্তির বশে সে বিপুল বেগে ঘূর্ণায়মান, কিন্তু সম্মুখে নির্ঘাত মৃত্যু। সূর্যের তেজ একদিন নিঃশেষিত হবে, সমস্ত সৌরমণ্ডল হিমশীতল এবং আমাদের এই পৃথিবী প্রাণহীন হয়ে যাবে, দশদিক্‌ ব্যেপে বিরাজ করবে শুধু মূক মৌন শীতল মৃত্যু। ব্যক্তিগত মানবজীবন বিশ্বের যন্ত্রশালায় স্ফুলিঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়, দপ ক'রে জ্বলে উঠে স্বল্পক্ষণ পরেই আবার নিবে যায়। তার পরে আর কিছুই নেই, যেটুকু সময় জ্বলে সেটুকুই সত্যিকার জীবন। জীবন জড়েরই একটা বিকাশ, জড়েই এর উৎপত্তি জড়েই লয়, মন বুদ্ধি এগুলো দেহযন্ত্রের ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। সুতরাং যতক্ষণ বাঁচি, ততক্ষণ যা ভোগ ক'রে নিতে পারি তাই লাভ। * * * কিন্তু জীবনকে এরূপ উদ্দেশ্যহীন মনে করলে মানুষের পক্ষে টিকে থাকাই দায়। বাস্তবকে ভুলে থাকবার জন্যে তখন প্রয়োজন হয় মাদকতার। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনে এই মাদকতার জোগান দেয়—সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিওর হাল্কা সঙ্গীত ও বাজে আলাপ, আর খেলার মাঠ (খেলা দেখা বা খেলায় নিজে যোগদান করা নয়), এগুলির দ্বারা উত্তেজনার মাত্রা যেটুকু অপূর্ণ থাকে—তা পূরণ করে ন্যাশনেলিজম ও কম্যুনিজম। উত্তেজনার জোয়ারের মুখে আসে যুদ্ধ, আর ভাঁটার সময়ে দারুণ অবসাদ। উদ্দেশ্যবিহীন জীবনস্রোত এই জোয়ার-ভাঁটায় চলতে থাকে,—এভাবেই চলবে, যতক্ষণ সর্বব্যাপী মৃত্যু জীবনকে না গ্রাস করে। হাক্সলি বলেছেন যে মানবজীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়াতেই এই নিদারুণ ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়েছে।

অতি সত্যি কথা। ব্যাপারটার গোড়ায় গলদ। একটা কথা অহরহ আমরা শুনতে পাই, তা হচ্ছে 'Approach' (অ্যাপ্রোচ), বিদেশী ভাষার শব্দ, এর যথার্থ ব্যঞ্জনা বুঝি কি না সন্দেহ। আমাদের মাতৃভাষায় সহজবোধ্য যে শব্দটি সর্বদা শুনে আসছি, তা হচ্ছে 'ভাব'। যে কোন কাজে ভাবটি শুদ্ধ হওয়া চাই। আমরা সাধারণতঃ বলি, ভাবগ্রাহী জনার্দন। অন্তর্যামী ভগবান—কর্ম-কর্তার ভাবটি লক্ষ্য করেন, কাজটির উপর তত জোর দেন না। এখন এই 'ভাবের ঘরে চুরি' হওয়াতেই মুশকিল দাঁড়িয়েছে। যাঁরা দেশের সমাজের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর, একটা কিছু না করেই ছাড়বেন না—তাঁরা যদি মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করেন তবে এক মুহূর্তেই অহমিকা দূর হয়ে যাবে। তখন বিনম্রভাবে তাঁরা

বলবেন "হে প্রভো। কতটুকু আমার বুদ্ধি, কী-ই বা বুঝি, কতদূরেই বা দেখি,—অপরের সেবা ক'রে তোমার নিকটবর্তী হতে চাই। অপরের ভাল-মন্দের নির্দেশ দেবার, অপরের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার স্পর্ধা আমার হৃদয়ে যেন স্থান না পায়। কি করলে অপরের যথার্থ সেবা হয় সেইটি বুঝবার শুভবুদ্ধি তুমি আমাকে দাও। নিজেকে জাহির করবার বাসনা আমাকে যেন পেয়ে না বসে। এইটি শুদ্ধভাব, এই ভাব নিয়ে কাজ করলে অহমিকা, ও হঠকারিতা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, অপরের প্রতি অবজ্ঞার ভাব মনে স্থান পায় না।

'হওয়া'টাই আসল, 'করা'টা আসল নয়। যে 'করা'—'হওয়া'র আনুষঙ্গিক এবং অনুকূল, সেই 'করা'ই শ্লাঘ্য। অপর যে সমস্ত 'করা', তা'তে প্রায়শঃ কর্তার এবং চারপাশের লোকের দুঃখ এবং অশান্তিই ঘটে, পরিণামে লাভ কিছুই হয় না। 'ঈশ্বরলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য' এ-কথা মেনে নিলে 'হওয়া'র উপরেই জোর পড়ে, এবং 'করা'টা তখন আপনাথেকেই ঠিক পথে চলে। এইটি বাদ দিয়ে যতই সেকুলারিজ্‌ম্ করি, যতই প্ল্যানিং করি, হিত কিছুতেই হবে না, গোলযোগ শুধু বেড়েই চলবে। ঈশ্বরের জায়গায় যদি পরিকল্পনাকে বসাই, ফল হবে হিতে বিপরীত, কারণ আপাততঃ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হলেও প্রশ্ন থেকে যাবে—ততঃ কিম্?

ধরাধামে অধিকাংশ নরনারী যে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হবে, এমন প্রত্যাশা অবশ্য করা যায় না। কোটির মধ্যে একজন ঈশ্বরলাভের জন্য যত্নশীল হয়। তথাপি একথা ঠিক যে এই উদ্দেশ্য স্বীকার করা এবং মাঝে মাঝে স্মরণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর। এই ভাঙ্গাগড়া, টানা-হেঁচড়া এবং দারুণ অহমিকার যুগে মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য প্রতিনিয়ত লোকের সামনে তুলে ধরা খুবই দরকার। এই আদর্শকে শিকেয় তুলে রাখা কিংবা গৌণ বলে মনে করা মানবসমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণজনক হ'তে পারে না। আর ভারতবর্ষের পক্ষে এই আদর্শকে বর্জন করা তো মৃত্যুর সামিল।

'নাল্পে সুখমস্তি'

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাসনার মাঝে প্রাণের তৃপ্তি খুঁজেছি।
মৃত্যুর জালে পেয়েছি নরক-যাতনা।
কাম-কাঞ্চনে দুঃখই শুধু—বুঝেছি।
আঁধারে ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস কত না।
তোমাতে আমার অমৃতসিন্ধু জেনেছি
সেই সিন্ধুর গভীরেতে চাই ডুবিতে।
তোমাতে আমার পারিজাত-ফুল দেখেছি
সে ফুল-মধুর আস্বাদ চাই লভিতে।
খাঁচার পাখীর পিঞ্জর দাও ভাঙিয়া!
অসীম শূন্যে এবার মেলুক পাখা সে।
উষার আলোতে দিগন্ত ওঠে রাঙিয়া!
মুক্তির বাঁশি বাজে ঐ দূর আকাশে!
পুকুরের মাছ সমুদ্রে যেতে চাহি গো!
কামনার যত বন্ধন যাক টুটিয়া!
দিগ্‌দিগন্তে জল ছাড়া কিছু নাহি গো!
যেখানেতে খুশি সেইখানে যাই ছুটিয়া।
অল্পেতে সুখ কখনোই তুমি পাবে না!
মানুষের প্রাণে ভূমানন্দের পিপাসা।
দুধের তৃষ্ণা ঘোলেতে কখনো যাবে না!
জনমের মতো কেটে যাক্ যতো কুয়াসা।

বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত

দিলীপকুমার রায়

কৈশোরে যখন "শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে" সর্বপ্রথম পড়ি ঠাকুরের প্রার্থনা—'বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দে মা', সে-সময়ে আমাদের বাড়ীতে বহু কবি মনীষী পণ্ডিত গুণী জ্ঞানীর পদার্পণ হ'ত। তাঁদের কাছে নিরন্তরই শুনতাম যুক্তির 'মডার্ন' অবদানের মাহাত্ম্য, সেকেলিয়ানাকে হাল আমলের ব্যঙ্গবাণে ছিন্নভিন্ন করার পৌরুষ, 'আগে দেখ্‌ব তবে মান্‌ব'—এই জাতীয় বিজ্ঞম্মন্য কথা। সুতরাং ঠিক সেই সময়ে কথামৃতে ঠাকুরের কথাটি প'ড়ে চমকে উঠেছিলাম বললে কারুরই বুঝতে বেগ পেতে হবে না, চমকে ওঠার কারণটি কি। কিন্তু যেটা হয়ত এ-যুগের অনেক মডার্নের কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে সেটা এই যে, হাজারো যুক্তিবাদীদের যুক্তিতর্ক-বিচারের জয়ধ্বনি-শোনা একটি কিশোর মন কেমন ক'রে এক অপণ্ডিতের এ-হেন অযৌক্তিক কথা মেনে নিল—কেমন ক'রে এক ঠাকুর এসে ভাসিয়ে দিলেন তাঁর উপলব্ধির বন্যায় তিলে-তিলে-গড়া যুক্তিতর্কের উইটিবি।

তারপর যতই দিন গেছে ততই যেন দিনে দিনে নতুন ক'রে বুঝেছি ঠাকুরের এ প্রার্থনার মর্ম—নিজের মনের লাখো সংশয়ের বিষণ্ণ মুহূর্তে। বুঝেছি—বৃন্দাবনের বাঁশির ডাক যে শোনে তার কাছে যুক্তিতর্ক-বিচারের মানা নগণ্য হ'য়ে ওঠে ভাগবতী করুণায়।

কিন্তু একটি কথা আছে। এই ভাগবতী করুণার ঘর-ছাড়া বাঁশি তারা শুনতে পায় না, যারা মনে করে জীবনের পরম সন্ধানে শ্রদ্ধার চেয়ে বেশি সত্য পাথেয় জোগায় অশ্রদ্ধা, প্রেমের চেয়ে বেশি আলো দেয় তর্ক, বিশ্বাসের চেয়ে জোরালো বনেদ গড়ে সংশয়।

এ-কথাটিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা। এ-কথা আমার প্রতিপাদ্য নয় যে সব জনশ্রুতিই মেনে নিতে হবে। আমার বলবার উদ্দেশ্য—পরম দিশা খুঁজতে হ'লে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের "হাঁ"র এজাহার যাঁরা দেখেন নি তাঁদের "না"-র এজাহারের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয়। আর যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে ব'লে এসেছেন আবহমানকাল যে খাঁটি জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি পায় সেই যে শ্রদ্ধার আলোয় আপ্তবাক্যকে দেখতে চায়। অন্য ভাষায় "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—অথবা "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" এই সত্যটিকে মেনে নেয় করুণাপ্রার্থী মানবাত্মার চিরন্তন তাগিদে।

এই জন্যেই সর্বদেশে ও সর্বকালে তাঁরাই মানুষকে সত্যিকার আত্মিক আলো বিলিয়ে গেছেন যাঁরা (সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও) শ্রদ্ধার আলো হৃদয়ে জাগিয়ে তবে দেখতে চাইতেন "হৃদয়-গুহায়" নিহিত ধর্মতত্ত্বের রূপ। এঁদেরই নাম দেওয়া হ'ত 'তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী'; এঁরাই ধারণ ক'রে এসেছেন ধর্মকে।

কিন্তু এই ধারণ করার কাজে তাঁদের যে সময়ে সময়ে বিশেষ বেগ পেতে হ'ত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুনিদের আশ্রমে দৈত্য-রক্ষরা দিত হানা—তাঁরা ছুটে এসে রাজার কাছে দরবার করতেন, "তপোবনগুলিকে রক্ষা করো রাজন্।" রাজারা ছিলেন ধর্মের শাস্ত্রী—সৈন্য পাঠাতেন, দশরথকেও তাই পাঠাতে হয়েছিল প্রাণাধিক প্রিয় রামলক্ষ্মণকে দৈত্যদের দমন করতে। কাজেই সে যুগের রাজারা ছিলেন ধর্মের রক্ষক, ভাগবত সত্যে শ্রদ্ধাবান্। নইলে মুনিদের তপোবন রক্ষা করার কী এত তাঁদের মাথা ব্যথা?

এখানে হয়ত আমাদের যুগের একটু মূলগত পরিবর্তন হয়েছে—অন্তত হাল আমলে। তাই শোনা যায় "সেকুলার" রাষ্ট্রতন্ত্রে ভগবান্ অস্পৃশ্য। তিনি থাকেন থাকুন প্রাইভেট পূজারীর মন্দির আলো ক'রে—এ-যুগের রাজাদের তাতে কোনো মুখর আপত্তি নেই। তাঁরা ঠিক কালাপাহাড় নন, কিন্তু তাঁরা চান না ধর্মের "ধারয়িতা" বা "রক্ষক" হ'তে। কেন চান না? কারণ সুস্পষ্ট,—তাঁরা ভাবেন যে রাজ্যের সুশাসন করতে হ'লে বাহাল করতে হবে (শুধু বুদ্ধির মন্ত্রণা মেনে) আইন আদালত সৈন্য সামন্ত। ব্যস্। কাজেই ধর্মকে ধারণ করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কয়েকটি নৈতিক নিষেধকে রক্ষা করাই রাজধর্ম। এক কথায়, ব্যবহারিক জগতে ভগবানকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়—মানুষ তার সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে তার বুদ্ধিপ্রসূত পরোয়ানা জারি ক'রে—আইনভঙ্গকারীদের দণ্ড দিয়ে, আইনের অনুজ্ঞাবাহীদের পোষণ ক'রে। জীবন তো নাস্তিক—দেখাই যাচ্ছে, কাজেই ভগবানকে নিয়ে কেন মিথ্যে টানাটানি? না না,—ভগবান্ থাকেন থাকুন আকাশের ওপারে আবছা-রূপে, কিংবা কয়েকটি গির্জা মন্দির মসজিদে টিম টিম ক'রে—সভ্যতার দেয়ালি জ্বালাবে মানুষ শুধু বুদ্ধির ও সাবধানতার বিদ্যুদ্দামে। অর্থাৎ এ-যুগের রাজধর্মের প্রাণের কথা হ'ল—ধর্মকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভালো, ধর্ম থাকুন তাঁর নিজের এলাকায়—কিনা অকেজো শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের চৌহদ্দির মধ্যে, মানুষের সভ্যতার উপজীব্য হোক—যুক্তি বুদ্ধি গবেষণা-জাতীয় "ইজ্‌ম্"-এর দল।

এ-ব্যবস্থা ধর্মভূমি ভারতবর্ষেও যে চালু হ'তে চলেছে—তারও ঐ একই কারণ—মানুষ ভেবে চিন্তে ঠিক করেছে ভগবান্ যেখানে ছায়াময় অধ্রুব, সেখানে ধ্রুব আলো জ্বালাবার জন্যে তাঁকে তলব করা নিষ্ফল বা পণ্ডশ্রম।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণপ্রমুখ—দিশারী হ'য়ে যাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, যাঁদের আমরা জ্ঞানী ব'লে চিনেছি তাঁরা এ-ব্যবস্থায় হাসেন—না হেসে পারেন না ব'লেই। তাঁরা যে তাঁদের জ্ঞানের আলোয় দেখেছেন একটি পরম সত্য—মানুষের সামাজিক নীতিরও শেষ নিয়ন্তা ভগবান্, তিনি না থাকলে সমাজে শুভবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, সভ্যতা এগিয়ে এসে মানুষকে বর্বরতার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে, এই জন্যেই যে সভ্যতার পিছনে আছে ভগবানের সমর্থন। তিনি আছেন ব'লেই মানুষ বিশ্বাস করে, "মা গৃধঃ"—লোভ কোরো না, প্রচার করে, পাপীকে ঘৃণা করতে নেই, ঘোষণা করে, অক্রোধ দিয়েই ক্রোধকে জয় করতে হবে। নাস্তিক নৈতিক বুদ্ধি এ-কথা বলে না। সে বলে দোষীকে সাজা দাও, শত্রুকে নির্মূল করো, নিজের সুখের জন্যে লুব্ধ হও, কেননা আমার সুখই পরম কাম্য তাতে পরের কষ্ট হয় তো ব'য়ে গেল।

এ-কথায় তথাকথিত নাস্তিক মানবহিতৈষীরা রুখে উঠে বলবেন: "কখ্‌খনো না, আমরা সবার সুখ চাই।" কিন্তু সত্যি কি চাই? যখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন আমরা কি ভাবি শত্রুরাও মানুষ? যখন আমার স্বার্থে অপরে হস্তক্ষেপ করে তখন কি আমাদের নৈতিক বুদ্ধি বলে: "যে হস্তক্ষেপ করছে তার ন্যায়সঙ্গত কোনো দাবি আছে কিনা ভেবে দেখ?" হাজার হাজার লোককে পশুর মতন জীবন যাপন করিয়ে আমাদের ব্যবসার মুনাফা বাড়ানো যে অন্যায়—এ কি আমরা সত্যিই মনে করি? করলে কি এ-সব স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে পারত?

না, মুখে আমরা যতই বলি না কেন—পরের

দুঃখে সত্যি প্রাণ কেঁদে ওঠে মাত্র দুচার জন মহাপ্রাণ মানুষের। আর কাঁদে এই জন্যেই যে তাঁদের মনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্বালিয়েছে আস্তিক শুভ বুদ্ধির আলো, দরদের আলো, ব্যথার আলো। এ-আলো যেখানে জ্বলেনি সেখানে যুক্তির নির্দেশে কেউ পরোপকার করতে ছোটেনি। পরোপকারের অন্তিম ভিত্তি হ'ল ধর্মে শ্রদ্ধা, ন্যায়ে শ্রদ্ধা, প্রেমে শ্রদ্ধা।

এ শ্রদ্ধা যে ভালো তা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না, যদি ভগবানকে 'ন স্যাৎ' ক'রে উড়িয়ে দিই। তিনি আছেন বলেই আমরা পরস্পরকে ভালো-বাসি—তিনি আছেন বলেই স্ত্রী পুত্র ভাই বোন বন্ধু আমাদের প্রিয়—তিনি আছেন বলেই আমরা স্বার্থসেবা ছেড়ে খুঁজি পরার্থনিষ্ঠা। তাই মানুষেব সবচেয়ে বড উপকার করেন পবম ভাগবতেরা—যাঁদের কাছে "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" কথার কথা নয়, অন্তরাত্মার একটি গভীর উপলব্ধি। এঁরাই ঋষি, মুনি, যোগী, তপস্বীরূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, এঁরা তাঁদের অসামান্য প্রেমের দৃষ্টান্তে, ত্যাগেব দৃষ্টান্তে চিরন্তন শ্রদ্ধার বাণী প্রচার ক'রে এসেছেন যে ভগবানকে যাঁরা সত্যি অন্তবে পেয়েছেন তাঁরা"সর্বভূতহিতে বতাঃ" না হয়েই পা'রেন না। এঁরা যদি না জন্মাতেন তাহ'লে আজ মানুষ বড জোর বলত—তোমার এলাকায় তুমি থাকো, আমার এলাকায় আমি থাকি, কিন্তু বেশি এগিও না, কারণ আমার স্বার্থ আমার কাছে সব চেয়ে বড়, মনে রেখো। এই মনোবৃত্তিই হ'ল সংঘাতের মূল। এ-সংঘাত আজ বিশ্বব্যাপী হ'য়ে উঠেছে—এ-দেশ যদি উদ্ভাবন করে দশহাজারী মারণ-বোমা, ওদেশ জবাব দেয় বিশহাজারী বোমা তৈরি ক'রে। পাল্‌টা উত্তরে এ-দেশ বলে—আচ্ছা রোসো—এই দেখ ত্রিশহাজারী বোমা। ও বলে: বটে? আচ্ছা এই দেখ লক্ষহন্তা ক্ষেপণাস্ত্র। …এই চলতে থাকল—বুদ্ধি বা যুক্তির কারখানায় এই নীতির পরোয়ানাই মান পেল—ভগবান্ হ'য়ে দাঁড়ালেন অশ্রদ্ধেয়।

কিন্তু এ অশ্রদ্ধার অন্তিম ফল—শুভ বুদ্ধির লোপ, যুক্তি বুদ্ধি হ'ল উকিল, ওদের যার তরফেই বাহাল করো না কেন, ওরা তাকেই দাঁড করাবে মান্য গণ্য ব'লে। তাইতো ভয়-দেখানো, চোখ-রাঙানো মারণ-মন্ত্রের পৌরো-হিত্য করতে শ্রেষ্ঠ মনীষী বৈজ্ঞানিকদেরও বাধল না। কিন্তু এর ফল দাঁড়াল এই যে নাস্তিক্যের পথে এগোতে এগোতে অবশেষে মানুষ দেখল যে, শত্রুকে নির্মূল করা মানে নিজেও নির্মূল হওয়া। তাই রাতারাতি ওদেশের বৈজ্ঞানিকরা সুর বদলেছেন, বলছেন: "না না, আমরা অ্যাটম-বোমা তৈরি কবেছি বটে, কিন্তু ছুঁড়তে তো বলিনি।" হাসির কথা নয়?

কিন্তু অ্যাটম-বোমা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁডবার প্রবৃত্তিও যে উগ্র হ'য়ে উঠবেই উঠবে। পাপকে প্রশ্রয় দিলে, নরক হাজিরি দেবেই দেবে। কিন্তু এ-কথাও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। তাই এ-যুগে এমন যুক্তিরও উদয় হ'ল যে নির্দোষ "নিরীহ বোমা" তৈরি করা সম্ভব, যার ফলে শত্রু মরলেও আমরা মরব না, বাতাস বিষিয়ে উঠবে না।

এ-যুগে জগতে চলেছে নাস্তিকতার কর্ম-ফলে অনিবার্য অশুভেব আবাহন—আত্মহত্যার জাঁকালো সাজসজ্জা। এর প্রতিকার তর্ক বা বিচার-বুদ্ধির হাতে নেই, আছে এক প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাসের হাতে। নিরীশ্বরবাদীর যুক্তিজাল যতই নিপুণ হোক না কেন, বিলাস-পূজার পূজারীর সাজ সরঞ্জাম যতই লোভনীয় হোক না কেন, আইন-আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থা যতই চমৎকার হোক না কেন, সভ্য-

তাকে ধারণ করে ধর্ম, ধর্মকে ধারণ করে প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস। যুক্তির চোখ কতটুকু দেখে? তাতে দৈনন্দিন কাজ চলে, ঘরোয়া উৎসবাদিও চলতে পারে। কিন্তু জীবনের পরম রূপটিকে চিনতে হ'লে দরবার করতে হবে শ্রদ্ধার কাছে, বিশ্বাসের কাছে, প্রেমের কাছে। আর এ-প্রেমের অন্তিম ভর (sanction) ভগবান্। রামকে অবিশ্বাস ক'রে রামরাজ্য গড়বার আশা দুরাশা। তাই ভগবান গীতায় বলেছিলেন: "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি", তাঁর শরণ নিলে তবেই মানুষ সর্বপাপ সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে, নইলে নয়।

মানুষের ভগবান

শ্রীজগদিন্দ্র বসু

নীরব কেন গো, উত্তর দাও মানুষের ভগবান;
মুক্তি চাহিয়া অহরহ কেন কাঁদে তব সন্তান?
এ ধরার মাঝে খুলিয়া নয়ন
কত কি তো তারা করিল চয়ন;
তবুতো ক্ষুধার হ'ল না তৃপ্তি, তৃষ্ণা হ'লনা দূর—
তবে কি তাহারা শোনেনি তোমার আনন্দ-ঘন সুর?

মন্দিরে বাজে আরতি-শঙ্খ, জ্বলে শত দীপমালা,
ভক্তেরা আসে চিত-চন্দনে সাজায়ে পূজার থালা—
দেবার যা থাকে তারা দিয়ে যায়,
এ জীবনে তুমি তাদেরি সহায়
মনের দৈন্য ঘোচাতে কাঁদে যে নিঃশ্বাসে আঁখি বুজে,
পথে প্রান্তরে মন্দিরে তাই তারা মরে তোমা খুঁজে।

ক্ষমা করো তুমি—রিক্ত নিঃস্ব জীবদের ভগবান!
সান্ত্বনা-বাণী শোনায়ে করগো দৈন্যের অবসান।
নিশিদিন তারা যত ভুল করে
অনুতাপানলে তত তারা মরে,
অস্থিরভাবে অবশেষে করে দেবতার সন্ধান,
অনুশোচনার অশ্রুতে ভিজে মাগিছে আত্মত্রাণ।

পার্থিব সুখ, বিত্ত-বিভব, মায়ার প্রাচীরে গড়া
অশান্তি আর বিদ্বেষ শুধু এদের হৃদয়ে ভরা:
এতদিন পরে জানিয়াছে ব'লে
দেবালয়ে তারা আসে দলে দলে
অসহায়ভাবে, করুণনেত্রে, মহানির্বাণ যাচে,
কম্প্রবক্ষে ওই চেয়ে দেখ ভগবান তব কাছে।

স্বামীজীর অবদান

'পথিক'

বিভিন্ন ধর্মমতের সামঞ্জস্য-বিধান

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-বোধ—সাধক-মনের বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশিত হয়, মনের ক্রম-পরিণতির ফলে একই সাধক, উপলব্ধির সোপান-ত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ইহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া স্বামীজী "বাদত্রয়ের" মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈতবোধই শেষ কথা এবং দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উহার পূর্ব-গামী অবস্থা—এই তত্ত্ব প্রাচীনকালে বিদিত থাকিলেও, উহার বহুল প্রচার স্বামীজীর দ্বারাই হইয়াছে। স্বয়ং উক্ত তিন প্রকার ভাবের অনুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রচারের ফল অমোঘ হইবেই। এখনও ব্যাপকভাবে তৎকৃত সামঞ্জস্য গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু কালে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ গোঁড়ামির মূল নষ্ট হইলে সাম্প্রদায়িকতারূপ বৃক্ষের বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হওয়াই অবশ্যম্ভাবী।

জগতের বিভিন্ন ধর্মমতের মূলতত্ত্ব ঐ তিনটি "বাদ" কিংবা উহাদের অল্পাধিক সংমিশ্রণ। অতএব বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে আত্মঘাতী বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, তাহার মূলে কুঠারাঘাতপূর্বক সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ধর্মবিরোধরূপ ঘোর অশান্তি দূর করিবার উপায় স্বামীজী করিয়া গিয়াছেন।

বিরোধী ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনপূর্বক উদারভাব প্রচারের ভার তাঁহারই উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত ছিল—ইহা তিনি স্বয়ং অনুভব করিতেন।

ধর্মমতসকলের সুসমঞ্জস প্রচার কতদূর মঙ্গলময় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। সমাজে ধর্মপ্রাণ বলিয়া সম্মানিতব্যক্তিদের মধ্যেও অধিকাংশ স্ব স্ব ধর্মমতকে প্রাধান্য দিয়া অপরাপর ধর্মমতকে নিম্নস্থান দিয়াছেন কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধা করেন নাই। উন্নত ব্যক্তিদের মনোভাবও যখন প্রায়শঃ অনুদার, তখন আর সাধারণের কি কথা?

কর্মযোগ প্রবর্তন

আমরা নিশ্চিত করিয়া বসিয়াছিলাম যে,—ধ্যান-ধারণা, নির্জন-বাস, লোকসঙ্গ-ত্যাগ দ্বারাই তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। কিন্তু, অন্য আর এক পন্থাও যে সমভাবে কার্যকরী তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। লোকহিতকর কার্যের দ্বারাও যে তত্ত্বানুশীলন সম্ভবপর, তাহা স্বামীজী আধুনিক কালে সুস্পষ্ট করিয়া বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে প্রচার করিলেন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, বর্তমান যুগের এই অভিনব পন্থা পুনঃপ্রবর্তন-কালে তাঁহাকে কি ভীষণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পুরাতন যখন বিস্মৃত হয়, তখন তাহাকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে গেলে অন্তরের বাধা যেমন প্রচণ্ড, বাহিরের বাধাও তেমন প্রবল। মহামৎস্য যেমন প্রখর স্রোতস্বতীর প্রচণ্ড বেগ উপেক্ষা করিয়া উভয় কূলেই সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তেমনি তিনি এই উভয় বাধাই অতিক্রম করিয়াছিলেন।

স্বামীজী কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, এবার একটা নূতন পথ দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত ধ্যান জপ বিচার প্রভৃতির দ্বারা মুক্তি হয়, এবার এখনকার ছেলেরা তাঁর কাজ

ক'রে জীবন্মুক্ত হ'য়ে যাবে।" কর্মযোগের এই পুনঃপ্রবর্তন স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলকথা ঃ ত্যাগ ও সেবা

ত্যাগ ও সেবার ভাব বৃদ্ধি করিতে পারিলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মহামঙ্গল। বৃক্ষমূলে জল ও সার প্রয়োগে যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়, বীজ যেমন বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে ত্যাগ এবং সেবাই মূল উপাদান।

উক্ত দ্বিবিধ ভাব পুষ্ট করিবার জন্য স্বামীজী অতীব তৎপর হইয়া প্রচার করিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে কে কি অভিনয় করিবে, কোন্ প্রতিষ্ঠান কোন্ বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হইবে—এ সকল দিকে স্বামীজীর তেমন নজর দেওয়ার সময় ছিল না। সকলকে যথাসম্ভব ত্যাগী ও সেবাব্রতী করিবার প্রচেষ্টাই প্রথম কর্তব্য, তদনন্তর মানুষ ও প্রতিষ্ঠান আপন আপন কর্মধারা নির্বাচন করিয়া লইবে—ইহাই ছিল তাঁহার কর্মপদ্ধতি। ত্যাগ ও সেবার ভাব বিকশিত না হইলে মানুষ ও সমাজ আত্মঘাতী হইবে, সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি-পূর্বক সর্বপ্রযত্নে সকলকে বুঝাইয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্যের অসামান্য ঐহিক উন্নতি সত্ত্বেও যথার্থ ত্যাগ ও সেবা ভাবের যথোচিত অনুশীলন সেখানে হয় নাই দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত ছিলেন। উহাদের ব্যবহারিক কুশলতা—আবশ্যক হইলে আমরা অবশ্যই নিজস্ব করিব, কিন্তু ত্যাগ ও সেবার ভাব যেন পরিত্যাগ না করি—ইহাই ছিল তাঁহার নির্দেশ।

অধুনা কর্তৃত্বস্পৃহা, পরমতাসহিষ্ণুতা, অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছা, লোকের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। ত্যাগ ও সেবার দ্বারাই ঐ মারাত্মক দোষ বর্জন করা সম্ভব।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থত্যাগ ও সেবাপ্রবৃত্তির অনুশীলন যিনি করিবেন না, তিনি বিদ্যা ও ধনালঙ্কারে ভূষিত হইলেও নিজের এবং দেশের অহিতই করিবেন। শিক্ষা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার ভিত্তি ঐ দুই মূল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামীজী, বহুধা উৎসাহিত করিয়াছেন। এখন শিক্ষক এবং সমাজপতি তদনুযায়ী কার্য করিলে শুভদিন অবশ্যই আসিবে।

উদারতা (কাহারও ভাব নষ্ট না করা)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিতেছেন ঃ সাধনবলে স্বামীজীর ভিতর, স্পর্শসহায়ে ধর্মশক্তি সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষণ হইয়াছে। কোন এক শিবরাত্রিতে সহসা ঐ দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সম্মুখে উপবিষ্ট জনৈক গুরুভ্রাতার মধ্যে শক্তিসংক্রমণ করিলেন। শক্তি-সংক্রমণের ফলে সেই ভ্রাতার অদৃষ্টপূর্ব ভাবান্তর ও অনুভূতি হইল। ঠাকুর উহা জানিতে পারিলেন এবং স্বামীজীকে ঐ বিষয়ে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "আগে ভিতরে ভাল করে জমতে দে । ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি, বল দেখি ? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল। এখন হ'তে হঠাৎ অমনটা আর করিস্‌নি।"

বালক নরেন্দ্র যখন পরিণত ও পুষ্ট হইলেন তখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। নূতন ভাব প্রত্যক্ষ করাইবার বিপুল সামর্থ্য সত্ত্বেও, তিনি হঠাৎ কাহারও ভাবধারায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। দুইটি ঘটনার দ্বারা ইহা বিশদ করিতেছি ঃ

কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন, "ম্যাক্‌সমূলারের খুব বিস্ময়

ছিল যে নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিন্তাধারা হঠাৎ আশ্চর্যরূপে বদলে গেল কি কারণে। তিনি বাইবেলের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচারাদি করছিলেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ছেড়ে আসবার হেতুও অনেকটা তাই। স্বামীজীই ম্যাক্সমুলারকে বুঝালেন যে ঠাকুরের প্রভাবই সেন মহাশয়ের পরিবর্তনের হেতু। স্বামীজী খুব বলতেন "ম্যাক্সমুলার সায়ন স্বয়ং। নিজের ভাষ্য পুনঃপ্রচারের জন্য নূতন দেহে সায়নাচার্যের আবির্ভাব।" এই মহামান্য ম্যাক্সমুলারের ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরকে জনসমাজে প্রচার করবেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি যা প্রচার করেছেন, তা আমি লিখে দিয়েছিলাম। স্বামীজী নিজে না লিখে আমাকে লিখতে বললেন, আমি আপত্তি করলে বললেন, "আমি লিখলে, বুড়োর মাথায় আমার ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।" আমি যা জানি সব লিখে দিলাম। ভেবেছিলাম স্বামীজী কাটছাঁট ক'রে দেবেন, কিন্তু দু'একটি কথার বদল ক'রে, আর দু'এক জায়গায় ভাষার অত্যুক্তি তুলে দিয়ে গোটা লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

কাহারও ভাব নষ্ট না করা স্বামীজীর জীবনে কত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। ম্যাক্সমুলারের ন্যায় মহাপণ্ডিতের চিন্তাধারায় তিনি কোন হস্তক্ষেপ করিলেন না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সিষ্টার ক্রিষ্টিন্ বলিতেন: কোন এক সভায় স্বামীজী বক্তৃতা দিতেছেন। শ্রোতারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনিতেছে। হঠাৎ, স্বামীজী ভাষণ বন্ধ করিয়া দিলেন। বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রহিল। পরে, কোন বিশিষ্ট শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী! বক্তৃতা হঠাৎ বন্ধ করিয়াছিলেন কেন? আপনার কি কোন বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল?" উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "আমি লক্ষ্য করিলাম, শ্রোতারা আমার ভাব স্ব স্ব বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় না লইয়া ভাবাতিশয্যের ঝোঁকে গ্রহণপূর্বক তাহাদের স্ব স্ব চিন্তাধারা পরিত্যাগ করিতেছে। স্বকীয় চিন্তাধারা হঠাৎ পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারা গ্রহণ মারাত্মক। আমি কেন শ্রোতাদের ভাবী গুরুতর দুঃখের কারণ হইব?" এই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়া স্ব স্ব জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই স্বামীজীর প্রকৃত পূজা।

বাংলা দেশে চলিত একটি পঙ্‌ক্তি—সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত কোন উচ্চতর সাধকের উক্তি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

"নিঠুর গরজী! তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?" অর্থাৎ যে ফুল এখনও কুঁড়ি, যাহার ফুটিবার বহু বিলম্ব আছে, তাহাকে হঠাৎ অস্বাভাবিক জবরদস্তি করিয়া প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা শুধু নিরর্থক নহে, ক্ষতিকরও বটে।

কেহ যদি একজনের উপর উহার পক্ষে অসহনীয় ভাব চাপায়, তাহার ফলে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই মারাত্মক ক্ষতি। "অহং"এর প্রশ্রয় দানে, দাতার নিম্নগতি এবং গ্রহীতার স্ব-ভাব হঠাৎ পরিত্যক্ত হওয়ায় অগ্রগতি ব্যাহত। অস্বাভাবিক নূতন ভাব স্থায়ী বা স্বাভাবিক হয় না, কিয়ৎকাল পরে পরিত্যক্ত হয়, অতএব উহা বৃথা সময় ও শক্তি নষ্ট।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা নিত্যই অপরের ভাব নষ্ট করিতেছি এবং অপরে আমাদের চিন্তাধারা হঠাৎ পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এক একটি সংস্কার বহু অভ্যাসের ফলে দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে। হঠাৎ তাহা উৎপাটিত করিয়া নূতন সংস্কার আমদানি করা সম্ভব নহে। পরন্তু ঐ চেষ্টায় বিশৃঙ্খলা ও বিরোধেরই প্রবর্তন হয়।

যিনি অপরের চিন্তাধারার মূল জানিতে

সচেষ্ট, তিনি হঠাৎ কোন পরিবর্তন আনিতে উৎসাহ পান না।

আমরা দেখিতে পাই, অপরকে সহসা নিজের মতাবলম্বী করিতে গিয়াই প্রচারকেরা যত অনর্থ ঘটান। এজন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

একদেশদর্শী বা একঘেয়ে ভাব, পরমহংসদেব আদৌ পছন্দ করিতেন না। বৈচিত্র্যকে সহ্য করা, বৈচিত্র্য দর্শনে আনন্দিত হওয়া কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। ঐ স্বভাব অর্জন করা বহু কষ্ট সাধ্য হইলেও উহাই পরমার্থ, অতএব অনুশীলনীয়। কি ব্যষ্টির জীবনে, কি জাতীয় জীবনে উদার-ভাব আয়ত্ত না করিলে শান্তি সুদূরপরাহত। উদারভাব বিনা ধর্মসমস্যা, সমাজ-সমস্যা এমনকি পারিবারিক সমস্যার সমাধানও অসম্ভব। যিনি উদার অর্থাৎ সর্ববিধ মনোভাব সহনক্ষম, তিনিই প্রকৃত বিনয়ী, তিনিই সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দানে সক্ষম এবং সকলের সহিত সহজে মেলামেশা করিতেও সমর্থ।

স্বামীজী প্রকৃত বিনয়ের মূর্তিমান্ আদর্শ হইয়া আসিয়াছিলেন। এমন আদর্শ সম্মুখে পাইয়াও সেই ছাঁচে নিজেদের গঠন করিবার চেষ্টা না করিলে বিশেষ দুর্ভাগ্য।

উদার সমাজ গঠন

মত বিরোধ বা ভাববিরোধ হইলে বিরোধীকে উৎখাতপূর্বক মাত্র নিজ মতাবলম্বীদের জিয়াইয়া রাখা, প্রায় সর্বত্রই—কি জাতীয় জীবনে, কি ব্যক্তিগত জীবনে লক্ষিত হইলেও ইহা যে অতিক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক তাহা স্বামীজী পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। ধ্বংস না করিয়া, বলহীন না করিয়া, বিরোধীকে সহ্য করা, নিয়ন্ত্রিত করা আপন করা যাঁহার স্বভাব তিনিই মহাত্মা, তিনিই কর্ণধার হইবার উপযুক্ত। স্বামীজী বলিতেছেন: যদি কেহ মনে করে যে, উৎখাত করা, বিরোধীর সহিত যুদ্ধ করাই উন্নতির লক্ষণ, তাহা হইলে বলিব, ঐ ব্যক্তির ভাবনা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। উৎখাত না করিয়া 'আপন' করাই উন্নতির পরিচায়ক। 'আপন' করাই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত স্বরূপ।

যুদ্ধের দিকে আমাদের ঝোঁকই নাই—অবশ্য দেশরক্ষার জন্য, কখনও কখনও আবশ্যক মত দুচার ঘা আমরা দিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ—এ আমাদের নয়। প্রত্যেককে ইহা শিখিতেই হইবে। অতএব এই যে নবাগত জাতিসকল আমাদের দেশে নানাভাবে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে, অবশেষে তাহাদের সকলকেই ভারত আপন অঙ্গরূপে গ্রহণ করিবে।

স্বামীজীর এই নির্দেশ আমরা যেন না ভুলি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার এই উদার ভাব যিনি অনুশীলন করিবেন, কেবল তিনিই সমাজে এবং রাষ্ট্রে উদারতা আনিবার সহায়ক হইবেন, অন্যেরা ঘোর অশান্তি ও অকারণ রাষ্ট্রবিপ্লবই অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিবে। সাধারণ লোক পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও সঙ্ঘমধ্যে মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পরের গুণগ্রাহী হইয়া, দোষত্রুটি সহ্য করিয়া একত্র থাকিবার চেষ্টা যত অধিক করিবেন, ততই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল। বহু লোক ঐ ভাবের অনুশীলনপর হইলে রাষ্ট্রপতি, কুলপতি এবং মণ্ডলাধিপতিও উদার ও পরমতসহিষ্ণু হইতে বাধ্য হইবেন।

ভগবান বুদ্ধদেবের সময় ভারতে বিভিন্ন জাতীয় লোক মিলিত হইয়াছিল। স্বামীজী বলিতেছেন, "টারটার, বেলুচি, হাজারা, বড়খাজি, উস্‌কাজি, আফগান, খিলিজি—ইত্যাকার নানা-জাতির সমাবেশ তখন ভারতে। উহারা স্ব স্ব জাতিগত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি লইয়াই এখানে আসিয়াছিল, ভারতবাসী হইয়াছিল

এবং আমাদের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। জাতি, বর্ণ, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি—সকল বিষয়েই আমাদের সহিত উহাদের এত অধিক বিভিন্নতা ছিল যে, সকলকে একীভূত করা অসাধারণ ব্যাপার বা অসাধ্য সাধনা, কিন্তু আমরা একীভূত করিয়াছিলাম। ভগবান বুদ্ধ উহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

যাহা অতীতে বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছিল, বর্তমানেও তাহা সত্য হইবে—ইহাই স্বামীজীর অভিমত।

অতএব আমরা স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে, বিরোধীকে উৎখাত না করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে সচেষ্ট হইলে—যাহা আপাততঃ অসাধ্য মনে হইতেছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে। ধর্মানুষ্ঠান, কর্মানুষ্ঠান ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে—সর্বত্রই দল পাকাইয়া প্রাধান্য লাভের চেষ্টা চলিতেছে। এই ভাব ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের পক্ষেই অতীব অকল্যাণকর, অতএব সর্বথা বর্জনীয়।

এক এক সময় মিলিয়া মিশিয়া থাকার সহজ হাওয়া বহিতে থাকে। বঙ্গদেশে স্বদেশী যুগে (১৯০৫—১৯০৮) এই হাওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহিয়াছিল। পুনরায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঐরূপ আবহাওয়া সারা-ভারতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাদৃশ হাওয়ার পুনরাবর্তনের জন্য গণ্ডে হস্ত স্থাপনপূর্বক অপেক্ষা না করিয়া উদার ও পরমতসহিষ্ণু হইবার সাধনা অতীব আবশ্যক। পূর্ব হইতে নিজেকে অনেকটা প্রস্তুত রাখিবার নিরন্তর চেষ্টার ফলে, মলয় যখন বহিবে তখন অতি দ্রুত ও স্থায়ী উন্নতি অবশ্য-ভাবী। কর্মজীবনে ও ধর্মজীবনে উভয়েই এই সাধনার সমভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবন গঠনের চেষ্টাই সমাজের ধারা পরিবর্তনের অগ্রদূত।

উদার সমাজ-গঠনে স্বামীজীর কর্মধারার পরিচয় কিছু এখন দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ যেমন অন্য ধর্মা-বলম্বীদের সকলের পক্ষেই সম্ভব এবং ধর্মান্তরিত হইবামাত্র যেমন উহারা তৎ-তৎ সমাজের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হইয়া যায়, নূতনে ও পুরাতনে, সামাজিক ব্যাপারে ও ধর্মানুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পৃথক্ ভাব থাকে না, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেও যাহাতে ঐরূপ হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর বিশেষ চেষ্টা ছিল।

হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার, অন্যধর্মী হিন্দুধর্ম গ্রহণেচ্ছু হইলে তাহাকে অসঙ্কোচে সানন্দে গ্রহণ, যাহারা সমাজের বাহির হইয়া গিয়াছে, ধর্মত্যাগ করিয়াছে—তাহাদিগকে পুনরায় স্বস্থানে আসিবার জন্য সাদরে আহ্বান, এ সকল যে অবশ্য কর্তব্য, শুধু কথায় নয়, কার্যেও স্বামীজী তাহা দেখাইয়াছেন। হিন্দুধর্ম সর্বগ্রাসী, সকল ধর্মই ইহার অন্তর্গত—এই তত্ত্ব প্রচার করা স্বামীজীর জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমেরিকায় প্রচার করিতে যাইবার পূর্বেই, তাঁহার কার্য-পদ্ধতির ইঙ্গিত তিনি দিয়াছিলেনঃ আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেছি, বৌদ্ধধর্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান মাত্র এবং খৃষ্টীয় ধর্ম যাহার দূরাগত একটি প্রতিধ্বনি বই আর কিছুই নহে।

বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধে তিনি বহু বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছিলেন এবং ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। বৃহত্তর এশিয়ার মূল কোথায় —তিনি জানিতেন। এখনই, স্বাধীন ভারতে স্বামীজীর চিন্তা ও ভাবনার ফল কিছু কিছু দেখিতেছি। বৌদ্ধ জগৎ ভারতের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেছে এবং যথাসময়ে অন্যান্য ধর্মও বাদ যাইবে না।

হিন্দুধর্মের (১) সর্বজীবে একত্ব এবং (২) কঠোর শারীরিক তপস্যারূপ দুইটি বিশেষভাব

জৈন-ধর্মাবলম্বিগণ অদ্ভুতভাবে বিকাশ করিয়াছেন। ঐ দুই ভাবের উপর জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

স্বামীজী বলিতেন : জৈন যখন ঘোষণা করে "আমরা হিন্দু"—তখন তাহারা অতীব সত্য কথাই কহিয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্য-সমাজ ও শিখ-খালসা-সংগঠন, হিন্দুধর্ম ও সমাজ হইতে বাহ্যতঃ সামান্য পৃথক্ হইলেও হিন্দুধর্মের সহিত পুত্র ও পিতার ন্যায় অতিশয় আত্মীয়তাসম্বন্ধ বা যুক্ত। স্বামীজী কখনও উহাদিগকে পৃথক্ না ভাবিয়া এক করিয়াই দেখিতেন।

স্বামীজীর চিন্তার ধারা সাধারণের চিন্তাধারা হইতে পৃথক্। কোন ইহুদী ভদ্রলোক তাঁহার চিকাগো বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতার ফলে শ্রোতাদের মনে কি ভাব হইয়াছিল তাহা তিনি বলিতেছেন :

অন্য ধর্মাবলম্বিগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মমতের এবং স্ব স্ব ভগবানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া সঙ্কীর্ণতার অবতারণা পূর্বক ধর্ম ও ভগবানকে খর্বই করিয়াছিলেন। নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এবং পরধর্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন না করিয়া স্বামীজী, সকল ধর্মের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াই স্ব-ধর্মের গৌরব এবং পর-ধর্মের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখা এবং অখণ্ডভাবে দেখার প্রভেদ অত্যধিক। কোন মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের জীবনী চিত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি, চিত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়া যখন সমগ্র চিত্রগুলি একযোগে দেখা যায় তখন বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে ভাব মনে হয় তাহা খণ্ডদৃশ্য-দর্শনোত্থিত ভাব হইতে অতিশয় পৃথক্ —ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এজন্য স্বামীজীর চরিত্রের বিভিন্ন দিক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সূক্ষ্মতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও উহা অসম্পূর্ণ দর্শন। তবে খণ্ডে খণ্ডে বিশ্লেষিত বহু বিশেষত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলে প্রচণ্ড ও ব্যাপক মার্তণ্ডের ন্যায় স্বামীজীর বিরাট্-রূপ ও মহত্ত্ব কোন কোন ভাগ্যবানের উপলব্ধি হইলেও হইতে পারে।

পূর্বে উল্লিখিত সার্বভৌমিক হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার-ব্যাপারে, ইহা সহজেই বোধগম্য যে, সকল হিন্দু একতাবদ্ধ না হইলে উপযুক্ত রূপ প্রচার-কার্য সুকঠিন। কারণ, উক্ত কার্যের জন্য যে সংহত ও একমুখী শক্তি আবশ্যক তাহা বর্তমানে বহুধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজে পাওয়া যাইবে না। এ কারণে বিভিন্ন ভাবযুক্ত হিন্দুর মধ্যে যাহা সাধারণ ভূমি তাহার আবিষ্কার-কার্যে স্বামীজী প্রথমাবধি সচেষ্ট ছিলেন। এই আবিষ্কৃত সাধারণ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র হিন্দুর নবযৌবন লাভ হইবে এবং যৌবনের আনন্দ, উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রকাশ পাইবে। ইহাই স্বামীজীর অভিমত।

ভগবান বুদ্ধ 'ত্যাগ এবং নির্বাণে'র মন্ত্র প্রচার করিতেই দেশবাসী স্ব স্ব বিস্মৃত শক্তি লাভ করিল এবং ঐ ত্যাগ ও নির্বাণই জাতির মেরুদণ্ড বা প্রাণস্বরূপ হওয়ায় তাঁহার অন্তর্ধানের ২০০।২৫০ বৎসরের মধ্যেই ভারত এক সমৃদ্ধ, বৃহৎ এবং শক্তিশালী ভাব-সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তদ্বৎ, হিন্দুসমাজ ও ধর্মের বহিরাবরণভেদ করিয়া তাহার প্রাণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিয়া স্বামীজী ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

এখন, বিভিন্ন হিন্দু-মতবাদের সাধারণ ভূমি কি? গন্তব্য স্থানই বা কোথায়? চরিত্রবলই সাধারণ ভূমি এবং সত্য ও চিরন্তনের প্রাপ্তিই গন্তব্যের অবধি। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্য অসন্দিগ্ধ। "সত্য ও চিরন্তন"—উপলব্ধির

ব্যাপার। এখানে শাস্ত্র ও লোকনায়কের দোহাই দিয়া শ্রেষ্ঠ বা নির্ভুল হইবার আবশ্যকতা নাই। এমনকি, এখানে বিজ্ঞান (science) এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও বিরোধ নাই, কারণ উভয়েরই প্রাণ উপলব্ধি—স্বয়ং অনুভব করিয়া নিশ্চয় হওয়াই উভয়ের মূল কথা।

যতই দেশ চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া সত্যের দিকে, চিরন্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিবে, ততই দেশের বলবৃদ্ধি ও উৎসাহবৃদ্ধি হইবে। আচার নিয়ম ও পূজা পদ্ধতি গৌণ, সত্যলাভের জন্যই উহাদের গ্রহণ বা বর্জন আবশ্যক। এই বোধ সম্পন্ন হইলেই বিভিন্ন মতবাদের সাধারণভূমি ও গন্তব্যস্থান আবিষ্কৃত হইয়া জীবনে প্রতিফলিত হইবে। তখন অখণ্ড ও অবিভক্ত ধর্মের দুর্জয়-শক্তির নিকট দুরতিক্রমণীয় অন্তরায় সকলও নিশ্চয় তুচ্ছ হইয়া যাইবে।*

* এই সম্পর্কে ১৩৬৩-মাঘে প্রকাশিত লেখকের 'স্বামীজীর দান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যাত্রী

শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

যাত্রা হ'ল শুরু ····
সর্পিল জীবন-পথ
কর্মের চড়াই উৎরাই
হ'য়ে পার
মরণ-বেলায় নিল সীমা।
মন দুরু দুরু ··
গতি হ'য়ে আসে শ্লথ
বিদেহী আত্মার।
সমুখে সীমানাহীন ফেনিল সাগর,
উপরে অনন্তোজ্জ্বল আকাশ-নীলিমা।

ফিরে যেতে চায় প্রাণ
মায়ার বন্ধনে—
ওই পরিচিত সীমায়িত
মাটির অঙ্গনে,
হায়! বন্ধ হ'য়ে গেছে দ্বার—
নাই আর অধিকার
সেথা প্রবেশের।
প্রয়োজন ফুরায়েছে আজ,
সবুজের স্বপ্ন-ঘেরা
গৃহ-প্রাঙ্গণের।

শুরু হল ··
মহাশূন্যে অবিরাম পরিক্রমা
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ ক'রে।
অজানারে হবে না'ক জানা—
স্বপ্নিল মুহূর্তগুলি একে একে
মিশে যাবে দিগন্ত-বলয়ে,
ফেলে যাবে রেখে
এক অশান্ত কামনা,
জানি—
সেদিন উঠিবে ফুটে
অমৃতের শ্যাম-বৃন্তে
জীবনের শ্বেত-পদ্মখানি।

শ্রীমদ্‌ভাগবত-নীরাজন

অধ্যাপক শ্রীসুবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা যেমন সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভাগবতও তেমন সর্বশাস্ত্রসার। শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতারই মত হিন্দুমাত্রেরই সমাদৃত, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজে শ্রীমদ্‌ভাগবত একাধারে বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাস।

আলঙ্কারিকগণ তিন প্রকার বাক্যের কথা বলিয়াছেন—প্রভু-সম্মিত, সুহৃদ্‌-সম্মিত ও কান্তা-সম্মিত। প্রভুর আদেশ যেমন ভৃত্যের নির্বিচারে অবশ্য পালনীয়, সেই আদেশের বৈধতা বা অবৈধতা সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকারই তাহার নাই। বেদ ও স্মৃতির নির্দেশও তেমন সনাতন-পন্থীর নির্বিচারে অবশ্য পালনীয়। আবার বন্ধু যেমন নানাপ্রকারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নানারকমে প্রলুব্ধ করিয়া আপন বন্ধুকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়, পুরাণাদির বাক্যও তদ্রূপ। এইভাবে দেখিতে গেলে গীতার বাক্য আমরা সুহৃদ্‌-সম্মিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, যদিও গীতাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াই সাধারণতঃ গণ্য করা হয়। আবার পত্নী যেমন নানারূপ মিষ্টবাক্যে পতিকে যে নির্দেশ করে তাহাতে তিক্ততা থাকে না, এমনকি অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিলে একটা চক্ষুলজ্জাও থাকে না, অথচ তাহার শক্তি প্রভুর আদেশ বা বন্ধুর অনুরোধ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়, এবং এই আদেশ পালন করিতে পতি আনন্দই পান। কাব্যের ভাষা বা বাক্য কান্তা-সম্মিত, বলিয়া নির্দিষ্ট।

শ্রীমদ্‌ভাগবত মুখ্যতঃ প্রকৃষ্ট ধর্ম-সার হইলেও ইহা অনেকটা কাব্যধর্মীও বটে। তবে কাব্য-চর্চায় যেমন রসাস্বাদনের ভিতর দিয়া জ্ঞান আহরণের একটি সহজ সুযোগ পাওয়া যায়, তেমন এ প্রণালীর একটা মস্ত বড় বিপদও আছে। একটি দুরন্ত বালকের জ্বর হইয়াছে। সে কিছুতেই তিক্ত কুইনিন খাইবে না। বুদ্ধিমান্ হিতৈষী পিতা একটা সন্দেশের ভিতর কুইনিনের ট্যাবলেট পুরিয়া ছেলেকে দিয়া বলিলেন, "এই সন্দেশটা খাও", ছেলে আনন্দে সন্দেশ লইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বালক ফিরিয়া আসিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্দেশটা খাইয়াছ?" পুত্র বলিল, "হ্যাঁ বাবা, বীচিটা ফেলিয়া দিয়া সন্দেশটা খাইয়াছি।" আমরা অনেকেই ঐ বালকের মত অতি-চালাক ও অত্যধিক লোভ-পরায়ণ। অনেক সময় রোচক বলিয়া কেবল সন্দেশটুকু লইয়া মাতিয়া উঠি, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস হয় না। ভাগবতের ধর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। উদ্দেশ্য ভুলিলে কুফলই হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত সমাজে প্রচুর।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অপূর্ব ভাষা। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাষার দিক দিয়া ইহা অদ্বিতীয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ভাষা কতকটা ইহার অনুরূপ হইলেও এতটা মধুর বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাষা বস্তুতই বেশ কঠিন। মনে হয়, গ্রন্থকার যেন ইচ্ছা করিয়াই বাছিয়া বাছিয়া দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে অন্ততঃ একটা সুফল হইয়াছে। কতক-গুলি দার্শনিক শব্দের সহিত আমরা বাল্যাবধি এমনই পরিচিত হই যে, যে কোন স্থলে ঐরূপ শব্দ দেখিলে আমরা তাহার অর্থের প্রতি ধ্যান দিবার আবশ্যকতা বোধ করি না, মনে করি উহা তো জানিই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে

দেখা যাইবে যে আমরা কেবল শব্দটি বা তাহার কয়েকটি প্রতিশব্দই জানি, অর্থ কিছুই বুঝি না, টিয়াপাখীর বুলির মত অনর্গল উচ্চারণ করি মাত্র। যেমন 'ত্রিভুবনপতি'—এই শব্দটির সহিত আমরা এতই পরিচিত যে কেহ যদি এই শব্দটির অর্থ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তখন মনে করি, সে বুঝি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতেছে, এই শব্দটার আবার মানে জানি না। কিন্তু বাস্তবিকই ইহার প্রকৃত অর্থ আমরা ভাবিয়া দেখি না। শ্রীমদ্ভাগবত-কার বহু স্থলেই এইরূপ সাধারণ প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে এক একটা কটমট শব্দ ব্যবহার করিয়া পাঠকের পাঠের গতি সংযত করিয়া যেন শব্দটির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি 'ত্রিভুবনপতি' না লিখিয়া অনেক স্থলেই লিখিয়াছেন, 'ত্র্যধীশ'।

এইরূপ অন্যান্য স্থলেও। গ্রন্থকারের শব্দ-চয়ন যেমন উদ্দেশ্যমূলক রীতিটিও তেমন অনন্য-সাধারণ। তাহাতে মন্ত্রশক্তি ও রসমাধুর্য একাধারে বর্তমান।

এ হেন অপূর্ব গ্রন্থ সাধারণের বোধগম্য নয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহার বহু টীকা আছে। বাংলা ভাষায় পয়ারাদি সাধারণ ছন্দে এবং গদ্যেও কিছু কিছু অনুবাদ আছে, কিন্তু তাহা তদ্রূপ প্রচলিত নয়। অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের ভাগবত সম্বন্ধে জ্ঞান প্রধানতঃ কথকদের ব্যাখ্যান হইতে লব্ধ। যাঁহারা ভাগবতের মূল জানিতে আগ্রহান্বিত তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মূলের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছুক, কিন্তু সংস্কৃতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় টীকাটিপ্পনীর সাহায্যেও মূল বুঝিতে পারেন না। এবম্বিধ জ্ঞান-পিপাসুর কোন প্রকার সহায়তা হইবে ভাবিয়া পরমভাগবত তত্ত্বদর্শী পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর "ভাবার্থদীপিকা" অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতের (প্রথম শ্লোকের) মূলানুগত একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পরিপূর্ণ বিবৃতির নাম 'নীরাজন', শ্রীধর স্বামী যে 'দীপিকা' প্রজ্বালিত করিয়া ভাগবতের তত্ত্ব 'দর্শন' করিয়াছেন তাহা হইতে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভক্তচিত্তস্থিত শ্রীভগবানের আরাত্রিক করাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীধরস্বামী-কৃত মঙ্গলাচরণের শেষাংশ

যাঁহার কৃপা মূক (বোবা)-কে বাচাল করে, পঙ্গু (খোঁড়া)-কে পর্বত লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ-স্বরূপ মাধবকে বন্দনা করি।

শ্রীভাগবত একটি দিব্য-বৃক্ষ, ইহার জন্ম পরম সত্তা শ্রীভগবান্ হইতে, জগত্তারণ ইহার অঙ্কুর, ইহা দ্বাদশটি (১২) স্কন্ধ (কাণ্ড) দ্বারা ব্যাপ্ত, ইহার চারিপাশে শোভমান বিশুদ্ধ ভক্তি-রূপ আলবাল (জলদানার্থ বৃক্ষবেষ্টন করিয়া যে গর্ত থাকে), ইহার তিন শত বত্রিশ (৩৩২) টি শোভমান শাখা (অধ্যায়), অষ্টাদশ সহস্র (১৮,০০০) সুন্দর পত্র (শ্লোক)। এই বৃক্ষ অনায়াসলভ্য, এবং অন্যান্য বৃক্ষ (শাস্ত্র) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অভীষ্ট ফল-প্রদ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ, স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে, মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো, যত্র ত্রিসর্গো২মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং, সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

অন্বয়ানুবাদ ঃ—অন্বয়াৎ (অন্বয়হেতু), চ (এবং) ইতরতঃ (অন্বয় হইতে যাহা অন্য, অর্থাৎ 'ব্যতিরেক', তদ্ধেতু) যতঃ (যাঁহা হইতে) অস্য (এই পরিদৃশ্যমান জগতের) জন্মাদি (জন্ম

প্রভৃতি,—জন্ম, স্থিতি ও লয়), [যিনি] অর্থেষু (বিষয়ে) অভিজ্ঞঃ (পূর্ণজ্ঞানবান্), [যিনি] স্ব-রাট্ (স্বয়ং অন্যনিরপেক্ষরূপে বিরাজমান, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ), যঃ (যিনি) আদিকবয়ে (প্রথম কবি, অর্থাৎ আদি দ্রষ্টা, যাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব পদার্থ সর্বপ্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল সেই ব্রহ্মার নিকট) হৃদা (মনে মনে, সঙ্কল্পমাত্রে) ব্রহ্ম (বেদ) তেনে (বিস্তার, বিবৃত বা প্রকাশ করিয়াছিলেন)—যৎ (যে বেদ সম্বন্ধে) সূরয়ঃ (বিজ্ঞেরা) মুহ্যন্তি (বিমূঢ় হন), যত্র (যাঁহাতে) ত্রি-সর্গঃ (সত্ত্বাদি তিন গুণের সৃষ্টি), অ-মৃষা (মিথ্যা নয়)—যথা (যেমন) তেজোবারি-মৃদাম্ (সূর্যকিরণ, জল ও মৃত্তিকার) বিনিময় (পরস্পর একে অন্যের বোধ), [যে বস্তু] স্বেন ধাম্না (স্বকীয় প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা) নিরস্ত-কুহকম্ (সমস্ত ভ্রান্তি নিরস্ত করিয়া অবস্থিত) [সেই] পরং সত্যম্ (পরম সত্যস্বরূপকে) ধীমহি (ধ্যান করি)।

দীপিকালোক :—বেদব্যাস নানাপুরাণ (অষ্টাদশ মহাপুরাণ), শাস্ত্র (মহাভারতাদি ধর্মশাস্ত্র) ও প্রবন্ধ (ব্রহ্মসূত্রাদি) লিখিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিয়া, সেই সব শাস্ত্রে তৃপ্ত না হইয়া, নারদের উপদেশে, শ্রীভগবানের গুণ বিশেষভাবে পুনঃপুনঃ বর্ণনাত্মক শ্রীভাগবতশাস্ত্র রচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেই ভাগবতশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমদেবতার অনুক্ষণ স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন "জন্মাদ্যস্য—" ইত্যাদি শ্লোকে।

"পর"—পরমেশ্বর। "ধীমহি"—এই শব্দে ধ্যৈ-ধাতুর সহিত যে 'মহি'-প্রত্যয় আছে, তাহা সাধারণতঃ 'বিধি' অর্থে প্রযুক্ত হয়, এরূপ সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে 'ধীমহি' শব্দের অর্থ হয়—'আমাদের ধ্যান করা উচিত'; কিন্তু এস্থলে উহার অভিপ্রেত অর্থ—'ধ্যান করিতেছি'। বেদে এইরূপ অর্থ বুঝাইতে বিধিজ্ঞাপক প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে, এস্থলেও বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। "আমরা"—এই বহুবচন 'শিষ্য-দের সহিত আমি'—এই অর্থের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্লোকের সারার্থ হইল—'সেই পরম সত্যকে, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি'।

এক্ষণে 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ'—এই দুই প্রকার লক্ষণ দ্বারা সেই পরমেশ্বর কিরূপ তাহাই নির্দেশ করিতেছেন। 'সত্য' এই কথাটি 'স্বরূপ' লক্ষণ। অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ 'সত্য'। পরমেশ্বর যে সত্য-স্বরূপ তাহা কিরূপে বুঝি ? এইরূপে—'যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা', যাঁহাতে, যে পরমেশ্বরে, তিনটির অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মায়া বা প্রকৃতির এই তিন গুণের সৃষ্টি, অর্থাৎ পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে আবির্ভাব—'অ-মৃষা' মিথ্যা নয়, সত্য, ফলিতার্থ—পঞ্চমহাভূতাদির সৃষ্টি **বস্তুতঃ** মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া মনে হয়, কেন ?—না, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়াই উহারা আত্মলাভ করে, পরমেশ্বরের সত্যতায়ই উহারা বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং যাঁহার সত্যতায় মিথ্যাও সত্যরূপে প্রতীত হয়, তিনি যে 'পরম সত্য' সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—সূর্যকিরণ, জল ও মৃত্তিকাদির পরস্পর 'বিনিময়' অর্থাৎ 'বিপর্যয়' এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি। সূর্যকিরণে জলবুদ্ধি মরীচিকায়, মৃত্তিকা বা কাচাদিতে জল-বুদ্ধি ইত্যাদি যথাযথ বুঝিতে হইবে। এই সব ভ্রমস্থলে যেমন অধিষ্ঠানের (সূর্যকিরণাদির) সত্যতার জন্যই জলাদির সত্যত্ব বুদ্ধি হয়, সেইরূপ আধারভূত পরমেশ্বরের সত্যতায়ই মিথ্যা ভূতসর্গও সত্য বলিয়া মনে হয়। অথবা, "যত্র ত্রিসর্গঃ মৃষা"—এইরূপ পাঠও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ—যাঁহাতে, যে পরমেশ্বরে ত্রিসর্গ

মিথ্যা। অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, সৃষ্টি মিথ্যা। একমাত্র পরমেশ্বরেরই পরমার্থ সত্যত্ব। তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সকলের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্যই বলা হইয়াছে, 'যাঁহাতে ত্রিসর্গ মিথ্যা।'

এক্ষণে, **যাঁহাতে** এই ত্রিসর্গ মিথ্যা, বস্তুতঃ নাই—এরূপ বলিলে 'যাঁহাতে' এই শব্দ দ্বারা 'যে অধিষ্ঠানে' ইহাই বুঝায়। এক খণ্ড স্বচ্ছ স্ফটিকে রক্তবর্ণ জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ব পড়িলে শ্বেত স্ফটিক খণ্ডকে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে স্ফটিক খণ্ড 'অধিষ্ঠান,' জবা 'উপাধি'। সত্য অধিষ্ঠানের সহিত উপাধির সম্পর্ক হইলে ভ্রম উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর অধিষ্ঠান, তাঁহাতে সৃষ্টি-বিভ্রম হয়—ইহাই 'যাঁহাতে ত্রিসর্গ মৃষা' এই বাক্যে বলা হইল। তাহা হইলে পরমেশ্বররূপ অধিষ্ঠানে একটা উপাধির সম্পর্ক হয়—এরূপ কথাও আসিয়া পড়ে। সেরূপ কোন সম্পর্ক বাস্তবিক হয় না—ইহা বলিবার জন্য বলা হইয়াছে "স্বেন ধাম্না—" ইত্যাদি। নিজেরই (স্বতঃসিদ্ধ) ধাম (মহঃ, জ্ঞান) দ্বারা সর্ববিধ 'কুহক', মিথ্যাজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে যে পরমেশ্বরে। পরমেশ্বরের জ্ঞান স্বয়ং-সিদ্ধ (আমাদের জ্ঞান বিষয়-ইন্দ্রিয়াদির অধীন) সর্বদা অখণ্ড, অপ্রতিহতরূপে বর্তমান, কোন উপাধি শর্ত (Condition) দ্বারা তাহার তিরোধান বা আবরণ কোনরূপে কোনকালেই (জগদ্ভ্রমকালেও) সম্ভব নয়, যথার্থ কোন উপাধির সম্পর্কও তাঁহাতে নাই। সম্পর্ক যাহা হয় তাহা মায়িকমাত্র।

'জন্মাদ্যস্য—' ইত্যাদি কথায় পরমেশ্বরের তটস্থ লক্ষণ[১] নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয়, যাঁহা হইতে ও যাঁহাতে হয়, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। তিনিই যে বিশ্বের জন্মাদির কারণ, তাহা 'অন্বয়' ও অন্বয়ের বিপরীত (ইতর) অর্থাৎ 'ব্যতিরেক' দ্বারা প্রমাণিত হয়। কার্যে (সৃষ্ট পদার্থে) পরমেশ্বর সং-রূপে অনুস্যূত আছেন, প্রত্যেক পদার্থই 'আছে' এইরূপে প্রতিভাত হয়—ইহা 'অন্বয়'। আর যাহা কার্য (সৃষ্ট পদার্থ) নয় (যেমন আকাশ কুসুম, বন্ধ্যা-পুত্র, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি) তাহাতে সত্তার (অস্তিত্বের) প্রতীতি হয় না—ইহাই ব্যতিরেক। অথবা, 'অন্বয়' শব্দের অর্থ 'অনুবৃত্তি' (অনুস্যূত থাকা), এবং 'ইতর' শব্দের অর্থ 'ব্যাবৃত্তি' (অনুস্যূত না থাকা)। যেমন, মৃত্তিকা মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট-শরাবাদিতে অবশ্য বর্তমান থাকে, সুবর্ণ কেয়ূর-কুণ্ডলাদিতে বিদ্যমান থাকে (ইহা অনুবৃত্তি), কিন্তু ঘটশরাবাদি মৃত্তিকাতে অনুবৃত্ত থাকে না (ইহা ব্যাবৃত্তি)। এইরূপ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি দেখিয়া মৃত্তিকাকে ঘটশরাবাদির জন্মাদির (উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের,—মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, আবার তাহাতেই লয় পায়) 'কারণ' বলিয়া নির্ধারিত হয়। এইরূপ এই সৃষ্ট জগতের কারণও 'সত্তার' অনুবৃত্তি এবং জগতের ব্যাবৃত্তি দেখিয়া পরমেশ্বরকেই নির্দিষ্ট করিতে হয়।

"জন্মাদ্যস্য—" ইত্যাদি কথার অন্য প্রকার অর্থও করা যাইতে পারে, যথা,—যাহা কিছু সাবয়ব (অংশযুক্ত) বস্তু, তাহা সকলেই কার্য

[১] কোন বস্তুর নির্দেশ করিতে হইলে তাহার দুই প্রকারের লক্ষণ বলিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া যায়, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ—যেমন গঙ্গার স্বকীয় স্বাদ, জল ইত্যাদি দ্বারা যখন গঙ্গার নির্দেশ করা হয়, তখন সেই সকল স্বরূপ-লক্ষণ। আবার, গঙ্গার তটে বর্তমান নগর, ক্ষেত্র, পর্বতাদির দ্বারা যখন গঙ্গার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহা তটস্থ লক্ষণ। অথবা, যে সমস্ত গুণ বা ধর্ম বস্তুর স্বাভাবিক, সর্বদা বর্তমান অপরিবর্তনীয়, তাহাই উহার স্বরূপলক্ষণ, আর, যাহা বাহ্য, আগন্তুক, সাময়িকভাবে বর্তমান, অথচ যাহার সাহায্যে বস্তুটিকে চিনিবার সুযোগ হয়, তাহাই উহার তটস্থ লক্ষণ। যেমন, কেহ যদি বলে, "ঐযে যে বাড়ীটার উপর একটা কাক বসিয়া আছে, ঐটাই রামের বাড়ী," তবে ঐ স্থলে 'কাক' বাড়ীর তটস্থ লক্ষণ।

(effect), কোন কারণ হইতে উৎপন্ন, একটা কারণের সহিত অন্বিত, ইহাকে বলা যায় 'অন্বয়'। আর যাহা তদ্রূপ নয়, তাহা কার্য নয়—ইহা হইল 'ব্যতিরেক'। এই জগৎও সাবয়ব পদার্থ, অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রমাণের বলে ইহার কারণ নিরবয়ব পরমেশ্বরই নিরূপিত হইতে পারেন। এই ভাবে শ্লোকের তাৎপর্যার্থ হইবে —'যে নিরবয়ব কারণ-রূপ পরমেশ্বর হইতে এই সাবয়ব বিশ্বের জন্মাদি হয়, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। শ্রুতি (বেদ)-ও বলেন, "যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্মে, যাঁহার বলে ইহারা জীবিত থাকে, এবং যাহাতে পুনঃ প্রবেশ করে—" ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রও বলেন, "আদি যুগের প্রারম্ভে যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, এবং যুগাবসানে যাঁহাতে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হয়—" ইত্যাদি। সুতরাং যুক্তি, শ্রুতি ও স্মৃতি এই ত্রিবিধ প্রমাণেই পরমেশ্বর জগতের জন্মাদির কারণরূপে স্থিরীকৃত।

তবে কি সাংখ্য-দর্শনে কথিত 'প্রধানই' জগৎকারণ বলিয়া এস্থলে ধ্যেয়রূপে অভিপ্রেত হইয়াছে? না, অভিজ্ঞ-শব্দ দ্বারা সাংখ্যোক্ত প্রধান নিরাকৃত হইয়াছে। 'অভিজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'পরিপূর্ণ-চৈতন্য', সাংখ্যোক্ত প্রধান জড়, চৈতন্য-শূন্য। সুতরাং এই শ্লোকে লক্ষিত কারণ 'প্রধান' হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন, "তিনি 'ঈক্ষণ' করিলেন, 'লোকসকল সৃজন করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি লোকসকল সৃজন করিলেন।" "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রেও ঐরূপ যুক্তিই দেখান হইয়াছে।

তবে কি জীবই কারণ?—না, জীবের কারণতা নিরাস করিবার জন্যই শ্লোকে 'স্বরাট্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'স্ব-রাট্' শব্দের অর্থ যিনি 'স্বয়ং বিরাজমান, প্রকাশমান', অর্থাৎ স্বতঃ-সিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞান। জীবের জ্ঞান পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র নয়। ইন্দ্রিয়-বিষয়াদি না থাকিলে জীবের কোন প্রকারের জ্ঞানই হইতে পারে না।

তবে কি ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) কারণরূপে লক্ষিত? বেদে বলা হইয়াছে, "প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, তিনি সমস্ত ভূতের একমাত্র পতি ছিলেন"। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে ব্রহ্মাও এই শ্লোকে কারণরূপে লক্ষিত নয়। এই শ্লোকের লক্ষ্য যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি "তেনে ব্রহ্ম—" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্লোকোক্ত আদিকারণ আদিকবি (ক্রান্তদর্শী, ঋষি) ব্রহ্মার নিকট বেদ প্রকাশ করেন। ইহার অনুকূল বেদবাক্য—"যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাকে (সেই ব্রহ্মাকে) বেদসকল প্রদান করেন, যিনি আত্মা ও বুদ্ধির প্রকাশক, মুমুক্ষু আমি সেই দেবের শরণ লইতেছি"। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মা অপর কাহারও নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ কথা তো কুত্রাপি বলা হয় নাই। ঈদৃশ আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ প্রসিদ্ধি নাই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মার নিকট বেদার্থ-প্রকাশ 'হৃদা' (মনসা—মনে মনে, সঙ্কল্পমাত্রে, বাহ্যতঃ নহে) হইয়াছিল।

এই যে 'ব্রহ্মার বেদার্থবোধ'—ইহাদ্বারা এই শ্লোকে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থও সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই গ্রন্থেই পরে বলা হইয়াছে —"পূর্বে (কল্পের আদিতে) ব্রহ্মার হৃদয়ে (সৃষ্টি-বিষয়িনী) স্মৃতি-উদ্বুদ্ধকারী, যাঁহার মুখ হইতে শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গ-যুক্ত সরস্বতী (বাণী, বিদ্যা, বেদ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, জ্ঞানদাতাদের শ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" (ভাঃ ২, ৪, ২১)।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় স্বয়ং কল্পারম্ভে বেদ স্মরণ করেন, পরমেশ্বরের প্রবর্তকত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা হইয়াছে—"যস্মিন্

মুহ্যন্তি সূরয়ঃ"—যে বেদবিষয়ে জ্ঞানীরাও বিমূঢ়। ব্রহ্মার জ্ঞান পরাধীন, অতএব স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান পরমেশ্বরই জগৎ-কারণ, ব্রহ্মা নহেন।

অতএব পরমেশ্বরই সত্য, এবং অসত্যেরও সত্যত্ব-বোধক বলিয়া তিনিই পরম সত্য, এবং সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় তাঁহার চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তিনিই সমস্ত ভ্রান্তিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে। 'তাঁহাকেই ধ্যান করি'—এইরূপ গায়ত্রীমন্ত্র[২] দ্বারা গ্রন্থারম্ভ হওয়ায় এই পুরাণ (ভাগবত) গায়ত্রী-নামক ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপ—ইহাই প্রদর্শিত হইল। যেমন পুরাণ-দান সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে: "যে গ্রন্থে গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহাতে বৃত্রাসুরের বধ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই 'ভাগবত' বলিয়া সম্মত। সেই গ্রন্থ লিখিয়া স্বর্ণ-নির্মিত সিংহ সহিত প্রৌষ্ঠপদী (ভাদ্র) মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যিনি দান করেন, তিনি পরম-পদ প্রাপ্ত হন। সেই পুরাণ ১৮০০০ শ্লোকাত্মক বলিয়া কথিত"। অন্য পুরাণেও আছে—"যে গ্রন্থ ১৮০০০ শ্লোকযুক্ত, দ্বাদশস্কন্ধ-মণ্ডিত, যাহাতে হয়গ্রীব-বিদ্যা ও বৃত্রবধ বর্ণিত আছে, এবং যাহার প্রারম্ভ গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা—তাহাই ভাগবত বলিয়া বিদিত"। পদ্মপুরাণেও শুক-কথিত এই পুরাণকেই 'ভাগবত' বলা হইয়াছে: "হে অম্বরীষ, শুক-কথিত ভাগবত নিত্য শ্রবণ করুন, এবং যদি সংসারক্ষয়ের (মোক্ষের) ইচ্ছা থাকে, তবে নিজ মুখেও এই গ্রন্থ পাঠ করুন" (গৌতম-বাক্য)। অতএব ভাগবত অন্য গ্রন্থ, এই গ্রন্থ নয়—এরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে।

২ গায়ত্রী-মন্ত্রে বলা হইয়াছে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্তিত করেন। এই শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বর আদিকবির বুদ্ধিও উদ্বোধিত করেন।

তারা শুধু জানিয়াছে স্বরূপ তোমার

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অতীতের প্রতিধ্বনি অনাগত উদয়ের ক্ষণে
জানি তুমি শুনাইবে মহামানবের কণ্ঠ হ'তে।
বিচিত্র ঘটনা যত মিশে যায় মহাকাল-স্রোতে,
একদা ফিরিবে তারা জন্মান্তর সনে, জনে জনে—
জীবনের জাগরণ শুনায়ে শুনায়ে মন্দ্ররবে
ধ্বনিবে সিন্ধুতে নভে মিলনের মধুর উৎসবে।

ধরণীর প্রতি রাত্রিদিনে যুগে যুগে যত বাণী
যত কর্ম যত ভাব চির সাধনার অনুরাগে,
পরাণের অভিব্যক্তি নিয়ে সদা জনারণ্যে জাগে,
তারা সব ব্যোমগর্ভে ভাসে, মর্মে মর্মে দেয় আনি

বিস্মৃত বিগত-বার্তা এ সংসারে প্রাণের খেলায়,
সংখ্যাতীত শতাব্দীর সাথে নিত্য আনন্দ-মেলায়
মর্ত্যকায়া মাঝে, অদৃশ্য লোকের সনে জানাজানি
চলে চিরদিন,—তরঙ্গের খেলা এপারে ওপারে
ভাবের বুদ্বুদ ওঠে আর মিশে যায়। বারে বারে
যে শক্তির চলে নৃত্য পরব্রহ্মে সুরে অহরহ,
তাহারি নর্তন-লীলা ক্ষুদ্র অণুপরমাণু-বুকে,
জন্মমৃত্যু রহস্যের অন্তরালে আবর্তিত সুখে।

দুর্জ্ঞেয় মহান্ কে গো মর্ত্য জন্ম ধরি হেথা কহ
তোমার সৃষ্টির কথা, বিশ্বভূমে রচি কুহেলিকা!
জীবন-সারথি হয়ে জীব-রথে জ্বালি দীপশিখা
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ দুর্যোগের পথে পথে বেদনা দুঃসহ
নিয়েছ আপন বক্ষে জীবের কল্যাণে অশ্রু-ঝরা
পৃথ্বী-আয়তনে।

নব নব রূপে রূপে দিলে ধরা
অসীম অনন্ত লোকে ভাগবত হ'তে ভিন্ন নহ।

তারা শুধু জানিয়াছে স্বরূপ তোমার—পরিচয়
দিল তব, তীর্থময় করি' বিশ্ব-লোক! প্রেমময়
হয়ে তুমি প্রাণী মাঝে প্রাণের গহনে করো লীলা,
উৎস করো উৎসারিত—দ্রবীভূত করি শৈল-শিলা,
মরুরে শ্যামল করি' বেদনাতে আপনারে দহ।
তোমারে প্রণাম প্রভু!
মায়ার বন্ধন হ'তে মুক্ত মোরে করিবে কি কভু?

'সমাজায় ইদম্'

শ্রীমতী অলকা রায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এদেশের ভাব-জগতে যে এক বিপ্লবের সূচনা হয়, স্বামী বিবেকানন্দ সে নবচেতনার পুরোধা, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুষ্ক নৈষ্ঠিক উপচার-বহুল ধর্মের অন্তঃসার-শূন্যতার প্রকৃত পরিচয় চিত্রিত করলেন তিনি সমাজের কাছে, আর পরিবর্তে মানবতার ধর্ম—হৃদয়ের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করলেন,—এই হ'ল তাঁর মহৎ কীর্তি। জনসেবার আদর্শের চরম মূল্য নির্ধারিত হয়েছে বোধ করি তাঁর নবসৃষ্ট 'দরিদ্র-নারায়ণ' কথাটিতে। স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র, স্বাধীন আত্মবিকাশের অভিনব ভাবনা আপ্যায়িত হ'ল তাঁর অমর-বাণীতে। ঘুমন্ত জাতিকে তিনি বজ্রনির্ঘোষে দিয়ে গেলেন জাগরণের প্রেরণা—দীক্ষা দিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' মন্ত্রে। বলে গেলেন—জনসেবাই দেশসেবা, জনসেবাই ঈশ্বরের আরাধনা, তাই শুনি তাঁর কণ্ঠে যুগান্তর-কারী সেবাধর্মের মহামন্ত্র :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

চিরকালের প্রেমসাধনার পথযাত্রীর বীণাতারে এমনিতরো একই সুরের মূর্ছনা ছন্দায়িত হয়ে ওঠে, রবিকবির কণ্ঠেও এই বাণীর প্রতিধ্বনি :

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।

'বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত' সর্বহারা-দের কথা ভেবেই কবির লেখনী আবার মুখর হয়ে ওঠে—রেখে যায় সাবধানবাণী :

বিধাতার রুদ্র রোষে, দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।

হতাশার ঘনঘোর কালো ছায়ায় দেশের আকাশ আচ্ছন্ন, তাই কবি-মনে জাগে উদ্বেগ—অশিক্ষা কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যে খর্বশক্তি, অনাদৃত অগণিত দেশবাসীর কাছে তাদেরই সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে—তাই কবি বলে যান :

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা',

নচেৎ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা অসম্ভব।

অহিংস গণ-আন্দোলনের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী তাঁর সুগভীর প্রেম ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন দেশের মর্মবেদনা—দেশবাসীর হৃদয় পাঠ ক'রে বুঝেছিলেন কোথায় তার দৈন্য, কি তার প্রয়োজন। তিনি বুঝেছিলেন সংগ্রাম শুধুমাত্র বৈদেশিক নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য নয়, অর্থনৈতিক শোষণ-মুক্তিও এর অঙ্গীভূত। এজন্যই তাঁর পরিকল্পনার কর্মসূচীতে গ্রামোদ্যোগ, বুনিয়াদী শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, সমাজসংস্কার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। মানবের প্রাথমিক দাবি—অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন—'ক্ষুধিত মানবের কাছে ভগবান একমাত্র রুটির আকারেই আবির্ভূত হ'তে পারেন।' আধ্যাত্মিক উন্নতি তো এক ধাপ পরের কথা, কারণ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণ' আর গান্ধীজীর 'হরিজন' সমাজসেবার মন্দিরে উপাস্যের নব নামকরণ।

ভাগ্যবিধাতার দুর্বোধ্য বিধানে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি

আর গান্ধীজীর জীবন-নাট্যের শেষাঙ্ক একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে রইল। তাই রাজনৈতিক মুক্তির পরবর্তী পরিকল্পনা সমাজসেবাব্রতের প্রযোগ-চিত্র তিনি সফল ক'রে যেতে পারলেন না।

ব্যক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়—কিন্তু ইতিহাস এগিয়ে চলে,—অবাধ তার গতি, অসীম তার পরিধি। কালচক্রের চলে অভিযান—আর তারই প্রতিটি মুহূর্তের রেখাঙ্কন বক্ষে ধারণ ক'রে চলেছে ইতিহাসের ধারা।

যেন বিধাতারই অনুগ্রহে গান্ধীজীর উত্তর সাধক বিনোবার আবির্ভাব—ভারতগগনে সহসা উল্কার মতো নয়, তাঁর বর্তমান পরিচয়ের পেছনে রয়েছে তাঁর আশ্রম-জীবনের সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসরের সাধনা, গ্রাম-জীবনের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক পরিচয় আজীবন, ভারতের মূল সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সুগভীর।

মহাপ্রয়াণের পর গান্ধীজীর পার্শ্বচর গঠন-কর্মীরা মিলিত হয়ে স্থাপন করলেন 'সর্বোদয় সমাজ', বিনোবা রইলেন এর পুরোভাগে। ইতঃপূর্বে আশ্রমবাসী ছাড়া দেশবাসীর কাছে বিনোবার পরিচয় ছিল সামান্য, শুধুমাত্র ১৯৪০খৃঃ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় উপযুক্ত বিবেচনায় গান্ধীজী বিনোবাকে একাজে নিযোগ করেন—সর্বজন-সমক্ষে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এ ছাড়া একান্ত সাধনায় ইনি তাঁর জীবন গড়ে তুলেছেন। একদিন প্রথম যৌবনে বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে ইনি বেরিয়ে পড়েছিলেন ব্রহ্মের সন্ধানে—আজও তাঁর সন্ধান চলেছে—কিন্তু নির্জন গুহাবাসে নয়, সমাজের মধ্যেই মানুষের সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠছে।

এই সমাজসেবার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে আত্মার সহজ বিকাশের জন্য মানবকে কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক সকল প্রকারের বন্ধন থেকে মুক্ত করাই বিনোবাজীর প্রথম প্রচেষ্টা, লক্ষ্য 'সর্বোদয় সমাজ' প্রতিষ্ঠা। মনীষী রাস্কিনের (Ruskin) 'Unto This Last'-এর পরিভাষা হিসাবে 'সর্বোদয়' নামকরণ গান্ধীজীর। এ সমাজের আদর্শ হবে সর্বজনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। দৈহিক, মানসিক, আত্মিক জগৎ নিয়ে একটি পূর্ণ-মানব। তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হ'লে প্রত্যেক দিকের বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে সহজ গতিতে, আর তারই অনুকূলে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

বুভুক্ষু দেশবাসীর আকুল ক্রন্দন, লক্ষ প্রাণের বক্ষবেদনা, মানবতার পূজারী বিনোবাকে আশ্রমের শান্ত পরিবেশে স্থির হ'তে দিল না—সর্বহারাদের ডাকে গৃহছাড়া বিনোবা তাদের প্রাথমিক দাবি অন্নবস্ত্রের সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হলেন। জনহীন প্রান্তর, বিপদসঙ্কুল পথ, আশাভঙ্গের সম্ভাবনা প্রতিমুহূর্তে—তবুও ক্ষীণকায় ষষ্টিপর বিনোবা এগিয়ে চলেন পদযুগল সম্বল ক'রে পল্লীর পথে প্রান্তরে, তার মর্মতলে। দীপ জেলে দেন ঘনসুনিবিড় ছায়ান্ধকারে যদি কেউ সাড়া দেয় দুঃখরাতের এই তীর্থযাত্রীর চরম আহ্বানে। বিনোবা জানেন, বিগত দুইশত বৎসরের বিদেশী শাসনের আওতায় গড়ে-ওঠা শিল্পযুগের অর্থনীতি প্রাণরস নিঙ্ড়ে নিয়েছে ভারতের পল্লী থেকে, তাই পল্লীভারত আজ নিঃস্ব, মুমূর্ষু, প্রায় শ্মশান-ভূমিতে পরিণত। পল্লীর পুনরুজ্জীবন নবক্রান্তির প্রধান লক্ষ্য। কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষককে ভূমি-দান ক'রে গ্রামে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এখন প্রাথমিক প্রযোজন। ভূমিকে কেন্দ্র করেই তাঁর নব-অর্থনীতির উদ্ভাবনা। তাই তাঁর কাছে ভূমির মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।

সমগ্র ভারতে ত্রিশ কোটি একর আবাদী জমি। পাঁচকোটি ভূমিহীনের প্রত্যেককে এক একর জমি দিলে সমগ্র আবাদী জমির এক ষষ্ঠাংশের প্রযোজন। বিনোবাজী তাই প্রতি গৃহে নিজেকে ষষ্ঠ পুত্রের

স্থানাভিষিক্ত ক'রে সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ সমাজের ষষ্ঠ পুত্র দরিদ্ররূপী নারায়ণের জন্যে দাবি করতেন —এই হ'ল তাঁর আন্দোলনের গোড়ার ইতিহাস। কিন্তু এ ভাবনার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে,—এখন 'ভূদান' গ্রামদানে পরিণত। গ্রামদানের ফলে ভূমির গ্রামীকরণ সম্ভব হচ্ছে। গ্রামবাসীরা একত্র মিলে যখন সমগ্রভূমির স্বত্ব গ্রামের নামে উৎসর্গ করে তখন একটা সামগ্রিক ভাবনা আসে গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে। ভূদানের মূলনীতি এখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ভূমিদানই সব নয়, 'মালিকানা' বিসর্জনই মূল কথা। শুধু ধনীর মনেই যে অধিকার-বোধের প্রবৃত্তি শিকড় গেড়ে রয়েছে তা নয়, দরিদ্রের মধ্যেও তা ব্যাপ্ত। লক্ষ টাকার আকর্ষণ আর সামান্য ছিন্নবস্ত্র বা ভিক্ষার ঝুলির মায়া একই মনের বিকার। সমাজ থেকে এ স্বামিত্ব-বোধের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার অবসান যে দিন হবে, সেদিন সফল হবে সাম্যের সাধনা। বিনোবার মতে আলো হাওয়া আর জলের মতো ভূমিতেও সকলের সমান অধিকার—অর্থের সাহায্যে এদের মূল্য-নির্ধারণ একটা প্রথা মাত্র—এ স্বার্থপর মানব-মনের অভিক্ষেপ।

'সবৈ ভূমি গোপালকী'—এই মন্ত্রই আজ গ্রামের আকাশে বাতাসে মুখরিত হয়ে উঠুক। নতুন দিনের নতুন সূর্য তার শুভ আবির্ভাবের দিনে কোন্ রঙে রাঙিয়ে দেবে মানুষের দৃষ্টিকে তা কে জানে? তবে একত্বের মন্ত্র সেদিন উচ্চারিত হবে গৃহে গৃহান্তরে—তখন পল্লীময় এক পরিবারের ব্যাপ্তি দূর ক'রে দেবে অন্তরের অতৃপ্তি। বিনোবা বলেন, গ্রাম-পরিবার রচনায় পরিবার-ত্যাগ নয়, পরিবার-বিস্তারই হ'ল আসল কথা। ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, কাজেই সকলের সঙ্গে মিলনই ভগবানের সঙ্গে মিলন।

বিশ্বে আজ যে কালনাগিনীর বিষ উদ্গীরণ হচ্ছে—হিংসাবহ্নি, পুঞ্জীভূত আক্রোশ আর মারণাস্ত্রের কুহকজালে অন্ধদৃষ্টি মানবের আকুল ক্রন্দনে দিগ্‌দিগন্ত যেখানে মথিত, সেখানে শান্তি একমাত্র প্রেমের পথেই আসতে পারে। যে ভারত একদিন মানবের ভাবজগতে ছিল পথিকৃৎ, আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নবেলায় তপন-তাপ-দগ্ধ বিশ্বে শান্তি-বারি সিঞ্চন করতে হবে তাকেই—তারও আগে প্রয়োজন আপন গৃহ-সমস্যার সমাধান। একমাত্র তখনই অপরের বিশ্বাস অর্জন করবে ভারত—একমাত্র তখনই বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে।

"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী—আমাদের সুখ সম্পত্তি একলার নহে"। একাকী ভোগের ভাবনাকেই লুপ্ত ক'রে দিতে হবে আজ। তাই নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে বিনোবার মুখে—'সমাজায় ইদম্'—এসব কিছু সমাজের। নবসুরের ঝঙ্কার তোলে, 'সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু'। আমরা সকলকে একসঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করব—সকলে একত্র ভোগ করব। উপনিষদ্ বলেছেন—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'—আর গীতায় একই কথার অভিব্যক্তি দেখি অন্যভাবে, "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"

পূর্বদিগন্ত রঞ্জিত হয়ে উঠেছে অরুণোদয়ের সম্ভাবনায়, জাগ্রত জনগণদেবতার শুভাগমনের পদধ্বনি বুঝি শোনা যায়। এই যে সমাজ-কল্পনা—এখানে ব্যক্তির মূল্য-নিরূপণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, অথচ ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের রয়েছে স্বীকৃতি। এর বীজমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সেই তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠেঃ 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে।

নবজীবনপথে নতুন অভিযাত্রী মানব-বন্দনার

ধ্বজা বহন ক'রে এগিয়ে চলেছেন—দুঃখের রক্ততিলক তাঁর ললাটে—বন্ধুর পথে তাঁর দুর্গম যাত্রা চেতনা সঞ্চার করে জড়ের মধ্যে—প্রেমের হাতে লুণ্ঠন ক'রে নেয় যত ঐশ্বর্য—হৃদয়ের সর্বস্ব। সে প্রেম তাঁকে বলে বিরাগ নয়—অনুরাগ, যে অনুরাগে মাতা পুত্রের মুখে সকল ভোগ্য তুলে দিয়ে নিজে উপবাসী থেকে অনুভব করেন আত্মার প্রশান্তি, যে অনুরাগে ঈশা শিরে কণ্টক-মুকুট ধারণ করেন, যে অনুরাগ রাজপুত্রকে করে ভিখারী—সেই অনুরাগের প্রতিষ্ঠা হবে সমাজে। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজার বিধান আছে, তাই সমাজ-সেবীর বাক্যেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করি :

আত্মা কোন এক দেহে নহে, সর্বত্র বিদ্যমান। তাহার মধ্যে আমাদের দেহ অন্যতম। আমরা একা একা মিষ্টান্ন খাইয়া থাকি, তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়। কিন্তু যখন আমরা সকলের সহিত মিলিত হইয়া একসঙ্গে গরীবের সাদাসিধা খাদ্য ভোজন করি তখন আমাদের অধিকতর আনন্দ হয়। কারণ, তাহাতে আত্মার ব্যাপকতা সাধিত হয়। যদি মানুষ একা ধ্যান করে তবে তাহাতে সে আনন্দ পায় বটে, কিন্তু পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে বসিয়া মৌন প্রার্থনা করিলে উহাতে অধিকতর আনন্দ হয়। এরূপে সব লোক একত্র হইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে তাহা হইতেছে ব্যাপকতার আনন্দ। আত্মা ব্যাপক হইবার জন্য সতত ব্যাকুল।

জয়রামবাটী-পরিক্রমা

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

'জয় মহামাঈকী জয়!' ব'লে জয়ধ্বনি করতে করতে নামলেন ভক্তেরা 'বাস্' থেকে। সামনে অক্ষয়-তৃতীয়ার উৎসব, তাই তাঁরা এসেছেন, জয়রামবাটীতে—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদামণি-দেবীর জন্মস্থানে—তীর্থদর্শন করতে। বাঁকুড়া জেলার এই গ্রামটি সারা পৃথিবীর তীর্থ। কলি-কাতা থেকে দূরত্ব—সোজা পথে তারকেশ্বর হয়ে ৬৩ মাইলের বেশী হবে না। কিন্তু সে পথ ভাল নয়, আর সে দিকের কোন যানবাহন নিয়মিত চলে না। এই জন্যে ঘুরে রেলপথে, হাওড়া থেকে বিষ্ণুপুর (১২৫ মাইল) সেখান থেকে বাসে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এখানে আসতে হয়।

এ স্থানের তীর্থমাহাত্ম্য সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলেন—মা-ঠাকরুনের দ্বারী স্বামী সারদানন্দ, তিনিই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই থেকে এর মহিমা বেড়ে চলেছে। এই দিনটি স্মরণ ক'রে প্রতিবছরই একটি বড় রকমের উৎসব হয়, তাতে যোগ দিতে বহু ভক্ত এসে থাকেন।

বাস থেকে নেমে ধুলো-পায়ে মাকে প্রণাম ক'রে ভক্তেরা আশ্রমের অধ্যক্ষ-সমীপে উপস্থিত হ'তেই তিনি সকলের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল জল খাবারের। মায়ের বাড়ীতে মায়েরই মত আদর যত্ন। স্নানাদি সেরে মন্দিরে একটু বসতেই দূরে গেল পথশ্রম, ঘুচে গেল মানসিক গ্লানি।

বেদীতে বসে আছেন 'মা'। সারদানন্দ স্বামী বসিয়েছিলেন ঐ তৈলচিত্র, মায়ের শতবার্ষিকীর

সময় বসানো হয়েছে মর্মর মূর্তি। বেদীর নিচে সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুর। ঠাকুরই দিয়েছিলেন 'মা'কে এই উচ্চ স্থান—ষোড়শী পূজা ক'রে।

*　　*　　*

ভোর হ'তে এখনও দেরী। জল জল করছে আকাশের তারা। 'ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং' বাজছে মন্দিরে ঘণ্টা, 'গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ' বাজছে শং ফুটো। প্রভাতী রাগে সানাই বেজে বিঘোষিত ক'রে দিল মধুর স্বরে অক্ষয়-তৃতীয়ার উৎসব। গ্রামবাসীরাও এলেন, ভক্তেরাও ছুটে এলেন, মঙ্গল আরতি দর্শন করতে। জগজ্জননী করুণাময়ী মূর্তিতে বসে আছেন, ভাবছেন ভক্তেরা। তাঁদের স্নেহময়ী মা ঐ বসে আছেন, দেখছেন সন্তানদের।

একের পর এক অনেক অনুষ্ঠান হ'ল :

গ্রাম সঙ্কীর্তন, বিশেষ পূজা চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, সভা, সন্ধ্যারতি, ভজন সঙ্গীত, ইত্যাদি। যোগ দিলেন অসংখ্য ভক্ত সে উৎসবে। সারবন্দী গরুর গাড়ী, পথচারী, দূরদূরান্তরের গ্রাম থেকে এল জয়রামবাটীতে উৎসবে আর মেলায়।

*　　*　　*

উৎসব শেষ। পরের দিন চলেছেন ভক্তেরা তীর্থ দর্শনে। সে তীর্থের কেন্দ্র ঐ মন্দির, যার হৃদয়কমলে ঐ বেদী। 'মা' বসে আসেন কমলাসনে, অজানা গ্রাম জয়রামবাটীতে, অখ্যাত দরিদ্র রামচন্দ্রের বাড়ীতে। গ্রাম্য সমাজে সংসারী-প্রকৃতি লোকের মাঝে মা এসেছিলেন—মানবী-শরীরে। ঐখানে ঐ তাঁর জন্মস্থান, বেদী সেইখানেই। এখানেই হয়েছিল বিবাহ 'সারদা'র সাথে গদাধরের, হরপার্বতী-মিলনের মত। ঐই বিয়েতে পুড়ে গিয়েছিল মাঙ্গলিক সুতো। সাংসারিক বন্ধন দূর ক'রে শিবশক্তির মিলনমাত্র রেখেছিলেন অগ্নিদেব সে বিবাহে। কতবার এসেছেন ঠাকুর এখানে। কত হাসি গান, কত নৃত্য, আমোদ-আহ্লাদ, সকলকে নিয়ে করেছেন আনন্দময় গদাধর।

একটু দূরেই পরবর্তীকালের বাড়ী, শ্রীশ্রীমায়ের যখন ন' বছর বয়স তখন তাঁর বাবা ওখানে আলাদা বাড়ী ক'রে, সপরিবারে বাস করতে থাকেন। ওখানেও ঠাকুর এসেছেন অনেকবার। বাড়ীটি শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় বেলুড় মঠ থেকে কিনে নিয়ে যত্ন ক'রে রাখা হয়েছে। এইটি মায়ের পুরাতন বাড়ী। ভক্তেরা এখন ঐ পবিত্র স্থানে ব'সে ঠাকুর ও মা-ঠাকরুনের স্মরণ-মনন করেন। মন্দির থেকে এই বাড়ীতে আসবার পথেই পড়ে মায়ের নতুন বাড়ী, যা স্বামী সারদানন্দ ক'রে দিয়েছিলেন। অনেক ভক্ত বাইরে থেকে মা-কে দর্শন করতে আসতেন, তাঁদের থাকা-খাওয়া, বিশ্রামের সুবিধা পুরাতন বাড়ীতে হ'ত না বলে এই বাড়ী হয়েছিল। এই বাড়ীতেই অধিকাংশ ভক্ত মাকে দর্শন করেছেন ও তাঁহার কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। মা-ও এখানে স্বচ্ছন্দে, সারা দিন ধরে নিজের ছেলে-মেয়ের মতই তাঁর ভক্তদের নানাভাবে স্নেহযত্ন করেছেন। তাঁদের জলখাবার দেওয়া, তাঁদের জন্যে রান্না করা, খেতে দেওয়া, শুতে দেওয়া, নিজের হাতে তাঁদের এঁটো পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, মন্ত্র দেওয়া, ঠাকুরের কথা বলা—সব কাজের মধ্যেও কিন্তু তিনি ছিলেন অবগুণ্ঠনবতী, বিশেষতঃ পুরুষদের সামনে—ভক্ত হ'লেও।

*　　*　　*

মন্দিরের কাছে টিনের ঘরখানিতে আছেন ধর্মঠাকুর, সুন্দরনারায়ণ আর কালীমণ্ডপ এখানে মা খাবার পাঠাতেন ঠাকুরদের জন্যে—যখন যেমন জুটত, মায় রুটিগুড়, সে দেবতাও তাঁর ছেলে—এই ভেবে। গাঁয়ের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায়, 'মা'র মন্দির থেকে

অল্প দূরে সিংহবাহিনীর মাড়ো, ওদেশে মন্দিরকে বলে মাড়ো। এখানে 'মা' হত্যে দিয়েছিলেন একবার তাঁর অসুখের সময়, ওষুধ পেয়েছিলেন, ব্যবহার ক'রে সেরেও গিয়েছিলেন। ভগবতী গোপনে এসে দেখালেন জগৎকে—আজও দেবতারা জাগ্রত, আজও তাঁরা আর্তের ডাকে সাড়া দেন, ওষুধ দেন, তাতে রোগ সারে। ওই মাড়োতে নিয়মিত পূজো পাঠাতেন মা, বিশেষ ক'রে জগদ্ধাত্রী পূজোর সময়—শেখাতে সকলকে এও ভক্তির একটি অঙ্গ। এখানেও ভিড় হয় অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন। মন্দিরের চারপাশ, পাশের পুকুরের পূব পাড়, এমনকি দক্ষিণ পাড়ের রাস্তা পর্যন্ত, ভরে যায় সেদিন ভক্তের ভিড়ে।

মা'র মন্দিরের পশ্চিমদিকে সামান্য দূরে, 'আহের' নামক দীঘির কাছ বরাবর ৺যাত্রা-সিদ্ধি রায়ের মন্দির। গাঁয়ের লোকের ধারণা, কোথাও যাবার সময় এখানে প্রণাম ক'রে গেলে যাওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 'মা' কোথাও যাবার যাবার সময় এখানে প্রণাম ক'রে যেতেন। ধর্মকে স্থাপন করতে এসেছিলেন তিনি, কাজেই অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অঙ্গ নিজে ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এই ভাবে করতে হয় ধর্ম কর্ম।

'মা'র মন্দিরের উত্তর দিকে খানিকটা আল-পথে গেলে 'আমোদর' নদ, এখানকার ঘাটটি ভাল। এ ঘাটে 'মা' অনেক সময় স্নান করতেন। এই জন্য ঘাটটি ভক্তদের কাছে 'দশাশ্বমেধ' ঘাট-তুল্য, আমোদর 'গঙ্গা'। সারদানন্দ স্বামী এইখানেই স্নান ধ্যান জপ তপ অনেক করেছেন। সাধু ভক্তরাও অনেকে, এ ঘাটে স্নান ক'রে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেন। ওখানে জল বেশ গভীর স্বচ্ছ ও শীতল।

গাঁয়ের বাইরে বারোয়ারি-তলা ছাড়িয়ে পূব-দক্ষিণ কোণে বড় রাস্তার দক্ষিণে 'বাঁড়ুজ্যে পুকুর'। 'মা'র বাড়ী থেকে অল্প দূরে এ পুকুর। নিত্যকার স্নান এ পুকুরেই তাঁর হ'ত। 'মা'র নূতন বাড়ীর পূর্বদিকে, বাড়ী সংলগ্ন 'পুণ্যিপুকুর'। এ পুকুরের জল সারা-দিন অনেক কাজে লাগত মায়ের। অনেক-বার তাঁর পুণ্য স্পর্শ পেয়ে এ পুকুর সত্যি পুণ্যিপুকুর হয়েছে। হাত-পা, রান্নার জিনিস—চালডাল তরিতরকারি, আবার ফলফুলুরি, এই জলেই ধোওয়া হ'ত। পূজোর, রান্নার, খাওয়ার বাসন যত মাজা-ধোওয়া, গামছা-কাপড় কাচা—এই পুকুরের জলেই হ'ত, আবার গা-ধোয়া, কখন' কখন' স্নানও হ'ত এরই জলে।

গাঁয়ের উত্তর পশ্চিমে বিশাল আহের দীঘি। 'মা-ঠাকরুন' এর তীরে কতবার এসেছেন, বেড়িয়ে-ছেন এবং হয়ত বা এর ধার থেকেই ছেলেবেলায় দলঘাস কেটে মাথায় ক'রে নিয়ে গরু বাছুরদের খাইয়েছেন। শেষবার জয়রামবাটী থেকে কলি-কাতা আসার সময় এর পাড়ে পালকিতে বসে পা ধুয়ে মিষ্টিমুখ ক'রে রওনা হ'ন।

মায়ের নতুন বাড়ীর দক্ষিণে, কয়েকখানি বাড়ী পড়ে, বড় রাস্তার তে-মাথায় 'ভানুপিসীর' ভিটে। জায়গাটি শুধু বেড়া দিয়ে ঘেরা। ইনি ছিলেন মায়ের সাথী সেই ছেলেবেলা থেকে, সুখ-দুঃখে সব সময় ইনি মায়ের কাছে কাছে থাক-তেন। বিয়ের পর যখন গাঁ-ময় র'টে গেল, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পাগল হয়েছেন। আর গাঁ-শুদ্ধ লোকে যখন 'আহা, আহা' ক'রে তাঁর চিন্তা উদ্বেগ ও বেদনা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তখন এই ভানু পিসীই—'তা কখন হ'তে পারে না'—এই কথা বার বার বলে 'মা'কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুর জয়রামবাটী এলে ঠাকুর ও মা-ঠাকরুনকে হরগৌরী-জ্ঞানে প্রণাম করেছিলেন।

এঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুর এঁর বাড়ী যেতেন। নানা ভাবে ভগবৎ-কথা বলে এঁকে

আনন্দ দিতেন। ইনিও প্রাণ খুলে ভক্তির কথা বলে বড়ই আনন্দ পেতেন। দরিদ্র হ'লেও ঘরে যা থাকত ঠাকুরকে খেতে দিতেন। ভক্তিতে তুষ্ট ঠাকুর, অল্প হ'লেও, তাই অমৃত-জ্ঞানে গ্রহণ করতেন। একবার এই ভাবে, আহার শেষ ক'রে ঠাকুর পান খেতে চাইলেন। ঘরে পান নেই, পাশের বাড়ী থেকে তিনি পান আনতে গেলেন। ঘরে পান নেই—এ-কথা ঠাকুরকে বলতে লজ্জা হ'ল। দেরি দেখে ঠাকুর রওনা হ'লেন কামারপুকুর, বেশ জোরে জোরে হেঁটে। বেলা প'ড়ে আসছে বেশী দেরি করা চলবে না তাই। তখন হলদি ও পুকুরে—এই গাঁ-দুখানির ভেতর দিয়ে যেতে হ'ত, দূরও ছিল প্রায় দু'ক্রোশ। সন্ধ্যে হয় হয়, হলদি গাঁয়ে ঢুকবেন, এমন সময় পেছুন থেকে মেয়েছেলের চলার শব্দ পেয়ে ফিরে দেখেন ভানুপিসী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছেন, দাঁড়ালেন, কাছে এলে দেখলেন, হাতে পান—তাই দিতে ক্রোশখানেক পথ দৌড়ে এসেছেন। পান তো নিলেন, নিয়ে সমাজের কথা ভাবলেন, অল্প বয়সের বিধবা, সন্ধ্যে বেলা লোকে দেখলেই বা কি বলবে। খোঁজ নিলেন, কাছে পয়সা আছে কি না, আছে জেনে বললেন, ওই দিয়ে হাঁড়ি কিনে নিয়ে যেও। লোককে বলবে, হলদি গাঁয়ে হাঁড়ি কিনতে গেছলুম। জয়রামবাটীতে হাঁড়ির দোকান নেই, সকলেই ওই গাঁ থেকেই কিনে নিয়ে যায়। তিনিও গিয়েছিলেন হাঁড়ি কিনতে, এতে কোন দোষ হবে না। কথামত, একটু দূরে কুমারদের ঘর থেকে হাঁড়ি কিনে নির্ভয়ে ফিরলেন ভানুপিসী।

গাঁয়ের দক্ষিণে বারোয়ারি তলায় ৺শীতলার মন্দির, সেখানে বসত দীননাথ দত্তের পাঠশালা ভায়েদের সঙ্গে 'মা'ও কখন কখন পড়েছেন এখানে।

দেখা শেষ হ'ল ভক্তদের—নবযুগের তীর্থ, জয়রামবাটীর যত স্থান। এ তীর্থের সর্বত্র 'ঠাকুর' 'মা-ঠাকরুনে'র পদরজঃ, বিশেষ ক'রে মায়ের। স্থূল শরীরে আবির্ভাব থেকে, ঐ শরীরের অদর্শন পর্যন্ত কতবারই না 'মা' বাস করেছেন এখানে। স্নেহসর্বস্ব মায়ের স্নেহের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে—জড়িয়ে আছে এ গ্রামের আনাচে কানাচে। সারা গ্রামখানি অন্নপূর্ণার পাদস্পর্শে সোনার কাশী হ'য়ে গেছে, অগ্রহায়ণ মাসে মাঠে মাঠে সোণার বরণ ধারণ ক'রে প্রকৃতি সকলকে জানিয়ে দেয় 'মা'য়ের আবির্ভাব। গোনা দিনগুলি ভক্তদের ফুরিয়ে আসে, ফিরে যেতে হবে কর্মস্থানে, তার আগেই দেখে যেতে হবে আশেপাশের তীর্থগুলি—শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি।

*　　*　　*

ভক্তেরা চলেছেন বাঁড়ুজ্যে পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ দিয়ে আলপথে—কিছু দূর গেলেই এ গাঁয়ের সীমানা শেষ, বাঁকুড়া জেলারও সীমানা শেষ। আরম্ভ হ'চ্ছে অলক্ষ্যে, ভিন্ন গাঁ 'পুকুরে' আর ভিন্ন জেলা হুগলী। দুটি গাঁ যেন একই গাঁয়ের দুটি পাড়া। 'পুকুরে' গাঁয়ের ভেতর দিয়ে বড় রাস্তা ধরে চ'লে গেলে মুদীর দোকান। দোকানের সামনে ডাক্-বাক্স ঝোলান। কিছু দূরে প্রাথমিক বিদ্যালয়। দোকান ডানদিকে রেখে রাস্তা ধরে আলপথে খানিক গেলে—একটি বড় রাস্তা পেরিয়ে মেঠো পথে—কখন পুকুরপাড, কখন ক্ষেত, কখন মাঠ ধরে গেলে আমোদর নদ। জল পেরিয়ে সোজা পূর্বদক্ষিণে ঐ রকম মেঠো পথে গেলে অমরপুরের ভেতর দিয়ে, ভূর-সুবোর মাণিক রাজার আমবাগানের মধ্য দিয়ে মাঠ পেরিয়ে কামারপুকুরের ভূতির খাল। শ্মশান ছাড়িয়েই হালদার পুকুর, তার পশ্চিমে পথের ধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ী।

এই পথে বহুবার 'ঠাকুর' চলা ফেরা করে-

ছেন। বিয়ের আগে কতবার এই পথে 'শিওড়ে' হৃদয় মুখুজ্যের বাড়ী গেছেন।

মা-ঠাকরুনও এই পথে কামারপুকুর গেছেন জয়রামবাটী থেকে, এই পথেই ফিরেছেন। খুব ছেলেবেলা কারুর কোলে চড়ে, একটু বড় হয়ে নিজেই হেঁটে কারুর সাথে,গাঁয়ে (জয়রামবাটী)-তে দোকান ছিল না, তাই 'পুকুরে'র মুদিখানা থেকে জিনিসও কিনে এনেছেন—ছেলেবেলায়।

এই পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যেরাও কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী যাওয়া আসা করেছেন অনেকবার। 'মা'য়ের এবং ঠাকুরের অসংখ্য ভক্ত এই পথেই কামারপুকুর জয়রামবাটী আসা যাওয়া করে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছেন। আজ অন্য পথ হয়েছে, কিন্তু এ পথের তীর্থ-মাহাত্ম্য যায়নি। এই পথের ধূলিকণাও বৃন্দাবনের ব্রজরেণুর মতো জ্ঞান করেন ভক্তেরা,—শিরে স্পর্শ করেন। সব দেখে শুনে নিজেদের ধন্য ভেবে জয়রামবাটী ফিরে আসেন ভক্তেরা।

* * *

পরদিন তাঁরা চলেন শিওড়, জয়রামবাটীর উত্তর-পশ্চিমে আন্দাজ একক্রোশ দূরে। সে গাঁয়ে উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া দুটি অংশ, মাঝখানে একটি বৃহৎ শিব-মন্দির—শান্তিনাথ শিব। সুন্দর মন্দির, নাটমন্দিরটিও প্রশস্ত। গ্রামখানি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ পাড়ায় হৃদয় মুখুজ্যের —শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাগনের বাড়ী, পূর্ব পাড়ায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মামার বাড়ী। ব্যবধান আধ ক্রোশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও হৃদয়—প্রায় সমবয়সী ছিলেন, এই জন্য দুজনার মধ্যে ভাব ছিল খুব। ইনি কামারপুকুরে মামার বাড়ী, উনি শিওড়ে দিদির বাড়ী প্রায়ই আসতেন। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, ঠাকুর সেখানে কর্ম গ্রহণ করলে হৃদয় তাঁর সহায়ক হন। এই সময় দীর্ঘ পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর, তিনি কখন সহায়ক, কখন সেবকরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে সাথে থাকতেন। ঐ সময় অপর কেহ দেখাশুনা করার লোক ছিল না, নানা সাধনা ও নানারকম ভাব অনুযায়ী ঠাকুরের বিভিন্ন রকম কথা ও আচরণ প্রকাশ পেত। সে সব ঠিক ঠিক বুঝে ভাব ও কথা অনুযায়ী সেবা—হৃদয় করতেন। এই জন্য অত কঠোর সাধনা-পরম্পরা ও ঘন ঘন বহু প্রকারের ভাব ও সমাধি হওয়া স্বাস্থ্যের বার বার বিপর্যয় ঘটা সত্ত্বেও ঠাকুরের শরীর থাকা সম্ভব হয়েছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যেই, হৃদয় ঠাকুরকে মাঝে মাঝে কামারপুকুরে এবং শিওড়ে নিয়ে আসতেন।

একবার কামারপুকুর থেকে শিওড় যাচ্ছেন ঠাকুর ও হৃদয়। সোজা পথে এসে, ধরলেন দক্ষিণ পাড়ায় হৃদয়দের বাড়ী যাবার রাস্তা। রাস্তাটি জমিদারদের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছে। গাঁয়ে ঢোকবার আগে, দূর থেকে দেখলেন, জমিদার নফর বাঁড়ুজ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, নিজের ক্ষেত-খামার দেখা-শুনা করছেন। ঠাকুর চলেছেন গোঁ ভরে, মনে মনে ভাবছেন, গাঁয়ের জমিদার যদি সেধে কথা বলে, তাহলে বুঝব 'মায়ের' মহিমা। যেমন ভাবা অমনি জমিদারবাবু কাছে এসে হৃদয়ের কাছে পরিচয় নিয়ে, বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ভগবৎ-প্রসঙ্গের পর ঠাকুর হৃদয়ের বাড়ী গেলেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে ঠাকুরের অবস্থা দেখে জমিদার এবং বাড়ীর সকলে তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'লেন। যখন ঠাকুর হৃদয়ের বাড়ী থাকতেন তখন তাঁরা ঠাকুরের জন্যে দুধ, দই, মাখন প্রভৃতি পাঠাতেন।

জমিদার বাড়ী থেকে অল্প দূরেই হৃদয়ের বাড়ী, সেখানে মাটির ঘর কয়েকখানি, বৈঠকখানা একটি, গৃহদেবতার মন্দির একটি। সব জায়গাই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পর্শপূত।

গাঁয়ের লোকেরা ছিলেন সাধারণতঃ শাক্ত, —বৈষ্ণববিদ্বেষী। ঠাকুর কীর্তন শুনতে চাইলে হৃদয় জানালেন যে গাঁয়ে ঐ দলের প্রবেশ নিষেধ, যদি আসে হয় খোল ভেঙে দেবে, নয় তাড়া করবে। ঠাকুর জেদ করায় হৃদয় জমিদারবাবুর শরণাপন্ন হলেন। ঠাকুর শুনতে চাইছেন বলেই তিনি অয়োজন করলেন এবং তাঁরই চণ্ডী-মণ্ডপে কীর্তন আরম্ভ হ'ল। খোল করতালের আওয়াজ শুনে লোকেরা—কেউ পণ্ড করবার উদ্দেশ্যে, কেউ তামাসা দেখতে, কেউ বা ভক্তির ভাব নিয়ে এলেন। ঠাকুরকে ভাবস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখে, সকলেই আসন গ্রহণ করলেন। কীর্তন শেষে হরির লুট দেওয়া হ'ল, প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সকলেই ভক্তিরসে সিক্ত হৃদয় নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সেই থেকে অনেকবার কীর্তন হ'য়েছে সে গাঁয়ে ও ভিড় ক'রে সকলে শুনেছেন।

মায়ের আবির্ভাবের পতি-নির্বাচনের ঘটনা দুটি এই গাঁয়ে ঘটেছিল। মজুমদার পাড়া 'মা-ঠাকরুনের' মা শ্যামাসুন্দরীর পিত্রালয়। দক্ষিণ দিকে 'এল্লা পুকুর' দীঘিবিশেষ। একবার তখন শ্যামাসুন্দরী ছিলেন পিত্রালয়ে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ পুকুরের পূর্বদিকে একটি বেলগাছের তলায় বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখেন একটি ছোট্ট ফুটফুটে সুন্দরী লাল-চেলী-পরা মেয়ে বেলগাছ থেকে নেমে পেছন থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি তোমার ঘরে এলুম'। বোধ হয় এই জন্যই মা-ঠাকরুন শেষবার জয়রামবাটী থেকে কলকাতা যাবার পথে ওই জায়গায় গিয়ে দর্শন ও প্রণাম করেছিলেন। ওই সময় শান্তিনাথের মন্দিরও দর্শন ক'রে পূজো দিয়েছিলেন।

আর একবার 'মা' তখন শিশু—কোলে চ'ড়ে বেড়ান, মামার বাড়ী গেছেন। শান্তিনাথের মন্দিরের সামনে যাত্রা হচ্ছিল। সেখানে ঠাকুরও গিয়েছিলেন, কোনও আত্মীয়ার কোলে চড়ে মা-ঠাকরুনও গিয়েছিলেন। আত্মীয়া শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের মধ্যে কাকে বিয়ে ক'রবে? শিশু আঙ্গুল দিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে দিলেন।

* * *

শিওড়েই শুনলেন ভক্তেরা, দেড়ক্রোশ আন্দাজ দক্ষিণ-পশ্চিমে, ফুলুই-শ্যামবাজার। ঐ গাঁয়ের নটবর গোস্বামী হৃদয়ের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা ভাব দেখে, নিজেদের গাঁয়ে, নিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং নিয়ে যান। সেখানে অনেক ঘটনা ঘটে ছিল, শুনেই ভক্তেরা চললেন সে গাঁয়ে। তখন তাঁদের শেষ হ'য়েছে শিওড়ের সব জায়গা দেখা। কোন জায়গায় একটু বিশ্রাম ক'রে সেই সব স্থান দেখতে চলেছেন যেগুলিকে অবলম্বন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়ছে।

দু'তিনখানি গাঁ ছাড়িয়েই কানে এল কীর্তনের ধ্বনি। গাঁ দু'খানি বেশ বড়। মনে পড়ল এই গাঁয়েই ঢোকার পথে ঠাকুর দেখেছিলেন মাঠে ক্রীড়ারত গৌর-নিতাই।

ঢুকেই গাঁয়ের ভেতর নটবর গোস্বামীর বাড়ী সেখানে ছিলেন ঠাকুর। কীর্তনের সময় একদিন দেখেছিলেন সে বাড়ীতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের—প্রত্যক্ষ। আর দেখেছিলেন তাঁর নিজের সূক্ষ্ম শরীর তাঁদের পায়ে পায়ে লুটাচ্ছে। মুহুর্মুহু ভাব হ'তে লাগল তাঁর। ভিড় লেগে গেল তাঁকে দেখবার জন্যে, রব উঠে গেল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে এমন মানুষ এসেছে। দরজা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল ভিড় আটকাবার জন্যে। তবুও দিনরাত বাড়ীর চারদিকে ভিড় ক'রে লোক বসে থাকত, কখন বেরুবেন দেখবে বলে, গাছে উঠে পাঁচিলে উঠে উঁকি মেরে দেখত।

এখানকার স্থানগুলি দর্শন ক'রে ভক্তেরা ফিরলেন জয়রামবাটী।

বাংলা গদ্যের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রণব ঘোষ

বৈদিক যুগ থেকে নব্যভারতীয় যুগ অবধি ভাষার কত রূপান্তরই না ঘটেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারা দুটি চিরকাল পাশাপাশি প্রবাহিত, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও সাধু আর চলতি—এ দুটি ধারা সাহিত্য-বহনের কর্মে নিয়োজিত। বৈদিক সংস্কৃতের চলিত রূপ থেকেই পাণিনির 'সংস্কৃত' উদ্ভূত। 'পালি' আর 'প্রাকৃত' জনসাধারণের মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু মজা এই যে, একবার সাহিত্যের স্থায়ী মর্যাদা পেলেই চলতি ভাষার চালচলনও বনেদী হয়ে ওঠে। তখন সাহিত্যিক কথ্যভাষা আর সাধারণের মুখের ভাষার পার্থক্য বেড়েই চলে, যতদিন না নূতন কোন ব্যক্তি বা আন্দোলন ভাষায় আমূল পরিবর্তনের সঙ্কল্প নিয়ে আসে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, এককালের রোমান্টিক সাহিত্য পরবর্তীকালের ক্লাসিক আদর্শে পরিণত হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি যা এককালের চল্‌তি ভাষা তাই আর এক কালের কেতাবী ভাষা। নূতন কালের মানুষের কাছে সে ভাষার স্থাণুত্ব অসহ্য লাগে। প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি দেখা দেন টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা।

বিদ্যাসাগর-পূর্ব পণ্ডিতী বাংলায় সংস্কৃত শব্দের জটিলতাকে ভাষার গুণ বলে মানা হ'ত। তাই সেকালের কোন পণ্ডিত যখন কিছুটা বোধগম্য ভাষা লিখেছিলেন, তখন অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, 'এ যে দেখছি বিদ্যাসাগরী বাংলা। এ যে বোঝা যায়!' পড়লেই যদি বুঝতে পারা যায়, তাহলে আর সাহিত্য হবে কেমন ক'রে! সুতরাং বাঙালী পণ্ডিতেরা বিদ্রূপ করতে পারেন—"রঘুরপি কাব্যম্, তদপি চ পাঠ্যম্।" কিন্তু বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে যতই নমনীয় ও অভিজাত করবার চেষ্টা করুন না কেন, নব্য শিক্ষিত সমাজের কাছে সে ভাষাও অন্তরের দূরত্বে রইল। এ হেন সময়ে "আলালের ঘরের দুলালে"র বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সংবর্ধনায় জাতীয় চিত্তের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হ'ল। বঙ্কিমের মতে: "বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ।" "যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।"[১] অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, আলালী ভাষার দুটি দিক—বর্ণনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ সাধুগদ্যের কাঠামোই ব্যবহার করেছেন, আর কথোপকথনের বেলায় এনেছেন একেবারে মুখের ভাষা। এদিক থেকে আরো অগ্রসর হয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য়। এই বইটিতে সর্বত্র নিরঙ্কুশভাবে উত্তর কলকাতার চলতি ভাষা ব্যবহৃত।

১৮৫৪ সালে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'শকুন্তলা'র প্রকাশকাল। ঐ সালেই হিন্দু-কলেজের দুটি প্রাক্তন ছাত্র রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচরণ মিত্রের মিলিত চেষ্টায় প্রকাশিত হ'ল 'মাসিক পত্রিকা'—যার উদ্দেশ্য চলতি ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি। একই কালে একদিকে সংস্কৃত

১ বাঙ্গালা ভাষা (বিবিধ প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র

কলেজের আভিজাত্যমন্থর ধীরগতি, আর একদিকে হিন্দু কলেজের বিদ্যুৎ-চঞ্চল প্রগতি। কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রকাশের (১৯১৪) আগে অবধি 'মাসিক পত্রিকা' বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রম-মাত্র। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ও উক্ত পত্রের প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা দু'জনে মিলে চলতি ভাষাকে পুরো সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তার ফলে, সাধুভাষার সীমা আজ সঙ্কীর্ণ, চলতি ভাষাই বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ততর রাজপথ। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র আগে আরো একজনের নাম স্মরণীয়। যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি যদি রচনা-বাহুল্যের অপেক্ষা না রাখে, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের হাতে চলতি গদ্যের যে বিশেষ রূপটি ফুটে উঠেছে উদ্বোধনের প্রথম প্রকাশকালেই (১৮৯৯) তা সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেরই চোখে পড়বে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' এবং 'পত্রাবলী'—এই চারটিমাত্র বইয়ের মধ্য দিয়েই আমরা গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারি। কিন্তু তার আগে আর একটু পূর্ব কথনের প্রয়োজন।

উনিশ শতকে যাঁরা সর্বপ্রথম এই চলতি ভাষার রাজপথ-নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও আছেন। কিন্তু এঁদের রচনায় চলতি ভাষার প্রয়োগ সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে নয়, অনেকটাই দৃষ্টান্তচ্ছলে। সজ্ঞানে সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। "টেকচাঁদ ঠাকুর" এবং "হুতোম প্যাঁচা" এই দুই ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এই দুটি ছদ্ম নামই এঁদের চলতি ভাষায় সাহিত্য-কীর্তির স্বরূপ অনেকটা বলে দেয়। সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করার প্রয়োজনেই এঁদের এই অদ্ভুত নামের আশ্রয় গ্রহণ। দু'জনেরই শরাঘাতের প্রধান লক্ষ্য কলকাতার 'বাবু'-সমাজ। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'বাবু' ইংরেজ-সমাগমে নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে হঠাৎ বড়লোক, কিন্তু দেশী বিদেশী কোন শিক্ষাই তাদের নেই। এমন একটি বাবুর বর্ণনা: "বাবুরামবাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি-পরা—ফুল-পুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান।" ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পর যে নতুন ধরণের 'বাবু' দেখা দিলেন, তাদের পরিচয় আছে হুতোমের নক্সায়: "আজকাল সহরের ইংরেজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন। প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট্'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিরূপ'।

একদিকে এই জীবন-সমালোচনা, আর একদিকে জগতের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় সহাস্য দৃষ্টি —এ দুয়ের সম্মেলনে আলাল ও হুতোম উনিশ-শতকের শিক্ষিত সমাজে অতি উচ্চ আসন অধিকার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অবির্ভাবের পর বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা উপন্যাসের পূর্ণতার সন্ধানী হ'ল। সেই সঙ্গে বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনাকে অনুসরণ ক'রে আলালী ও বিদ্যাসাগরী ভাষার মধ্যপন্থাই বাংলা-সাহিত্যে আদর্শরূপে স্বীকৃতি পেল। তার ফলে কথ্য ভাষায় সাহিত্য-রচনার রেওয়াজ দেখা দিল না। "আলাল" ও "হুতোম" উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে রইল।

চলতি ভাষাকে সব রকমের ভাবপ্রকাশের উপযোগী ক'রে তুলবার কাজে আলাল বা হুতোমের দান খুব কম। যে ভাষা কেবলমাত্র রসিকতার জন্যেই মন হরণ করে, গভীর ভাবের মহলে তার যাতায়াত কম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা

বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।"[২] কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের রুচি হুতোমী ভাষাকে স্বীকার করতে চায় নি। বঙ্কিমের মতে, " যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।"[৩] এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে, বিষয় অনুযায়ী ভাষার মাপ কাঠিতে হুতোমই সার্থকতর। কারণ, হুতোমের বিষয়বস্তু সমগ্র জীবন নয়, জীবনের নক্সা: 'বিষবৃক্ষ' বা 'গোরা' নিশ্চয় এ ভাষায় লেখা যায় না। কিন্তু আলালী ভাষাতেও লেখা যায় না। সুতরাং চলতি ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে এলেও তার সাহিত্যরূপের সঙ্গে মুখের কথার পার্থক্য থাকবেই। বিষয় অনুসারে সে পার্থক্য কম বা বেশি হতে পারে—এইমাত্র।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আবার স্মরণীয় —" . সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃত-বহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।"[৪] বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ ক'রে বাংলা গদ্যের এই ক্লাসিক রীতি 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব অবধি অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করেছে।

বাংলা-ভাষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে উনিশ শতকের পঞ্চম ষষ্ঠ-দশকে যখন এমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, সেই সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-লব্ধ অভিজ্ঞতায় বাংলার চলতি ভাষা এক নূতন মহিমা লাভ করছে। হুগলী জেলার গ্রাম্যটান মেশানো তাঁর সরল, অনতিমার্জিত, অথচ সত্যোপলব্ধিময় বাণী নব্যশিক্ষিতদের কানে অপূর্ব শোনালো। এ-ভাষার সঙ্গে বাংলা গদ্যের দুই মহারথী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর ভাষামাধুর্যের চেয়ে ভাব-মাধুর্যের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে দিলেই কথ্যভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণত্ব বুঝতে পারা যাবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো। নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপের সময় একজন প্রশ্ন করলেন, "যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা ক'ন না?" এর উত্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। . যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন গুন করে।" (শ্রীরামকৃষ্ণ—কথামৃত-৩য়)

* * *

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম। তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো।

---

২ বাঙ্গালা ভাষা (বিবিধ প্রবন্ধ)— বঙ্কিমচন্দ্র

৩ ঐ (ঐ)— ঐ

৪ বাঙ্গালা ভাষা—বঙ্কিমচন্দ্র (বিবিধ প্রবন্ধ)

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আর মহাশয়। জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ।"

ঈশ্বরলাভের উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে বলছেন—" বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশাহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, "না, আমি মা'র কাছে যাব," সেই রকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভালপথে তুলে লন।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৫ম)

উদ্ধৃতির এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাগ্‌ভঙ্গীর বৈশিষ্ট স্ুপরিস্ফুট। প্রথমতঃ উপমার আশ্চর্য সুপ্রয়োগ এবং সেই উপমায় মৌলিক উপলব্ধির সজীবতা। দ্বিতীয়তঃ চলতি ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্রের গূঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করবার অসাধারণ ক্ষমতা। তৃতীয়তঃ সহজ রসজ্ঞানের সুপটুতা। জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ভাষার উপযোগিতা অসাধারণ। বিশেষ করে যখন একথা ভাবি যে, "আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।"[৫] "তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৬] এই মহাজনপন্থা অনুসরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বিবেকানন্দ যে গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তার প্রভাবে স্থাণু, অচল কোন কিছুকেই তিনি স্বীকার করতে পারতেন না। এই প্রচণ্ড গতিময় ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ দেখি তাঁর পত্রাবলীতে, 'পরিব্রাজক,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাববার কথা' বই তিনটিতে। চলতি ভাষার পক্ষে স্বামীজীর যুক্তি একান্ত সহজবুদ্ধি-প্রসূত—"স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?"[৭] অন্ততঃ স্বামীজীর পক্ষে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা নিজের কানেই শুনেছেন। (ক্রমশঃ)

---

৫ বাঙ্গালা ভাষা (ভাববার কথা) স্বামী বিবেকানন্দ
৬, ৭, ৮ ঐ

সমালোচনা

অণুব্রত—নির্মাণ-অঙ্ক (হিন্দী)—শ্রীসত্য-নারায়ণ মিশ্র সম্পাদিত, শ্রীপ্রতাপসিংহ বৈদ কর্তৃক অখিল ভারত অণুব্রত সমিতি, ৩ পর্তুগীজ চার্চ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত, ২৯৩ পৃষ্ঠা, এই বিশেষাঙ্কের মূল্য এক টাকা।

হিন্দী পাক্ষিক পত্র 'অণুব্রতে'র এই 'নির্মাণ-অঙ্ক' পাঠ করিযা প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা কতকগুলি সহজপাঠ্য ও শীঘ্রবিস্মরণীয় 'কহানী'র সমাবেশ নয়, ইহাতে রহিয়াছে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণ-বিষয়ক আদর্শবাদভূয়িষ্ঠ রচনা। বিভিন্ন প্রবন্ধের ভাষাব সাবলীলত্ব উল্লেখযোগ্য। 'কহানী'ও ইহাতে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, তবে ইহারা 'অণুব্রতে'র বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শেব সহিত সুসমঞ্জস। বিশিষ্ট মনীষিবর্গেব কল্যাণপ্রদ লেখসম্বলিত এই হৃদয়গ্রাহী পত্রিকাটি আন্তরিক অভিনন্দনেব যোগ্য।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

Swami Vivekananda, My Master (Reminiscences) by Swami Sadasivananda—Published by the author from I, 435 Vinay Nagar New Delhi-3, Pp 88 Price As 6 (nP 37)

আমার গুরুদেব—স্বামী বিবেকানন্দ—(স্মৃতিকথা)—স্বামী সদাশিবানন্দ, মূল বাংলার ইংরেজী অনুবাদ—'বেদান্ত কেশরী'-তে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত। লেখক স্বামী বিবেকানন্দকে—যে অল্প কিছুদিন দেখিয়াছেন এবং যেভাবে তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন তাহাই যথাযথ কথাচিত্রে আঁকিয়াছেন। কোথাও স্বামীজীর স্নেহকোমল মাতৃভাব, কোথাও আনন্দময বালকভাব, কখনও শংকরাচার্যের মত, কখনও সমাজসংস্কারক, কোথাও সামাজিক অবিচারের জন্য রুদ্ররোষে উদ্দীপ্ত, আবার শান্ত করুণায় কাশী সেবাশ্রম *প্রতিষ্ঠার উৎসাহদাতা, পুনরপি ধর্মপ্রচারে যোদ্ধার* মত, নানাভাবের পরিবেশনে পুস্তিকাটি সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে।

ভারতের সাধক (তৃতীয় খণ্ড)—শঙ্কর-নাথ রায় প্রণীত, প্রকাশক: শ্রীসুধীর মুখার্জি, রাইটার্স সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, পৃষ্ঠা ৪৮৬, মূল্য আট টাকা।

সাধক-মহাপুরুষদিগের জীবন ভাষায় প্রকাশ করা অতি কঠিন কাজ। যাঁহারা লোকগুরু, ধর্মাচার্য, সংস্কৃতিব যথার্থ ধারক ও বাহক তাঁহাদিগেব অমূল্য অলৌকিক জীবন লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে যে সাবধানতা ও অনুধ্যান প্রয়োজন পুস্তকখানি পড়িলে তাহার বিশেষ অভাব অনুভূত হয় না। ইতঃপূর্বে 'ভারতের সাধক' দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠকগণের সমাদর লাভ করিয়াছে। এই খণ্ডে যে দ্বাদশ জনের পুণ্য জীবন আলোচিত হইয়াছে তাঁহারা: আচার্য শঙ্কর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ভক্ত তুকারাম, গোস্বামী তুলসীদাস, মাতৃসাধক রামপ্রসাদ, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, মহর্ষি রমণ ও শ্রীঅরবিন্দ। প্রাঞ্জল ভাষা, রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং হৃদয়গ্রাহী ভাববিন্যাসের জন্য পুস্তকখানি বাংলা জীবনী-সাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সংযোজন-রূপে গৃহীত হইবে।

একটি ভুল চোখে পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহকালে তাঁহার বয়স উনত্রিশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহা চব্বিশ হইবে। পরবর্তী সংস্করণে ইহা সংশোধনীয়।

*　　*　　*

Nath Yoga—লেখক: শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: দিগ্বিজয় নাথ ট্রাষ্ট, গোরক্ষনাথ মন্দির, গোরক্ষপুর। পৃষ্ঠা—১১২। মূল্য দুই টাকা।

যোগ-সাধনা ভারতের অতি প্রাচীন ও বিজ্ঞানসম্মত উপাসনা। সুদূর অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রবহমান ভারতীয় অধ্যাত্মধারায় যোগ বা আত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন, উদ্বেল তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে এক বৈশিষ্ট্য রচনা করিয়াছে। বহু আত্মবিজ্ঞানী সাধক যুগে যুগে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন-সাধনায় ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই আত্মবিজ্ঞানবিৎ যোগীদের অন্যতম পুরোধা। তাঁহার যোগসূত্র বা রাজযোগই পরবর্তীকালে ঋষি-যোগী-সাধকগণের দৃষ্টিতে নব নব অনুভূতির আলোক আনিয়া দিয়াছে। যোগী গোরক্ষনাথও যোগশাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি-আশ্রয়ে স্বীয় জীবনে যে পরমানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া 'নাথ-যোগী' সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গোরক্ষনাথজীর তপস্যাপূত ভূমিতেই বর্তমানের গোরক্ষপুরস্থ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই যোগি-সম্প্রদায় তাঁহাদের গুরুনির্দিষ্ট সাধনার অনির্বাণ শিখাকে ধারণ করিয়া ধর্ম-পিপাসু শত শত মানুষকে পথ দেখাইতেছেন।

আলোচ্য ইংরেজী পুস্তকখানিতে গোরক্ষনাথজীর প্রবর্তিত সার্বজনীন উদার ধর্মমতসমূহ সুগ্রথিত হইয়াছে। যোগসাধনার গোড়ার কথা, উহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে অতি সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সুচিন্তিত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। যোগ-সাধকের পরম প্রাপ্য ও উহার পন্থা—যাহা গোরক্ষনাথজীর অনুবর্তিগণ নিজ জীবনের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন তাহারও আভাস গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। জীবননাথ পরমেশ্বরের উপাসনাই নাথযোগের মূল কথা। জ্ঞান-যোগ ও ভক্তির সম্মিলিত সাধনায় সাধককে তাহার স্বনাথের সহিত একাত্মবোধের পথে নিয়ত প্রেরণা দেয়।

সম্প্রদায়-গুরু গোরক্ষনাথজী যোগেশ্বর শিবের অবতাররূপে পূজিত হইয়া থাকেন। গোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক অবদানের কথা চিন্তা করিলে লোকগুরু হিসাবে তাঁহার আসন যে কত উচ্চে তাহা ধারণাতীত। তথাপি এ-প্রসঙ্গে লেখকের একটি উক্তির মর্মার্থ আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। "The influence of Gorakhnath and his sect" শীর্ষক একটি অনুচ্ছেদের এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন:

"No other Avatara or prophet or religious reformer after Lord Buddha (except possibly Sankara) appears to have stirred the imagination of all classes of people of all the provinces of India and the outlying countries to such an extent, and to have exerted so much influence upon their thoughts and emotions and practices, as did Gorakhnath

বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ হইতে শুরু করিয়া চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভারতের সকল আচার্যপুরুষের জীবনাবদানকে এত সহজে পরিমাপ করা সম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

'শিবতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় দীর্ঘ পরিশিষ্টটি তথ্যবহুল। প্রচ্ছদপট ও কাগজ ভাল। ছাপা আরও একটু বড় অক্ষরে হইলে সুবিধা হইত। এই ধরণের গ্রন্থের বহুল প্রচারের উপযোগিতা রহিয়াছে।

—শ্যামাচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়েব জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩.১২ ৫৭) শুক্রবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১০৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে দিবসব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। উষাকালে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোডশোপচারে পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সাত হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী: কলিকাতা বাগবাজার-পল্লীর যে বাটীতে (১নং উদ্বোধন লেন) শ্রীশ্রীমা দীর্ঘ একাদশ বৎসর ছিলেন এবং যেখানে তিনি মহাসমাধি লাভ করেন—বহু পুণ্যস্মৃতিজড়িত সেই বাটীতে শ্রীশ্রীমায়েব শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির পর সমবেতকণ্ঠে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হইলে ভজন, ষোড়শোপচারে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতির মাধ্যমে দিবসব্যাপী উৎসব চলে। শত শত ভক্ত জগজ্জননীর শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। আট শত নরনারী বসিয়া এবং প্রায় তিন সহস্র ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পরেও বহু ভক্তের সমাগম হয়।

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর : গত ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীসারদা মঠে শ্রীশ্রীমায়েব বিশেষ পূজা হোম এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্তপাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং বালিকাগণ-কর্তৃক ভজন একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে, বেলা ৮টা হইতে ভক্তসমাগম আরম্ভ হয়। মঠ-প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ভজন করিলে পর ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে ব্রহ্মচারিণী ইলা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী হইতে উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শোনান। প্রায় ১৭০০ ভক্ত মহিলাকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনের পর রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কালীকীর্তন হইয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দ-জন্মোৎসব

১নং উদ্বোধন লেনে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১২ই পৌষ (২৮-১২-৫৭) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব সানন্দে অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের সুবৃহৎ প্রতিকৃতিখানি পত্র পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা মনোরমভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, বেদ ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হোম, ভোগরাগ, পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনীপাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় ১০০০ ভক্ত বসিয়া এবং ১০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে—যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তগণকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহারই পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি, (১৭ই পৌষ) বুধবার 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১১ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে উপনিষদ্

ব্যাখ্যার পর আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বীত-শোকানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ (ইংরেজীতে), স্বামী বোধাত্মানন্দ এবং সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ। রাত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক 'অহল্যা উদ্ধার' রামায়ণ-কীর্তন হয়।

২রা জানুআরি অপরাহ্ণে গীতা-ব্যাখ্যার পর জনসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ এবং স্বামী পুণ্যানন্দ (সভাপতি)।

সভান্তে বিশিষ্ট শিল্পীদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

৫ই অপরাহ্ণে প্রভুপাদ শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী 'নবধা ভক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সন্ধ্যায় চোরবাগান কীর্তন-সমাজ কর্তৃক লীলাকীর্তন গীত হয়। সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগমে কাশীপুর উদ্যানবাটী আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানেও পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু'-দিবস উপলক্ষে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে ষোড়-শোপচারে পূজা, হোম, বিশেষ ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন এবং প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

কার্যবিবরণী

সারদাপীঠ (বেলুড়): রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের পরিকল্পনা ও এগারো বৎসরের (১৯৪৫-১৯৫৬) সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সারদাপীঠ বিভাগের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায় শ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করিতে পারে। সারদাপীঠের ৫টি বিভাগ : বিদ্যামন্দির, শিল্পমন্দির, তত্ত্বমন্দির জনশিক্ষা-মন্দির এবং সমাজশিক্ষা-মন্দির বা সমাজশিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্র (S E O T C)

বিদ্যামন্দির

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে বিদ্যামন্দির (আবাসিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে। প্রথম বর্ষ হইতেই ইহার উৎকৃষ্ট পরীক্ষাফলের প্রতি জনসাধারণ ও শিক্ষা-ব্রতিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

১৯৫৬ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় বিদ্যামন্দির ছাত্রদের পাসের হার শতকরা শত। আই-এ পরীক্ষার্থী ২২ (উত্তীর্ণ: ১৭—১ম বিভাগে, ৫—২য় বিঃ) এবং আই-এস্-সি পরীক্ষার্থী ৫৭ (উত্তীর্ণ: ৪৭—১ম বিঃ, ১০—২য় বিঃ), আই-এতে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থান এবং ৫টি বৃত্তি, আই-এস্ সিতে ৩টি বৃত্তি।

বিদ্যামন্দিরে ২৫০ ছাত্রের মধ্যে ৫০জন আংশিক সাহায্য পায়। ১৯৬০ খৃঃ হইতে বিদ্যামন্দির তিন বৎসরের ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

শিল্পমন্দির

শিল্প মন্দিরের তিনটি বিভাগ : ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ১৯৫২-৫৫ খৃঃ পর্যন্ত জুনিয়ার ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বা তদূর্ধ্ব শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে তিন বৎসরের সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স বা লাইসেন্-সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করা হইয়াছে। এখানে সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ইলেক্ট্রি-ক্যাল, মেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা শ্রমশিল্প-বিভাগে বয়ন ও রঞ্জন-শিল্প, খেলনা-তৈয়ার এবং কাঠের ও দর্জির কাজ শিখানো হয়।

'যুগান্তর-পত্রিকা' রিফিউজি-রিলিফ-ফাণ্ড

কর্তৃক প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে উদ্বাস্তু ছাত্রগণের টেকনিক্যাল লাইনে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গবেষণাগার

শিল্প-বিভাগে একটি গবেষণাগার আছে। এখানে উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা শিল্প-সম্বন্ধীয় নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করা হয়। গোময়-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, পেট্রল-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, ইলেক্‌ট্রিক ক্লক ও অটোমেটিক তাঁত উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রশংসিত।

শিল্প-বিভাগের বিক্রয়কেন্দ্রে শ্রমশিল্প ও যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্যাদি সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

তত্ত্বমন্দির

তত্ত্বমন্দিরে একটি চতুষ্পাঠী আছে, এখানে সারদাপীঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বিভাগ কর্তৃক ধর্ম-বিষয়ক সভা ও ক্লাস প্রভৃতি পরিচালিত হয়।

ভারতের জাতীয় আদর্শ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক সংস্কৃত ভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দিবার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মহতী ইচ্ছা রূপায়িত করিবার জন্য বেলুড় মঠের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

জনশিক্ষা-মন্দির

জনশিক্ষা-মন্দিরের প্রধান কাজ দেশের বিভিন্ন অংশে 'ত্যাগ ও সেবা'র আদর্শে উপযুক্ত কর্মী ও দেশসেবক গড়িয়া তোলা। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র, শিক্ষা-শিবিরের মাধ্যমে ইহার কাজ ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে ভারত সরকারের সহায়তায়।

স্নাতকোত্তর সমাজ-শিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হইয়াছে (১৯৫৬ খৃঃ)। এখানে গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ সমাজ, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক-গণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, প্রায়োগিক শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দুই বারে ৬৬টি জন সমাজসেবী শিক্ষা পাইয়াছেন।

সারদাপীঠের আরও কয়েকটি বিভাগ: ফটোগ্রাফি, গোপালন, কৃষি ও পুস্তক-প্রকাশন।

বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৮৭৩, এ পর্যন্ত ২,৬৪২ জন শিক্ষিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে ৮টি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়,পুস্তক-সংখ্যা ১৫,০৯০,পত্রিকা—মাসিক : ৭১, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক : ৩৩, দৈনিক : ২৭।

সারদাপীঠ হইতে প্রকাশিত পত্রিকা: বিদ্যামন্দির (কলেজের), ত্রয়ী (শিল্প-মন্দিরের), চরৈবেতি (জনশিক্ষা-মন্দিরের), অনির্বাণ ও মাসিক বুলেটিন (S E O. T C)

জামসেদপুর: বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩৬তম বার্ষিক কর্মবিবরণীতে প্রকাশ এই কেন্দ্র কর্তৃক ১২টি বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে সহিত পরিচালিত হইতেছে। তন্মধ্যে চারটি উচ্চ বিদ্যালয়, তিনটি মিডল স্কুল, তিনটি উচ্চ ও দুইটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। মোট (২৬৬২+১৯৭৭=) ৪৬৩৯টি ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্কুলের লাইব্রেরিতে মোট ৮৮৩৬ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য-চর্চার সুব্যবস্থা আছে।

সর্বসাধারণের জন্যও একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। এখানে ১০টি মাসিক, ৩টি দৈনিক ও ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব মহোৎসাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সোসাইটি-পরিচালিত আটটি স্কুলের বিবরণ তালিকাকারে প্রদত্ত হইল :

নাম	স্থান	ছাত্র বা ছাত্রী সংখ্যা	পরীক্ষার ফল
(১) শ্রীবামকৃষ্ণ হাই স্কুল	বিষ্টুপুর	ছাত্র ৩২৩	৮৮%
(২) শ্রীসাবদামণি „	সাকচি	ছাত্রী ৩৩৪	৮৮%
(৩) বিবেকানন্দ „	সাকচি	ছাত্র ৪৫৬	৮৬%
(৪) সিষ্টাব নিবেদিতা হাইস্কুল	বার্মা মাইনস	ছাত্রী ৩২৯	৯৪ ৫%
(৫) বিবেকানন্দ মিডল স্কুল	বিষ্টুপুব	৩৬৯+২৭৫=মোট ৬৪৪	
(৬) „ „ „	সাকচি	৬৮৭+৫০৪= „ ১১৯১	
(৭) „ , „	সিধগোবা	১২১+৭৪= „ ১৯৫	
(৮) „ উচ্চ প্রাথমিক	সিধগোবা	৩৭০+২৮০= „ ৬৫০	

কাঁথি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর ধবিযা জনকল্যাণে রত। স্কুল ও কলেজের বিদ্যার্থীদেব জন্য একটি ছাত্রাবাস, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয, সর্বসাধারণের জন্য দুইটি গ্রন্থাগার (একটি ভ্রাম্যমাণ) এবং একটি হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এই সেবাশ্রম কর্তৃক পবিচালিত হয়।

১৯৫৫ ও '৫৬ খৃষ্টাব্দেব কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে দুগ্ধবিতরণ, ছাত্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে আর্থিক সাহায্য এবং সাইক্লোন ও অতিবৃষ্টি দ্বাবা ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় পাঁচ শত পরিবারের মধ্যে রিলিফ-কার্য করা হইয়াছিল।

পূর্ব পূর্ব বৎসরেব ন্যায় শুচি-সুন্দর পরিবেশে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভাবতেব বাহিবে

সিঙ্গাপুর : প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৮ খৃঃ হইতে এই কেন্দ্রটি অগ্রগতির পথে আগাইয়া চলিতেছে। ইহার বিবিধ জনহিতকর কার্যের মধ্যে এ দেশে ভারত-সংস্কৃতি প্রচারই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দেব ২৯তম বর্ষেব কার্যবিবরণীতে প্রকাশ—বর্তমানে এই কেন্দ্রের সভ্য-সংখ্যা সাত শত। কেন্দ্র-পবিচালিত জনপ্রিয় গ্রন্থাগারটিতে প্রতি বৎসর সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েব শতাধিক মূল্যবান্ গ্রন্থ সংযোজন কবা হয়।

১৯৪০ খৃঃ গত বিশ্ব-যুদ্ধেব সময় কয়েকটি নিরাশ্রয় বালক লইয়া প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমটি প্রয়োজনবোধে বিদ্যার্থি-ভবনে রূপান্তরিত হইয়াছে। বার্টলি বোডের উপর ছয় একর জমিতে তিনটি আবাসিক গৃহবিশিষ্ট এই বিদ্যার্থি-ভবনে একশত ছাত্র থাকিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতে পাবে। মালয়ী খৃষ্টান ছাত্রও এখানে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে, ইহাই এই ছাত্রাবাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছাত্রগণকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেব সহায়তায় শিল্পবিভাগ খোলা হইয়াছে। শিল্পবিভাগে বয়ন, খেলনা তৈয়ারী, কাঠের কাজ, দর্জির কাজ প্রভৃতি শিখানো হয।

ছাত্রাবাস ছাডাও এই কেন্দ্র কর্তৃক তিনটি বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে : বিবেকানন্দ তামিল স্কুল (ছাত্রসংখ্যা ১৪১), সারদাদেবী তামিল স্কুল (ছাত্রীসংখ্যা ১৫৩), বয়স্কদিগকে

ইংরেজী শিখাইবার জন্য নৈশ বিদ্যালয় (বিদ্যার্থি-সংখ্যা ১১১)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা, বক্তৃতা ও ভজন সহায়ে উদ্‌যাপিত হয়, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বহু লোক উৎসবগুলিতে যোগদান করেন।

ব্রাজিলে বেদান্ত-প্রচার ঃ ব্রাজিলের কতিপয় বেদান্তানুরাগী বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধে দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টিনা বুয়েনস্ এরিস শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক স্বামী বিজয়ানন্দজী গত অক্টোবর মাসে ব্রাজিলে একটি প্রচার-সফরে বাহির হন। তিনি রিও দি জানেইরো শহরে ৪টি এবং সাঁও পাউলো শহরে ২টি বক্তৃতা দেন। তিনশতাধিক ব্যক্তির সহিত পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশ্নোত্তরাদিতে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ৫০ জন জিজ্ঞাসুকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধর্মোপদেশ এবং ১৫ জন প্রার্থীকে আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ দেন। স্বামী বিজয়ানন্দজী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বুয়েনস্ এরিসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্রাজিলে তিনি ২৮ দিন ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি এবং প্রচার-কার্যে ওখানকার বেদান্তানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে।

এ মাসের জন্মতিথি ঃ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৭ই মাঘ	২১শে জানুআরি
„ ত্রিগুণাতীতানন্দ	১০ই „	২৪শে „
„ অদ্ভুতানন্দ	২১শে „	৪ঠা ফেব্রুআরি

বিঃ দ্রঃ—শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি ঃ ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুআরি, বৃহস্পতিবার।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব ঃ গত ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব বারাসত শহরের শিবানন্দ-ধামে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, শিবমহিম্নস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, ভজন, শিবানন্দবাণী-আলোচনা, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন ও কথকতা, রামনাম-সংকীর্তন, কালীকীর্তন, লবকুশের রামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয়, শোভাযাত্রা, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, রামকৃষ্ণ-পুঁথিপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ এবং জনসভায় বক্তৃতা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এক বিরাট জন-সভায় (সভাপতি) স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার মহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বেলগেছিয়া ঃ (অনাথদেব লেন, কলিঃ-৩৭) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১৪ই হইতে ১৬ই পৌষ তিনদিন ধরিয়া শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজাহোম চণ্ডীপাঠ, সংকীর্তন-সহ পল্লীপরিক্রমা, রামায়ণ গান, কথকতা, কালীকীর্তন ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জীবানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন ও অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

বিভিন্ন স্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে আমরা বিস্তারিত উৎসব সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি ঃ

তেজপুর (আসাম) ঃ শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব এবং কল্পতরু „

খেপুত (মেদিনীপুর) ঃ শ্রীশ্রীমায়ের „

বিজ্ঞান-সংবাদ

১৯৫৭ খৃঃ আণবিক গবেষণার অগ্রগতি

একদিকে ঠাণ্ডাযুদ্ধের উপকরণ-স্বরূপ হাইড্রোজেন-বোমা ও আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা চলেছে, আর অন্যদিকে শান্তির উদ্দেশ্যেও কম পরীক্ষা হয়নি, চিকিৎসায়, শিল্পে, কৃষিতে এবং সাধারণ গবেষণায় সর্বত্র আজ আণবিক শক্তির প্রসার।

এ বছর অনেক দেশেই নতুন আণবিক চুল্লি ও প্রতিক্রিয়া-কক্ষ (Re-actor) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আরও কতগুলি দেশে হবার প্রস্তাব হয়েছে। এখান থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি ভবিষ্যতে কারখানায় ও গৃহে গৃহে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

এ বছর খাদ্য-সংরক্ষণে আণবিক বিকীরণের কাযকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে, আশা করা যায় দু'এক বছরের মধ্যেই এ বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে—যন্ত্রপাতি এমনই নিখুঁত ভাবে তৈরি হচ্ছে।

আণবিক শক্তি সহায়ে জাহাজ চালানো বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় গবেষণা সমাপ্ত, আণবিক জাহাজ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে আণবিক সাবমেরিন চালানো হয়েছে। নিত্য নিঃমিত বিমান-চালনায় কিভাবে বি-এক্টর কাজে লাগানো যাবে—সে সম্বন্ধে গবেষণাও সারা বছর ধরে চলেছে। বি-এক্টর-শক্তি দ্বারা বিমান-চালনার প্রাথমিক পরীক্ষা সফল হয়েছে।

আণবিক বিকীরণের ফলস্বরূপ বহু রেডিও-আইসোটোপ উৎপন্ন হয়, তাদের চাহিদা হাসপাতালে ঔষধরূপে, পরীক্ষাগারে রোগনির্ণয়ে, মৌলিক গবেষণাগারে, এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে—সর্বত্র ক্রম-বর্ধমান।

কৃষি-গবেষণায় বৈজ্ঞানিকগণ আইসোটোপের ব্যবহার করছেন—ফসল বাড়াতে, খাদ্যশস্যের রোগ-প্রতিরোধে, সারের উন্নতিকল্পে এবং কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে।

ছোট আকারে আণবিক ব্যাটারি বা অণু থেকে সরাসরি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদন যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে।

[U S Atomic Energy Commission এবং Tass এর সংবাদ হইতে সংকলিত।]

সংস্কৃতি-সংবাদ

নিখিল ভারত সাহিত্য-সম্মেলন

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ২৫শে পর্যন্ত তিন দিন কলিকাতায় মহাজাতি-সদনে ভারতের প্রধান ভাষাগুলির সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম একটি নিখিল ভারতীয় সম্মেলনে মিলিত হন। গত বৎসর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ার সাহিত্যিক সম্মেলনেই ইহার বীজ উপ্ত হয়। সভায় আমেরিকা রাশিয়া, হাঙ্গারী, জার্মানি ও পাকিস্তানের সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েকজন ভাষণও দেন।

বর্তমান সংস্কৃতির বহু সমস্যা আলোচিত হয়, 'বৈচিত্র্যে একত্ব'ই ছিল যেন সকলের মূল বক্তব্য। 'জাতীয় ভাষা'র প্রশ্নও প্রথমদিনেই আলোচনার পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৈদিক মঙ্গলাচরণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, ইতিহাস-ভূগোলের বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষকে আরও নিকট—আরও ঘনভাবে সম্বদ্ধ করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদেরই। তাঁহারাই বিচিত্র কৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য অনুভব করেন, তাঁহাদেরই একটি সাধারণ ভারতীয় সভ্যতা-গঠনে সাহায্য করিতে হইবে। প্রতিটি সাহিত্যিক অপূর্ব, প্রত্যেকেই বিশ্বজনীন। লেখকমাত্রেই স্বাধীন মানব।

চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী তাঁহার প্রেরিত ভাষণে লিখিয়াছেন দলীয় যন্ত্র ও নির্বাচনী

বাক্স হইতে মুক্ত থাকিয়া চিন্তাশীল লেখকগণকে গণতন্ত্রের স্বাধীন শক্তি হইতে হইবে।

সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা তাঁহার ভাষণে বলেন—সাহিত্যিকগণকে ভারত-কৃষ্টির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া এই বিচিত্র সম্পদের ভিত্তির উপরেই ভারতের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপনিষদের বাণী 'তত্ত্বমসি' মনে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় দিন প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধে বলেন, সমস্যাটি তিন ভাগে বিভক্ত: সাহিত্যিক, শিক্ষা-বিভাগীয় এবং রাষ্ট্রীয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য সাহিত্য ও শিক্ষা, অপর ভাষাকে ঘৃণা করিয়া কোন ভাষা উন্নত হইতে পারে না, অন্তর্নিহিত শক্তিতেই ভাষা উন্নত হয় এবং অপর ভাষা হইতেও লাভবান হয়। সাহিত্য নয়, ভাবের ঐক্যই আজ জীবন-মরণের প্রশ্ন। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিগণ সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক সংকট, রাষ্ট্রের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ, পাশ্চাত্ত্য সংঘাতে ভারতীয় ভাষায় উন্নতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিনের সমাপ্তি-অধিবেশনে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সুচিন্তিত ভাষণে বলেন:

আজ ভারতের সাহিত্যিকদের আঁকিতে হইবে দেশের ব্যথা ব্যর্থতা বিভেদ ও আত্ম-প্রবঞ্চনার চিত্র। সাহিত্যিকেরা যদি বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত না হইয়া ভারতের ঐক্য ও মানবের ঐক্য দর্শন করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে।

মানবজাতি এক মূল হইতে শাখায় প্রশাখায় দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ আবার একতার দিকে চলিয়াছে বর্তমান যুগের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের—শারীরিক সংযোগ এবং আধ্যাত্মিক সংঘর্ষ। সাহিত্য-ক্ষেত্রেই উভয়ের আদর্শ এক। সাহিত্যই মানব-মনের মুক্ত স্বভাবকে রূপায়িত করে, আত্ম-সচেতনতাই মানবকে মহিমান্বিত করে। রাজ-নীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সব কিছুর উদ্দেশ্য—'ব্যক্তি'র স্বাধীনতা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আজ নিকটতর হইতেছে, এ এক আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব, সাহিত্যিকরাই পারেন ক্ষুদ্র বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সাংস্কৃতিক সহ-যোগিতার সৃষ্টি করিতে, মানবের ঐক্য—রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা, আর্থনীতিক বন্ধুত্ব বা সামাজিক ব্যাপারের উপরেই নির্ভর করে না, মানসিক নৈকট্যের উপরেই মানবের ঐক্য নির্ভর করে। 'সমগ্র মানবজাতি এক পরিবার' এই বোধ-জাগরণে সাহিত্য এখনও অনেক কাজ করিবে—তিনি এইরূপই আশা করেন।

সংশোধন:

গত পৌষে প্রকাশিত ৬৮৭ পৃষ্ঠার 'মুক্তির প্রার্থনা' কবিতার ২২শ পঙক্তি পড়িবেন:

'নিরঞ্জনা, তোমারি প্রাসাদে শাশ্বত আনন্দ শিশু নিরঞ্জন—'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পঞ্চকম্

ব্রহ্মচারি-মেধাচৈতন্য-বিরচিতম্

বিধীনাং শ্রৌতানামনিয়মগতে সংহততয়া,
ন সংপ্রাপ্যাধারং ক্বচিদপি সখেদং লযজুষাম্।
ইদানীস্ত্বামেকং সহজবিষয়ং সংস্কৃতমতিং
কিমেতৎ সংশ্রিত্য প্রিযমিব হিতং জন্ম সফলম্ ॥ ১ ॥

নিষেধাস্তে সর্বে বিলসদভয়াকুণ্ঠিতধিযো
বিশেষান্ পাপাংস্তাননৃজুমনুজানত্র কলিজান্।
সমাশ্রিত্যামত্তাঃ প্রকটিতজযা ধিক্কৃতজনা,
অহো রামং কৃষ্ণং সচকিতমবেত্যাতিবিজিতাঃ ॥ ২ ॥

তিতিক্ষা ত্যাগোঽসৌ শমদমসমাধ্যভয়তাঃ,
ক্ষমা শান্তির্ভক্তিঃ সহচরতয়া জ্ঞানমতিগম্।
প্রসিদ্ধং বৈরাগ্যং মণিললনযোঃ সত্যপরতা,
তনৌ দিব্যায়াং তে যুগপদতিলোভাৎ কিমবসন্ ॥ ৩ ॥

কিমুন্মত্তো মূর্খস্তব গুণগরিম্নঃ স্তবমিমং,
পিশাচার্ত্তঃ কর্ত্তুং সিতশশিধৃতৌ বাল ইব বা।
ক্ষমার্হোঽয়ং দাসঃ সহজকৃপযা নাথ নিরতো
বিবেকানন্দানামপি দুরবগাহ স্বরমণ ॥ ৪ ॥

ত্বমেকোঽদ্বৈতস্ত্বং ত্বমপি সকলো নিষ্কল ইতি,
ত্বমারাধ্যো দেবঃ শরণমিহ দীনস্য কৃতধীঃ।
প্রিয়স্ত্বং সর্বেষাং স্মরণমননৈকাধিকরণং
নমো ভূযস্তুভ্যং সুকৃতনিকরাণাং প্রতিকৃতে ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ: হে নিয়মবন্ধনশূন্য! বৈদিক বিধিসমূহ সম্মিলিত ভাবে কোথাও একটি আশ্রয় না পাইয়া দুঃখে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল, প্রিয় বন্ধু পাইয়া যেমন লোকে কৃতার্থ হয়, তেমনি সংস্কৃতবুদ্ধি সহজ-আশ্রয় একমাত্র তোমাকে লাভ করিয়া কি সেইরূপ জন্মের সফলতা প্রাপ্ত হইল? ॥ ১ ॥

নিষেধবাক্যসকল নির্ভয়ে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল, বিশেষ করিয়া এই পৃথিবীতে কলিকালে সম্ভূত পাপী কুটিল মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া সম্যক্ মত্ত হইয়া নিজেদের জয় প্রকটিত করিতেছিল এবং ধার্মিক লোককে ধিক্কার দিতেছিল, কিন্তু হায়, হঠাৎ রামকৃষ্ণকে জানিতে পারিয়া একেবারে পরাজিত হইয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥

ঐ তিতিক্ষা, ঐ ত্যাগ, শম, দম, সমাধি, অভয়তা, ক্ষমা, শান্তি, ভক্তি, অতীন্দ্রিয়জ্ঞান, কামিনী-কাঞ্চনে প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা—ইহারা কি তোমার দিব্য শরীরে অতিলোভে যুগপৎ সহচররূপে বাস করিয়াছে? ॥ ৩ ॥

হে আত্মরতে, (তুমি) স্বামী বিবেকানন্দেরও দুর্বোধ্য। এই ব্যক্তি কি উন্মত্ত, মূর্খ, পিশাচ-গ্রস্ত অথবা শুভ্র শশী ধরিতে উদ্যত বালকের মত অজ্ঞ, যাহাতে গুণে অতি মহান্ তোমার স্তব করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। হে নাথ, তুমি সহজকৃপাবলে এই দাসকে ক্ষমা করিবে ॥ ৪ ॥

তুমি এক, তুমি অদ্বৈত, তুমি সর্বকলাযুক্ত—বস্তুত তুমি নিষ্কল, তুমি সত্যবুদ্ধি এই সংসারে দীনের আরাধ্যদেবতা ও শরণ। তুমি সকলের প্রিয়, স্মরণ ও মননের একমাত্র আধার। হে পুণ্যরাশির প্রতিকৃতি! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৫ ॥

যুগ-প্রয়োজন

নবীন ধর্মের আবিষ্কর্তা জগদ্গুরু, সর্বজ্ঞ অবতারপুরুষ যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্যই আবির্ভূত হন, ধর্মক্ষেত্র ভারত নানা যুগে বহুবার তাঁহার পদাঙ্ক হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছিল।

যুগপ্রয়োজন উপস্থিত হইলে অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষের শুভাবির্ভাব এখনও তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চিদূর্ধ্ব চারি শত বৎসর মাত্র পূর্বে তাঁহার ঐরূপে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর অদৃষ্টপূর্ব মহিমায় শ্রীহরির নামসংকীর্তনে উন্মত্ত হইবার কথা লোকপ্রসিদ্ধ। আবার কি সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে?

আবার কি বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, নষ্টগৌরব ভারতের যুগপ্রয়োজন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়নপূর্বক তাঁহাকে বর্তমান কালে শরীর পরিগ্রহ করাইয়াছে?

ঘটনা ঐরূপ হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বর্তমানকালের যুগপ্রয়োজন সাধিত করিতে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত পুনরায় ধন্য হইয়াছে।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, অবতরণিকা—স্বামী সারদানন্দ)

কথাপ্রসঙ্গে

'সর্বধর্ম-স্বরূপিণে—'

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কালচক্রে ঘুরিয়া আসে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া—নব সৃষ্টির বার্তা বহিয়া, নব জীবনের আশা লইয়া মলয় বায়ু ডাক দিয়া যায় গাছে গাছে, বলে : ওঠ জাগো, শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে, ফুল ফুটাইবার সময় আসিয়াছে—ওঠ, জাগো, ফোটো।

জোয়ারের জলের কুলুকুলু আহ্বানে ঘুমন্ত মাঝি জাগিয়া উঠে—নোঙর খুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেয় যাত্রাপথে। দুর্যোগের রাত্রিশেষে দখিনা হাওয়ায় পাল তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া নৌকা তীরবেগে অগ্রসর হয় তার লক্ষ্য পথে।

এমনই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। যুগান্তের অন্ধ জড়তায় ভারত ছিল নিদ্রাচ্ছন্ন, স্বরূপ স্বধর্ম ভুলিয়া পর-পদানত পর-পদলেহী ভারতবাসী পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষাকেই জীবনের ধর্ম করিয়া তুলিয়াছিল। স্থানে স্থানে দু'চারিটি জ্যোতির্ময় তারকা নিশীথ আকাশের অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোক বিকীরণ করিতেছিল। অবশেষে, তপস্যাপূত রাত্রিশেষে দেখা দিল উষার উদয়াচলে 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'।

অজ্ঞান-জাত বদ্ধ সংকীর্ণতা চূর্ণ করিয়া জ্ঞান প্রেমের পরম বিস্তার প্রথমে দু'চারিটি সাধক-মনকে এ যুগের নূতন ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিল, ধীরে ধীরে সেই মহাভাব হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, দেশ হইতে দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া সূচনা করিল এক নব-মানব-সংহিতার—যাহার মূলমন্ত্র : সত্য এক—কিন্তু তাহার বহু রূপ—বিচিত্র বিকাশ। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা বহু রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক অদ্বয় সত্য ভাষার মধ্য দিয়া যখনই প্রকাশিত হইবে তখনই তাহার নানা বিচিত্র রূপ অনিবার্য। নানার মধ্যে যাহারা এক দর্শন করে—শাশ্বতী শান্তি তাহাদেরই। বৈচিত্র্যে একত্ব দর্শনই জ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব সুন্দর সহজ সরল ভাষায় বলিয়াছেন : 'এক জ্ঞান জ্ঞান, নানা জ্ঞান অজ্ঞান'।

জগৎ, জীব ও ঈশ্বর এই তিনটি লইয়াই মানুষের অনুসন্ধান। জগতের বৈচিত্র্য তাহাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু অনুসন্ধানী মন বৈচিত্র্যের মধ্যে ধীরে ধীরে ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করিয়া, পদার্থে পদার্থে ধর্মের মিল লক্ষ্য করিয়া, বিভিন্ন পদার্থ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করিল—যে পথের প্রান্তে আজ মানব-চক্ষে প্রতিভাত, সকল পদার্থই এক মহাশক্তির রূপান্তর।

জীব-সম্বন্ধেও মানুষের অনুসন্ধান তাহাকে বৈচিত্র্য হইতে ঐক্যের পথেই লইয়া চলিয়াছে। সকল জীবের জন্ম-জীবন-মৃত্যু পর্যালোচনা করিয়া মানুষ দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে—জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে যুগযুগান্তর ধরিয়া বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন আধারে, কিন্তু একই উদ্দেশ্যে—সে উদ্দেশ্য বিস্তার, সে উদ্দেশ্য মুক্তি, সে উদ্দেশ্য আনন্দ।

এই মুক্তির ও আনন্দের মীমাংসাই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে বিচিত্র দেবতা-কল্পনায়—নানা নামে ঈশ্বর-উপাসনায়—যাহার পর্যবসান 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম-স্বরূপাবধানে।

চলার মধ্যপথেই যত বিরোধ ও বিভেদ, তাহার কারণ নানা দর্শন। উচ্চ স্তরে উঠিলে তবেই মনে প্রতিভাত হয় পৃথিবীর আকার ও প্রকারের এক অখণ্ড সত্য ধারণা : সমতলও যেমন সত্য, গিরি গহ্বর উপত্যকাও তেমন সত্য, তুষারশুভ্র একক শৃঙ্গও সেই সত্যেরই আর এক

মহিমময় প্রকাশ, যেখান হইতে পরিদৃষ্ট বৈচিত্র্য এক অপূর্ব অননুভূত সুষমায় মণ্ডিত হয়, সমগ্র দৃশ্য এক পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তাহাই হইয়াছিল, নানা মত ও নানা পথ ধরিয়া প্রতিবারই এক অখণ্ড তত্ত্বে উপনীত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন—সকল মত সকল পথই সত্য। স্থানকালপাত্র-ভেদে প্রতিটি ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বিভিন্ন উপায়। সেই পথ যাঁহারা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর লাভ করিয়া মানুষকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন তাঁহারা এক এক ধর্মের প্রবর্তক—সেই সেই ধর্মের স্বরূপ।

পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যবশত এই বৈচিত্র্য বিভেদের কারণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব—পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মজগতে বাদ-বিসম্বাদের অবসান সূচনা করিতেছে। যুগ-প্রয়োজনে কোন কোন ধর্মের, কি সকল ধর্মেরই বহিরাবরণ আজ বর্জনীয়। সর্ব ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সত্য এক, লক্ষ্য এক, সাধনার দ্বারা অন্তরের গভীর অনুভূতি দ্বারা এই মহা তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছেন।

তাইতো স্বামীজীর কণ্ঠে সর্বধর্মের প্রকৃত তত্ত্বরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে:

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম-স্বরূপিণে।
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

যাঁহার আবির্ভাবে সাধারণভাবে মানুষের ধর্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং বিশেষভাবে প্রত্যেক ধর্মই উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, তিনিই ধর্মের স্থাপক, যিনি সকল ধর্ম সাধনা করিয়া, প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিয়া, তত্তৎ ধর্ম প্রবর্তকগণের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছেন তিনি সেই সেই ধর্মের স্বরূপ। এক এক ধর্মের প্রবর্তক যখন ঈশ্বরাবতার রূপে পূজিত হন, তখন সর্বধর্মের নব-জীবনদাতা যে অবতারবরিষ্ঠ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ধর্মের স্থাপক, সর্ব ধর্মের স্বরূপ অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

বিজ্ঞান ও মানবতা

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এবং জানুআরির প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজে বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিভিন্ন বক্তা ও মনীষীর কণ্ঠে যে সকল ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে আশা ও আকাঙ্ক্ষার উচ্চ সংগীতের সহিত আশঙ্কার চাপা সুরটিও ধরা পড়িয়াছে।

১৯৫৭ খৃঃ নানা কারণে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বর্ষ। এই বৎসরেই মানুষ শুরু করিয়াছে জলে স্থলে আকাশে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বহুমুখী বিজয়াভিযান। সদ্যোলব্ধ আণবিক শক্তিকে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিবার চেষ্টাতেই আজ একে একে সফল হইতেছে মানুষের অনেক দিনের স্বপ্ন।

শুভক্ষণেই শুরু হইয়াছিল আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বর্ষ। এই সমারম্ভের অল্পদিনের মধ্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করিয়াছে। দক্ষিণমেরুও আজ মানবের পদানত। কে জানে এই দুই নবার্জিত লোকে মানবের কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে? আর কেই বা জানে এই গবেষণা-বর্ষ শেষ হইবার পূর্বেই চন্দ্রলোকে, গ্রহান্তরে গমন প্রভৃতি কীর্তি বিজ্ঞানকে জয়-মণ্ডিত করিবে কি না? জনৈক প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন ২০৫৭ খৃঃ পৃথিবীর লোকসংখ্যা তিন গুণ হইবে অথচ খাদ্যাভাব ঘটিবে না, বিজ্ঞান কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিবে, রোগ ও মহামারী সম্পূর্ণভাবে বিজিত হইবে। যুদ্ধও

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকিয়া প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হইবে। খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমানের ভীতি ও সংশয়-কণ্টকিত জগৎ এই একশত বৎসর বাঁচিবে কি উপায়ে?

বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার মধ্যে জড় পদার্থ ও জড়শক্তি এমনই ভাবে রাজত্ব করিতেছে তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই কল্পনা করিতে পারেন—এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব- ও যন্ত্র-আবিষ্কারেব মূলে রহিয়াছে মানুষেব মন, যাহাকে সর্বাংশে জড় বলা চলে না।

ইংলণ্ডের মহামনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বৈজ্ঞানিক কৌশলের বর্তমান অগ্রগতির সহিত তুলনা করিয়াছেন—চালকবিহীন একটি সামবিক ট্যাঙ্ক-বাহিনীর। তাঁহার মতে আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, পাশ্চাত্ত্য মানবকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিযাব পরিপূরক স্বরূপ—এই সকল আবিষ্কৃত পদার্থ লইয়া বাঁচিবার উপায়ও আবিষ্কার করিতে হইবে।

নবতম আবিষ্কারগুলি একই সঙ্গে আনন্দ ও ভযেব কারণ হইযাছে, সন্দেহ ও প্রতিযোগিতার বিষ মানব-মনকে বিযাক্ত কবিতেছে, রোগ ও মহামারীর বীজাণু-জয়ী বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও জিঘাংসার বীজাণুর মূলানুসন্ধান করিতে হইবে, নতুবা সকলই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে।

পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় ভারত বিজ্ঞানে অনগ্রসর, কিন্তু চিন্তার জগতে—মনীষার জগতে তাহার যে উত্তরাধিকার, তাহা লইয়াই সে আজ বিশ্বসভায় অগ্রসর হইতেছে। সর্বধ্বংসী সভ্যতা-সংকট ভারতে একাধিক বার দেখা দিযাছে প্রত্যেক বারই ভাবত-মনীষা সেই সংকট উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্টির নূতন নূতন পর্যাযে পদক্ষেপ করিয়াছে। বিশেষ এই যে, বর্তমানের সংকট বিশ্বব্যাপী।

অণুপরমাণুকে বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান যে শক্তি অর্জন করিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব, কিন্তু এই শক্তিকে সংযত করিয়া কল্যাণে নিযুক্ত করিতে হইলে আজ প্রয়োজন মনের বিশ্লেষণ, কারণ প্রকৃতির যে শক্তি তাহা অন্ধ শক্তি, তাহার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ বোধ নাই। প্রকৃতির নিয়মেব বশেই ভূমিকম্প হয়, বজ্রপাত হয়, নদীতে বন্যা আসে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দ্বীপকে পরিপ্লাবিত করে। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের হিসাব প্রকৃতি রাখে না। মানুষই নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আধিদৈবিক আধিভৌতিক বিপদকে বারণ করিবার চেষ্টা করে, প্রকৃতিকে জয় কবিবার বাসনা করে। তাই সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত: প্রকৃতি জড়া, প্রকৃতি অন্ধ, পুরুষ চেতন, পুরুষ চক্ষুষ্মান্। মানুষের অন্তরে এই চেতন পুরুষই চিন্তা করিতেছেন—সব কিছু অনুভব করিতেছেন, উদ্ভাবন করিতেছেন। বহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়া মানুষ জাগতিক উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিতেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের রহস্য অবগত না হইলে এই উন্নতি অবনতিব পূর্বাভাষেই পযবসিত হইতে বাধ্য।

বিজ্ঞানের জয়ের গর্বে বালকের মতো উল্লসিত হইবার বয়স মানুষ আজ অতিক্রম কবিয়াছে, তাহাকে আজ প্রতিটি আবিষ্কারেব মানবিক মূল্যায়ন করিতে হইবে, কল্যাণ অকল্যাণেব হিসাব করিতে হইবে। সামাজিক রাষ্ট্রিক কল্যাণ ব্যতীত মানুষের নিজস্ব একটি কল্যাণ আছে, সে সম্বন্ধেও তাহাকে সচেতন হইতে হইবে, এবং মনে হয় এইখানেই সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। ব্যক্তির আত্যন্তিক কল্যাণই সমাজের কল্যাণে প্রতিফলিত হইবে। প্রতিটি মানুষকে যদি উন্নত করা যায় তবে সমাজ আপনিই উন্নত হইবে, এবং এই উন্নত

মানব-পরিচালিত সমাজ রাষ্ট্র সব কিছু নিশ্চয়ই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

পৃথিবীতে আজ বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই. বুদ্ধিমান যন্ত্রকুশল বৈজ্ঞানিক আজ বিশ্বের বিস্ময়, কিন্তু অভাব আজ কল্যাণবুদ্ধির। যন্ত্রের সঙ্গে অহোরাত্র বাস করিয়া যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ অহরহ শুনিয়া—যন্ত্রের জটিল গতি সর্বদা চিন্তা করিয়া বহু বৈজ্ঞানিকের মন আজ যন্ত্রাকার-কারিত। বৈজ্ঞানিক ভুলিতে বসিয়াছে যে সে মানুষ, ভুলিতে বসিয়াছে সে জ্ঞানের তাপস, কল্যাণব্রতী।

বর্তমানের এই সংকট-মুহূর্তে শ্রীনেহরুর কণ্ঠে যথাসময়েই ধ্বনিত হইতেছে ভারত-মনীষার সাবধান-বাণীর সহিত অভিজ্ঞতার নির্দেশ-বাণী।

The major problem of the age is how far Science and technology will be governed by wisdom They can lead us to what may be called the earthly paradise provided you give wisdom to Science and the children of Science (Address after Jadavpur Convocation)

যন্ত্র ও বিজ্ঞান প্রজ্ঞা দ্বারা কতটা নিয়ন্ত্রিত হইবে—ইহাই এ যুগের বড় সমস্যা। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে প্রজ্ঞা দিতে পারিলে তাহারা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানকে প্রজ্ঞায় পরিণত করিবে কে, কি উপায়ে?

The teaching of Science should be balanced by teachings in the humanities, otherwise the personality would be lopsided. Science without human approach is likely to be dangerous. We should aim at an integrated human being who fits in with the spirit of the age

(Address at Jadavpur)

বিজ্ঞান-শিক্ষার সহিত মানবতা শিক্ষা দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা ব্যক্তির ভারসাম্য হারাইয়া যাইবে। মানব-ভাব-বর্জিত বিজ্ঞান বিপজ্জনক, আমাদের লক্ষ্য একটি পূর্ণ মানব, যে যুগ-ভাবের সহিত খাপ খাইয়া যাইবে।

শ্রীনেহরু আশা করেন:

Scientists may gradually develop something of the wisdom of the sage, something even of the compassion of of the saint (Address at Science Congress, Madras)

হয়ত ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিকের অন্তরে ঋষির প্রজ্ঞা ও সাধুর করুণা আবির্ভূত হইয়া যান্ত্রিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিককে অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ মহাপুরুষে পরিণত করিবে। সেইদিন মানুষের শুভদিন—সেইদিন পৃথিবীর নবযুগ।

শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিকের কীর্তিকলাপই আজ যথেষ্ট নয়, জ্ঞান ও করুণার ভাব মানব-মনে আবির্ভূত না হইলে সম্মুখে 'মহতী বিনষ্টিঃ'।

প্রকৃতি ও মানব

মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠবার জন্যে সংগ্রাম করছে ততক্ষণই সে মানুষ, এবং এই প্রকৃতি ভিতরে ও বাহিরে। এই প্রকৃতি শুধু আমাদের শরীরস্থ এবং বহিঃস্থ যাবতীয় পদার্থের অণুগুলিকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, উপরন্তু অভ্যন্তরস্থ অতি সূক্ষ্ম সত্তাকেও নিয়ন্ত্রিত করে, প্রকৃতপক্ষে ভিতরের শক্তিই বাহিরকে চালায়। বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা ভাল, এবং খুবই চমৎকার, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা আরও চমৎকার। গ্রহনক্ষত্র কি নিয়মে চলছে, তা জানা ভাল ও চমৎকার, কিন্তু মানুষের মনের ইচ্ছা, ভাব ও আবেগগুলি কি নিয়মে চালিত হয়, তা জানা অনন্তগুণে ভাল ও চমৎকার। এই ভিতরের মানুষটিকে জয় করা, মানুষের মনের সূক্ষ্ম রহস্য অনুধাবন করা, এবং এর গোপন তত্ত্বগুলি জানা সম্পূর্ণভাবে ধর্মের এলাকায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণ*

আপনারা আমাকে আজ এই উৎসবে যোগদান করার সুযোগ দিয়েছেন, এটি আমি নিজের বড় সৌভাগ্য বলে মনে করছি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম আজ সারা জগতে সুপরিচিত। আমরা যখন আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভুলে এক নতুন স্রোতে অবশ হয়ে ভেসে চলেছিলাম, তখন এমন একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'ল, যিনি আমাদের সেই স্রোত থেকে শুধু টেনে তুললেন না, পরন্তু সেই ধারাকে পরিবর্তন করে সারা দেশের সামনে এক নতুন জাগরণ নতুন আলো দেখিয়ে গেলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা সেই দিব্য পুরুষের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন এবং যে সব বিদ্বান তপস্বী ও সাধু সজ্জন তাঁর আদর্শের পথে চলেছেন, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ জীবন ঈশ্বরের নামে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, আজ ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় বড় শহরে এবং অনেক ছোট ছোট স্থানে, আপনারা যেখানেই যাবেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠের শাখা কোথাও না কোথাও দেখতে পাবেন। যেখানে যেখানে এই স্বামীজীদের দেখতে পাওয়া যায়, সেখানেই সেবাকেন্দ্রে দেখতে পাবেন দুঃখ দূর করার উপায়ও বর্তমান। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মানুষের ভুলের দরুন, যে কারণেই দুঃখ আসুক, সব জায়গাতেই স্বামীজীরা প্রস্তুত আছেন, তাঁরা দুঃখীদের দুঃখের ভাগ নেবার জন্য সর্বদা তৎপর।

আমার সৌভাগ্য যে যখন যেখানে এ-রকম সেবাকার্য করার সুযোগ ও সৌভাগ্য পেয়েছি, সেখানে স্বামীজীদের শুধু দর্শন নয়, তাঁদের সহযোগিতাও লাভ করেছি। আর এই কারণেই আমি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন ভক্ত হয়ে গেছি। তার মানে এ নয় যে আমি তাঁদের মত যোগ-সাধনা জানি, অথবা তাঁরা যে উচ্চ স্তরের দর্শনের বিচার করতে বা শিক্ষা দিতে পারেন, তা আমি কিছু জানি, এ নয় যে তাঁরা যে প্রকার ত্যাগ ও সংযমের মধ্যে জীবন যাপন করেন, আমার জীবনও তেমনিভাবে কাটে, কিন্তু আমি মুগ্ধ এই জন্য যে ঐ সব বজায় রেখে, এবং অন্য সব কাজ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জনসেবাকে তাঁরা ধর্মের এক বড় অঙ্গ, এমনকি এটিকেই সব চেয়ে বড় অঙ্গ বলে তাঁরা মেনে নিয়েছেন বললেও কিছুমাত্র ভুল বলা হবে না। আজ ভারতের যা অবস্থা, তাতে এই প্রকার লোকেরই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, যাঁরা সেবাভাব নিয়ে সকলের সহায়তা ও উপকারের জন্য সর্বদা নিযুক্ত থাকবেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত দিব্য পুরুষের প্রেরণা ও শিক্ষার ফলেই আমরা ও সমগ্র জগৎ এই ভাব ও আদর্শ উপলব্ধি করতে পেরেছি।

যাঁরা বছরের পর বছর ধরে দর্শন-পাঠে কাটান রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁদের মধ্যে গণ্য হতেন না, অথবা যারা সাধারণ কাজেই জীবন কাটিয়ে দেয় তিনি তাদের মতও ছিলেন না। তিনি ছিলেন দৈবীশক্তিসম্পন্ন অবতারপুরুষ, তাঁর হৃদয় একদিকে ছিল ভগবদ্-ভক্তিতে ভরপুর, অপর দিকে ছিল অসীম মানব-প্রেম এবং সকলের জন্য সদ্ভাবনা ও ভালবাসায় ভরতি। এইজন্য কেবলমাত্র ধার্মিকেরা নয়, প্রকৃত অর্থে যাদের ধার্মিক বলা যায় না তারাও তাঁর প্রভাবের বাইরে থাকতে পারত না এবং ঐ সময়ের মানদণ্ডে যাঁরা সুশিক্ষিত বলে বিবেচিত হতেন, তাঁরা শুধু তাঁর কথাই শুনতে আসতেন না, অধিকন্তু রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে নিজ নিজ জীবনে গড়তে সচেষ্ট হতেন। আমার মনে হয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এমনি শক্তি ছিল যে তিনি সহজেই অপরের জীবন নতুন ভাবে গড়ে তুলতে পারতেন।

দিল্লী শহরের পক্ষে এ বড় সৌভাগ্যের কথা যে দাওরজীর সাহায্যে, তাঁর প্রেম ও শ্রদ্ধার ফল-স্বরূপ আজ এখানে এমন একটি মন্দির আমরা লাভ করেছি যেখানে হাজার হাজার নরনারী এসে শুধু মূর্তি দর্শনই করবে না, অধিকন্তু উপদেশামৃত পান করতেও পারবে। শুনেছি এখানে যখনই কোন

* ৩০.১১.৫৭ তারিখে নূতন দিল্লীতে রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন মন্দির উদ্‌ঘাটন করার সময় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ-প্রদত্ত হিন্দী ভাষণের সারানুবাদ।

ধর্মালোচনা হয়, তখন হাজার হাজার লোক আসে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরে বহু লোক রামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্তির দর্শন পাবে এবং দিন দিন আরও অধিক লোক এখানকার ধর্মালোচনাসভায় উপদেশামৃত পান ক'রে নিজ নিজ জীবন সফল ক'রে তুলতে পারবে।

আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য যে এই উৎসবে আপনারা আমাকে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দান করেছেন, এজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ—এই বলে আমি আনুষ্ঠানিক-ভাবে এই মন্দির উদ্‌ঘাটন করছি।

তুমি কি এসেছ আজি ?

শ্রীদিব্যপ্রভা ভবালী

তুমি কি এসেছ আজি, হে অরূপ! রূপের খেলায়—
বিশ্বের নিশ্চল প্রাণে অনাবিল আলোক প্লাবনে ?
জ্যোৎস্না-স্নাত ধরণীর অপরূপ সৌন্দর্য মেলায়,
নিবিড় স্বপন-সুধা-বিজড়িত প্রকৃতি নয়নে ?

তুমি কি এসেছ আজি এ অসীম জ্যোতি-পারাবারে
বিদূরিয়া অন্ধকার তমোময় ভব-গহনের ?
দ্যুলোকের পথ বাহি' এসেছ কি ভূলোকের দ্বারে
বিতরি' বারতা কোন্ সুদূরের আনন্দ-লোকের ?

তুমি কি এসেছ আজি, হে অমৃত! এ মর্ত্য ভবনে,
ঢালিছ অনন্ত ধারে শান্তিসুধা মৃত সঞ্জীবনী ?
ত্রিতাপ-তাপিত প্রাণ জুড়াইল স্নিগ্ধ পবশনে
অমল প্রভাব তব বিগলিত প্রেমনিস্যন্দিনী।

তুমি কি এসেছ আজি জ্যোতিষ্মান্! নিশি অবসানে—
টুটায়ে স্বপনজাল মোহনিদ্রা জড় জগতের,
জাগায়ে চৈতন্যালোক বিমূর্ছিত নিখিলের প্রাণে ?
নিবিড় তিমির ভেদি উদে রবি নব প্রভাতের!

তুমি কি এসেছ আজি, মেঘমুক্ত মানস গগনে
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি! নিস্তরঙ্গ চিত্ত-সরোবরে ?
রিক্ত এ জীবন মম পূর্ণ হ'ল করুণা-কিরণে,
বহিল অমৃতধারা হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে!

তুমি কি এসেছ মোর ধ্যানলোকে চিন্ময় মূরতি—
নিরানন্দ হৃদিকক্ষে চিদ্‌ঘন আনন্দ অক্ষয় ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-বক্ষে উদ্ভাসিল কী অখণ্ড জ্যোতি,
চরাচর বিশ্বপ্রাণ হ'ল আজি ভূমানন্দময়!

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

দক্ষিণেশ্বরে কত সব বড় বড় পণ্ডিত আসত ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিন্তু শাস্ত্র পড়ার ধারও ধারতেন না, অনুভূতিই ছিল তাঁর সম্বল। তাঁর যখন যা অনুভূতি হ'ত তা শাস্ত্রে আছে কি না, তিনি জানতে চাইতেন শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে। শাস্ত্রের সঙ্গে ঠাকুরের অনুভূতির হুবহু মিল দেখে পণ্ডিতদের সব মাথা নুয়ে যেত। শাস্ত্র পড়া থাকলেও তারা সবাই আসত ঠাকুরের কাছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে।

উপনিষদ্ অপরাবিদ্যার চেয়ে পরাবিদ্যাকে বড় বলেছে, আর ঐ পরাবিদ্যা-লাভই ভারতের আদর্শ। বিশ্ব-বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার এই আদর্শের প্রতীক আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এক কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসীর কাছে একদিন মাথা নুইয়েছিলেন এই ভারতবর্ষে। পড়ার চেয়ে অনুভূতিকেই বড় মনে করেছে ভারত চিরকাল। লক্ষ্য বস্তু রয়েছে হৃদয়-গুহায়—'নিহিতং গুহায়াম্'। হৃদয়ের গভীরে মনকে ডুবিয়ে দাও, যত ডুববে তত নতুন নতুন দর্শন হবে স্তরে স্তরে। ঋষিদের এই সব দর্শনের ফলই তো বেদ, উপনিষদ্, কোরানও তাই, বাইবেলও তাই। এ তো গেল অন্তর্জগতের কথা।

বহির্জগতের কথা নিয়ে আছে বৈজ্ঞানিকের দল। জাগতিক উন্নতি তারা নানা দিক দিয়ে করছে, আবার এটম্-বম্বও করছে। এজন্য তাদের কত চেষ্টা, কত গবেষণা। এতে কি শান্তি পাচ্ছে তারা? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেরও দেখ, —শুধু কথার কচ্‌কচানি। তারা ধ্যান-ধারণার ধারও ধারে না; তারাও কি শান্তি পায়? শাস্ত্র চিনিতে বালিতে মেশানো—ঠাকুর বলতেন। তাতে নানা মত ও পথের কথা আছে। কোন্ পথ নেবে বুঝতে না পেরে সকলে দিশেহারা হয়ে যায়। ঠাকুর তাই বলতেন—সাধুমুখে শাস্ত্রের সার কথা জেনে নিতে হয়। বিবেকী পণ্ডিতদের কথা অবশ্য আলাদা, তাঁরা আসল জিনিসটির দিকে লক্ষ্য রেখে শাস্ত্রের সারকথা নিয়ে চলেন।

জাগতিক জিনিসগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা ঘাঁটছে। কি দিয়ে ওগুলি তৈরী তাই বিশ্লেষণ করছে, তারাও এগোচ্ছে। এই ভাবে একদিন না একদিন তারা এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যেখানে আর বিশ্লেষণ করা যায় না,—তখন ধ্যানের ভেতর দিয়ে একত্বের জ্ঞানে তাদের পৌঁছতে হবে। তারাও দেখবে—'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'। তাই বলি—এগোতে হবে। ঠাকুর বলতেন—ডুব দাও, এগিয়ে পড় আর ঝাঁপ দাও।

এগোতে না পারলে কিছুই হবে না। সংসারের কথাই ধর না, কাজের মধ্যে যত ডুবে যাবে কাজও তত ভাল হবে। ঘর-দোর, জমি-জমা, টাকা-কড়ি সব পাবে। একজন ব্রহ্মচারী এক কাঠুরেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'এগিয়ে পড়'। কাঠুরে এগিয়ে দেখলে এক চন্দন কাঠের বন রয়েছে। আরো এগিয়ে দেখলে তামার-খনি, তারপর রূপার খনি। আরো এগিয়ে পর পর দেখতে পেলে সোনার খনি, হীরের খনি। খুশিতে তার মন একবারে ভরে গেল। তাই বলি এগিয়ে যাও, হৃদয়ে মনকে ডোবাও। যত ডুববে তত আনন্দ বাড়বে।

সাধনার নানা পথ, নানা স্তর—যে যে পথে

* বাঁচিতে ৩।৯।৫৭ তারিখে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক অনুলিখিত।

এগোয়, যার গুরু যেমন পথ দেখান। একটা পথ ধরে চলতে হয়। যত মত তত পথ। এক একটি মত নিয়ে যেন এক একটি দল গড়ে উঠেছে। এরূপে কত সম্প্রদায়ের না সৃষ্টি হয়েছে। মসজিদের লোকেরা চীৎকার ক'রে বলছে: আমাদের কাছে সবাই এসো, আমাদের ধর্ম সত্য। গির্জার লোকেরা ডাকছে: আমরাই তোমাদের আলো দেখাব, পরম পিতার কাছে পৌঁছে দেব। মুক্তি পাবার একমাত্র পথ এই। নিরাকারবাদীরা বলছে: ব্রহ্মকে পেতে গেলে আমাদের অনুসরণ কর। শাক্ত বৈষ্ণব সকলেরই ঐ এক কথা। সবাই বলে আমাদের পথই সত্যস্বরূপকে জানার একমাত্র পথ। শুধু কি এখানেই শেষ। তারা আরো বলে: আমাদের পথই ঠিক, আর অপর পথ সবই ভুল, অন্য পথে মুক্তি নাই। এই নিয়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত মারামারি, কত লাঠালাঠি। ঠাকুর বলতেন: এ যেন অন্ধের হাতী দেখা। কেউ দেখেছে পেট-টা, তার ধারণা হ'ল হাতী জালার মত। আবার কেউ দেখেছে কানটা, তার ধারণা হাতী কুলোর মত। যার যেমন স্পর্শানুভূতি। 'চিদাকাশে যার যা ভাসে' তাই তার বোধের সীমানা। যার চোখ আছে সেই হাতীটার পূর্ণ রূপ ঠিক দেখতে পায়, সে দেখে অংশ সত্য, পূর্ণও সত্য। এক অংশ সত্য জেনেছি বলে বাকী আর কিছু নেই, বা আর সকলের দর্শন মিথ্যা, এ কথা কি ক'রে বলি? ঠাকুর গল্প বলতেন: এক জঙ্গলে এক গাছে একটি গিরগিটি থাকত। যারা সেই দিকে যেত তারা সবাই সেটাকে দেখতে পেত। কেউ দেখেছে সেটি লাল, কেউ নীল আবার কেউ হলদে, কেউ বা সাদা। একদিন কয়েক-জনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে ঐ গিরগিটির রং নিয়ে। যে যেমন দেখেছে সে সেই রংকেই গিরগিটির রং বলে সবাইকে বিশ্বাস করতে বলছে আর অপরের দেখাটাকে ভুল দেখা বলছে। এমন সময় একজন সব শুনে বললে, "দেখ, আমি যে এই গাছ তলায় থাকি—তোমাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিক, ওটা বহুরূপী—ওর রং বদলায়—ও কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও বা হলদে, আবার কখনও বা দেখি ওর কোনও রং-ই থাকে না।' এই কথা শুনে তাদের ঝগড়ার শেষ হয়।

সাম্প্রদায়িকতায় যখন সমগ্র বিশ্ব জর্জরিত, তখন এমন একজন শক্তিশালী মহাপুরুষের দরকার হ'ল—যিনি ঐ লোকটির মত প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে জোরের সহিত বলতে পারবেন 'যত মত তত পথ। সব পথই সত্য'। শুধু বলা নয় নিজ জীবনে সব পথে সাধনা ক'রে ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন সেই সত্য। হাতে নাতে পরীক্ষা ক'রে না দেখালে এই বিজ্ঞানের যুগে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? সকল ধর্ম সাধনা ক'রে দেখালেন, সব ধর্মই ঠিক, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে ৬৪ খানি তন্ত্রমতে সাধনা ক'রে তন্ত্রোক্ত মতের সত্যতা প্রমাণ করলেন, তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈতমতের সাধনা ক'রে করলেন সিদ্ধিলাভ। বৈষ্ণবাদি অপরাপর মতে সাধনা ক'রে ঐ সব মতগুলিকেও সমর্থন করলেন। এই ভাবে দেখালেন সকল পথই সত্য, মতটা পথ—অনুভূতির এক এক স্তর। তাঁর অনুভূতির কথা শুনে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা বলত, শাস্ত্রে যা যা অনুভূতির কথা লেখা আছে ঠাকুরের তা তো হয়েছেই—আরো বরং বেশী হয়েছে। তিনি দেখতেন চিন্ময়ী মা, চিন্ময় কোশাকুশি, চিন্ময় বেদী, চিন্ময় ঘট। সবই চিন্ময়। সবই মা। তিনি আরো বলতেন, তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে এবং আরো কত কি কে তা বলতে পারে?

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ব্রহ্মের এক পাদই এই জগৎ; বাকী

তিন পাদে ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশ অজানা রয়ে গেছে, তার খবর কে বলতে পারে? মানুষের কতটুকু জ্ঞান, কতটুকু উপলব্ধি? তিনি না জানালে কার সাধ্য তা জানে।

ঠাকুরের সর্ব স্তরের অনুভূতি ছিল বলেই না তাঁর গুরুদেব তোতাপুরীকে বিশ্বাস করাতে পারলেন—বেদান্তের ব্রহ্ম যেমন সত্য, লীলা-জগৎও তেমন সত্য, রূপ ও অরূপ দুই-ই তিনি। ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে বিশ্বাস করাতে পারলেন ব্রহ্ম সগুণও বটে, আবার নির্গুণও বটে। ছাদ ও সিঁড়ি দুই একই জিনিসের তৈরী, ইট আর চূণ ইত্যাদি দিয়ে। এই ভাবে তিনি যার যা অসম্পূর্ণ ছিল তা সম্পূর্ণ করেছিলেন।

হিন্দুধর্ম ঋষিদের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—এটা সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আত্মাতে ধর্মে ধর্মে রেষারেষি নাই, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া নাই। সেখানে সব এক, একাকার। আত্মাকে জানাই শেষ কথা। তাকে জানলে সব জানার শেষ হয়। আত্মাকে জেনে অমৃতত্ব লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁতে আমার সত্তার সম্পূর্ণ লোপ করার নামই সমাধি—নির্বিকল্প সমাধি,—যেন শিশুর মার কোলে ঘুমনো। নিজের সত্তা মাতৃ-সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' ঠাকুরের কী আধার—তিন দিনে নির্বি-কল্প সমাধি। যে অবস্থায় পৌঁছতে তাঁর গুরু তোতাপুরীর লেগেছিল ৪০ বৎসর, বুদ্ধের লেগেছিল ৬ বৎসর। দালাই লামা এ কথা শুনে খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি হলে সাধারণ জীবের ২১ দিনের মধ্যে শরীর ত্যাগ হয়। অবতার-পুরুষদের কথা কিন্তু আলাদা। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য শরীর রক্ষা করেন। তাঁরা আসেন 'গোব্রাহ্মণহিতায়, জগদ্ধিতায় চ'।

ব্রহ্ম যে কেমন তা তিনি কত ভাবে বলেছেন। তিনি বলতেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না। আরো বলতেন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, গিয়ে গলে গেল। সব একাকার—কে এসে খবর দেবে?' ঠাকুর আর একটি উপমা দিতেন:

এক ঘর যুবক বসে আছে। সমবয়সী কয়েকজন মেয়ে তাদের দেখছে দূর থেকে। একজন মেয়ের বরও সেই যুবকদের মধ্যে বসে আছে। মেয়েটির এক বন্ধু যুবকদের এক একজনকে দেখাচ্ছে আর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছে 'ঐ কি তোর বর?' সে পর পর বলছে—না, না, না। এই ভাবে যেই তার বরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছে তখন সে নাও বলে না, আবার হাঁও বলে না, একটু হেসে একেবারে চুপ। ব্রহ্ম অস্তি-নাস্তির পার।

যখন সত্যস্বরূপের দর্শন হয় তখন 'না' বা 'হাঁ' বলার শক্তি থাকে না—একেবারে আনন্দে ভর-পুর। কেশববাবু একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নিরাকার ব্রহ্ম কেমন? ঠাকুর তিন-বার বললেন 'নিরাকার ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম'—তারপর সমাধি। অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটি ঘণ্টা সকলে ঐ অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। ঠাকুর যেন ব্রহ্মকে আস্বাদন করছেন।

এতেও কি লোকের বিশ্বাস হয়? অবিশ্বাসের যুগ যে। তিনি জোর ক'রে তাই স্বামীজীকে বললেন, 'তাঁকে দেখা যায়। ঠিক তোকে যেমন দেখছি তার চেয়ে স্পষ্ট করে তাঁকে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে দেখা শুধু কেন, কথা পর্যন্ত কওয়া যায়।'

ঠাকুর সব সময়ে ভাবমুখে থাকতেন। ভাব-মুখে থাকার অর্থ কি? এর মানে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এই দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা—'তুমি নাথ সর্বস্ব আমার' এই ভাব নিয়ে থাকা। এই ভাব থেকে সংসারের কর্তব্য কর্ম করা। এই অবস্থায় সহজেই উদ্দীপনা হয়।

শুকনো দেশলাই ঘষলেই জলে। আর ভিজা দেশলায়ের অবস্থা তো জানই। 'আমি কর্তা' জ্ঞান নিয়ে থাকা—ভিজা দেশলায়ের অবস্থা। একটা ভাব চাই। ঠাকুর থাকতেন মার ছেলে হয়ে, যীশু হয়েছিলেন পরম পিতার সন্তান, রামপ্রসাদ হয়েছিলেন কালীর ব্যাটা, হনুমান ছিলেন রামের দাস। এই রকম এক একটা সম্পর্ক পাতিয়ে সেই ভাব নিয়ে থাকতে হয়। একেই বলে ভাবে থাকা। ঠাকুর মার সঙ্গে কত কথা কইতেন এই ভাবে। ভক্তগণসহ কেশববাবু এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতেই ঠাকুর সমাধিস্থ। মা ও ছেলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন 'কলকাতা থেকে বাজ্যের লোক জুটিয়ে আনলি। আমি কি ওদের কাছে বক্তৃতা করব? আমি ওসব পারবনি বাপু।' আর একদিনের ঘটনা। ঠাকুর মাকে বলছেন, 'মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?' এই ভাবে ঠাকুর মার সঙ্গে কত কথাই না কইতেন।

অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর এতদূর পর্যন্ত বলেছেন 'সত্যি বলছি, মাইরি বলছি, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।' তাদের এত অবিশ্বাস যে পরক্ষণেই ঠাকুর বলছেন,'কাকেই বা বলছি আর কেই বা বিশ্বাস করবে?' এ-সবের জন্য ঠাকুরকে অনেকে পাগল পর্যন্ত বলত। ঠাকুরের ঐ উক্তির সমর্থন আমরা শাস্ত্রে পাই।

এবার দেখা যাক শাস্ত্র কোথায় ঠাকুরের এই সকল অনুভূতিকে সমর্থন করছে। কেনোপনিষদে দেবাসুর-যুদ্ধে দেবতাদের জয় ও অসুরদের পরাজয়ের কথা আছে। ব্রহ্ম দেবতাদের দেবতা। তিনিই দেবগণের জয়ের হেতু। দেবগণ একথা না জেনে মনে করেছিলেন যে এই বিজয়-গৌরব তাঁদেরই। দেবতারা যখন বিজয়োৎসবে মত্ত, তখন যক্ষরূপে ব্রহ্ম উপস্থিত হলেন তাঁদের সামনে। আগন্তুক কে, তা জানবার জন্য দেবতাগণ অগ্নিকে পাঠালেন। ব্রহ্ম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? এবং তোমার শক্তি কি?' উত্তরে অগ্নিদেবতা বললেন—'আমি অগ্নি। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আমি দগ্ধ করতে পারি।' তখন যক্ষরূপী ব্রহ্ম একগাছি শুষ্ক তৃণ তাঁর সম্মুখে রেখে তা দগ্ধ করতে বললেন। অগ্নি সগর্বে তৃণটি দগ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু না পেরে লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন। বায়ুদেবতারও ঠিক তেমনি দশা হ'ল। তখন গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র যক্ষের স্থলে এক সুশোভনা দেবীমূর্তি দেখতে পেলেন। সেই দেবীরূপিণী উমা দেবরাজকে বললেন, 'ইনি ব্রহ্ম। এঁরই শক্তি-বলে দেবতাদের বিজয় হয়েছে। এঁর শক্তিতেই দেবতাগণ শক্তিমান্'। দেবতাগণ লজ্জিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন তাঁদের ভ্রম।

এখন দেখ, ব্রহ্ম রূপ ধারণ করেন, দেখা দেন এবং কথাও বলেন। ঠাকুরের কথাও তো তাই। ঠাকুর ব্রহ্মকে এই ভাবেও উপলব্ধি করেছিলেন, আর তাই সকলকে তিনি বলতেন যে ভগবানকে দেখা যায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াও যায়।

ঠাকুর আর একটি কথার ওপর খুব জোর দিতেন, বলতেন তাঁকে লাভ করতে হ'লে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে। ঠাকুরের জীবনে এটি আমরা দেখি—তিনি টাকা ছুঁতে পারতেন না। টাকা ছুঁলে হাতে যেন শিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটত আর হাত বেঁকে যেত। এবার এই দিকটায় আসা যাক—শাস্ত্র একথা কোথায় সমর্থন করছে।

অজ্ঞান থেকেই 'আমি কর্তা' বা অহংবোধের উৎপত্তি। সবই তখন 'আমি করছি' এই ভাব। আমার ছেলে, আমার স্বামী, আমার বাড়ী—সবই আমার। সবাই বলে রাণী রাসমণি

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর-বাড়ী করেছেন, ক'জন বলে মায়ের ইচ্ছায় হয়েছে। 'আমি ও আমার' এই বোধ অজ্ঞান। ঠাকুরের কিন্তু এই 'আমি' ছিল না। বেণীপালের বাড়ী উৎসব হয়েছিল। যখন বিদায় নিচ্ছেন সকলে ঠাকুরকে বললে, 'আপনি কত আনন্দ দিলেন'। ঠাকুর বললেন: আমি কোথায় আনন্দ দিলুম—তিনিই দিয়েছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।

এই 'আমি' আছে ব'লেই জাগতিক সুখের জন্য মানুষ পাগল। পুত্রলাভের জন্য, বিত্তলাভের জন্য, লোকমান্যের জন্য কত চেষ্টা। আর ওগুলিকে আঁকড়ে ধ'রে বলে 'আমার আমার'। শাস্ত্রের কি এই শিক্ষা? বৃহদারণ্যকে দেখি:

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়শ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি, যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ।

এই কারণে আগে চার আশ্রমে থেকে কর্তব্য-পালন বিধি ছিল। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রম বাস শেষ ক'রে সমস্ত এষণা ত্যাগ ক'রে—তারাই সন্ন্যাস গ্রহণ করত যারা অমৃতত্ব লাভ করতে চাইত।

আরো দেখি—যম নচিকেতাকে পরীক্ষা করছেন—সে আত্মজ্ঞান পাবার অধিকারী কি না তা দেখার জন্য। যম তাকে বলছেন:

"যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।"

নচিকেতা, পৃথিবীতে যাহা কিছু কাম্য এবং দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্য বস্তু—যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। বালক নচিকেতা ইচ্ছা করলে কামিনী কাঞ্চন সবই পেতে পারত। ওগুলি দিয়ে তো অমৃতত্ব লাভ হবে না, তাই সে উত্তর দিলে, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—মানুষ কখনও বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না।

ঠিক একই কথা মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে যাবার পূর্বে তাঁর যা কিছু সম্পত্তি দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ ক'রে দিতে চাইলেন। তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করছেন, 'এই ভোগের উপকরণগুলি কি অমৃতত্ব-লাভের উপায় হবে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলেন 'অমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেন।' এ সব দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হবে না।

ঠাকুরও বলতেন তাই। তিনি গঙ্গাতীরে বসে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বিচার করতে করতে দুটোকেই গঙ্গায় ফেলে দিলেন। তাঁর ঐশ্বর্যও যা নিরৈশ্বর্যও তা। মন যাঁর পরম আনন্দে ভরপুর তাঁর কাছে মাটিও যা টাকাও তা।

ঠাকুর আরও বলতেন—সংসারের সব কিছু ভোগ করবো আবার ভূমানন্দও সম্ভোগ করবো—দুটো এক সঙ্গে হয় না। একটাকে ত্যাগ করতে হবে অপরটাকে গ্রহণ করার জন্য। এখানে কোনও আপোষ বা compromise চলবে না। ঠাকুর বার বার একথা বলেছেন। কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ করার প্রতি তাই এত জোর দিয়েছেন তিনি।

কামিনী মানে নারীতে স্ত্রী-বুদ্ধি, আর কাঞ্চন মানে ধন-ঐশ্বর্য—এক কথায় এষণা। পুত্রৈষণার জন্য স্ত্রী, আর স্ত্রীপুত্রের জন্যই কাঞ্চন—আর ঐগুলির পরেই লোকমান্য হবার ইচ্ছা—এ সবই ত্যাগ করা চাই। যুগে যুগে ঋষিদের যা অনুভূতি ঠাকুরেরও সেই অনুভূতি। তাঁরাও পুত্রৈষণা ও লোকৈষণা ত্যাগ করতে বলে গেছেন অমৃতত্ব-লাভের জন্য। ঠাকুরও এগুলিকে সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি আরও বলতেন ঐগুলি ত্যাগ করো—অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হও। সংসারে যেগুলিকে আমার আমার

বলছো সেই গুলিকে ভগবানের চরণে অর্পণ করে বল—'ও সব তোমার, তোমার, তোমার।'

ঠাকুর স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন পুত্রৈষণার জন্য নয়। তাঁকে দেখতেন জগতের মাতা-রূপে। তাইতো তাঁকে তিনি পূজা করলেন এবং নারী-জাতির ভেতর ক'রে গেলেন মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা। জগতে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। সহধর্মিণী স্ত্রী ও গর্ভধারিণী মায়ের মধ্যে সাক্ষাৎ জগন্মাতা তিনিই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর চোখে তিনই এক, একই তিন—এ এক অপূর্ব অনুভূতি।

যখন বিজাতীয় ভাবের আওতায় জগৎ শাশ্বত সনাতন আদর্শকে ভুলে গেল, সত্যকে ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরে মত ও পথ নিয়ে দিকে দিকে ঝগড়া, মারামারি, লাঠালাঠি শুরু ক'রে দিলে তখন যুগ-প্রয়োজনে আদর্শচ্যুত জগৎকে গ্লানি-মুক্ত করার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁর উপদেশগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির ফল বলে জগৎ বিস্মিত হয়ে মাথা পেতে মেনে নিলে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলে গেছেন, 'ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে হলে ঠাকুরকে বোঝ।' গীতা বল, উপ-নিষদ্ বল, ঠাকুরের কথা না পড়লে কিছুই বোঝা যায় না। তাঁর জীবনটাই হ'ল সব শাস্ত্রের সার।

তাই বলি এই অবতার-পুরুষের শরণাগত হও, তাঁর চিন্তায় মগ্ন হও। তাঁর জীবনই বেদ। তাই পড়ে অমৃতত্ব লাভ কর।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমুখ-ধ্বনিত বাণী স্মরি', এলে কি এ যুগে অবতরি'
বাখিতে ধরম ধরা'পরে নব রূপে নরদেব-সম ?
হে যুগদেবতা নমো নম॥

ত্রেতায় এসেছ ধরাধামে রামরূপী তুমি নরহরি
দ্বাপরে নেমেছ ব্রজভূমে নীরদ-শ্যামল দেহ ধরি'।
কলিতে এসেছ গোরা হয়ে, প্রেমের পশরা শিরে বয়ে'
জগতললাম-ভূত তুমি, ত্রিলোক-মানস-প্রিয়তম।
হে যুগদেবতা নমো নম॥

রাম ও কৃষ্ণ—দু'টি তনু, তোমাতে ধরিল নব-দেহ
শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে তুমি জগতে বিলালে কত স্নেহ।
সর্ব ধর্ম মাঝে বুঝি সাম্য-মৈত্রী পেলে খুঁজি'
সমন্বয়েরি সেতু গড়ি' ঘুচালে মনের মোহ, তম।
হে যুগদেবতা নমো নম।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভগ্নী নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে লিখেছেন : He had inherited the long-garnered knowledge of his race, that religion is no matter of belief but experience. ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার নয়,ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে আস্বাদন করবার ব্যাপার। এই আস্বাদনের অভিজ্ঞতা যেখানে নেই সেখানে ধর্মও নেই। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন : 'বিদ্যা-সাগরকে দেখলাম—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই।'

উপনিষদের ঋষি বলেছেন : যে সকল পণ্ডিত তাঁকে অন্তরের মধ্যে দেখেছেন তাঁদেরই সুখ শাশ্বত হয়, অন্যদের নয়—নেতরেষাম্। লেখা-পড়া-জানা লোকদের বেশীর ভাগই শুধু পণ্ডিত। কিন্তু শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ঠাকুর বলতেন: ধারণা করা চাই। এই ধারণা করার উপরেই ঠাকুর বার বার জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবানের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ আছে—এ কথা বললে বা শুনলে কি হবে? দরকার হচ্ছে তাঁর আনন্দের আস্বাদন। প্রয়োজন—শাস্ত্রে যা তত্ত্ব হয়ে আছে সেই metaphysicsকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করা, ঠাকুরের ভাষায় 'ধারণা করা'। তাঁকে ধারণা করলে কি হবে? অমর হবো। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেছে, ঠাকুর বলছেন : এতে ডুবে গেলে মরে না, অমর হয়। তিনি যে সুধার হ্রদ, অমৃতের সাগর। এই অমৃতের সাগর বাহিরের কামিনী কাঞ্চন বা খ্যাতিতে নেই, আছে অন্তরে। কিন্তু এ সংবাদ কয় জনে রাখে? ঠাকুর বলছেন : 'অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। মাটি চাপা আছে।'

অন্তরে সোনা আছে—ঠাকুর এসেছিলেন, মানুষকে এই সন্ধান দিতে। কি ক'রে এই সোনা লাভ ক'রে জীবনকে ধন্য করা যায়, তারও রহস্য-দ্বার তিনি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে গেছেন, বলেছেন এগিয়ে যাওয়ার কথা। এগিয়ে গেলে তবে অন্তরে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যাসাগর লেখাপড়ায় সমাজ-সেবায় আনন্দ পেতেন প্রচুর। সেই আনন্দে এসে তিনি থেমেছিলেন। কিন্তু জগতের উপকার করার মধ্যে যে আনন্দ আছে সেই আনন্দই তো জীবনের চরম আনন্দ নয়। চন্দন-বনের পরে আছে সোনার খনি। এই সোনার খনি পাওয়ার আনন্দ চাই। আমাদের মন আনন্দেরই কাঙাল, যে-আনন্দের কাছে আর সব আনন্দ ম্লান হয়ে যায়, যে-আনন্দ শাশ্বত, যে আনন্দ পেলে আর সব আনন্দ তুচ্ছ বলে মনে হয়। ভগবানেই এই চরম আনন্দ।

ঠাকুর ছিলেন খুব practical, যাকে দার্শনিক-দের ভাষায় বলে pragmatist (প্রয়োজনবাদী)। দরকার হচ্ছে জীবনের চরম আনন্দকে আস্বাদন করা, সেইজন্য প্রয়োজন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। কারণ, 'The ultimate reality is the peace of God which passeth all understanding'—কথাটা আল্‌ডুস্ হাক্স্‌লীর। এই দিক থেকেই ঠাকুর বলেছিলেন : বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক। 'ফিলজফি লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে?' দরকার তো মাতাল হওয়া নিয়ে। এক ছটাক মদে যদি মাতাল হ'তে

পারো তবে শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে—এ হিসাবে দরকার কি ?' প্রয়োজন আম খাওয়া, 'বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে কাজ কি ?' যুগের সম্মুখে ঠাকুরের এই প্রশ্ন অতি মোক্ষম প্রশ্ন। বুদ্ধিকে আমাদের শাস্ত্রে কোথাও ছোট করা হয়নি। 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।' কিন্তু একটা জায়গায় এসে বুদ্ধির দৌড়ও ফুরিয়ে যায়। একসেরা ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না। বুদ্ধির সর্বগ্রাসী ঔদ্ধত্যের মধ্যে যে একটি আত্মঘাতিনী নির্বুদ্ধিতা আছে তার বিরুদ্ধে এ যুগে বিদ্রোহ করেছেন মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্‌ (William James), ফরাসী মনীষী বার্গসঁ এবং আরও অনেকে। কথামৃতের মধ্যে এই একই বিদ্রোহের সুর বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

> 'পাণ্ডিত্যে কি আছে ? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই।' (কথামৃত ৪র্থ ভাগ)

দরকার আনন্দ। 'সব আনন্দ ধূলায় ফেলে দিয়ে সে আনন্দে বচন নাহি ফুরে' (রবীন্দ্রনাথ)—সেই আনন্দে আমাদের প্রয়োজন। আমাদের আত্মা এই আনন্দেরই দাবি করছে জীবনের কাছ থেকে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গীতার রচনাবলীতে লিখেছেন : 'বিষয়ের আনন্দ প্রথমটায় অমৃত বলেই মনে হয়, কিন্তু পেয়ালার তলায় রয়েছে প্রচ্ছন্ন গরল।' অমৃতের পরে আসে বিষের জ্বালা, আসে ক্লান্তি, আসে দুঃখ, আসে 'secret silent loathing and despair' (হুইট্‌ম্যান)। আর এ রকম তো হবেই, 'because these pleasures in their external figure are not things which the spirit in us truly demands from life' (অরবিন্দ, গীতাভাষ্য)। —বাহিরের বিষয়ের আনন্দের প্রতি আমাদের আত্মার সত্যিকারের তো কোন আকর্ষণ থাকতেই পারে না। ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, সোনা-দানা, ইন্দ্রিয়ের সুখ—একদিন না একদিন এরা ফুরিয়ে যায়। আজ আছে, কাল থাকবে না। নচিকেতার সেই উত্তর যমরাজকে—যার মধ্যে রয়েছে চিরন্তন সত্যের অভিব্যক্তি : শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ। আমাদের আত্মা চায়, 'something behind and beyond the transience of the form, something that is lasting, satisfying, self-sufficient' (অরবিন্দ)। আত্মা জীবনের কাছে দাবি করছে সেই বস্তু যা ক্ষণভঙ্গুর রূপজ আনন্দের ঊর্ধ্বে, যা শাশ্বত, যা স্বয়ংপূর্ণ, যার মধ্যে আমাদের সমস্ত পিপাসার অবসান। 'It is the infinite for which we hunger,—এই পরম সত্য ঠাকুরের কাছে একটুও গোপন ছিল না। রামকৃষ্ণ-অবতারে এই অনন্তের আনন্দময় সংবাদ তিনি বহন ক'রে আনলেন আমাদের কাছে। বললেন, 'ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এ সব খবরে কাজ কি ?' বললেন, 'সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে ? কুলকুচো করলেও কিছু হবে না, খেতে হবে, তবে নেশা হবে।' ধর্ম হচ্ছে 'matter of experience'—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাপার, আমের ডাল আর পাতা গোনার বৌদ্ধিক কসরত নয়, আম খাওয়ার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। কথামৃতের পাতায় পাতায় এই কথাটা ঠাকুর কতরকম ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়।

কি ক'রে ঈশ্বরের ধারণা হবে ? ঠাকুর বললেন : ঈশ্বরকে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাকলে এ সব কথা ধারণা হয় না। উপনিষদের পাতায় যা অধ্যাত্মজগতের মূল্যবান তত্ত্ব হয়ে

আছে—তাকে সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে জীবন্ত সত্য ক'রে তুলতে হবে। জার্মান দার্শনিকের (Spengler) সেই মূল্যবান কথা : ধর্ম হচ্ছে 'livingly experienced metaphysics' অর্থাৎ সিদ্ধি গায়ে মাখার ব্যাপার নয়, সিদ্ধি খেতে হবে, তবেই নেশা হবে। কুলকুচি করলেও কিছু হবে না।

ইহলোকে পরলোকে পরম সত্য ব'লে যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে 'the peace of God which passeth all understanding' 'তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে'—কবির এই কথার মধ্যে অত্যুক্তি একটুও নেই। ভগবানের মধ্যে মানুষের এই আনন্দের অনুভূতি অনির্বচনীয়। 'কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে।' (গীতাঞ্জলি)

ঘি কিরকম খেতে? তার উত্তর : কেমন ঘি, না যেমন ঘি। যে কখনো ঘি খায়নি তাকে ঘিয়ের আস্বাদ বোঝানোর অন্য কি ভাষা থাকতে পারে? ঠাকুর ঈশ্বরের আনন্দের আভাস দেবার জন্যে অনেক রকমের উপমা ব্যবহার করেছেন কথামৃতের মধ্যে। যথা :

মিছরির পানা পেলে চিটেগুড় তুচ্ছ হয়ে যায়। হাঁড়ির মাছের গঙ্গায় ছাড়া পাওয়ার অনুভূতিকেও তিনি উপমাস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। খাঁচার পাখীর আকাশে ওড়ার অনুভূতিও উপমা-হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ Essays on the Gita-র মধ্যে একটি পরম সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি : Happiness is indeed the one thing which is openly or indirectly the universal pursuit of our human nature,—happiness or its suggestion or some counterfeit of it, some pleasure, some enjoyment, some satisfaction of the mind, the will, the passions or the body আমাদের মানব-প্রকৃতি আনন্দকেই সর্বত্র খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেও আমরা আনন্দকেই খুঁজছি যদিও সে আনন্দ মেকী ছাড়া আর কিছু নয়।

হাঁসপাতাল ডিস্পেনসারী করাটাকে ঠাকুর চরম মূল্য দেননি। বলেছেন : 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।' চরম সত্য হচ্ছে ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দ। আমাদের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে সে তো কখনো কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দকে সত্যিকারের আনন্দ মনে ক'রে তাদের কামনা করতে পারে না। সে আনন্দ ঘুমিয়ে যায়, আর তখন 'রক্তকরবী'র রাজার মতো আমরা বলতে থাকি, 'আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত, আমি তপ্ত।' রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে' শচীশ বলছে দামিনীকে : 'তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।' রবীন্দ্রনাথের The Religion of Man-এ পড়ি : 'the abiding cause of all misery is not so much in the lack of life's furniture as in the obscurity of life's significance'

হাক্স্‌লী প্রেম আর জ্ঞানকে উচ্চতর গুণ বলেছেন। বুদ্ধি নিশ্চয়ই মানুষের একটি পরম সম্পদ, এবং জীবনের পরম উদ্দেশ্য তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই আমরা বস্তুকে ছেড়ে অবস্তুর পিছনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি, দুঃখ-সাগরের মধ্যে ক্রমাগত হাবুডুবু খাচ্ছি, —যস্মাৎ মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ (কঠোপনিষদ্)। মানুষের বুদ্ধির চোখ যখনই উন্মীলিত হয় তখনই সে বুঝতে পারে—সত্য হচ্ছে ভগবান এবং সত্যের মধ্যে মুক্তিতেই তার যথার্থ আনন্দ, তখনই

নবজীবনের মধ্যে শুরু হয় তার রূপান্তর, উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তার ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয় একটা দারুণ সংগ্রাম। আর এই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার আনন্দ কী অনির্বচনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশের উপলব্ধিতে সত্য যখন উদ্ভাসিত হ'ল —আনন্দের আতিশয্যে দেশকালের অস্তিত্ব সে এককালে ভুলে গেল, দামিনী আর শ্রীবিলাসকে জাগাল ঘুম থেকে তার উপলব্ধিগত সত্যকে পৌঁছে দিল সেই রাতের গভীরে বিস্মিত দুটি নবনারীর কাছে। অনন্ত জীবনের মধ্যে আত্মার এই জন্মান্তরের চিরস্মরণীয় লগ্ন জীবনে যখন উপস্থিত হয় তখন সব কিছু মনে হয় তুচ্ছ, মোহমুক্ত মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে:

আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

(গীতাঞ্জলি)

'চতুরঙ্গে'র শচীশের মধ্যে এই জন্মান্তরের পালা শুরু হ'ল যখন—দামিনীর আকর্ষণ ম্লান হ'য়ে গেল তার কাছে। জীবনধারার এই পরিবর্তনের মুহূর্তে শচীশের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে:

'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।'

ঈশ্বরের অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন করবার জন্যে দামিনীকে ত্যাগ করা ছাড়া শচীশের গত্যন্তর ছিল না। কথামৃতের পাতায় পাতায় এই ত্যাগের কথা কত রকমের উপমার দ্বারা বারংবার ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রাণকৃষ্ণকে ঠাকুর বলছেন:

'একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সুতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে সূচের ভিতর যাবে না।'

কিন্তু এই প্রবন্ধের উপসংহার করতে চাই সবচেয়ে মূল্যবান যে কথাটি সেই কথা দিয়ে অর্থাৎ সাধনার গুরুত্বের কথা দিয়ে। এই সাধনার দিকটার উপরে ঠাকুর বারে বারে জোর দিয়েছেন: 'শুধু মুখে বললে কি হবে—দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন. দুধকে দই পেতে মন্থন কর, তবে তো হবে।' আবার বলছেন: 'মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। পুকুরে চার ফেলবে না, ছিপ নিয়ে বসে থাকবে না, মাছ ধ'রে ওঁর হাতে দাও।'

গুরু মাছ ধ'রে শিষ্যের হাতে তুলে দেবেন— ঈশ্বর পাওয়ার রাস্তা এত সহজ নয়। হুইটম্যানের সেই কথা:

Not I, not any one else can travel
that road for you,
You must travel it for yourself.

(Song of Myself)

আমি অথবা অপর কেহই তোমার হয়ে সেই পথ অতিক্রম করতে পারি না, তোমার রাস্তা তোমাকেই চলতে হবে।

ঠাকুর মহিমাকে বলছেন: ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো।

কবি হুইট্‌ম্যানের কবিতায় অন্যত্র রয়েছে:

No one can acquire for another—not one,
No one can grow for another—not one

ঠাকুরের কথাগুলির সঙ্গে সমুদ্রপারের মহাকবির সুরের কি অদ্ভুত মিল। হুইট্‌ম্যান পড়তে পড়তে কথামৃতের কথা বারবার মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের 'The Mother' পুস্তকের গোড়াতেই আছে দুটি শক্তির কথা: a fixed and unfailing aspiration that calls from

below and a supreme Grace from above that answers.

—মানুষের পক্ষ থেকে ঈশ্বর পাওয়ার জন্যে একটা আন্তরিক এবং নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা আর ঊর্ধ্ব থেকে নেমে-আসা ভগবানের করুণা।

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে।
(গীতাঞ্জলি)

দয়া তো চাই, করুণার প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু ভক্তের দিক থেকে সাধনার প্রয়োজনও কি কিছুমাত্র কম? The Mother-এর অন্যত্র আছে :

Reject the false notion that the divine Power will do and is bound to do everything for you at your demand and even though you do not satisfy the conditions laid down by the Supreme.'

—তুমি তাঁর নিয়মকে স্বীকার করবে না অথচ চাইবামাত্র সেই পরমাশক্তি তোমার হয়ে সব কিছু ক'রে দেবেন—এ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করো।

সত্য আর মিথ্যা, আলো আর অন্ধকার, আত্ম-সমর্পণ আর স্বার্থবুদ্ধি কখনই একই সঙ্গে ঈশ্বরে নিবেদিত হৃদয়মন্দিরে ঠাঁই পেতে পারে না। মন্দিরকে রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জীবনের এক দিকটাকে সত্যের দিকে উন্মুক্ত রাখব এবং অন্য পথে অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জকেও প্রবেশের সুযোগ দেব—এই একই সঙ্গে দুধ ও তামাক খাওয়ার পথে ঈশ্বরের করুণা লাভ কখনই সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের আনন্দের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ 'গীতা-রচনা'য় পরিষ্কার করেই বলেছেন :

'But it is not at first our normal possession, it has to be conquered by self-discipline, a labour of the soul, a high and ardous endeavour.'

কঠিন এবং ক্লান্তিহীন সাধনাকে বাদ দিয়ে চালাকির রাস্তায় যেমন কোন বড় জিনিসকেই লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি ঈশ্বরলাভও সম্ভব নয়। কেউ কাউকে ঈশ্বর পাইয়ে দিতে পারে না। পাইয়ে দেওয়া সম্ভব হ'লে ঈশ্বর-পাওয়া-মানুষ এমন দুর্লভ হ'ত না।

প্রশান্ত চিরদিন

শ্রীমতী বিভা সরকার

সঙ্গীত তব লহরে লহরে
ফিরিছে ভুবনে খেলা ক'রে ক'রে,
　হে পূর্ণ তুমি আনন্দময়
　　প্রশান্ত চিরদিন।
অনুদিন মোর সন্ধানী মন
খুঁজিছে গোপনে, কই সে রতন?
　ঐ সঙ্গীতে হবে কি বিভোর
　　আমার জীবন-বীণ?

জাগি নিশিদিন সদা অবিরাম
মন-জপমালা জপে কোন্ নাম?
　সদা অলক্ষে করে কার ধ্যান
　　হৃদয় তীর্থ-বাসী?
সব দ্বিধা মোর শেষ বলো কবে?
সব সংকোচ জয়মালা হবে
　পথ-চলা মোর লভিবে বিরাম
　　সে কোন্ দুয়ারে আসি?

বিবেকানন্দ-বন্দনা

মিশ্র হাম্বীর কেদারা—একতালা

কথা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, টি,

সুর—সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বরলিপি—কুমারী আভা সরকার, গীতিভারতী

জাগো ছন্দের সুরে ওগো বিবেকানন্দ বীর।
জাগো অন্তর-শতদলে, জাগো শান্ত মধুর ধীর ॥
তব বিশাল নয়ন-তারা, সে যে সুনীল সাগরপারা,
বলে সুদূরের ভাষা, পড়ে ঝরিয়া করুণা-নীর।
তব অমৃতময় বাণী মম হৃদয়-সরোজ মাঝে
পুনঃ ঝঙ্কারি তোলো প্রভু, হোক চঞ্চল রিপু থির।
ওগো রামকৃষ্ণ-প্রাণ দেহ চরণ-কমলে স্থান,
মন প্রাণ দিয়া ডালি নমি আনত করিয়া শির।

স্বরলিপি

০ [ধা ধা]	১	+	৩	+
{ না ধা পক্ষা	পা গা মা	(ধা -া না	ধনা র্সর্রা র্সা)}	না -া ধা
জা গো ছং	০ ন্দে র	সু ০ ০	রে০ ০০ ০	সু ০ রে

‖ ৩	০	১	+	৩	০
- -া পা পা	ক্ষা ক্ষা পা	ক্ষপা ধা পক্ষা	মা -া া	মা সা সা	{ রা রা রা
০ ও গো	বি বে কা	ন০ ০০ ন্দ	বী ০ ০	র জা গো	অ ০ ন্ত

১	+	৩	০	১	+
রা রা গা	মা পা পা	-া পা পা }	না ধা না	র্সা র্সগা র্রা	র্সা না ধা
র শ ত	দ ০ লে	০ জা গো	শা ০ ন্ত	ম ধু০ র	ধী ০ ০

৩ র্স
পা ধা ণা ‖
০ ০ র

	০	১	+	৩	০
{ পা পা	পা পা পা	না ধা না	র্সা -া র্সা	-া র্সা না	ধা না ধা
ত ব	বি শা ল	ন য ন	তা ০ রা	০ সে যে	সু নী ল

১	+	৩	০	১	+
নার্মা র্গা র্রা	র্সা না ধা	পা) -া -া	{ সা মা মা	মা মা গা	পা -া ক্ষা
সা গ০ র	পা ০ ০	রা) ০ ০	ব লে সু	দূ রে র	ভা ০ ০

৩	৩	০	১	+	৩
(পা -া া) পা পা পা	ধা না ধা	না র্স র্গা র্রা	র্সা না ধা	পা ধা র্স ণ
(যা ০ ০) যা প ডে	ঝ রি যা	ক ক০ ণা	নী ০ ০	০ ০ বং

	০	১	+	৩	০
সা সা	সা রা রা	-া রা গা	মা পা পা	-া পা পা	ঝা রা গা
ত ব	অ মৃ ত	০ ম য়	বা ০ ণী	০ ম ম	হৃ দ য়

১	+	৩	০	১	+
মা ধা পা	মা গা রা	-া } সা না	সা মা মা	মা মা গা	পা -া হ্মা
স রো জ	মা ০ ঝে	০ } পু নঃ	ঝ ঙ্ কা	বি তো ল	প্র ০ ০

৩	০	১	+	৩
পা } পা পা	ধা না ধা	না র্স র্গা রা	র্সা না ধা	পা
ভু } হো ক্	চ ন্ চ	ল বি০ পু	থি ০ ০	ব

	০	১	+	৩	০
পা পা	পা -া পা	না ধা না	র্সা -া র্সা	র্সা র্সা র্সা	নধা না পা
ও গো	বা ০ ম	কৃ ষ্ ণ	প্রা ০ ০	ণ্ ও গো	রা০ ০ ম

১	+	৩	০	১	+
না ধা না	র্সা -া র্সা	র্সা র্সা র্সা	নধা না পা	র্রা র্রা র্রা	র্স র্রা র্গা র্রা
কৃ ষ্ ণ	প্রা ০ ০	ণ ও গো	বা০ ০ ম	কৃ ষ্ ণ	প্রা০ ০ ০

৩	০	১	+	৩	০
র্সা র্সা র্সা	নধা না পা	না ধা না	র্সা -া র্সা	র্সা র্সা র্সা	র্সা র্রা র্রা
ণ ও গো	বা০ ০ ম	কৃ ষ্ ণ	প্রা ০ ০	ণ্ ও গো	রা ০ ম

১	+	৩	০	১
র্রা র্রা র্রগা	র্সর্রা গর্মা গর্রা	র্সা র্সা র্সা	নধা না পা	না ধা না
কৃ ষ্ ণ০	প্রা০ ০ ০ ০ ০	ণ্ ও গো	রা০ ০ ০	কৃ ষ্ ণ

+	৩	০	১	+	৩
র্সা -া র্সা	র্সা র্সা না	ধা না ধা	না র্স র্গা র্রা	র্সা না ধা	পা -া পা
প্রা ০ ০	ণ্ দে হ	চ র ণ	ক ম ০ লে	স্থা ০ ০	০ ০ ন্

০	১	+	৩
সা মা মা	মা মা গা	পা -া হ্মা	পা (-া -া) পা পা
ম ন প্রা	ণ দি য়া	ডা ০ ০	লি (০ ০) ন মি

	১	+	৩
ধা না ধা	না র্স র্গা র্রা	র্সা না ধা	পা ধা র্সণা
য়া ন ত	ক রি০ য়া	শি ০ ০	০ ০ র০

বাংলা গদ্যের চল্‌তি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর এই মাধুর্য-ভাণ্ডার থেকে আরো দু'চারটি কণিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমাদের সত্যস্বরূপ যে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সে কথা বুঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানসূর্য কাজ করে না। ঘরের ভিতরে আনলে আতস-কাঁচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাঁচে পড়ে, তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাকলে আতস-কাঁচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত - ৪র্থ ভাগ

মনকে বশ করবার উপায়-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ—"অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই যাবে। মন ধোপা-ঘরের কাপড়। তাকে লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। (কথামৃত—৪র্থ)

মায়া আর দয়ার পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বপ্রেমের মূল কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন—"শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়।" (কথামৃত—৫ম)

সকল পথের সাধনার শেষে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন "অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ"-ভাবে থাকবেন। সেই অবস্থার অনুভূতি-বর্ণনা: তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগ্‌লুম। পূজো উঠে গেল। এই বেলগাছ। বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এলো। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হলো। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর আর সে রকম করে তুলতে পারি নি। একদিন ফুল তুলতে গিয়েছি, দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট্‌—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হ'ল না। (কথামৃত—৩য়)

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, কথামৃত-সঙ্কলয়িতা 'শ্রীম' যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে রেখে গেছেন তার যথার্থ সম্মান এখও সাহিত্যরসিকদের কাছ থেকে আসেনি। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ"। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহে 'শ্রীম' যে শিল্পনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, তার একমাত্র তুলনা ইংরেজী সাহিত্যে বস্‌ওয়েল-কৃত ডাঃ জনসনের বাণী সংগ্রহ। কিন্তু জগতের ইতিহাসে অধ্যাত্ম অনুভূতির এমন অপরূপ দিনলিপি ইতিপূর্বে আর রচিত হয়নি। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ এই "শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।" শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দিব্যানুভূতি-রূপায়ণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য "কথামৃতে"র মধ্য দিয়ে চিরন্তনতার অধিকার লাভ করেছে।

জীবন এবং সাহিত্য—যত কাছাকাছি থাকে, ততই পূর্ণতা পায়। তাই চলতি ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ: "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না, সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক

চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।"[৮] অর্থাৎ জীবনের যোগেই সাহিত্য। সংস্কৃতপন্থী সাধু ভাষা যদি জীবনের যোগ হারিয়ে ফেলে তাহলে চল্‌তি ভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই স্বামীজীও প্রযোজনবোধে অসঙ্কোচে সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর "বর্তমান ভারত" বইটি সাধুভাষায় লেখা হলেও আশ্চর্য রকম প্রাণবন্ত। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে"র সূচনায় তিনি ক্রিয়াপদের বাহুল্য বর্জন করে গদ্যের যে রূপ দিয়েছেন তা সংস্কৃতেরই নামান্তর। তবু তাঁর ভাষা সবচেয়ে জোর পেয়েছে চল্‌তি ভাষার স্বাধীন ক্ষেত্রে। কারণ, এই স্বাধীনতাই তাঁর ধাতুপ্রকৃতি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আরো দু'একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য: ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।[৯]

বাংলার নানা উপভাষার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় এ প্রসঙ্গেও তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাষা বড় হয়ে উঠেছে তাকেই গ্রহণ করতে বলেছেন—"অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা।"[১০] বছর দুই আগে "পূর্ববঙ্গের সমকালীন সেরা গল্প" নামে যে গল্প-সঙ্কলনটি পূর্ববঙ্গের তরুণ সাহিত্যিকেরা প্রকাশ করেছেন তাতেও দেখেছি মূলতঃ কলকাতার ভাষাই বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কৃত ভাষাও একদিন মানুষের সহজ বুদ্ধির কাছাকাছি ছিল। কিন্তু কালে যত সহজাত প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছে, ততই ভাষাও হয়েছে পল্লবধর্মী। "বাপ্‌রে, সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে—রাজা আসীৎ!!! ওসব মড়ার লক্ষণ।" জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তির সঞ্চার হলে আপনাআপনিই এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয় মন্থরগতি ভাষার রূপ বদলে যাবে। তখন—"দুটো চল্‌তি কথায় যে ভাব-রাশি আসবে, তা দু' হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"[১১]

"পরিব্রাজক" বইটি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রাকালে জলপথে ভ্রমণের কাহিনী। এ বইটির প্রধান গুণ এই যে, এর চলমান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সমুদ্র ভ্রমণ হয়ে যায়। সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এমন একটা চাক্ষুষ করানোর ক্ষমতা আছে, যা ভ্রমণ-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ। এই বইটি পড়তে পড়তে যে মানস ভ্রমণ আমরা ক'রে থাকি, তাতে একই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের বৈচিত্র্য আর ইতিহাসের গতিধারা আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে।

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ?[১২] গঙ্গা ও হিমালয়ের সঙ্গে সুচির-বন্ধনে বিজড়িত ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি এই প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অন্তরালে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে।

৮,১০,১১ বাঙ্গালা ভাষা (ভাববার কথা)—স্বামী বিবেকানন্দ

৯ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

১২ পরিব্রাজক—স্বামী বিবেকানন্দ

এ অপূর্ব সাহিত্য-রস-সৃষ্টির পিছনে রয়েছে সন্ন্যাসী হৃদয়ের শান্ত উদার অচঞ্চল দৃষ্টি।

বাংলা দেশের নিজস্ব রূপটির বর্ণনায় বিবেকানন্দ-মানসের শিল্পচেতনা অতুলনীয় সার্থকতায় বিকশিত :

"এই অনন্ত শস্যশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবারে) আর কিছু আছে কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি আর রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ, তাল-নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী-ঢালা আম, নীচু, জাম, কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ার-কান্দী, ইরানি, তুর্কিস্তানী গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুটে ঠিক কোরে রেখেচে, জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস, গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখে ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"[১৩]

উপরের উদ্ধৃতির শেষ লাইনটি জুড়ে যে আবেগের অগ্নিস্পর্শ রয়েছে, সে স্পর্শের প্রজ্বলনে আমরা নিমেষে দীপ্ত হয়ে উঠি। আর ঐ "একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা"—বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ বাংলা সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন কি?

স্বামীজীর চল্‌তি ভাষা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। তাঁর চল্‌তি ভাষায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদ বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সব শব্দ নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। হৃষীকেশের গঙ্গাবর্ণনায় "কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুল" অথবা ডায়মণ্ডহারবারের দিকের গঙ্গা-তীরবর্ণনায় "অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোত-স্বতীমাল্যধারিণী" জাতীয় শব্দ তিনি বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। অথচ, ভাষার ভারসাম্য হারাননি। বরং এই সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে ঘিরে চল্‌তি ভাষা কলমন্দ্রে মুখরিত।

টেকচাঁদ এবং হুতোমের রচনায় আমরা কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালী বাবু-সমাজের ছবি পাই। কিন্তু স্বামীজীর চল্‌তি ভাষা সমগ্র বিশ্ব-পরিক্রমার বিষয়বস্তুকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। চল্‌তি ভাষার সার্থকতা এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরো সুপ্রমাণিত। টেকচাঁদ ও হুতোমের সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার কিছুটা সাধর্ম্য আছে হাস্যরস-প্রবণতায়। কিন্তু রুচির নির্মলতায় বিবেকানন্দের হাস্যরস আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সে তুলনায় টেকচাঁদ ও হুতোমের রুচি স্থানবিশেষে গ্রাম্য।

মার্কিনী বর্ণবিদ্বেষের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন, তার অন্তর্নি-হিত বেদনাকে কীভাবে তিনি সরস ব্যঙ্গে পরিণত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিল মার্কিন-ঠাকুর। দাড়ির জালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বল্লে, 'ও চেহারা এখানে চল্‌বে না।' মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি মাথায় গেরুয়া

---

১৩ পরিব্রাজক

রঙের বিচিত্র ধোকড়ামাত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হ'লনা, তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিযে দিলে যে, বরং ধোক্‌ড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্‌বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পরলেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দিবে। আবও দু'একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জলে যায়, খাবার-দোকানে গেলুম, "অমুক জিনিষটা দাও," বল্‌লে "নেই," "ঐ যে রয়েছে।" "ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।" "কেন হে বাপু?" "তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো।[১৪]

'পবিব্রাজক' বইটির হাঙ্গব-শিকারের বর্ণনায চল্‌তি ভাষার সাহায্যে সমগ্র ঘটনাটির গতিবেগ ও কৌতুক আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। 'ভাব্‌বার কথা' থেকে স্বামীজীর হাস্যরস-নিপুণতার আর একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। 'বলি রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নয়, তার ওপর নেশা ভাঙ্ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি? রামচরণ—"সে সোজা কথা, মশায়—আমি সর্ব্বলকে উপদেশ করি।"[১৫]

আবার, ইতিহাসের ধারা-অনুসরণকারী বিবেকানন্দ-মানস আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এই চল্‌তি ভাষাতেই বৈপ্লবিক গতি সঞ্চার করেছেন। প্রাচীনকালের বাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারতের কথায় তাঁর মনে পড়েছে এ সমৃদ্ধির মূলে ছিল "বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত" ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী। "...তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খানা দর্শন লিখেচেন, দশখানা কাব্য বানিয়েচেন, দশটা মন্দির করেচেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাট্‌ছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য জাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?"[১৬] ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে এই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বঞ্চনাপরায়ণ তথাকথিত উচ্চবর্ণের উদ্দেশে তাঁর নির্মম নির্দেশ: "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।"[১৭] বিপ্লবী চেতনার এই অগ্নিবাণী বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

এমনিভাবে জীবনের লঘু সৌন্দর্যের সীমা থেকে মনীষার উত্তুঙ্গ শিখর অবধি স্বামীজী এই চল্‌তি ভাষার সাহায্যে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। 'পরিব্রাজকে'র পাশাপাশি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে পড়তে সেই কথাই মনে হয়। দুটি ভিন্নমুখী সভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বামীজী কত অনায়াসে সুসম্পূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির অতিস্তুতি থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের ভারতীয়তার গোঁড়ামি—এই দুই প্রান্তিক চিন্তাধারার থেকে দূরে স্বামী বিবেকানন্দ নিখিলমানবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পারস্পরিক বিনিময়ের সত্য পন্থাটি নির্দেশ করেছেন। আজ অবধি আমাদের শিক্ষিত সমাজ সে আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলে মনে

১৪ পরিব্রাজক
১৫ ভাব্‌বার কথা—স্বামী বিবেকানন্দ
১৬ পরিব্রাজক
১৭ ঐ

হয় না, তাই আমাদের ভারতীয়তার আদর্শ আজও অসম্পূর্ণ।

"প্রথমে বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে, কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোনও জাতিতে কোনও গুণের আধিক্য, প্রাধান্য। আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মে'র। আমরা চাই কি—"মুক্তি"। ওরা চায় কি—"ধর্ম"। "ধর্ম" কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে ধর্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম দিনরাত খোঁচাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল। ·এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই, কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হ'ল, না এদিক না ওদিক।"[১৮]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যটি অনুপম প্রাঞ্জলতায় বুঝিয়ে দিয়ে স্বামীজী এই দুই সভ্যতার বহিরঙ্গ বিষয়গুলিরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। শারীরিক গঠনভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, সমাজে নারীর মর্যাদা, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলকেন্দ্র ফ্রান্স—এ সব কিছুর তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর ভাষাভঙ্গীর শাণিত অথচ সরস সৌন্দর্য আন্তরিক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনার সময়ও স্বামীজী একথা মনে রেখেছেন—"তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা এ দুই ভুল।[১৯] সেই ব্যবহারিক পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজীর দৃষ্টিতে দুটি সভ্যতাই সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছে। এই প্রসারিত দৃষ্টির ফলেই এ দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে স্বামীজী নূতন আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে Evolution theory বা পরিণামবাদ (আধুনিক পরিভাষায় বিবর্তনবাদ) ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ দুই দেশেই আছে। একটি বহির্মুখী, অন্যটি অন্তর্মুখী। বিষয়টি তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যে গুলো আলাদা, তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম বলে, এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল, ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি, পাথর, গাছ, পালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছুলেন, বল্লেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম', আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া', 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান।"[২০]

" এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে,—এদের রকম দিয়ে,—জড়-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন ক'রে বহু হ'ল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত ক'রে দিয়েছি যে ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে। তবে সেই এক কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটা খোঁজার নাম বিজ্ঞান (Science)।"[২১]

"মাসিক পত্রিকা"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ শিকদারের বক্তব্য ছিল, "যে ভাষা স্ত্রীলোকে বুঝবে না, তা আবার বাংলা কি?" শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "সরল স্ত্রীপাঠ্য

১৮ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
১৯ ঐ
২০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
২১ ঐ

ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা রাধানাথের একটা বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'তে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কি না।"[২২] অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতদের উচ্চস্তরের জ্ঞানবিকাশের সংযোগ ঘটানো যে একান্ত প্রয়োজন এ-কথা রাধানাথ শিক্‌দার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের ইংরেজী-বাহিনী উচ্চশিক্ষা আজ অবধি মাতৃভাষাকে বাহন করতে কুণ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষার চেয়ে গণশিক্ষার বিস্তারই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয়।

স্বামীজীর চল্‌তি ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলে ছিল জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মভাব। এই গণদৃষ্টিই চল্‌তি ভাষার মূল কথা। অবশ্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পালি', 'প্রাকৃত' প্রভৃতি মূলতঃ কথ্যভাষা কালে কালে পুরোপুরি লেখ্যভাষায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা শ্রীবিষ্ণু দে-র অধিকাংশ গদ্য রচনা যতটা সংস্কৃত-শব্দ সমৃদ্ধ, তার তুলনা বিদ্যাসাগরী বাংলাতেই মেলে। অথচ এঁরাও চল্‌তি ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন।

কিন্তু চল্‌তি ভাষার প্রধান প্রয়োজন--মুখের ভাষার সঙ্গে যোগরক্ষা। সেদিক থেকে উনিশ শতকের প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীই অনুধাবনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র" এবং "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" বই-দুটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবে এই দুটি গ্রন্থের আধুনিক সংস্করণে পরবর্তীকালের সংশোধন রয়েছে বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক পরিণতি লক্ষ্য করলে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যের গদ্যরীতি নিজস্ব পৌরুষ ও বীর্যের দৃপ্ত ব্যঞ্জনায় অনন্য উদাহরণরূপে দেখা দেয়। আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাসই তাঁর জীবন ও সাহিত্য-রচনার পটভূমি। তাই বিবেকানন্দের রচনায় বাংলা গদ্যরীতি কোমলকান্ত রূপের পরিবর্তে ঋজু ওজস্বিতায় দীপ্ত। "পত্রাবলী" থেকে এই রীতির উদাহরণঃ

"প্রত্যেক আত্মাতে অনন্তশক্তি আছে, ওরে হতভাগাগুলো, 'নেই নেই' বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই-নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে।...... ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।...Avalanche-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় ক'রে, হর হর মহাদেব। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্।"

এমনি আরো অনেক সঞ্জীবনী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর চল্‌তি গদ্যের মোটামুটি পরিচয় দান এখানেই শেষ করা যাক। একথা মনে রাখতে হবে যে, লিখতে গেলেই কিছুটা কারুকর্মের প্রয়োজন। 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' ভাষার বনিয়াদ চল্‌তি ভাষা,—তবু লেখার জগতে এসে সে ভাষাকে কিছুটা পরিবর্তন মেনে নিতে হয়েছে। বিষয়ানুযায়ী সে পরিবর্তনে স্বামীজীর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু অনুরাগ ছিল সকল জনের উপযোগী চল্‌তি ভাষার প্রতি। বাংলা গদ্য-সাহিত্য তাই তাঁর কাছে চিরঋণী।

*২২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ

অগ্নিগর্ভ বাণী (২)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

'যত মত তত পথ'

'হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং সে সকল ধর্ম দেখছো, এ-সব তার ইচ্ছাতে হবে, যাবে—থাকবে না। · হিন্দুধর্ম বরাবর আছে, আর বরাবব থাকবে।' —শ্রীরামকৃষ্ণ

'The aim of my whole life has been to make Hinduism aggressive'—(হিন্দু-ধর্মকে সংগ্রামশীল কবাই আমার সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য) —স্বামী বিবেকানন্দ

হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য অপৌরুষেয়তা। বুদ্ধকে বাদ দিয়ে বৌদ্ধধর্মের, যিশুকে বাদ দিয়ে খৃষ্টান ধর্মের, মহম্মদকে বাদ দিয়ে ইসলাম ধর্মেব কল্পনা করা যায় না। এ-সকল ধর্মেব প্রত্যেকটিই পুরুষ-বিশেষকে আশ্রয় ক'বে গড়ে উঠেছে, তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে, তাঁব মতবাদকেই এক-মাত্র প্রামাণ্য এবং তাঁর আচরণকেই একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ কবেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন কিংবা মতবাদেব উপর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দুসমাজ—বেদপন্থী সমাজ। কিন্তু 'বেদ' বলতে বুঝায় অখিল জ্ঞান-বাশি, সুতরাং এতে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে ব্যাহত কিংবা খর্ব কবে না,—পরন্তু জন্মগত ও সমাজগত সংস্কার এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভে সাহায্য করে।

জাগতিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান শতসহস্র শাখায় পল্লবিত হয়ে দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু যে বিদ্যা পরাৎপর তা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা একমুখী। জগৎ অনন্ত, তার বৈচিত্র্যের কোন সীমা নেই, টুকবো টুকরো ক'রে জানতে গেলে তার কূলকিনারা নেই—জানার কাজ কস্মিন্ কালেও শেষ হবে না। কিন্তু বহুর মধ্যে এক লুকিয়ে আছে, সীমাহীন বাহ্য বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটিমাত্র সত্তা বিদ্যমান, সেইটিকে ধরতে পারলে সব কিছু জানা হয়ে যায়। হিন্দু-ধর্মের মুখ্য উপদেশ: সেইটিকে জানো। বই পড়ে তাঁকে জানা যায় না, তাঁকে জানতে গেলে বিশেষ ভাবে জীবন যাপন করতে হয় এবং প্রাণপণে চেষ্টা কবতে হয়। চেষ্টার প্রণালী অনেক—রাস্তা অনেক, যে কোন একটি ধবে চলতে পারা যায়। তাই, যত মত তত পথ।

ভুল পথও তো থাকতে পারে। পারে বৈ কি, এবং যথেষ্ট রয়েছে। যিনি গন্তব্য স্থল পর্যন্ত পৌছে ফিরে এসে আমাদের বলছেন, আমি পথেব শেষ দেখে এসেছি, এই পথ দিয়ে গেলে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌছানো যায়,—তাঁর কথাই নির্ভবযোগ্য এবং গ্রাহ্য, তাঁব মতই পথ। যিনি তা করেন নি, তাঁর মত পথ নয়। পারে কে পৌছেছেন, কে পৌছাননি জানব কেমন ক'রে? জানা তত কঠিন নয়। আচরণ দেখেই বুঝা যায় জগৎপ্রপঞ্চের পাবে কে পৌছেছেন আব কে পৌছান নি।

'যত মত তত পথ' কথাব অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে: মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব একথাটি সর্বদাই বলতেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মতুয়ার বুদ্ধি মানুষকে অন্ধ ক বে দেয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হিন্দুধর্ম একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে, কিন্তু ইসলাম কিংবা খৃষ্টানধর্ম তা স্বীকার করে না। ইসলামে এবং খৃষ্টানধর্মে কতকগুলি বাঁধা মতবাদ রয়েছে, সেগুলিকে মানতেই হবে। যেমন ধরুন: 'কিয়ামতের'—অর্থাৎ 'শেষ বিচারে'র

দিনে, মুসলমানী মতে মহম্মদ, এবং খৃষ্টানী মতে যিশু ব্যতীত আর কেহই মানবকে উদ্ধার করতে পারেন না। হিন্দুধর্মে এরূপ বাঁধা-ধরা কিছুই নেই। নানা সাধন-প্রণালী নানা দেব-দেবী, নানা বিধি-বিধান রয়েছে,—যা তোমার ভাল লাগে তাই বেছে নাও, যা তোমার মনঃপূত হয় তাই গ্রহণ কর। যে পথ ধরেই চল, লক্ষ্যস্থলে ঠিক পৌছবে।

আবার অধিকারিভেদের কথা আছে। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী একটা কিছু নিয়ে আরম্ভ কর, তার পর ধাপে ধাপে উপরে এবং আরো উপরে উঠে যাও। যা এই মুহূর্তে সাধ্যায়ত্ত নয় তা নিয়ে টানাটানি করো না। আগে শক্তিসঞ্চয়, তার পরে আরোহণ।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যাবে যে হিন্দুধর্ম বৈজ্ঞানিক ধর্ম,—উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে রুচি এবং শক্তি-সামর্থ্যের পার্থক্য রয়েছে, এবং চিরকাল থাকবে। এই সহজ সত্য হিন্দুধর্ম মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে। আর এও বলে যে ঈশ্বরলাভে সকলেরই সমান অধিকার থাকলেও অধিকারি-ভেদে পথ বিভিন্ন। তাই এই ধর্ম এত উদার এবং এর ভিতরে এত বৈচিত্র্য। আবার এই জন্যই এই ধর্ম 'সনাতন ধর্ম', যুগে যুগে সর্বশ্রেণীর মানবের স্থান এতে রয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা এর আশ্রয়,—মানবকে ঈশ্বরলাভে প্রণোদিত করা—সেই পথে তাকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে গন্তব্য স্থলে পৌছে দেওয়া—এর লক্ষ্য। এই সনাতন ধর্ম কখনও বিনষ্ট কিংবা পরাভূত হ'তে পারে না। আজ যারা হিন্দুজাতি, তারা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সনাতন ধর্ম বিলুপ্ত হবে না। প্রাচীন গ্রীক জাতি বিলুপ্ত কিংবা নির্বীর্য হয়ে গিয়েছে, কিন্তু গ্রীক সভ্যতা ও চিন্তাধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। সনাতন ধর্মের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারে না। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অনেক মনীষী ও সত্যান্বেষী ব্যক্তি এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও বহুতর ব্যক্তি নিশ্চয়ই করবেন। আমরা ভারতবাসীরা যদি এই মহান্ ধর্মের ধারক ও বাহক হ'তে না পারি, কিংবা হ'তে না চাই—তাতে আমাদেরই অপদার্থতা এবং বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহকের একান্ত অভাব মানব-সমাজে কদাচ ঘটবে না।

'যত মত তত পথ' যদি মানি, তবে হিন্দু-ধর্মকে সংগ্রামশীল করা যায় কোন যুক্তিতে? যে ব্যক্তি যে ধর্মে জন্মেছে কিংবা রয়েছে, সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই ত সে ঈশ্বর লাভে সমর্থ হবে, অতএব তাকে হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করি কিরূপে? এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগবে। এসম্পর্কে দু'টি বিচার আছে। প্রথমতঃ ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে হবে যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ অতীতে প্রসারণশীল ছিল কি না। যদি ছিল বলে প্রমাণ পাই, তবুও বিচার করতে হবে যে বর্তমানের বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার যুগে হিন্দুধর্মকে সংগ্রামশীল করার কোন যৌক্তিকতা ও সার্থকতা আছে কি না।

যে আর্য মানবশাখা (Indo-Aryans) সুপ্রাচীন কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অধিবাসীকে তাঁরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ-বন্ধনের মধ্যে এনেছিলেন। এই প্রসারণের স্রোতে মতের এবং রক্তের মিলন-মিশ্রণ কিছু কম হয়নি,—তার সাক্ষী ধর্মশাস্ত্র, তার সাক্ষী ব্রাহ্মণাদি বর্ণের চেহারা-ছবি। পুরাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব এ বিষয়ে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। প্রচারের দ্বারা,

সংসর্গের দ্বারা, মেশামেশির দ্বারা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা সারা ভারতময় এবং ভারতের বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তরবারির দ্বারা, কিংবা রাজশক্তির প্রভাবে একটা কোন বাঁধা-ধরা মতবাদ কিংবা সমাজবন্ধন ভারতীয় আর্যেরা অন্যের উপর চাপিয়ে দেননি। নিজেরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন, যারা যখন আসতে চেয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখেই হিন্দু-সমাজে ভরতি করেছিলেন—কাউকে নিশ্চিহ্ন কিংবা নিষ্পিষ্ট করেননি। আজও দেখতে পাই, বহুভর্তৃকা হিমালয়-বাসিনী, মৃত গবাদি পশুর মাংসভোজী দক্ষিণদেশী 'মাহার', কালীমাঈর স্থানে কুক্কুট-বলি-প্রদানকারী সাঁওতাল—সকলেই হিন্দু। বন্যার জলধারার ন্যায় হিন্দুধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষকে আপ্লুত, আপ্লাবিত করেছিল,—আর তাই সব কিছুকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ এবং পরিপাক করতে পেরেছিল। এই প্রসারণের মূলমন্ত্র—'যত মত তত পথ', কারো উৎসাদন নয়, জাঁতাকলে পিষে সবাইকে একাকার করা নয়। যে যেমন অধিকারী, তার সহিত সেরূপ ব্যবহার করা, এবং তার বিদ্যাবুদ্ধির উপযোগী সাধন-প্রণালীর নির্দেশ দেওয়া, আবার সকলের জন্যই উচ্চতম জ্ঞানে পৌঁছবার রাস্তা খোলা রাখা—এই ছিল পদ্ধতি। এর ফলে গোটা গ্রাম, গোষ্ঠী কিংবা সমাজ একদিনে, একসঙ্গে হিন্দুধর্ম গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজে ঢুকে পড়েছিল। প্রামাণ্য ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানকে বলা যেতে পারে হিন্দুসমাজের ভিতরেই একটা বিদ্রোহ অথবা আভ্যন্তরীণ বিপ্লব। সেই বিদ্রোহ দমিত হতে না হতেই বাহির থেকে এল ইসলামের আক্রমণ। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপরেই নয়, পরন্তু হিন্দুর ধর্ম সমাজ মতবাদ প্রভৃতি সব কিছুর উপরেই এক অতি রূঢ়, নির্মম ও নিদারুণ আঘাত। কিন্তু এটা তলিয়ে দেখা এবং বুঝা উচিত যে হিন্দু-সমাজই একমাত্র সমাজ যা রণক্ষেত্রে বারংবার পর্যুদস্ত হয়ে, এবং বহু শতাব্দী মুসলমানদের শাসনাধীন থেকেও পরাভব স্বীকার করেনি, এবং নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে দেয়নি। মরক্কো থেকে আফগানিস্তান (সম্প্রতি পশ্চিম পাঞ্জাব) পর্যন্ত, যেখানেই ইসলাম কিছু কাল রাজদণ্ড ধারণ করেছে, সেখান থেকেই পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম এবং সমাজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে যে তা ঘটেনি, বহু চেষ্টা দ্বারাও ঘটানো সম্ভব হয়নি—এটা হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের হিমালয়-সদৃশ অটল দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন, বহু প্রলোভন সত্ত্বেও ভারতীয় হিন্দু-সমাজ বিনষ্ট হয়নি। যতবার মন্দির ভেঙেছে, হিন্দুরা ততবার মন্দির গড়েছে, যখন আর কিছুতেই পারেনি তখন বলেছে, "আমার এই দেহের ভিতরেই মন্দির, হৃদয়-মন্দিরেই তাঁর পূজারতি ক'রব, আর বাইরে তাকিয়ে দেখ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই মন্দির, সেখানে সারাক্ষণ তাঁর পূজা চলেছে, চন্দ্রসূর্য তাঁর আরতি করছে, মলয় বাতাস তাঁকে চামর ঢুলাচ্ছে,—রে মূর্খ। তুমি তাঁর রূপই বা হরণ করবে কি ক'রে, আর পূজাই বা বন্ধ করবে কেমন ক'রে?"

ইসলামের পরে ভারতবর্ষে এল খৃষ্টান। প্রথম যারা এসেছিল তারা ছিল জলদস্যু। পরে যারা এল তারা অনেকটা ভদ্রবেশী; কিন্তু সঙ্গে এল খৃষ্টান পাদ্রী। তাদের উৎসাহের ফলে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ কিছু কম হয়নি। অধিকন্তু খৃষ্টান আগন্তুকদের গায়ে ছিল আধুনিক ইউ-রোপের ধনৈশ্বর্য ও জ্ঞানগরিমার বহুমূল্য পরিচ্ছদ। চোখে যে চটক লাগেনি তা নয়, তথাপি হিন্দুসমাজ স্রোতের মুখে ভেসে যায়নি, নিজের সম্বিৎ হারায়নি।

'যত মত তত পথ'—এই উদার বাণীই হিন্দুর আত্মরক্ষার মন্ত্র। এই মন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে তবে অপর কোন ধর্মের প্রচারকের দ্বারা বিমোহিত হব না, যিশু কিংবা মহম্মদ একমাত্র পরিত্রাতা—এ ধরনের উক্তি নিতান্ত বালজনোচিত বলে গণ্য ক'রব। শ্রেষ্ঠ, উদার, যুক্তিযুক্ত, বহু মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা যুগে যুগে প্রমাণীকৃত, সনাতন ধর্মকে ছেড়ে সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ হ'তে যাব কেন?

'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণীই হিন্দুধর্মের প্রচারমন্ত্র। এই বাণী সকল দেশে, সকল সমাজে আদৃত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মবিষয়ে সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি কিছুতেই দূর হবে না। ইউরোপের ইতিহাসে দেখতে পাই, খৃষ্টধর্মের মতবাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের (Rationalism) কঠোর সংগ্রাম কত শতাব্দী ধরে চলেছে। আমাদের চোখে এটা নিতান্ত অদ্ভুত বলে ঠেকে, যেহেতু হিন্দুধর্ম মানুষের বিচারবুদ্ধিকে কখনও দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেনি, বরাবর বলে এসেছে: 'চিন্তায় এবং আচরণে সর্বদা ভয়শূন্য হও, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হও।'

অপরদিকে 'যত মত তত পথ' একথা স্বীকার করা একজন মুসলমান কিংবা খৃষ্টানের পক্ষে কত কঠিন! এ মানতে গেলে যা তার মনের সবচেয়ে বদ্ধমূল সংস্কার, সেই সংস্কারকেই ছাড়তে হয়। মৌলবী একথা বলতে পারেন না যে শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ ভিন্ন মানবের অন্য আশ্রয় আছে, পাদ্রীও বলতে পারেন না যে যিশু ভিন্ন মানবের অন্য গতি আছে, কিংবা থাকতে পারে।

'যত মত তত পথ' এই পতাকা হাতে নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ অপরাপর ধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তূর্যনিনাদ করেছিলেন। এই বাণী হিন্দুধর্মের স্পর্ধার বাণী। এই বাণীকেই আজ সর্বতোভাবে এবং সর্বশক্তি দিয়ে জোরালো করতে হবে। 'যত মত তত পথ'—এই বাণীর মধ্যে যেমন আছে সত্যানুরাগ, বিনয়, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা—তেমন আছে অসহিষ্ণুতার এবং মতুয়ার বুদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। এই বিনয়, উদারতা ও সহিষ্ণুতার ভাবকে সংগ্রামশীল করে তুলতে হবে, নতুবা মানবজাতির কল্যাণ নাই। 'Dangers of Obedience' প্রবন্ধাবলীতে হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) বলেছেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে ভালোমানুষ সেজে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, 'ভালোমানুষিকে'—জিগীষু ক'রে তুলতে হবে। "Even meekness must become aggressive." এ না করলে দুর্জনের প্রতিপত্তি কেবল বাড়তেই থাকে। ধর্মের বেলায়ও এই উক্তি সম্যক্ প্রযোজ্য। উদারতা যত পিছু হঠে, ঔদ্ধত্য এবং গোঁড়ামি ততই তাকে আরও চেপে ধরে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'যত মত তত পথ' এটি যেমন শান্তির ও প্রেমের বাণী—তেমনি আবার যারা পরমতের প্রতি অসহিষ্ণু, যারা শুধু মতুয়ার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, তাদের বিরুদ্ধে এটা আপোষবিহীন সংগ্রামের বাণী। এভাবে বিচার করলে স্পষ্টই দেখতে পাই—যে কয়টি মহদুক্তি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনই বিরোধ কিংবা অসঙ্গতি নাই।

সুবিখ্যাত ইতিহাস-রচয়িতা আর্নল্ড টয়েনবির 'An Historian's Approach to Religion' নামক গ্রন্থ থেকে দু'একটি কথা উদ্ধৃত ক'রে এই আলোচনা শেষ ক'রব। তিনি বলেছেন যে ইউরোপে দু'রকমের ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা পরমতসহিষ্ণুতা, দেখা যায়: এক নেতিমূলক, আর এক অস্তিভাবমূলক। অনেকেই ভাবে, ধর্ম একটা ভুয়া জিনিস, এ নিয়ে কচ্‌কচি করা মূর্খতা,

যারা করে তারা মরুক গে। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর লোক ভাবে—ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি, বলাবলি করলে শত্রুতার এবং তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তার ফলে স্বার্থহানি ঘটে, অতএব এ-বিষয়ে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ, লড়ালড়ি একটা কুৎসিত অশোভন কাণ্ড, ভদ্র-লোকের এতে যাওয়া উচিত নয়,—এ হ'ল তৃতীয় রকমের মনোবৃত্তি। এ তিনটাই নেতিমূলক ভাব থেকে উৎপন্ন, সুতরাং নিকৃষ্ট। কোন জলন্ত বিশ্বাস কিংবা দৃঢ় মনোভাব এর পশ্চাতে নেই।

উচ্চাঙ্গের পরধর্মসহিষ্ণুতা এই সত্যোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মের লড়াই শুধু যে নিরর্থক স্বার্থহানিকর কিংবা অশোভন তা নয়,—উহা মূলতঃ অন্যায়। "চরম সত্যকে ক'জন আর উপলব্ধি করেছে? অতএব তার সম্পর্কে নানা লোকের ধারণা যে নানা রকম হবে তা তো অনিবার্য। আর এই নিগূঢ় রহস্যে মর্মে পৌঁছবার পথ যে শুধু একটিই আছে তা কখনই হ'তে পারে না। আমার নিজের অবলম্বিত পন্থা ঠিক,—এ ধারণা আমার নিকট যতই সত্য হোক না কেন, অন্যের অবলম্বিত পন্থা যে ভুল তা কি ক'রে বলি? আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিস্তার এবং পথঘাট কতটুকুই বা আমি জানি? ভগবদ্-বিশ্বাসীর ভাষায় বলতে গেলে—আমি যেটুকু আলো ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছি, অপরে তার সমান—এমন কি—বেশী আলোও পেয়ে থাকতে পারে। অধিকন্তু, আমি ও আমার প্রতিবেশী ভিন্ন পথে চলার দরুন আমাদের পরস্পরের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যস্থল এক হওয়ার দরুন আমাদের পরস্পরের বিভেদের চেয়ে মিলনটাই কি বড় নয়? পরম সত্যের যাঁরা অনুসন্ধিৎসু এবং সেভাবেই যাঁরা জীবন যাপন করেন (অর্থাৎ যাঁরা তাঁর নিকটেই আত্ম-সমর্পণ করেছেন) তাঁরা সবাই ত একই লক্ষ্যের অভিমুখী। তাঁরা ত স্বভাবতই উপলব্ধি করবেন যে তাঁরা ভাই ভাই, এবং তাঁদের পরস্পরের ব্যবহার ভ্রাতৃবৎ হওয়া উচিত। পরমতসহিষ্ণুতা যতক্ষণ 'প্রেমে' পরিণত না হয়, ততক্ষণ উহা অসম্পূর্ণ।

"আজ যখন বিভিন্ন মানবসমাজ নানাভাবে মেশামেশি, ঘেঁসাঘেঁসি করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন ভারতে উদ্ভূত ধর্মসমূহের উদার ভাবের এবং শিক্ষার অনুকূল পবন দূরদূরান্তরে প্রবাহিত হয়ে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদীর অন্তঃকরণের অনুদার ভাবগুলিকে হয়তো ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এই ঝেড়ে ফেলার দায়িত্ব মূলতঃ আমাদের। যাঁরা নিজে উদ্যমশীল, ভগবান তাঁদেরই সহায়। আমাদের অর্ধজগৎ জুড়ে আ যেখানে ইহুদীর অনুদারতা ও অসহিষ্ণু মনোভাব বিরাজমান—সেখান থেকে আমাদের এই পারিবারিক দুষ্ট-ব্যাধিকে আমরা বিতাড়িত করতে পারব কি না —মানবেতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে এটাই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।"

এই প্রশ্ন যে আজ পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মধ্যে অন্ততঃ দু'চারজনের মনে জেগে উঠেছে—তা'তে কি আমরা সেই বীর সন্ন্যাসীর মহতী চেষ্টার সাফল্যেরই সূত্রপাত দেখতে পাচ্ছি না—যিনি অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিশ্বধর্মসভায় হিন্দুধর্মের 'যত মত, তত পথ' এই মহাবাণী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, এবং হিন্দুধর্মকে সংগ্রামশীল করবার জন্যে জীবন আহুতি দিয়েছিলেন?

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

শ্রীভারতী (সরলা দেবী)

[লেখিকার স্মৃতি-কথার অধিকাংশই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-২য় ভাগ এবং 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে ; অপ্রকাশিত অংশ মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ হইল। উঃ সঃ]

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ী হইয়াছে। ইহা ১৯১৬ সালের কথা। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া মা কয়েকদিন হইল 'উদ্বোধনে' আসিয়াছেন। আমি তখন ববেনের পিসির[1] বাড়ীতে থাকি। পিসিমার সঙ্গে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। মা কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাব পর দেশের নানা গল্প করিতে লাগিলেন। আরতির পব আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

কিছুদিন পর আবার একদিন সকালে মার বাড়ী গিয়াছি পিসিমাব বাড়ীব বৌ দুটি আমার সঙ্গে ছিল। মা পূজা কবিয়া উঠিয়াছেন, আমবা প্রণাম করিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল আছ মা?' বলিলাম, 'হ্যাঁ মা, ভাল আছি।'

আমাদের প্রসাদ দিয়া মা বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন—আমাকে বলিলেন, তুমি কিছুদিন আমাব কাছে থাক না। বৌমাটী (মণীন্দ্রেব মা) চলে গেছে, বড় অসুবিধে হচ্ছে। আমি বলিলাম, —'আচ্ছা মা, থাকব, তবে পিসিমাকে একবাব বলতে হবে।' মা বলিলেন. 'তা হবে বৈকি মা। তাব কাছে রয়েছ, তাকে জিজ্ঞেস করে এসো।'

আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, মা বলিলেন, 'দাঁড়াও মা, যোগেন এসেছে, তাকে একবার বলি।' যোগেন-মা উপরে আসিলে মা বলিলেন, 'যোগেন, একে থাকতে বলছি।' যোগেন-মা বলিলেন,'তা বেশ তো, তোমার একজন চাইত মা, বৌটী চলে গেছে, কত কষ্ট হচ্ছে, ও থাকলে বেশ হবে, তা ও কবে আসবে?'

আমি বলিলাম, 'পিসিমাকে জিজ্ঞেস করে কাল পরশুর মধ্যে আসব।'

পরদিনই সন্ধ্যাবেলা পিসিমা আমাকে মার কাছে রাখিয়া গেলেন। তিন মাস মার কাছে ছিলাম, ঠাকুব-ঘবের কাজ আব অন্যান্য কাজ কিছু কিছু করিতাম। রাধুকে গল্প শোনানোও একটা মস্ত কাজ ছিল। গল্প বলার জন্য রাধু খুব বিবক্ত কবিত। না বলিলে মার কাছে যাইয়া বলিয়া দিত। মা তখন বলিতেন, 'যাও মা, ও যা বলে শোন। এমন মেয়ে, যা ধরবে তাই করবে।' আমি তখন তাহাকে মজার মজার নানা গল্প বলিয়া শোনাইতাম। নলিনী ও রাধুর[2] সঙ্গে মাঝে মাঝে খেলাও করিতাম। তাহাদের সঙ্গে খুব ভাব হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যাব আবতিব পর মা বিশ্রামের জন্য শুইতেন, আমি মাব পায়ে কোনদিন তেল মালিশ কবিতাম, কোনদিন পা টিপিয়া দিতাম। রাধু মার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতে চাহিলে মার সামনেই গল্প বলিতাম। গল্প শুনিয়া মাও বালিকার মত আনন্দ করিতেন। মাঝে মাঝে যোগেন-মাও আসিয়া বসিতেন ও মার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ করিতেন।

উদ্বোধনে মা ভোরে ঠাকুর-তোলা, পূজা, ভোগ, বৈকালী দেওয়া, এই সব নিজের হাতে করিতেন। যোগেন-মা সন্ধ্যারতি করিতেন, রাত্রে ভোগ এবং শয়নও দিতেন।

একদিন সন্ধ্যারতির পর মা খাটের উপর

১ ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের ভগিনী।

২ দুইজনেই শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, আমি মার পা টিপিয়া দিতেছি, যোগেন-মাও মেজেতে মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছেন। নানা কথাবার্তার পর মা বলিতে লাগিলেন, "কত সৌভাগ্য মা এই মনুষ্যজন্ম, খুব ক'রে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কিছু হয় না। তবে ভগবানকে কি সহজে কেউ ডাকতে চায় মা? চড় না খেয়ে কেউ রাম নাম বলে না। এই দেখনা, যেমন'—'। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। সংসারে ঘা খেয়েই না তার বৈরাগ্য আসে আর ভগবানে মন যায়। জানো মা,—স্কুলে পড়াশুনা করত, এক ছেলের সঙ্গে ভাব হয় ও তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরে তাকে গন্ধর্ব বিয়ে করে। একটি ছেলেও হয়েছিল। ছেলেটী মারা যায়, তখন শোক পায়। তারপর সেই লোকের দুর্ব্যবহারে তার সঙ্গে থাকতে না পেরে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। অনেক জায়গায় ঘুরেছে আর অনেক তপস্যা করেছে। অনেক রকম ভাষা জানে, এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাষা বলত। বলরাম বাবু ওকে কি ক'রে পায়। শেষে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে আসে। এখন মেয়েদের আশ্রম করেছে। ওর স্বভাব পুরুষের মত, লেকচার দিয়ে বেড়ায়।"

যোগেন-মা বলিলেন, "তা বাপু তপস্যা করেছে। ঠাকুর বলেছিলেন, ওর আচার্যের স্বভাব, ও কিন্তু এখানকার নয়।"

মা ও যোগেন-মার মধ্যে খুব সুন্দর আন্তরিকতাপূর্ণ একটী সম্বন্ধ ছিল। বহুদিন বহুভাবে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতাম। দুইজনে মিলিয়া কত স্মৃতি আলোচনা করিতেন।

সন্ধ্যারতির পর ঐ সময়টুকু মাকে খুব কাছে পাইতাম বলিয়া আমাদেরও অতি আনন্দে কাটিত। দিনের বেলা বেশীর ভাগ সময়ই ভক্তদের ভিড় থাকিত।

১৯১৮ সালের মাঘ মাস। জয়রামবাটী হইতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে খবর আসিয়াছে, মায়ের খুব অসুখ, ম্যালেরিয়া-জ্বরে শয্যাগত। আমি তখন নিবেদিতা স্কুল-বাড়ীতে আছি। পূঃ মহারাজ খবর পাঠাইলেন, "আমরা আজ জয়রামবাটী রওনা হচ্ছি, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।" ডাঃ (জ্ঞানেন্দ্রনাথ) কাঞ্জিলাল ও সতীশ ডাক্তার,[১] দুইজন ব্রহ্মচারী, যোগেন-মা, গোলাপ-মা ও আমাকে সঙ্গে লইয়া পূঃ মহারাজ সেইদিন রাত্রির গাড়ীতেই রওনা হইলেন। রাত্রি ৩টায় বিষ্ণুপুর পৌছিলাম। ভক্ত সুরেশ্বর সেন গরুর গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই রাত্রি তাঁহার বাড়ীতে থাকা হইল। পরদিন সকাল ৭টায় আবার গরুর গাড়ী করিয়া সকলে রওনা হইলাম। মাঝপথে জয়পুরের চটীতে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা হইল, রাত্রি প্রায় ১০টার সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছিলাম। আমাদের দেরি দেখিয়া সকলেই চিন্তা করিতেছিলেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে মায়ের অসুখের খবর বিস্তারিত পাওয়া গেল। মহারাজরা সকলে আশ্রমে রহিলেন, আমি, যোগেন-মা ও গোলাপ-মা আশ্রমে প্রসাদ পাইয়া নিকটস্থ 'জগদম্বা-আশ্রমে'[২] থাকিতে গেলাম। পরদিন সকালে আবার সকলে রওনা হইলাম। পথে আমোদর নদীতে সকলে স্নান করিয়া লইলাম। শীতকাল, জল খুব কম, আমরা হাঁটিয়াই নদী পার হইলাম। প্রায় ১১টার সময় জয়রামবাটী মায়ের বাড়ীতে পৌছিলাম। মায়ের ঘরে যাইয়া দেখিলাম মা লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন, চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে, বিছানাপত্র ময়লা, লেপে ওয়াড় নাই, মাথার চুল সব চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। যোগেন-মা

১ ডাঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বামী সারদানন্দের ভ্রাতা।

২ শ্রীশ্রীমায়ের স্ত্রীভক্তদের জন্য নির্মিত আশ্রম; শ্রীশ্রীমাও সেখানে বাস করিয়াছেন।

মায়ের কাছে যাইয়া সজলনয়নে বলিলেন, "মা, তুমি এই ভাবে পড়ে আছ? তোমার এই অবস্থা।" মা একটু কাঁদকাঁদ স্বরে বলিলেন, "যোগেন, বড় অসুখ।" খানিকক্ষণ পরে আবার খুব কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিল। যোগেন-মার নির্দেশে আমি মাকে খুব চাপিয়া ধরিলাম। যোগেন-মা পূঃ শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিলেন, কাঞ্জিলাল ডাক্তার ও সতীশ ডাক্তার দুজনেই মাকে দেখিলেন, ডাক্তার কাঞ্জিলাল চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে জ্বর ছাড়িল এবং অন্নপথ্য দেওয়ার ২।৩ দিন পর ডাক্তার দুজনেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন। পূঃ শরৎ মহারাজের ইচ্ছা—মা একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবেন। তাই আমরাও থাকিয়া গেলাম। পনর, ষোল দিন পর পূঃ মহারাজ মাকে কলিকাতা যাইবার কথা বলাতে মা বলিলেন, "আমি এখন বড় দুর্বল, বাবা, এ মাসে আর যেতে পারব না, ফাল্গুন মাসে যাব।" মহারাজ উত্তর দিলেন, 'আপনার যেমন ইচ্ছা মা। তবে আপনি যদি এখন না যেতে চান, আমরা চলে যাই?' গোলাপ-মা এবং যোগেন-মাও ঐ কথা বলিলেন। মা বলিলেন, 'কি করি, যোগেন? বড় দুর্বল এ-মাসে সরলাকে আমার কাছে রেখে যাও।'

তাহার ২।৪ দিন পরে পূঃ শরৎ মহারাজ, গোলাপ-মা ও যোগেন-মা কামারপুকুর হইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আমি মার কাছে রহিলাম।

মা ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন। ঐ অসুস্থ শরীরেও মাকে কত ঝামেলাই না সহ্য করিতে হইত। জয়রামবাটীতে কাজ করিবার লোক থাকিলেও মা নিজ হাতে অনেক কাজ করিতেন, বারণ করিলেও শুনিতেন না, বলিতেন, 'তোমরা তো করছই, এই একটুখানি আমি করছি।' দূর দূর দেশ হইতে প্রায়ই ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ দীক্ষার্থী হইয়া আসিতেন। তাঁহাদের খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত চিন্তাই মাকে করিতে হইত। সমস্ত দায়িত্বই তাঁহার ওপর ছিল, তিনি কিন্তু কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। বলিতেন—'আহা মা, কত দূর থেকে কষ্ট ক'রে আসছে সব।' একদিন সন্ধ্যার সময় পূর্ববঙ্গ হইতে তিনজন স্ত্রী ও তিনজন পুরুষ দীক্ষা লইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। সেদিন রাঁধুনী ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। মা খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি আর মাকু তাড়াতাড়ি রান্না করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াতে সে কী খুশী। পরদিন তাঁহারা দীক্ষা লইয়া বিকাল বেলা চলিয়া যান।

একদিন রাধুর স্বামী মন্মথ সকালের দিকে আসিয়া মাকে বলিল, 'মা, আমাদের বড় বিপদ। যদি ৩।৪ দিনের মধ্যে লাটের খাজনা দিতে না পারি, জমিদারি সব নীলাম হয়ে যাবে, আমাকে আপনার ২০০৲ টাকা দিতেই হবে, তা না হলে আমার সব যাবে।' মা শুনিলেন, কিন্তু তখনই কোথায় অত টাকা পাইবেন? ওখানে তো যত্র আয় তত্র ব্যয়, মার হাতে মোটে টাকা থাকিত না। প্রায়ই মনি-অর্ডার আসিত বলিয়া ডাক-পিয়ন এবং অন্যেরা ভাবিত যে মায়ের অনেক টাকা আছে। ঠাকুরসেবা ও ভক্তসেবাতে যে সব খরচ হইয়া যায়, তাহা কেহ জানিত না। মাকে খুব চিন্তা করিতে দেখিয়া নলিনী বলিল, 'পিসিমা, উপস্থিত তুমি রাধুর কিছু গহনা বাঁধা রেখে কারুর কাছ থেকে টাকা এনে মন্মথকে দাও।' মা যেন অকূলে কূল পাইলেন, বলিলেন, 'নলিনী বেশ বলেছে মা, তাই করা যাক।' মা ডাক-পিয়ন যোগেন্দ্র বিশ্বাসের কাছে দুখানা গহনা রাখিয়া ২০০৲ টাকা ধার করিয়া আনিলেন। যোগেন্দ্র অবাক্ হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি টাকা

ধার করতে এসেছ, সে কি? তোমার এত টাকার মনি-অর্ডার আসে, এই ক'টি টাকার জন্য তোমাকে ধার করতে হচ্ছে।' মন্মথ টাকা লইয়া চলিয়া গেলে মা বলিতে লাগিলেন, "কী ঘরেই রাধুর বিয়ে হ'ল মা! জমিদার, বড ঘর বলে বিয়ে দেওয়া হ'ল, আর এখন টাকা-টাকা ক'রে আমায় অস্থির ক'রে দিলে, আহা, গৌর-দাসী বলেছিল, 'মা, ঐ পোড়ো ঘরে মেয়ে দিও না, শেষে কষ্ট পাবে।' তাই হ'ল মা। কালী[৫] ঐ কাণ্ডটি ঘটালে মা। সে বললে, 'বড ঘর, জমিদার, ঐ ঘরে দেবে না তো কার ঘরে দেবে?' শেষকালে দেখছি মেয়ে আমার না খেয়ে মারা যাবে মা।"

মন্মথের সমস্ত বিষয় মা আমাকে দিয়া শরৎ মহারাজের কাছে লিখাইলেন, বলিলেন, 'লিখে দাও, রামের[৬] কাছে আমার স্বদের টাকা বের হয়ে থাকলে ২০০৲ টাকা শীঘ্র পাঠাতে।' আমাকে বলিলেন, "ঠাকুরের তো মা পরনের কাপডের ঠিক ছিল না। সর্বদাই ভাবসমাধিতে থাকতেন বললেই হয়। ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া থাকতেন না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকবে বল? তবু তাঁর কত ভাবনা আমার জন্য! দেখনা, এই টাকা রেখে দিলেন আমার জন্য। আর এদের খালি 'টাকা দাও, টাকা দাও' রব। রাধুকে একখানা কাপড কোনদিন কিনে দিলে না। আমি যখন নহবতে থাকতুম, ঠাকুর একদিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক টাকায় তোমার চলে?' আমার ৫৲ টাকা কি ৬৲ টাকায় চলে জেনে আমার জন্য ৬০০৲ টাকা রেখে দিয়েছেন।"

মায়ের ঐ টাকা বলরামবাবুর জমিদারিতে খাটানো হইত ও মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে উহার স্বদ হইত। মা ঐ টাকাকে তাঁর নিজের টাকা বলিতেন।

এই ভাবে মাকে তাঁহার ভাই ও ভাইঝিদের সংসারের ঝামেলা সহ্য করিতে হইত। আবার এদিকে ভক্ত-সমাগম। তাই তাঁহাকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত।

ফাল্গুন মাসের শেষে পূঃ শরৎ মহারাজ মাকে কলিকাতা যাইবার জন্য আবার পত্র লিখিলেন। মা শুনিয়া বলিলেন, 'মা, আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। তুমি শরৎকে লিখে দাও যে এখন আর আমি যাব না। আমার সেবা-যত্নও বেশ ভাল চলছে। আমি বোশেখ মাসে যাব, তুমিও একেবারে আমার সঙ্গে যেও।'

চিঠির উত্তরে মহারাজ আবার লিখিলেন, 'মা, এত বড অসুখ থেকে উঠলেন, এখন একটু হাওয়া পরিবর্তন দরকার। আমার মনে হয়, মা যদি কলকাতা আসতে না চান, তবে কোয়াল-পাড়া জগদম্বা-আশ্রমে কিছুদিনের জন্য থাকলে ভাল হয়।' মা ঐ চিঠি পাইয়া আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, 'তাই ভাল, শরৎ লিখেছে, আমরা কয়েকদিন কোয়ালপাড়া মঠে যেয়ে থেকে আসি, তুমি শরৎকে লিখে দাও।' চিঠি লেখা হইল, কোয়ালপাড়া আশ্রমেও খবর গেল। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি আমাদের সকলকে লইয়া মা কোয়াল-পাড়া গেলেন। মাকু, নলিনী, রাধু, ছোট মামী, সকলেই ছিলেন। অতি আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। আমরা জগদম্বা-আশ্রমে থাকি। অন্য আশ্রমের ছেলেরা প্রত্যহ মায়ের খবরাদি লইতেন, বিকালবেলা বাজনা-সহযোগে মাকে নানা রকম গানও শুনাইতেন।

একদিন ওখানে খুব শিলাবৃষ্টি হয়। আমরা আনন্দ করিয়া শিল কুড়াইয়া খাইতেছিলাম। মাও আমাদের নিকট শিল চাহিয়া বালিকার মত আনন্দ করিয়া শিল খাইতে লাগিলেন।

---

[৫] শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যম ভ্রাতা।

[৬] শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু।

শিল খাওয়ার দরুণ আমার খুব জ্বর হয়। একদিন একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। মায়ের তখন কী স্নেহ-যত্ন। আমি একটু ভাল হইয়া উঠার পর মারও আবার জ্বর আসিল। আমাদের তখন বিশেষ চিন্তা। স্থানীয় ডাক্তার আনিয়া দেখানো হইল, কিন্তু জ্বর বাড়িয়াই চলিল। এক এক সময় জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া যাইতেন ও পূঃ শরৎ মহারাজকে খুঁজিতেন। কলিকাতায় শরৎ মহারাজকে টেলিগ্রাম করা হইল। তিনি তখন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কাঞ্জিলাল ডাক্তার এবং একজন সাধুকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন, আর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহাকে আবার খবর দিবার জন্য বলিয়া দিলেন। মা কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়াই বলিলেন, 'শরৎ এলো না?' ডাক্তার কাঞ্জিলাল বলিলেন, 'মা, আমরা এসেছি, এবার আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।' মা বলিলেন, 'বাবা, এমন ঔষধ দাও, যাতে ভাল হয়ে উঠি।'

দুই তিন দিন চিকিৎসার পরও কিন্তু জ্বর ছাড়িল না, বরং বাড়িতে লাগিল। তখন তাহারা পূঃ শরৎ মহারাজকে আসিবার জন্য লিখিলেন। তিনি খবর পাইয়াই যোগেন-মা, সতীশ ডাক্তার প্রভৃতিকে লইয়া কোয়ালপাড়া আসিলেন। শরৎ মহারাজ আসিতেই মা তাঁহাকে কাছে বসিতে বলিলেন। জ্বরের জন্য মায়ের হাত পা খুব জ্বালা করিত, শরৎ মহারাজের ঠাণ্ডা গায়ে হাত দিয়ে বলিতে লাগিলেন, 'আঃ, কী ঠাণ্ডা গা।' মা ধীরে ধীরে ভাল হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলালের কলিকাতাতে কাজ থাকাতে মা অন্নপথ্য করিতেই তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেইদিন বিকালেই আবার মায়ের জ্বর আসিল। সতীশ ডাক্তার ছিলেন; তিনি বলিলেন, 'মা, আমার তো এলোপ্যাথি ঔষধ, দেব কি?' মা বলিলেন, 'দাও বাবা'। সতীশ ডাক্তারের ঔষধে মা ভাল হইয়া উঠিলেন।

মা অসুস্থ থাকিতেই রাধু তাহার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল, মার উহাতে মত ছিল না। রাধু এই বলিয়া চলিয়া যায়, 'তুই তো চললি, তা বলে আমি শ্বশুরঘর করবো নি?' মার খুব কষ্ট হইল। তিনি যোগেন-মাকে বলিলেন, 'যোগেন, রাধু আমায় ফেলে চলে গেল' যোগেন-মা বলিলেন, 'তা যাবে না মা? ওর এখন ঐ ঘর করবার সময় হয়েছে। তুমি যে মা ঐ বয়সে দক্ষিণেশ্বরে হেঁটে গিয়ে ঠাকুরের কাছে উঠেছিলে, সে কথা কি মনে নাই?' মা একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'তা ঠিক, যোগেন।' পরে একদিন মা বলিয়াছিলেন, 'মা, রাধু মায়া কাটিয়ে চলে গেল, তখন মনে হ'ল যে ঠাকুর বোধহয় আর রাখবেন না। এখন দেখছি, ঠাকুরের আরও কাজ বাকী আছে।'

মা একটু ভাল হইতেই পূঃ শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'মা, এবারে কিন্তু আপনাকে কলিকাতা নিয়ে যাব, রেখে যাচ্ছি না।' মা, বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, এবার যাব,' 'আমাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সে-বারে দুর্বল বলে যাইনি, এবারে যে আরও দুর্বল। গত বারে ফিরে গেছে, এবারে আর ফেরানো যাবে না।' পরে যোগেন-মাকে বলিলেন, 'যোগেন, একবার জয়রামবাটী তো যেতে হবে, যাত্রা বদলাতে। সেখান থেকে রাধুকে এনে গোছগাছ ক'রে তবে যাব।'

দুই একদিনের মধ্যেই জয়রামবাটী যাইবার ব্যবস্থা হইল। সেখানে পৌঁছিয়া মা রাধুকে শ্বশুরবাড়ী হইতে আনাইলেন। তাহাকে বলিলেন, "আমরা তো কলকাতা যাচ্ছি, তুই যাবিনা? চল্ আমাদের সঙ্গে।" রাধু উত্তর করিল, "আমি এখন যাবোনি। তুই কলিকাতায় যা, আমি এখন যাবোনি।" মা তখন আমাদের বলিলেন,

"মা, ও যাবেনা তো কি করব? শ্বশুরঘর করতে চায়, করুক।"

আমাদের কলিকাতা যাইবার দিন স্থির হইল। মা পালকিতে আর আমরা গরুর গাড়ীতে কোয়ালপাড়া পৌঁছিলাম। সেই দিন ওখানে বিশ্রাম করা হইল। মায়ের শরীর দুর্বল, গরুর গাড়ীতে বা পালকিতে কষ্ট হইতে পাবে, এইজন্য পূঃ মহারাজ বাঁকুড়া হইতে ৩০ টাকা দিয়া দুই খানা ঘোড়ার গাড়ী আনাইলেন। নলিনী-দিদি, মাকু, নবাসনের বৌ প্রভৃতির জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। মায়ের জন্য ঘোড়ার গাড়ীর মাঝখানে বাক্স রাখিয়া বিছানা করিয়া দেওয়া হইল, আর বালিশ দিয়া উঁচু করিয়া ইজিচেয়ারের মত করা হইল, যাহাতে মা আরাম করিয়া যাইতে পারেন। মা সব দেখিয়া বলিলেন, "শরৎ আমার কী ব্যবস্থাই করেছে।" মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো ছিল, মা বলিলেন, "যদি যেতে দেরি হয়, মাঝরাস্তায় ঠাকুরকে মুড়ি ভোগ দেব।" যখন শুনিলেন যে আমরা ১২টার মধ্যে বিষ্ণুপুর পৌঁছিব তখন বলিলেন, "তবে আর ভোগের দরকার নেই, সকালে একবার ভোগ হয়েছে।"

মা মাঝরাস্তায় একবার গাড়ী হইতে নামিলেন। একটী মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোত্থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন?

মা—জয়রামবাটী থেকে আসছি, কলকাতা যাচ্ছি।

মেয়ে—কলকাতায় কে থাকে?

মা—আমার ছেলেরা থাকে।

মেয়ে—আপনার ছেলেরা বুঝি খুব ে করে?

মা– হ্যাঁ, তা করে বৈকি।

আমাকে দেখাইয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এটী কে?"

মা—এটী আমার কোলের মেয়ে।

ঐ রাস্তায় তখন ঘোড়ার গাড়ী চলিত না। তাই গাড়ীর আওয়াজে দুই পাশে বহু লোক জমা হইয়াছিল। ১১টার সময় গাড়ী বিষ্ণুপুর পৌঁছিল। ভক্ত সুরেশ্বর সেনের বাড়ী একটু গলির ভিতরে। বাড়ীর দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গলি কলাগাছ, আম্রপল্লব, আলপনা দিয়া সাজানো, আর রাস্তার দুই পাশে সব ভক্তরা মাকে গাড়ী হইতে নামাইবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন পূজাবাড়ীতে দেবীপ্রতিমা আসিয়াছেন। মাকে ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামাইয়া একখানা পালকিতে বসানো হইল। শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সেন ও আরো তিনজন ভক্ত কাঁধে করিয়া পালকি ভিতর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। বাড়ীটীও ঝকঝকে পরিষ্কার, সুন্দর আলপনা দেওয়া। মায়ের জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট ছিল, মা সেখানে ঠাকুরের ফটো বাহির করিয়া রাখিলেন এবং পূজা করিয়া শালপাতায় ভোগ নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের ভোগের পর মা বলিলেন, "মা, বড্ড খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।"

পূঃ মহারাজদের গাড়ী রাস্তায় খারাপ হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের পৌঁছিতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। সেদিন বিষ্ণুপুর থাকা হইল, পরদিন বেলা ১১টার গাড়ীতে আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম। গড়বেতা ষ্টেশনে ওখানকার আশ্রমের ভক্তরা মাকে দর্শন এবং প্রণাম করিলেন আর এক চুপড়ী তালশাঁস দিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর আমরা হাওড়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে মায়ের জন্য গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা সকলে ঐ গাড়ীতে করিয়া উদ্বোধনে গেলাম। উদ্বোধনে আসিয়া গাড়ী থামিতেই শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ সান্যাল গেটের কাছে একখানা চাদর বিছাইয়া দিলেন, মা তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া উপরে গেলেন। গোলাপ-মা মায়ের জন্য আগেই বিছানা করিয়া

রাখিয়াছিলেন; মা তাহাতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে মায়ের অনুমতি লইয়া সুধীরাদির[৭] সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নিবেদিতা স্কুলে গেলাম। অল্পদিন হইল সুধীরাদির দাদা দেবব্রত[৮] মহারাজের দেহত্যাগ হইয়াছে। মায়ের মন এজন্য অত্যন্ত খারাপ। সুধীরাদির জন্যও খুব চিন্তা করিতেছেন। আমাকে বলিলেন, "সুধীরাকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। তুমি তাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

সুধীরাদি মার কাছে আসিলে মা দেবব্রত মহারাজের জন্য বিশেষ দুঃখ করিতে লাগিলেন, "আহা, এমন ভাই চলে গেল। ভাই তো নয়, সে ছিল যোগীপুরুষ।" মা খুব কাঁদিতে লাগিলেন। সুধীরাদি কিন্তু অবিচলিতা রহিলেন। তিনি শুধু বলিলেন, মা, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন বলুন।

মা—হ্যাঁ মা, আমি ভাল হয়ে উঠব।

সুধীরাদি— তবেই আমার সব হ'ল।

মায়ের শরীর দুর্বল বলিয়া সাধারণ ভক্তদের যাতায়াত নিষেধ ছিল। শুধু দুই একজন মেয়ে ভক্ত আসিতেন। মা ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তের সমাগমও বাড়িয়া চলিল। আষাঢ় মাস হইতে মা পুনরায় দীক্ষাদান আরম্ভ করিলেন।

কার্বাঙ্কল হওয়ায় পূঃ হরি মহারাজ তখন উদ্বোধনে শয্যাশায়ী ছিলেন। শচীন[৯] মহারাজও খুব অসুস্থ। শচীন মহারাজ ও দেবব্রত মহারাজ মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মা উদ্বোধনে আসার কয়েক দিন পরে শচীন মহারাজও দেহত্যাগ করেন। হরি মহারাজ একটু সুস্থ হইয়া মঠে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শ্রাবণমাসেই দেওঘর হইতে পূঃ বাবুরাম মহারাজ বিশেষ অসুস্থ হইয়া বাগবাজার বলরাম মন্দিরে আসিলেন এবং ৮।১০ দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন (৩০শে জুলাই, ১৯১৮)। মা উহাতে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। পরদিন যখন বলরামবাবুর স্ত্রী দেখা করিতে আসিলেন, মা আবার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "আহা, কী ভাইই ছিল! দেবের দুর্লভ ভাই ছিল, এমন আর দেখা যায় না।"

তারপর আবার গোলাপ-মা রক্তামাশয়ে অসুস্থ হইয়া পড়েন। আমি তখন মার দু'একটী কাজ ছাড়া বাকী সব সময় গোলাপ-মার সেবা করিতাম। ঐ সময়ে পূঃ মাষ্টার মহাশয় আমাকে একখানি 'কথামৃত' উপহার দিয়া পড়িতে বলিলেন, ভাল লাগিলে আরও দিবেন—বলিলেন। পরে আরও তিন খানি দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া মা বলিলেন, "মাষ্টার সরলাকে খুব ভালবাসে, কেমন বই দিয়েছে! আচ্ছা, সরলা আমাকে পড়ে শোনাও তো। আমি একটু একটু পড়িয়া শুনাইতাম। মা বেশ মন দিয়া শুনিতেন এবং আনন্দের সহিত পুরাতন স্মৃতি আলোচনা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরের নানা কথা আলাপ করিতে করিতে বলিতেন, "ওরা কেমন চালাক গো, সব ঠিক ঠিক লিখে রেখেছে। ঠাকুর ঐ-রকমই সব বলতেন। কেমন সব ছেপে বের করছে। কত লোক সব জানতে পারছে। আমিও তো কত শুনতাম গো। এ-রকম বের হবে জানলে আমিও লিখে রাখতাম। কে জানে মা, এত সব হবে।"

গোলাপ-মার অবস্থা যখন বাড়াবাড়ি, তখন মা ঠাকুরের ফটোতে মাথা রাখিয়া প্রার্থনা করিতেন, "ঠাকুর, গোলাপকে নিও না। আমি তা হ'লে কি ক'রে থাকব!" গোলাপ-মা সুস্থ হইয়া উঠিলে সুধীরাদি আমাকে স্কুলে লইয়া যাইবার

[৭] সুধীরা বসু, নিবেদিতা স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষা।

[৮] স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

[৯] স্বামী চিন্ময়ানন্দ।

জন্য মায়ের কাছে অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু স্কুলে যাইবার ৩।৪ দিন পরই যোগেন-মা পিঠের একটি কার্বাঙ্কলে অত্যন্ত কষ্ট পাওয়ায় তাঁহার সেবার জন্য আবার আমাকে উদ্বোধনে যাইতে হইল।

কাহারও ক্ষতাদি কিছু হইলে মা তখনই ঐ জায়গায় সিংহবাহিনীর মাটি লাগাইয়া দিতেন, গোলাপ-মার অসুখে দেখিয়াছিলাম, আবার যোগেন-মার সময়েও দেখিলাম, ফোড়ার উপর ঐ মাটি লাগাইয়া দিতেছেন। কিছুদিন পরে ফোড়া কাটিতে হইবে শুনিয়া মা বলিতে লাগিলেন, 'ও যোগেন, কাটতে হবে, সে কি মা! সিংহবাহিনীর মাটিতে সারল না। ও মা, কি হবে? আবার কাটতে হবে।' কোন রকম কাটা-ফাড়ার কষ্ট মা দেখিতে পারিতেন না। যোগেন-মার অস্ত্রোপচারের সময় মা ঠাকুর-ঘরে যাইয়া জপ করিতে লাগিলেন। সব হইয়া গেলে আমি মাকে খবর দিতে মা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন, 'হয়ে গেছে? যোগেন ভাল আছে? কোন কষ্ট হয়নি ত?' তখন যোগেন-মার কাছে আসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'খুব লেগেছে মা? এখন বেশ ভাল আছ?'

ইঁহারা ভাল হইয়া উঠিলে ললিত[১০] বাবুর ইচ্ছা হইল মাকে একদিন থিয়েটার দেখাইবেন। মাকে বলাতে মা রাজী হইলেন। নলিনী, মাকু প্রভৃতি থিয়েটার দেখার জন্য উৎসুক হইল। তখন অপরেশবাবু মিনার্ভা থিয়েটারে। অপরেশবাবু ও ললিতবাবু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নলিনী, মাকু, রাধু, মন্মথ, নবাসনের বৌ, মা, গোলাপ-মা, ও সাধুরা অনেকে থিয়েটার দেখিতে গেলেন, আমিও ছিলাম। সেদিন 'রামানুজ' অভিনয় ছিল। মা, যোগেন-মা ও গোলাপ-মাকে অপরেশবাবু তিন তলার বিশেষ আসনে বসাইলেন। মা হৃষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। একটী দৃশ্য ছিল—রামানুজকে তাঁহার গুরু দীক্ষাদানের সময় বলিতেছেন, 'এই মন্ত্র তুমি কাউকে বলবে না। যে এই মন্ত্র শুনবে সেই মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাকে অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে।' মহাপ্রাণ রামানুজ ইহা শুনিয়াও লোক-কল্যাণ-কামনায় উচ্চৈঃস্বরে সেই সিদ্ধ মন্ত্র সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। ঐ দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতে মা একেবারে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। রামানুজের ভূমিকায় তারাসুন্দরী অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ দৃশ্যের পর তিনি মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। কিন্তু মা তখন একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্যা—গোলাপ-মা মাকে কয়েকবার জোরে জোরে ডাকার পর তাঁহার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান আসিলে তারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মা কিন্তু তারাকে প্রকৃত রামানুজ-জ্ঞানে কোলে বসাইয়া চুম্বন করিলেন। গোলাপ-মা বলিতে লাগিলেন, 'আহা, তারার কি ভাগ্য, তারার কি ভাগ্য!' অভিনয় শেষ হইবার পর সকল অভিনেত্রীই মাকে প্রণাম করিল, মাও সকলকে আশীর্বাদ করিলেন, তারা ইহার পরেও মাঝে মাঝে উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করিতে আসিতেন।

সেইদিন ছোট্ট জায়গায় বসিয়া মায়ের কষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি বলিয়া গোলাপ-মা ললিতবাবুকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। তাই তিনি আর একদিন খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়া মাকে দোতলায় রয়েল বক্সে বসাইয়াছিলেন। থিয়েটার দেখাইয়া একদিন তিনি সার্কাস দেখাইবার জন্য মাকে গড়ের মাঠে লইয়া যান। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত সার্কাস দেখা হইয়াছিল। নানা রকম খেলা দেখিয়া মা বালিকার মত আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। অনেক রাত্রি হওয়াতে কোন ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল না। ললিতবাবু একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আনিলেন। কিন্তু মা ট্যাক্সিতে যাইতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। একবার এক জায়গায় যাইবার সময় মায়ের ট্যাক্সির নীচে একটা কুকুর চাপা পড়িয়াছিল। সেই দিন হইতে মা আর ট্যাক্সিতে উঠেন নাই। ললিতবাবু অনেক করিয়া বলিলেন, 'মা গাড়ী এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, ট্যাক্সিও খুব ধীরে ধীরে চালাবে, ইত্যাদি। কিন্তু মা আবার বলিলেন, 'দেখো, তুমি গাড়ী পাবে।' তখন সত্য সত্যই খানিক দূরে যাইয়া ললিতবাবু একখানা ফিটন-গাড়ী পাইলেন। ঐ গাড়ী করিয়া সকলে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলাম। (ক্রমশঃ)

---

[১০] শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, জন ডিকিনসন অফিসের কর্মচারী, শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত।

পূর্ণিমা

শ্রীরবি গুপ্ত

আজি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-পূর্ণ-চাঁদে
কোন্ শিল্পী-মানস-মণি-মূর্ছনাতে
উচ্ছ্বাস-উচ্ছল
উল্লাস-উজ্জ্বল
ধ্রুব স্বপ্ন এ-ধূলি চির স্বর্গে সাধে,
আজি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-পূর্ণ-চাঁদে।

আজি উধাও আকাশ-পথে মেঘের মানা—
ভুলি ধরার আঁধার দ্বারে দেয় সে হানা।
ধরণীর জাগে প্রাণ
লভে অভিনব গান,
ফোটে বারিদ বাধায় কোন্ সুর-সাহানা,
আজি উধাও আকাশ-পথে মেঘের মানা।

কোন্ অসীমের লভে আলো গহন রাতি,
এ কী নিতল ছায়ার তলে প্রভাতী ভাতি।
অনাহত ওঠে সুর
সুবর্ণ সিন্দুর,
লয় ধরণীর নীরবতা ছন্দে মাতি,
কোন অসীমের লভে আলো গহন রাতি।

ওই বিলসিত-বিদ্যুৎ মানস-মণি
বুঝি ধূলির তন্ত্রী মূক তুলিছে ধ্বনি'।
অমল অনল-ভাষে
তাহারি মন্ত্র আসে,
চির জ্যোৎস্না জ্যোতির দ্বারে সাজে সরণি,
ওই বিলসিত-বিদ্যুৎ মানস-মণি।

নীল অবারিত পারাবার—মুক্ত তরী
কার অতল অসীম ধনে উঠিছে ভরি'।
সুদূরিকা ইসারায়
সাধে বুঝি এ-ধরায়,
চলে অনন্ত-অভিসার-দীপ্তি ক্ষরি',
নীল অবারিত পারাবার—মুক্ত তরী।

আজি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-পূর্ণ-চাঁদে
কোন্ শিল্পী-মানস-মণি-মূর্ছনাতে
উচ্ছ্বাস-উচ্ছল
উল্লাস-উজ্জ্বল
ধ্রুব স্বর্গ এ-ধূলি চির স্বপ্নে বাঁধে,
আজি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-পূর্ণ-চাঁদে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটকম্

অধ্যক্ষ ডক্টব শ্রীযতীন্দ্রবিমলচৌধুবী-বিরচিতম্

(অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত)

[বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের আদেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অমিয় জীবনচরিত অবলম্বনে বিরচিত সংস্কৃত নাটক "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" সংক্ষিপ্ত আকারে একাধিক সংস্কৃতির পীঠে এবং আকাশ-বাণীতেও অভিনীত হইয়াছে। কয়েকটি মূল শ্লোকসহ প্রথমাঙ্কের সুলিখিত বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হইল। উঃ সঃ]

প্রণমামি সনাতন-নন্দপবাং

নবধাম-সুখাকর-বিষ্ণুপ্রিযাম্।

জননী-শচিকানয়নাঞ্জনিকাং

জগদীশ-মহাপ্রভুচিত্তহবাম্॥

পিতা সনাতন মিশ্রেব শ্রেষ্ঠ আনন্দের কাবণ, নবদ্বীপেব সর্বসুখেব খনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিযাকে প্রণতি নিবেদন কবি—যিনি জননী শচীদেবীর নয়নাঞ্জন-স্বরূপা এবং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুব মনোমোহন-কারিণী॥

[নান্দীগানেব পবে সূত্রধাবেব প্রবেশ]

ভগবান্ মহাপ্রভু এবং মহাজননী বিষ্ণুপ্রিযা আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন॥

আহা। নিখিল বিশ্বে কত কত দেশই না আছে, কিন্তু আমাদের দেশ ভাবতবর্ষ সর্বথা অতুলনীয়। আমাদেব এই ভাবতবর্ষে যুগে যুগে পাযণ্ডদলন এবং ধর্ম সংস্থাপনেব নিমিত্ত ভগবান্ জগদম্বিকা এবং পার্ষদগণ-সহ স্বয়ং অবতীর্ণ হন। শুচি ব্যক্তি নিত্য শচীর [১] ভজনা করেন, সেই শচী বা শক্তি বসুন্ধরা করেন পবিত্র।

বস্তুতঃ কায়মনোবাক্যে যদি কেউ শচীর ভজনা করেন, তা হলে অচিবেই সেই ভক্ত শুভ ফল প্রাপ্ত হন—যার থেকে অধিক আব কিছুই হতে পাবে না। সর্বসুখ-বিধাযক গোবিন্দ তাঁব প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন—কারণ, মাতৃপূজা-পবাযণের প্রতি ভগবানেব কৃপার অন্ত নেই। [২]

[মহাপ্রভুব প্রবেশ]

মহাপ্রভু—আহা—কে আমার জননী শচীর বন্দনা কবছেন? ধন্য আমার জননী যিনি পতি এবং অষ্টসুতা-বিযোগ এবং আমাব অগ্রজ বিশ্বরূপেব সংসাব-ত্যাগ-জনিত দুঃখ নীববে সহ্য করছেন—অকাতরে, কেবল আমাব ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে জীবন ধারণ ক'রে আছেন। সর্বংসহা-সদৃশী আমার জননী এখন কোথায়? মা! মা!

[জননী শচীদেবীব প্রবেশ]

শচীদেবী—বাবা। এই যে আমি। কেন, ধন, আমায় ডাকছ? এই যে আমার গৌরসুন্দর যে একাকী এখানে দাঁড়িয়ে।

---

১ এস্থলে "শচী" শব্দটার দুটী অর্থ: (১) শক্তি, (২) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জননী।

২ কায়েন মনসা বাচা শচীং ভজেত চেন্নরঃ। অচিরাল্লভতে ক্ষেমং যস্ত পরতরং ন হি॥
তস্মিংস্তুষ্যতি গোবিন্দঃ সর্বসুখবিধায়কঃ। নিরবধিঃ কৃপা তস্ত মাতৃপূজাপরায়ণে॥

মহাপ্রভু—মা! আজ তোমাকে আমি একটি গভীর গোপন কথা বল্‌বো, আমার নিজের সম্বন্ধেই। আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি, মা। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে জননীর অপেক্ষা শ্রেয়ঃ গুরু আর নেই। জননীই শ্রেষ্ঠ তপঃ, ধ্যান, জ্ঞান, সাধন ও চরম মোক্ষ।

প্রকৃতপক্ষে, তিনিই সাক্ষাৎ জগজ্জননী, যাঁকে আমরা 'মাতা' বলে সম্বোধন করি, তাঁর ক্রোড়ে থেকেই সন্তান স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে। তিনিই করুণা-কোমল সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপার মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

যাঁর স্নেহ সন্তানের শিশু, বাল্য বা প্রৌঢ় বয়সে সমানই থাকে, কোনোদিনও পরিবর্তিত হয় না, সেই জননীকেই প্রণাম করি ॥*

বিন্দু থেকে আরম্ভ ক'রে সমগ্রদেহের সংগঠন এবং পুষ্টিসাধনে মাতা, সন্তানের মানসিক ভাবের পরিপূর্তি এবং তার ঐশ্বর্য প্রকাশেও মাতা, সন্তানের সর্ব কার্যেই মাতারই যেন প্রসার ঘটে। ফলতঃ, সন্তান তো মাতারই আত্ম-সম্প্রসারণ মাত্র। আমার এই সোনার ভারতবর্ষে চিরকাল জননীর কি অতুলনীয় সম্মান। এই দেশে ভগবান্ আছেন কি নেই, এমনকি সেই বিষয়ও বহু বাগ্‌বিতণ্ডা, বিবাদ-বিসংবাদ করেছে, কিন্তু মা যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কোনও ঋষি, কোনও শাস্ত্রকার কোনও দিন মতানৈক্য করেননি। সকল ঋষিরই বিধান—জগদ্বিনিময়ে হোক্, আত্মবিনিময়ে হোক্, বা ঈশ্বর-বিনিময়েই হোক্—মায়ের সন্তোষ বিধান অবশ্যই করতে হবে। সুতরাং মা। তুমিই তো জগদম্বিকা, তুমিই আদ্যাশক্তি। কাজেই জননি! আজ তোমার কাছে আমার মনোভাব প্রকাশ একান্ত কর্তব্য।

শচীদেবী—[স্বগত] জানিনা। পুত্র আমার কিই বা বলবে? আমার হৃদয় কেন কাঁপছে?

[প্রভুর প্রতি] নিমাই। নিঃসঙ্কোচে তুমি তোমার বক্তব্য বল। সব সমস্যারই সমাধান আছে। তোমার দুঃখের কারণ কি, আমায় নিঃসঙ্কোচে বল।

মহাপ্রভু—জননি। গয়াধাম থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই আমার হৃদয়ে জাগছে এক অনিবার্য অশান্তি। শতভাবে চেষ্টা করেও এই অশান্তি আমি দূর করতে পারছি না। কেবল মনে জাগছে একটি মহাপ্রশ্ন : সমগ্র জগৎ দুঃখদাবানলে দগ্ধ, অজ্ঞান-তমসায় পরিবৃত, পাপকালিমায় লিপ্ত হয়ে রয়েছে, কি ক'রে দূর হবে এই ঘনান্ধকার, উদয় হবে প্রেমের দিব্য কিরণ-বিস্তারী দিনমণির, বিরাজ করবে দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, গৃহে গৃহে এক অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও অখণ্ড প্রীতি? মা! সাধনার জন্যই এই মানব জীবন। কিন্তু আমার সেই অমূল্য জীবন প্রতি পলেই যেন বিফল হয়ে যাচ্ছে—যেহেতু আজ পর্যন্ত আমি সর্বপ্রকারে সর্ব শক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রেমধর্ম সম্প্রসারণের জন্য যত্নপরবশ হইনি। সেইজন্য প্রার্থনা করি—মা। আপনি তাই করুন যাতে আমি জগতের সর্বদুঃখ হরণ করতে সমর্থ হই। মা—আজ আদেশ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণের তেমন আরাধনা করতে পারি যাতে তিনি অচিরেই আমাকে স্বরূপ প্রদর্শন ক'রে নিজেই জগৎ সমুদ্ধরণের প্রকার বলে দেন।

---

* মূল শ্লোক : [শিখরিণী ছন্দে]

ইয়ং সাক্ষাদ্দেবী জগতি জনয়িত্রীতি বিদিতা
যদুৎসঙ্গে স্থিত্বা ত্রিদিবসুলভং শর্ম লভতে।
শিশৌ যূনি স্নেহঃ প্রবয়সি চ তুল্যোঽস্তি তনুজে
যদীয়স্তাং বন্দে করুণমসৃণাম্ ঈশ্বরকৃপাম্ ॥

শচীদেবী—[স্বগত] অহো! নিয়তি কে খণ্ডন করতে পারে? আমি যা ভয় করেছিলাম, তাই তো সত্যই ঘটল। পুত্র বিশ্বরূপের ন্যায় এই বিশ্বম্ভরও গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণকেই শ্রেয়ঃ বলে মনে করছে। কিন্তু আমার কন্যা পরম-পতিব্রতা লক্ষ্মীস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে? পুত্রবিরহখিন্না আমিই বা কি ক'রে জীবন ধারণ করবো? (প্রভুর উদ্দেশ্যে)—

পুত্র! সাবধানে মন দিয়ে আমার কথা শোন। তুমিই বলছ যে মাতাই পরম ধর্ম। তা হলে আমাকে—তোমার জননীকে ত্যাগ ক'রে তোমার ধর্মাচরণ কি ক'রে সম্ভবপর? ধর্মপ্রচারই যদি তোমার অভিলাষ হয়, তা হলে তোমায় মনে রাখতে হবে যে তুমি যদি স্বয়ং ধর্মবিরোধী কাজ কর, তা হলে কেউ তোমার অনুসরণ করবে না। তখন কি ক'রে তোমার ধর্মপ্রচার হবে? সেজন্য, বৎস! আমি বলি—তুমি গৃহে আমার কাছে থেকেই ধর্ম আচরণ কর। তোমার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ মাধবী মাধবপ্রিয়া, কমললোচনা কমলা, পরম-রমণীয়া রমা। এমন সতী সাধ্বী লক্ষ্মী কি ক'রে দারুণ পতিবিরহব্যথা সহ্য করবেন? আর ধর্মপত্নী-পরিত্যাগী তোমার ধর্মই বা থাকবে কোথায়?

মহাপ্রভু—আদরিণী জননী, শান্ত হও, ধৈর্য ধর। যদি মোহবশতঃ আমি তোমার মনে বিন্দুমাত্রও কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে চিরজীবন যেমন, আজও তেমনি, পরম স্নেহভরে ক্ষমা কর।

শচীদেবী—আরো বলি, নিজের দিক থেকে—যে মাতা স্বয়ং আর্যাচার পালনপূর্বক সর্বদা পরের হিতসাধন করেন, যে মাতা পুণ্যজনিত আলোকশোভায় সর্বদা লাবণ্য বিস্তার করেন, যে মাতা জগদীশ্বরের পাদপঙ্কজদ্বয়ের কমনীয় পুষ্পরূপে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন, যে মাতা অন্তিমে পুত্রবধূ এবং পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রেখে চিরনিদ্রায় অভিভূত হতে পারেন, একমাত্র সেই মাতাই তো ধন্যা॥* তা হলে, আমার কথাও তুমি কিছু ভেবে দেখেছ কি?

মহাপ্রভু—আমার জননীই যে স্বয়ং বিশ্বজননী, এই বিষয়ে আমার চিত্তে কোনও সন্দেহ নেই। মাতঃ! তুমিই ত সকলের হৃদয়ে অবস্থান কর। কিন্তু মা! দেখ—বর্তমানে তোমার সব সন্তান আত্ম-মহত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে, হিংসা-দ্বেষ-পরায়ণ হয়ে বন্য পশুর মত উচ্ছৃঙ্খল ও দুঃখ দৈন্যবহুল জীবন যাপন করছে। মা! অধম হলেও আমার জননীর প্রতি কর্তব্য আমি ভুলিনি। তা হলেও আমি নিরন্তর এই ভাবি,—আমার প্রাণ-প্রিয়তম ভ্রাতৃমণ্ডলীর দুর্মতি যাতে দূর করতে পারি, সেজন্য অবিলম্বে আমার সাধন অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। এই কারণেই আমি বৈরাগ্য অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে আমার জননীর আদেশ অবশ্য সর্ব প্রথমেই প্রার্থনীয়। এই ভেবেই আজ আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হয়েছি।

শচীদেবী—(অশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে) হা ভগবন্! আমার কপালে এই কি শেষে ঘটলো?

---

* মূল শ্লোক: [শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে]

আর্যাচারপরায়ণা পরহিতে দত্তাবধানা স্বয়ং
লাবণ্যং পরমং সদা বিকিরন্তী পুণ্যপ্রভা শোভয়া।
আত্মানং কমপুষ্পকং কৃতবতী বিশ্বেশপাদাব্জয়ো-
র্ধন্যা ক্রোড়গতা বধূতনয়য়োর্নিদ্রাতি মাতা চিরম্॥

[শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ত্বরিত গতিতে প্রবেশ]

বিষ্ণুপ্রিয়া—মা। তুমি অশ্রু বর্ষণ করছ কেন? নাথ। তুমি আমার মাকে কি বলেছ? আমার এই জননী স্বয়ং জগদম্বিকা, নিখিল বিশ্বের হিতসাধনে তৎপরা—তাঁর চোখে কি জল শোভা পায়? মা। কি হয়েছে, আমাকে শীঘ্র বল।

মহাপ্রভু—আমিও বলছি, আমাদের দু'জনের জননী বিশ্বজননী। সেজন্য, এই বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী তুল্য। কিন্তু। কি চরম দুর্ভাগ্য যে আজ সকলেই পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করছে। কে আমাদের এই সকল দুর্ভাগা ভ্রাতা ভগিনীদের আত্মোপলব্ধির পন্থা প্রদর্শন ক'রে তাদের এই বিভ্রান্তি দূর করবে—এই বিষয়েই আমি জননীকে প্রশ্ন করেছি। এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সন্ন্যাসই অবলম্বনীয়, এই ভেবেই জননী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু—দেখ, যিনি নিজে বিশ্বজননী, তিনি যে সকল সন্তানের কল্যাণের কথা ভাববেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য বলি—আমাদের দুজনকে বৈরাগ্যই অবলম্বন করতে হবে। যা'তে আমরা জগতের সর্ব দুঃখ দূর করতে পারি, তজ্জন্য আমরা দু'জনেই যত্নপরবশ হব।

বিষ্ণুপ্রিয়া—নাথ। তা বেশ তো। কিন্তু তা'তে গৃহ পরিত্যাগ করতে হবে কেন? হরির পূজা করতে হয় ভক্তি দিয়ে, আমার হরি তো আমার সাম্নেই বিরাজমান। সর্বদা ধ্যান-তৎপর হয়ে তুমি হরির ভজনা কর, আমিও সেইভাবে আমার হরির ভজনা করবো। আমি তোমার সহধর্মিণী। তুমি যা যা আচরণ করবে, আমি অবিকল তাই তাই আচরণ করবো। গৃহেই হোক্ বা বনেই হোক্—আমি সর্বতোভাবে তোমার পথ অনুসরণ করবো। তুমি যদি গৃহী হও, আমিও গৃহিণী, তুমি যদি সন্ন্যাসী হও, আমিও সন্ন্যাসিনী। এটাই জগতে বিহিত বিধি; কে তার অন্যথা করতে পারে? কিন্তু জগদম্বিকারূপিণী আমাদের জননীর কি হবে, কি করেই বা তিনি জীবন ধারণ করবেন?

শচীদেবী—আদরের কন্যা আমার। এইজন্যই তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া—স্বয়ং বিষ্ণুও তোমারই প্রিয়সাধনে ব্রতী থাকেন। মা, আমার জপের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে—এখন তো আমাকে যেতেই হয়—আমি বিষ্ণুমন্দিরে যাচ্ছি। এ বিষয়ে তুমি যা বলবে, আমিও ঠিক তাই বলব। বৎসে। বিশ্বম্ভর যেমন, তেমনি তুমিও আমার জীবনের অবলম্বন। (শচী নিষ্ক্রান্তা হলেন)

মহাপ্রভু—কল্যাণি। তুমিই কেবল জননীর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস কর। তা হলে সকলে তোমাকে আশ্রয় ক'রে জীবনধারণ করতে পারবেন, তুমি আমার জননীরও অবলম্বন হবে। হৃতশ্রী ধর্মও তোমাকে আশ্রয়রূপে পেয়ে পুনরায় জগদ্ধারণের কারণ হবে।

পতিপ্রাণে বিষ্ণুপ্রিয়ে। এই কলিযুগ অত্যন্ত কঠোর। এই কলিযুগে একমাত্র বৈরাগ্যই মুক্তির পথ। সে জন্য আমাদের একত্রবাস সম্ভবপর নয় ॥১

---

১ মূল শ্লোক:

বিষ্ণুপ্রিয়ে পতিপ্রাণে কঠোরোঽয়ং কলের্যুগঃ।
বৈরাগ্যমেব মার্গোঽস্মিন্ আবয়োর্ন সহস্থিতিঃ ॥ ১

অবশ্য আমাদের বাইরের দিক থেকে বিচ্ছেদ হলেও অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণই থাকবে। এ ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নেই।

কিন্তু এভাবে বিরহানলসন্তপ্তা হয়েও তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ জীবনব্রত পরিত্যাগ করো না॥ ২

হরির নাম, হরির নাম, কেবলই হরির নাম।—এই নাম সঙ্কীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে যেন কোনও প্রকার ব্যাঘাত না হয়॥ ৩

সন্তানগণ পিতৃহীন হলে অবশ্যই দুঃখক্লিষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করে। কিন্তু মাতৃহীন হলে তারা ধনে প্রাণে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ৪

সে জন্য সন্তানদের কল্যাণার্থে তোমাকে নিরন্তর নবদ্বীপেই বাস করতে হবে।

তুমি সে ভাবে আমাদের জননীর সেবাও করবে, যাতে তিনি কোনও ক্রমেই আমার বিচ্ছেদ দুঃখকে দুঃখ বলে গণনা না করেন॥ ৫

আমাদের এই দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত এবং হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

তুমিই তাকে সর্বদা রক্ষা করো। কারণ, রাষ্ট্র ধর্মহীন হয়ে চলতে পারে না॥ ৬

সে জন্য তুমি স্বয়ং পঙ্কজিনী হয়ে সমস্ত পঙ্ক বিদূরিত কর।

জগৎ-কল্যাণকারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া তুমিই আমাকে পূর্ণ শক্তি প্রদান কর॥ ৭*

বিষ্ণুপ্রিয়া—জীবনবল্লভ। আমি ভারতীয় রমণী, তোমার পথই আমার পথ, এবং সর্ব-শক্তি প্রয়োগ করেও এই পথকেই নিরন্তর আমার অনুসরণ করতে হবে। তোমার অভীষ্ট সম্পাদন নিমিত্ত সর্বতোভাবে আমি আত্মনিয়োগ করবো।

হে নদীয়ার ঈশ্বর। এই সমগ্র বিশ্বই তোমার পরম স্বরূপের মূর্ত প্রকাশ। সে জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই—অগ্নিতে, বায়ুতে, জলে চিরস্থির নীল আকাশে তোমার বিশ্বমোহন হাস্য স্ফুরিত হচ্ছে॥ ১+

তোমার প্রিয়া তার প্রিয়ের আদেশ পালন করতে যেন সর্বদাই সচেষ্ট হয় প্রাণেশ্বর! একমাত্র তুমিই আশ্রয়, একমাত্র তুমিই আমার ধারক ও পালক, তুমিই আমার সাধন ভজন, বিশ্বেশ্বর। ২

জননীর অশ্রুধারায় যে সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, তার তরঙ্গ রোধ করাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

*মূল শ্লোক:

অন্তর্যোগো বহির্ভেদো নাস্তি নৌ গতিরন্যথা।
বিরহানলসন্তপ্তা মা ত্যজ ব্রতমুত্তমম্॥ ২
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
নামকীর্তনযজ্ঞে নো ন ব্যাঘাতঃ কথঞ্চন॥ ৩
পিতৃহীনাঃ সুতাঃ খিন্না জীবন্তি হি কথঞ্চন।
মাতৃহীনাস্তু তে নষ্টাঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি॥ ৪

সন্তানার্থং নবদ্বীপে বাসঃ স্যাত্তে নিরন্তরম্।
মাতৃসেবা তথা কার্যা নাম্বা দুঃখমবাপ্স্যতি॥ ৫
পঙ্কে নিমজ্জিতং রাষ্ট্রং হিংসাদ্বেষ-প্রপূরিতম্।
সদা সংরক্ষিতব্যং তে ন রাষ্ট্রং ধর্মবর্জিতম্॥ ৬
স্বয়ং পঙ্কজিনী ভূত্বা পঙ্কং সর্বং বিদূরয়।
বিষ্ণুপ্রিয়ে জগদ্ধিতে পূর্ণাং শক্তিং প্রদেহি মে॥ ৭

+ হে নদীয়েশ
বিশ্বং তব পরমো বিকাশঃ।
অনলেঽনিলে জলে সুচিরনভোনীলে
স্ফুরতি তে সুমোহনহাসঃ॥ ১

প্রিয়াদেশবাণী- পালনপ্রয়াসিনী
প্রিয়া তব ভবতু প্রাণেশ।
ত্বমেব মম শরণং ত্বমেব মম ভরণং
ত্বমসি সাধনং বিশ্বেশ॥ ২

একইভাবে তোমারই ভক্তদলের হাহাকার ধ্বনিতে যে আলোড়ন বিলোড়নের উদ্ভব হবে, তাও আমি প্রশমিত করবো। ৩

আমার জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলস্বরূপ তোমারই যে শ্রীচরণ আমি লাভ করেছি, সেই শ্রীচরণতলেই যেন আমি সর্বদা নত হয়ে তোমার সেবা করতে পারি।

তোমার মঙ্গলহস্ত সর্বদাই আমার দিকে প্রসারিত করে রাখ, তোমার পূত রূপ সর্বদাই আমার সম্মুখে প্রকাশিত কর, আমি যেন সর্বদাই তোমার প্রিয় কার্য সাধন করতে পারি॥ ৪

[ধ্যানমগ্না বিষ্ণুপ্রিয়ার মৌন অবলম্বন]

মহাপ্রভু—বিষ্ণুপ্রিয়া যাই বলুক না কেন, সে ত শেষ পর্যন্ত নারীই। হায়! সে আমার চিরতরে গৃহ-পরিত্যাগ সময়ে নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে সমর্থ হবে না। সে জন্য আমি কালরাত্রির প্রভাবে একে সুপ্তিমগ্ন করবো। (ক্ষণকাল এদিক ওদিক নিরীক্ষণ ক'রে) আহা!—আমার প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গাঢ় নিদ্রায় এখন নিমগ্না। সমগ্র মহীমণ্ডলে বিষ্ণুপ্রিয়ার তুলনা নেই। কত দুঃখ সে ভোগ করেছে, কিন্তু কোনদিনই আমাকে কোনও দুঃখের কথা নিবেদন করেনি। নিজে শ্রেষ্ঠ রাজপণ্ডিত-দুহিতা এবং পরম সুখে লালিতা পালিতা হয়েও আমার গৃহে সে নীরবে দারিদ্র্য-দাবানলে দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু কোনও দুঃখকেই সে দুঃখ বলে মনে করে না। সর্বদা সর্বপ্রকারে কেবল মৈত্রীভাবনা এবং পরের হিতসাধনেই ব্যস্ত। সে দিনরাত অকাতরে পরকে শিক্ষাদান করছে, ফলে আমার গৃহ আজ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-নিকেতনে পরিণত। জন্ম থেকেই সে সর্বজ্ঞা—সকল শক্তির আধার-স্বরূপা, অথচ সব সময়ে সে আমারই কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করে—নিজের শক্তি উপেক্ষা ক'রে আমারই কাছে শক্তি প্রার্থনা করে। ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'রে ক'রে প্রার্থনা-ক্রমে নিরন্তর সে এই ভাবে আমাকে দেয় শক্তি। ফলতঃ একমাত্র সেই তো আমার হৃদয়ের শক্তি, প্রাণের স্ফূর্তি, চিত্তের শান্তি। তা হলেও কালধর্ম অনুসারে তাকে পরিত্যাগ ক'রে আজ আমাকে সাধনমার্গে অগ্রসর হতে হবে। শ্রীভগবান্ তার মনে বল দিন, সে আমার ধর্ম রক্ষণে সমর্থ হোক,—আমারই বিষ্ণুপ্রিয়া হোক্ সমগ্র বিশ্বের পরম হিতের কারণ, সমস্ত দুঃখদাবানলের নির্বাপণের হেতু। মমতাময়ি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমায় গমনের জন্য অনুমতি দাও॥　　(মহাপ্রভুর প্রস্থান)

[স্বপ্নদৃশ্য]

বিষ্ণুপ্রিয়া (স্বপ্নে বলছেন)—হে হৃদয়সর্বস্ব। কখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না। আমি সব কিছুই সহ্য করতে পারি—কেবল তোমার বিরহ ব্যতীত। তোমার শ্রীচরণতলেই আমি নিরন্তর লীন হয়ে থাকবো, তোমার, তোমার জননীর বা অন্য কারো দুঃখের কারণ আমি হবো না। সমগ্র বিশ্ববাসীর দুঃখ-বিমোচনই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহলে তা সিদ্ধ করার জন্য আমিও সর্বদাই যত্ন করবো। ফলতঃ তোমার অভিপ্রায় যতদিন পর্যন্ত না সিদ্ধ হয়, ততদিন পর্যন্ত আমার কোন সুখ থাকবে না; কেবল আমাকে বিরহে জর্জরিত করো না।　　[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

জননী-ক্রন্দনাসার-　সংজাত-পারাবার-
　স্রোতোধারা-বারণ-ব্রতিনী।
শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তদল-　হাহাকার-কলরোল-
　বিলোড়ন-প্রশমন-বিধায়িনী॥ ৩

নাথপাদপদ্মতলে　জন্মান্তর-তপঃফলে
　সেবানতা সুধর্মপালিনী।
হস্তং তব প্রসারয়　রূপং স্বকং প্রকাশয়
　নূনমস্মি প্রিয়সংসাধিনী॥ ৪

ফুট্‌বে আলোর দ্যুতি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

থাক্ না আঁধার নিবিড়তর,
ফুট্‌বে আলোর দ্যুতি
তোমার প্রেমকে ক'রবে নিকট
ব্যথার অনুভূতি।
জাগবে প্রাণে দুঃখ যত,
সহজ হবে কৃপা তত,
আমার মাঝে তোমার আসার
হবে গো প্রস্তুতি।
আঁধার যতই উঠবে ভ'রে
ফুট্‌বে আলোর দ্যুতি।

কাঁটার মৃণাল 'পরেই ফোটে
অফুট কমল-কলি,
পাষাণ-কারা হ'তেই জাগে
তটিনী উচ্ছলি'।
রাতের 'পরে প্রভাত আসে,
নবীন রবি মধুর হাসে,
শীতের 'পরে বসন্ত-বায়
জাগায় বনস্থলী!
এম্‌নি ক'রেই ফুট্‌বে আমার
জীবন-কমল-কলি।

আমার ব্যথার ধূপের শিখায়
জাগবে মধুর বাস,
তপ্ত বুকে হবে প্রিয়,
তোমার সুপ্রকাশ'
আমার অঝোর অশ্রু-লোরে
তোমার হাসি উঠবে ভ'রে,
বাঁধবে মোরে প্রেমের ডোরে,
পূর্ণ ক'রি আশ!
এমনি ক'রেই সহজ হবে
তোমার সুপ্রকাশ।

আমার গভীর দুঃখ-ব্যথা
ব্যর্থ কিছুই নয়,
আমার প্রাণে আন্‌বে ওরা
তোমার অভ্যুদয়।
নাহি গো ভয়, হবে গো জয়,
আসবে তুমি হে কৃপাময়,
সফল হবে সকল আঘাত,
সকল ক্ষতি-ক্ষয়।
আমার প্রাণে জাগবে তোমার
উদার অভ্যুদয়।

সরলতা ও বিশ্বাস

সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট ক'রে বিশ্বাস হয় না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার এই সব।

সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

সমালোচনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন (প্রথম খণ্ড)—ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বিরচিত। প্রাচ্যবাণী-গবেষণা গ্রন্থমালার একাদশ পুষ্পরূপে প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৭১+ভূমিকা ২০৮+১॥৵০ , মূল্য ষোল টাকা।

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সুবিদিত। তাঁহার সুবৃহৎ ভূমিকা, টীকা প্রভৃতি সংবলিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' বঙ্গদেশের অমূল্য ও অনুপম সম্পদ্। তাঁহার 'গৌর-তত্ত্ব' ও 'গৌর-কৃপার বৈশিষ্ট্য' আপন গৌরবে মহীয়ান্। কিন্তু "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন" গ্রন্থ তাঁহার ভূতপূর্ব সমস্ত কীর্তি-গ্রন্থকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া চরম উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁহার পরিকল্পিত সমস্ত গ্রন্থের একটি ভাগ মাত্র। এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয়—গৌড়ীয় মতে ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভেও সুপণ্ডিত গ্রন্থকার বিস্তৃত ভূমিকায় ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' অংশটি (পৃঃ ১৩৯—২০৮) অত্যন্ত মূল্যবান। গৌড়ীয় মতে মোক্ষ-তত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, রস-তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বৈশিষ্ট্য, প্রভৃতি অধ্যায় রূপে-রসে অনুপম।

মূল অংশে বিশ অধ্যায়, ব্রহ্মের শক্তি, পর-ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, পরব্রহ্মের আকার সম্বন্ধে আলোচনা, শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব প্রভৃতি অধ্যায়ে বহু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ প্রদান করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে শ্রীগৌর-ভগবানের বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে।

দার্শনিক মতবাদের প্রপঞ্চনে মতানৈক্যের অবসর থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ আলোড়ন পূর্বক ডক্টর নাথ মহাশয় যে অমৃত উত্তোলন করিয়াছেন, তাহাতে স্বর্গের দেবতারাও যে তাঁহার প্রতি সাতিশয় লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের মুদ্রণ, প্রচ্ছদ-সজ্জা প্রভৃতির জন্য অকাতর ব্যয় করা সত্ত্বেও যে অল্প মূল্যে এই গ্রন্থ প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

India's Message of Peace (ভারতের শান্তি-বাণী)—By A N Purohit. Second Edition To be had of the Author, Gurupara, P. O. Sambalpur, Orissa, India Pp 300 , Price Rs 5

পুস্তকখানি পাঁচটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে এমহাম্ (Mr. Emeham) নামীয় জনৈক মার্কিন যুবকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিক্ত ও বিষাদময় অভিজ্ঞতা-অর্জন, রোমের সেণ্ট পিটার গির্জার সম্মুখে গ্রন্থকারের সহিত পরিচয় এবং পরে জীবনে শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার (মিঃ পুরোহিতের) উড়িষ্যায় সম্বলপুরস্থ আশ্রমে যোগদানের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী চারিটি অধ্যায়ে এমহাম, এড্‌মণ্ড, লেণ্টম্, সান্‌টাং, মানো, আকবর, মোদ, মাধব, জয় প্রভৃতি কতিপয় বিদেশী ও দেশী অনুরাগী আশ্রমবাসীর নিকট প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মানুষের স্বরূপ জীবনের উদ্দেশ্য ও তল্লাভের উপায়, কঠিন জীবন-সমস্যাগুলির সমাধান, সদাচারের মধ্য দিয়া জীবনগঠন, যুদ্ধের ধ্বংসকারিতা, নীতিহীনতা ও অশেষ দুর্গতি, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে প্রকৃত শান্তিলাভের উপায় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

প্রকৃত শান্তি নিজের ভিতরে খুঁজিতে হইবে

—আত্মজ্ঞানেই পরম শান্তি ও আনন্দ। রাজনৈতিক শান্তিবাদীদের মন ও মুখ এক নহে—মুখে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী আওড়াইলেও ভিতরে হিংসা, ঘৃণা, লোভ ও সন্দেহের আগুন পোষণ করায় তাঁহাদের ঘোষণা ও প্রচেষ্টাগুলি বিশ্বশান্তিস্থাপনে কোন সহায়তা করিতেছে না। শান্তিই ভারতের শাশ্বত বাণী। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য জীবের দেবত্বে বিশ্বাস ও ইহার উপলব্ধিই সমস্ত ভবরোগের মহৌষধ। এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, সক্রেটিস, গান্ধী প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অজ্ঞতাবশতই হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতই হউক, গ্রন্থকার ভারতের শান্তি-বাণী প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করেন নাই। মনে হয় ইহাতে পুস্তকখানির মর্যাদা ক্ষুন্ন হইয়াছে।

—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

সরল হিন্দুধর্ম-বিজ্ঞান (প্রথম—চতুর্থ ভাগ)—শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন শর্মারায় প্রণীত, প্রকাশক: শ্রীশৈবেন্দ্রমোহন শর্মারায়, ব্রহ্মপুর, পো: গড়িয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ২৭০, মূল্য তিন টাকা, একত্র ১-২ ভাগ ১৷০, ৩-৪ ভাগ ১৸০।

স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এবং ছাত্র ও যুবকগণের মধ্যে ধর্মের সাধারণ জ্ঞানবিষয়ে অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া লেখক অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চারিখণ্ডে সরল ভাষায় হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব গ্রথিত করিয়াছেন।

প্রথম ভাগে (৬৬ পৃষ্ঠা) হিন্দুজাতি, জীব জগৎ, ঈশ্বর, মায়া, মৃত্যু, প্রভৃতি তত্ত্ব প্রাথমিক ভাবে আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় ভাগে (৬০ পৃ:) ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, জড় ও চৈতন্য—জন্মান্তরবাদ, আত্মা, দৈব ও পুরুষকার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুরূহ তত্ত্বের সহিত লেখক পরিচয় করাইয়াছেন। তৃতীয় ভাগে (৬৩ পৃ:) হিন্দুসমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, শাস্ত্র, ষড়্‌দর্শন ও যুগধর্ম-প্রবর্তক আচার্যগণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। চতুর্থ ভাগে (৮০ পৃ:) কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন হিন্দুধর্ম মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ তো বটেই, শিক্ষকগণ এবং সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠকগণও জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ এই পুস্তকখানি পড়িয়া নিজ নিজ জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিবেন।

অনেকগুলি ছাপার ভুল চোখে পড়িল। ছোটখাট সিদ্ধান্তের ত্রুটি যে নাই তাহা নহে, সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সংশোধনীয়। মোটের উপর হিন্দুধর্মের সাধারণ প্রাথমিক জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ একখানি পুস্তক অতিরিক্ত পাঠ্যরূপে বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হইলে ছাত্রগণ উপকৃত হইবে, সমাজও উন্নত হইবে।

মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

Eight Upanishads (Volume One)-with Commentary of Śankrācārya—translated by Swami Gambhirananda, published by Advaita Ashrama (Mayavati, Almora U P) Calcutta office : 4, Wellington Lane, Calcutta 13 Pp 415, Price Rupees Six

স্বামী গম্ভীরানন্দজী কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত শাংকর-ভাষ্য-সমেত ঈশ, কেন, কঠ ও তৈত্তিরীয় এই চারিটি উপনিষদ: প্রথমে উপনিষদের মূল শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে, তারপর বড় অক্ষরে ইংরেজী মূলানুগ আক্ষরিক অনুবাদ, শেষে ছোট অক্ষরে—শংকরাচার্যের ভাষ্যানুবাদ। সংস্কৃতভাষায় যাঁহাদের আশানুরূপ দখল নাই, ইংরেজীর মাধ্যমে আচার্য শংকরের মহোচ্চ দার্শনিক ভাবরাশির সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চান এ পুস্তক তাঁহাদের সহায়ক হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ২৮ পৌষ (১২ই জানুআরি) রবিবার শুভ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৬তম আবির্ভাব-উৎসব সারাদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, সমবেত ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, হোম, ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে আট সহস্র ভক্ত বসিয়া প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পার্শ্বস্থ গঙ্গা-তীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বাংলায় এবং স্বামী বিমলানন্দ ইংরেজীতে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর মানবপ্রীতির দিকটি পরিস্ফুট করেন।

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বরঃ গত ২৮শে পৌষ শ্রীসারদামঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, উপনিষদ্ ও চণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত মহিলা-সভায় সভানেত্রী ছিলেন জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৃন্ময়ী রায়। অধ্যক্ষা রেণুকা বাগ্‌চী, অধ্যাপিকা সুশীলা মণ্ডল এবং মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

ফরিদপুরঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষে প্রাতে ভজন ও কীর্তন, বিশেষ পূজা হোম ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ফরিদপুরের জেলা-জজ জনাব এম, এ, মওদুদ সাহেবের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক আবৃত্তি, সঙ্গীত ও স্তোত্র-পাঠের পর রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র ও শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক অতি মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচনা করেন। সর্বশেষে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর জীবনদর্শন অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃগণের তৃপ্তি বিধান করেন। তৎপর উপস্থিত সর্বশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বরঃ গত ২১শে জানুআরি ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূজা হোম বেদ ও চণ্ডীপাঠ জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহা-রাজের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। উড়িষ্যার উন্নয়ন-মন্ত্রী মাননীয় শ্রীরাধানাথ রথের সভা-পতিত্বে মঠপ্রাঙ্গণে বৈকালের জনসভায় সুপ্রীম কোর্টের উকিল শ্রী বি কে. পাল, কটক মেডি-কেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ কে এন মিত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন, সংগঠন-ক্ষমতা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিবিধ কার্যাবলীর আলোচনা করেন।

সভাপতি মাননীয় শ্রীরথ তাঁহার সুললিত ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের ঠিক পূর্বে ভারতের রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্মনীতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও

তাঁহার শিষ্যগণ যেন একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত জাতির শরীরে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন; ভারতীয় সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভারতের রাজনীতিক মুক্তিলাভেও ইহার পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। মানবজাতির কল্যাণে, এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণের পিছনে দিব্যশক্তি প্রচণ্ড ভাবে ক্রিয়াশীল। বিজ্ঞানের বিবিধ আবিষ্কারের পর মানুষ আজ ধ্বংসের ভয়ে ভীত। মানুষের ভিতর দিয়া ভগবৎ-সেবার ভাবই নিশ্চয় আজ জগৎকে রক্ষা করিবে। এতদুদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত 'রামকৃষ্ণ-আন্দোলন'কে লালন পালন করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়াছেন। এই আন্দোলন ধীরে এবং নীরবে মানবজাতির ভাগ্য নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে—ইহার যথার্থ মর্ম বুঝিতে বৎসরের পর বৎসর—হয় তো শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া যাইবে। উড়িষ্যাবাসীদের সৌভাগ্য যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই ভুবনেশ্বরে রামকৃষ্ণ-সংঘের ভাবী সন্ন্যাসিগণের শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মিশনের জনহিতকর কর্মধারা এদেশেও প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

সেবাকার্য

মাদ্রাজ : (১) বন্যা-রিলিফ

নেলোর জেলার বন্যায় মিশন-পরিচালিত রিলিফের কার্য শেষ হইয়াছে। ১৮ই নভেম্বর হইতে ১লা জানুআরি পর্যন্ত ৪৫খানি গ্রামে ২৭০৭ পরিবারকে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য বিতরণ করা হইয়াছে :

৩৫৪৫ ধুতি, ৩৬৭১ শাড়ী, ২৪১০ ছোটদের জামা, ১০৪১ বড়দের জামা, ১৫৫০ কম্বল, ৭৪৪১ পুরাতন কাপড়, ১৩৩২ গজ জামার কাপড়, ২৫৯৬ মাদুর, ৯১১৫ বাসনপত্র, ৬৬৬৫ মণ চাল—একটি নলকূপ, এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের শ্লেট পেন্সিল জামা ও জ্যাকেট।

বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই মিশন সাহায্য পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছে। মোটের উপর নগদে ৪৩,০০০৲ ও জিনিসপত্রে ৩০০০৲—সবই খরচ হইয়া যাওয়ায় সেবাকার্য বন্ধ করা হইল।

(২) দাঙ্গা-রিলিফ

গত সেপ্টেম্বরে রামনাথপুরম্ জেলায় যে শোচনীয় দাঙ্গা হয় তাহাতে স্থানীয় জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করে। মিশনের সেবা-কার্য শুরু হয় ৪. ১০ ৫৭ তারিখে এবং সমাপ্ত হয় ২৮ ১২ ৫৭ তারিখে। এই কার্যে ৮৫,০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত সেবা-বিবরণী প্রদত্ত হইল :

তালুক	গ্রামসংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	ভস্মীভূত গৃহ পুনর্নির্মাণ
পরমকুড়ি	২	১০৮	১০৫
মুদুকুলাথুর	৭	২৯৮	২৫৭
অরুপ্প্ কোট্টাই	৪০	৯৫১	৩৯৫
শিবগঙ্গা	৭৫	১,৮৯৫	৪৬৬
মোট	১২৪	৩,২৫২	১,২২৩

এতদ্ব্যতীত ধুতি শাড়ি ও ছেলেমেয়েদের পোষাক যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ করা হয়, মাদুর, বাসনপত্র, বাড়ী তৈরীর জন্য খুচরা সরঞ্জাম এবং বাসোপযোগী অন্যান্য জিনিসপত্রও প্রয়োজনানুযায়ী প্রদান করা হয়।

ভিত্তিস্থাপন

সারদাপীঠ, বেলুড় : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ১২ই জানুআরি সকাল ৯ ঘটিকায় সারদাপীঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনি ও পূত বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির (B T College) ও জনশিক্ষা-মন্দিরের গ্রন্থাগার ও সভাগৃহের (Library-cum-Assembly Hall) ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

অতঃপর একটি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে পূজ্যপাদ মহারাজজীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় সারদা-পীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দজী বলেন : স্বামীজী বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয়

ভিত্তিতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই ভিত্তি-স্থাপন স্বামীজীর সেই মহতী পরিকল্পনার আংশিক বাস্তব রূপায়ণ। স্বামীজী-পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলার প্রাথমিক কাজে সারদাপীঠকে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তিনি সরকার ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডাঃ কালিদাস নাগ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিশনের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীশৈলকুমার মুখার্জী আবেগপূর্ণ ভাষায় সরকার ও জনগণকে মিশনের শিক্ষাবিস্তার কার্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানান।

পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন: স্বামীজী মানুষ-গড়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। প্রকৃত মানুষের অভাবই তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন 'Man-making education'—মানুষ গড়া ও সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করার মধ্যেই শিক্ষার পরিপূর্ণতা—ইহাই ছিল স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ। রামকৃষ্ণ মিশন এই আদর্শের পথেই মিশনের শিক্ষায়তনগুলিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করিতেছে। আজ যে শিক্ষণ-মন্দির ও গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপন করা হইল উহাও এই আদর্শসিদ্ধির পথে নূতন প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা তথা মিশনের সমুদয় শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার জন্য তিনি স্বামীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।

বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাগৃহটি নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' বহন করিবেন বলিয়া সভায় ঘোষণা করা হয়।

বহুমুখী বিদ্যালয় উদ্বোধন

আসানসোল (বর্ধমান): 'শিক্ষা শুধু অর্থোপার্জনের জন্য নয়, বিদ্যালয়গুলিকে অর্থোপার্জনের যন্ত্র মনে করা ভুল। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে যথার্থ মানুষরূপে গড়িয়া তুলে'—সিস্টার নিবেদিতার এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া গত ২৫শে জানুআরি, শ্রীপঞ্চমীদিবসে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একটি বৃহৎ মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনে বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। ডাক্তার রায় আরও বলেন, মানুষ শুধু মাত্র নিজ পরিবারের জন্যই নয়—পরিবার সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার ভার লইতে হইবে—এই লক্ষ্যেই মানুষকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সর্বার্থসাধক এই বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনে সরকারী উদ্যোগের কারণ নির্ণয় করিয়া তিনি বলেন, বৎসরের পর বৎসর বহু ছাত্র স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বিফল হয়, অর্থ ও পরিশ্রমের ইহা এক বিরাট অপচয়, এই সকল বিদ্যালয়ে রুচি,প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছাত্রেরা যে কোনও বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে। বি এ বা এম্. এ পাশ করাকেই একটা কৃতিত্ব মনে করিলে চলিবে না, একজন ভাল মিস্ত্রি নিকৃষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং বেশী প্রয়োজনীয়। স্কুলের শিক্ষায় ও পরীক্ষায় ব্যর্থ ছেলেটি হয়তো কোনও একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সাফল্য অর্জন করিবে।

শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি, বর্ধমানের কমিশনার ও স্থানীয় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এই উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নিবেদিতা বিদ্যালয় (কলিকাতা): গত ২৭শে জানুআরি সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় উত্তর কলিকাতার নিবেদিতা লেনে রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের চারতলা-বিশিষ্ট নবনির্মিত ভবনে বহুমুখী বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বলেন:

যে সব মেয়েরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাচ্ছে তাদের সব সময় মনে রাখতে হবে দেশ ও জাতিকে গড়ে তোলার ভার তাদের ওপর। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-বিজড়িত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে পরের কল্যাণে তাদের জীবন নিবেদন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা জানান, স্বামীজীর প্রচারিত ভারতীয় নারীর আদর্শে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ৬০ বৎসর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা মূল বিদ্যালয়টির পত্তন করেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ প্রায় ১৯জন শিক্ষিকা বিনা পারিশ্রমিকে ৬৭২টি ছাত্রীকে শিক্ষা দিতেছেন, প্রায় ৩৪৫ জন ছাত্রী অবৈতনিক। যাহারা বেতন দেয় তাহাদেরও বেতনের হার অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা কম।

আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার

নিউ ইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার প্রতি মঙ্গলবারে নিয়মিতভাবে স্বামী ঋতজানন্দ ভগবদ্‌গীতা ও স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন। রবিবারের বক্তৃতার বিষয় এইরূপ ছিল :—

নভেম্বর : মন কেন এত চঞ্চল? কর্মের পথে মুক্তি। নিম্ন থেকে উচ্চতর সত্তায়।

ডিসেম্বর : আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুতি, মানব-মনের রহস্য, শ্রীশ্রীমা কিভাবে শিক্ষা দিতেন? শ্রীভগবানের অবতরণ, খৃষ্টের শৈলোপদেশ জীবনে কাজে লাগাইয়া দেখি না কেন? ধ্যানানুভূতির বৈচিত্র্য।

স্যান ফ্রান্সিস্কো : বেদান্ত সোসাইটি প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় সোসাইটির নিজস্ব বক্তৃতাগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ধর্ম, বেদান্ত ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।

নভেম্বর : ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ, যুক্তিবাদ ও মরমিয়াবাদ, আমাদের বর্তমানে নিহিত অতীত, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : ডুব দাও, উপাসনা কিভাবে করিব? উপাসনা কি? জড়, মন ও চৈতন্য, প্রাত্যহিক জীবনকে অধ্যাত্মভাবান্বিত করা, যীশু বলেছিলেন : আমাকে অনুসরণ কর।

ডিসেম্বর : একটি মহাপুরুষ—যাঁহাকে দেখিয়াছি, আমরা কি ভগবানের প্রতি বিশ্বস্ত? শোন, শুভসংবাদ আনিয়াছি। ইহবিমুখতা কি? আমি শরীর নই, আমি মন নই। যখন ভগবান্ মানুষের মধ্যে বাস করেন, সাধু, প্রেরিত পুরুষ ও অবতার, স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। (খৃষ্টম্যাস উপলক্ষ্যে)।

নভেম্বর মাসে প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'মুণ্ডক উপনিষদ' আলোচনা করেন। ডিসেম্বরে স্বামী অশোকানন্দ ঐ সময়ে সবিস্তারে বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব হইতে সময় স্থির করিয়া, বেদান্ততত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ নিজ আধ্যাত্মিক সমস্যা আলোচনা করিতে পারেন।

রবিবার বেলা ১১টায় শিশুদের ক্লাসে বেদান্তের উদার ভাব শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে এবং বড় বড় ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহের বিস্তারিত উৎসব-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত—

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব : শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রন্থাগার, কাটজু-নগর—যাদবপুর।

স্বামীজীর উৎসব : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, তেজপুর (আসাম), শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, রাণাঘাট (নদীয়া) ,শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রন্থাগার, কাটজুনগর।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ উৎসব : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ-জীর পঞ্চনবতিতম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে তদীয় জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার শীকড়া কুলীনগ্রামে (২১শে ও ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারি) তিনদিন-ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ-কয়দিনের নানা প্রকার অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ২১শে জানুয়ারি তিথিপূজা-দিবসে বেলা ১ ঘটিকা হইতে "রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বালক আশ্রমের" পরিচালনায় "রাম-নামকীর্তন" ও বেলা ২।৩০ মিঃ হইতে স্বামী পুণ্যানন্দজী কর্তৃক "কথকতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনী" আলোচিত হয়। ২২শে জানুয়ারি, বুধবার সন্ধ্যায় সারদাপীঠ (জনশিক্ষা মন্দির) কর্তৃক উক্ত জীবনী ছায়াচিত্র সহযোগে আলোচিত হয়। ২৩শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, উষাকাল হইতে মঙ্গলারতি, পূজা, তীর্থ-পরিক্রমা ও জনসভা পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতি-সংবাদ

আইসল্যাণ্ডে ভারতীয় ভাবধারা

আইসল্যাণ্ডের নোবেল-লরিয়েট প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ ল্যাক্সনেস (Mr Halldor K. Laxness) সম্প্রতি ভারত সফরে আসিয়া গত ৯ই জানুআরি বোম্বাই-এ PEN প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃতি-সমিতির আয়োজিত একটি সভায় বলেন :

আইসল্যাণ্ডে প্রত্যেকে পড়িতে ও লিখিতে জানে। নিরক্ষরতা সেখানে বহু যুগ পূর্ব হইতেই দূরীভূত। সে দেশের অধিবাসীর সর্বাপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষা লেখক হওয়া।

ভারতীয় লেখকদের মধ্যে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী সেখানে সর্বাধিক সমাদৃত। শেষোক্ত লেখকের যোগবিষয়ক গ্রন্থগুলি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। [P.T.I]

বিজ্ঞান-সংবাদ

অভিনব ফিল্ম প্রোজেক্টর

সম্প্রতি লণ্ডনে একটি নূতন ধরনের ফিল্ম প্রোজেক্টর দেখানো হইয়াছে—যাহার সাহায্যে ফিল্ম কমেণ্টারিগুলিকে অতিশয় দ্রুত ও সুলভে যে কোন ভাষায় ভাষান্তরিত করা যায়। ভারতের মত বহুভাষী দেশে এই ধরনের প্রোজেক্টর খুবই কাজে লাগিবে।

বর্তমানে যে পদ্ধতির সাহায্যে ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম হইতে কমেণ্টারি বাদ দেওয়া হয় তাহাতে আবহ শব্দাদিও সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়া যায়। নূতন প্রোজেক্টরটির সাহায্যে আবহ-শব্দাদি বজায় রাখিয়াই কমেণ্টারি বাদ দিয়া যতবার ইচ্ছা অন্যান্য ভাষায় তাহা রেকর্ড করা যায়।

[British Information Service]

ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় জ্ঞানসংগ্রহ

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বর্ষ (International Geophysical Year) শুরু হইয়াছে ১লা জুলাই ১৯৫৭, এবং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ পর্যন্ত চলিবে। ৬৪টি জাতির বৈজ্ঞানিকগণ স্থল জল ও বায়ু-মণ্ডলের নূতন জ্ঞানসংগ্রহে সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণায় মগ্ন, গত ছয় মাসের পরীক্ষালব্ধ কতকগুলি সিদ্ধান্ত এখনই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

বায়ুমণ্ডল মহাশূন্যে কয়েক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত—হয়তো খুবই পাতলা আকারে (rarefied form), পূর্বে মনে করা হইত এই বিস্তৃতি কয়েক শত মাইল।

বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে সূর্যরশ্মির প্রচণ্ড প্রভাব। পৃথিবী ৫০ হইতে ৪০০ মাইল পর্যন্ত আয়নমণ্ডলের (ionosphere) স্তরবিন্যাসের কারণ সূর্যের বিকীরণ এই মণ্ডলেরই কোন কোন স্তর আকাশবাণীতে ব্যবহৃত বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে।

সৌরকলঙ্ক এবং সূর্যের স্ফুলিঙ্গ বেতার-তরঙ্গ ব্যাহত করে, এবং জাহাজের কম্পাসকেও প্রভাবিত করে, হয়তো ঝড় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের

সহিতও ইহাদের সম্পর্ক আছে। উপরন্তু ইহারা অস্বাভাবিক মেরুপ্রভা, ভূচুম্বক ও বিশ্বরশ্মি-ক্রিয়ার (Cosmic ray-activity) কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবাহী রকেট সাহায্যে জানিয়াছেন স্ফুলিঙ্গ উৎপাতের উর্ধ্বদেশে সূর্যের বায়ুমণ্ডলের তাপ ১৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১ লক্ষেরও অধিক সেন্টিগ্রেড তাপে সূর্যের গ্যাসগুলি যেন পক্ব হইয়া (cooked) নূতন পদার্থে পরিণত হয় এবং রঞ্জনরশ্মি (X-ray) বিকীরণ করে যেগুলি আসিয়া পৃথিবীর আয়নমণ্ডলে নূতন ক্রিয়া শুরু করে।

একই সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রভার পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন উভয় মেরুপ্রভা একই সঙ্গে সংঘটিত হয়, এ বিষয়ে পূর্বে নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন, সূর্যস্ফুলিঙ্গ-তাড়িত বিদ্যুৎকণা যখন পৃথিবীর উর্ধ্বমণ্ডলে আঘাত করে তখনই মেরুপ্রভা দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গত নভেম্বরে—মেরুপ্রভায় একটি নয়, দুইটি রামধনুর মত বৃত্তাংশ দেখিয়াছেন।

যন্ত্রবাহী বেলুন সাহায্যে বিশ্বরশ্মি-বিকীরণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য,—ঐ রশ্মি পৃথিবীর অতি নিকটে আসে। এক জায়গায় সূর্যস্ফুলিঙ্গ-উৎক্ষিপ্ত কণা ২০ মাইল উপরেই ধরা গিয়াছে। পূর্বে ভাবা হইত ৫০ মাইল উর্ধ্বে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়।

নৈশ আকাশে এক প্রকার ক্ষীণ জ্যোতি আছে তাহাকে বায়ুজ্যোতি (air-glow) বলা হয়, পূর্বে মনে করা হইত ইহা শান্ত স্থির জ্যোতি; এখন দেখা যাইতেছে ইহা খুবই জটিল, এবং এক রাত্রির মধ্যেই ইহার যথেষ্ট তারতম্য হয়। ইহার কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধিৎসা প্রবল।

মেরুপ্রদেশ লইয়া গবেষণা ব্যাপকভাবে চলিয়াছে। উচ্চ স্তরে প্রেরিত রকেট সাহায্যে জানা গিয়াছে উর্ধ্বদেশে শীতের ঝড়ের বেগ ৩৩৫ মাইল পর্যন্ত উঠিয়াছে।

উভয় মেরু প্রচণ্ড বৈদ্যুত শক্তি দ্বারা আবৃত, দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ৪০টি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র হইতে লব্ধ বিবরণ সহায়ে তত্রত্য বায়ুমণ্ডলের সাংবৎসরিক তাপ ও চাপের মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং আব-হাওয়ার পূর্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে। আবহবিজ্ঞানীরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিভাবে ঝড় উৎপন্ন হয়। শীতকালে মেরুতে সূর্য অদৃশ্য থাকিলেও উর্ধ্বদেশে বিদ্যুৎ-শক্তি কিছুমাত্র কমে না।

* * *

ইতিমধ্যেই এই ভূতাত্ত্বিক বর্ষে বিজ্ঞানের দুইটি বড় রকমের জয় বিঘোষিত হইয়াছে, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ এবং দক্ষিণ মেরু বিজয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৮ই ফাল্গুন (২০.২.৫৮) বৃহস্পতিবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৩তম শুভ জন্মতিথি-পূজা এবং পরবর্তী রবিবার ১১ই ফাল্গুন (২৩.২.৫৮) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব (সাধারণ উৎসব) অনুষ্ঠিত হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান

বৈদিক, বৌদ্ধ ও মুসলিম যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম অপরিহার্য ছিল। তখন ধারণা ছিল শুধু মাত্র বুদ্ধিশক্তির অনুশীলন নয়—ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে ধর্ম ও নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আচরণও প্রয়োজন, একটা সচেতন উদ্দেশ্য না থাকিলে সুনিয়ন্ত্রিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ সম্ভব নয়। সার্থক জীবনে বিচারপ্রবণতার সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্য থাকে, উহারই সাহায্যে মানুষ জীবনের ঝড়ঝাপটা সহ্য করিতে পারে। জীবনের এ-দিকটা অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া শিক্ষার অঙ্গরূপেই গৃহীত হইতে পারে, কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে বিকশিত করিয়া তোলা।

বিদেশী শাসক হিসাবে ব্রিটিশেরা ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, খৃষ্টান মিশনারিগণ ইহা পছন্দ করেন নাই। বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি কেন্দ্র করিয়া খৃষ্টধর্মের প্রসারই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৩খৃঃ ডাফ সাহেব পার্লামেণ্টে জানান, ভারতে নিরর্থক সাহিত্য-দর্শনের পরিবর্তে যথার্থ সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চায় আমরা আনন্দিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই চর্চার ফলে দেশীয় মিথ্যা ধর্ম বিধ্বস্ত হইলে তাহার স্থানে একমাত্র সত্যধর্ম খৃষ্টানধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা হইল না। ১৮৫৫ খৃঃ স্বীকৃত হইল, সকল ধর্মের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেই মানিয়া লওয়া হইবে—যদি উপযুক্ত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়।

ধর্মব্যাপারে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বলিলেন: ব্রিটিশ শাসনের মূলনীতি নিরপেক্ষতা, ...স্কুল-কলেজে ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা এবং পাঠ্য-সূচীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খৃষ্টানধর্ম শিক্ষা দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। যে সব প্রতিষ্ঠান কোন না কোন ধর্মের সঙ্গে জড়িত তাহাদের সহিত সরকারের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ঐরূপ সকল প্রতিষ্ঠানকে সমান সুযোগ দেওয়া দুষ্কর, হয়ত বা অসম্ভব। তাছাড়া—সরকার বা ধর্মনিরপেক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান সকল ধর্মের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র একটি শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের কার্য সীমাবদ্ধ রাখেন এবং বিভেদকে আরও বাড়াইয়া তুলেন।

১৮৮২খৃঃ শিক্ষা-কমিশন সুপারিশ করেন:

(১) স্বাভাবিক ধর্মের ভিত্তিতে একটি নীতি-পুস্তক রচিত হউক, তাহা সরকারী বেসরকারী সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়ানো চলিবে।

(২) অধ্যক্ষ বা কোন অধ্যাপক প্রত্যেক ক্লাসে প্রতি বৎসর 'মানব ও নাগরিকের কর্তব্য' বিষয়ে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন।

এই কমিশনের সদস্য মিঃ তেলাঙ্গ জানান, ন্যায়সঙ্গতভাবে ধর্মশিক্ষা দিতে গেলে দুই প্রকার পাঠ্য সম্ভব: হয় সকল ধর্মের সাধারণ নীতিগুলি লইয়া স্বাভাবিক ধর্ম, নয়—প্রত্যেক ছাত্রের পিতা মাতার ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিগুলি। পরিশেষে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ধর্মবিষয়ে

জড়াইয়া না পড়িয়া নিরপেক্ষ থাকাই ভাল, অন্যথায় একদিকে উহা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবে না, অপরদিকে নিরপেক্ষতা ব্যাহত হইবে।

১৮৮৪খৃঃ সরকারী সিদ্ধান্তের ভাবার্থঃ পূর্বোক্ত নীতিপুস্তক বহু সমস্যার সৃষ্টি না করিয়া চালু করা সম্ভব কিনা সন্দেহ, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সকল ধর্মের অনুমোদিত একখানি নীতি-পুস্তক প্রণয়নও অসম্ভব।

১৯০২ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই সমস্যা আবার আলোচনা করেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট উপায় নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। শুধুমাত্র পাঠ্যসূচীতে ধর্মতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবকে বাতিল করিয়া দেন।

১৯১৭-১৯ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ প্রশ্ন আলোচনা করেন নাই, কারণ যেদেশে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মই সকল বিভেদ-বিবাদের মূল সে দেশে এ সমস্যা বড়ই জটিল ও কঠিন।

* * *

(১৯৪৪-৪৬খৃঃ) যুদ্ধোত্তর শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ বোর্ডের স্মারকলিপিতে স্বীকৃত হয়, ধর্মের ব্যাপক ভাবটি সকল শিক্ষাকেই উদ্দীপিত করিবে, এবং সর্বপ্রকার ধর্মনীতি-বর্জিত শিক্ষাসূচী পরিণামে বন্ধ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ইহার ফলে লাহোরের বিশপের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়, তাঁহারা সকল দিক বিবেচনা করিয়া মত দেনঃ যদিও তাঁহারা মনে করেন চরিত্র-গঠনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি এ সকল শিক্ষার দায়িত্ব ধর্ম-নিরপেক্ষ বিদ্যালয়ের উপর নয়, অভিভাবকের এবং সম্প্রদায়ের উপর থাকাই উচিত। কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌রা যখন সাহিত্য-বিজ্ঞানের শিক্ষা গৃহ ও সম্প্রদায়ের উপর ছাড়িয়া দিতে রাজী নন—তখন ধর্মবিষয়ক শিক্ষাই বা কিরূপে ছাড়িবেন? জীবনে ধর্মের যথার্থ রূপটি শিক্ষার প্রথম অবস্থাতেই যদি শিক্ষার্থীর চোখে না ধরা যায়—তাহা হইলে শিশু পূর্ণ বিকাশ হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইবে। গৃহ ও সম্প্রদায়ের হাতে এ ভার ন্যস্ত থাকিলে সাম্প্রদায়িকতা পরমত-অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতা বাড়িবারই সম্ভাবনা।

ভারতীয় শাসনপদ্ধতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি নীতি গ্রহণ করিয়াছেঃ

১৯নং বিধানে বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাস, আচার ও প্রচারের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে, জনসাধারণের শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও নীতি উল্লঙ্ঘন না করিয়া সকলেরই এ বিষয়ে সমান অধিকার।

২১নং জনসাধারণের করের টাকা কোন ধর্মের উপকারার্থে ব্যয়িত হইবে না।

২২(১) সম্পূর্ণভাবে সরকারী টাকায় চালিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। যদি কাহারও দানে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দাতার ইচ্ছা থাকে, ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে—সেখানকার কথা আলাদা।

২২(২). সরকার-মনোনীত বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে কাহাকেও সেই শিক্ষালয়-পরিচালিত কোন পূজা-প্রার্থনায় যোগদান করিতে হইবে না—যদি ছাত্রের নিজের এবং নাবালক হইলে তাহার অভিভাবকের এ বিষয়ে সম্মতি না থাকে।

এই বিধান কেন হইয়াছে—তাহার কারণ অতি স্পষ্ট। আমাদের দেশে নানা ধর্মের লোক রহিয়াছে, সরকার কখনও এত বিভিন্ন ধর্মে শিক্ষা দিতে পারেন না, তাছাড়া প্রত্যেক ধর্মই দাবি করে, তাহার ধর্মেই সকল সত্য নিহিত। একটি ধর্ম সত্য, আর অন্যগুলি মিথ্যা এই বিতর্কেই বিদ্যালয়ের শান্তি বিনষ্ট হইবে। দাতা-পরিচালিত বিদ্যালয়ে দাতার ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে।

সংবিধানে এ কথা বলা হয় নাই যে, যাহাদের আপত্তি আছে তাহাদের ছাড়া সকলকেই ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, বলা হইয়াছে—যাহারা চায় তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে না। ছাত্রের, নাবালক হইলে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

আবার প্রশ্ন ওঠে, সরকার-চালিত সংস্কৃত কলেজে গীতা উপনিষদ পড়া চলিবে কিনা, তাহার উত্তর এই যে ধর্মবিষয়ক গবেষণা ও ধর্মমত প্রচার সম্পূর্ণ পৃথক। সরকার-চালিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক দার্শনিক ঐতিহাসিক অধ্যয়ন ও গবেষণা চলিবে, কিন্তু মতপ্রচার চলিবে না। রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সমান সুযোগ দিবে, একটিকে বিশেষ সুবিধা দিবে না বা বিশেষ অসুবিধায় ফেলিবে না—ইহাই গণতন্ত্রের ভাব।

আমেরিকার গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ যে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে উহা 'ধার্মিক' নয় বা 'অধার্মিক'ও নয়, ব্যক্তি-গত বিবেকের সম্মান সেখানে সুরক্ষিত। সেখানে কংগ্রেস কোন ধর্ম-বিশেষের প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন আইন করিবে না—স্বাধীন ধর্মাচরণে কাহাকেও বাধা দিবে না। একজন আমেরিকান নিজের বিশ্বাস-অনুযায়ী ঈশ্বরের পূজা-উপাসনা করিতে পারে—রাষ্ট্র এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করিবে না। ৫ম হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপের অর্ধেক যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের মূলে দেখা যায় ধর্মবিশ্বাস লইয়া বিবাদ—অথবা ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিসম্বাদ। আমেরিকায় এগুলি একেবারে অজানা রাষ্ট্রের চক্ষে সকল ধর্ম সমান, রাষ্ট্রের নিজের কোন ধর্মের ছাপ নাই।

*　　*　　*

ধর্মের যে অপব্যবহার হয় এবং সম্প্রতিও হইয়াছে, তাহার জন্যই আমাদিগকে এত সাবধান হইতে হইতেছে—যদি স্কুলে আমরা ছাত্রদের শান্তি প্রীতি ও উদারনীতির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক মত শেখাই তবে ভবিষ্যতের ভেদবিবাদের বীজই বপন করা হইবে।

এক সময় লোকের ধারণা ছিল—নিজের ধর্মে বিশ্বাস করিতে হইলে অপরের ধর্ম যে ভুল তাহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। যদিও উভয় ধর্মের মত একই হয়, ভাষাও একই হয়—তথাপি একদল বলিবে, আমারধর্ম ভগবানের আদেশে—আর অপরের ধর্ম শয়তানের কারসাজি।

ধর্মের নামে বহু নিষ্ঠুরতা ও ব্যভিচার দেখিয়া আমরা ধর্মের উপর চটিয়া যাই, উহাকেই উন্নতির পরিপন্থী ও বিবাদের কারণ মনে করি। যাহারা ভুক্তভোগী অথবা ঐ সকলের সাক্ষী তাহারা স্বভাবতই ধর্মকে নির্বাসনে পাঠাইতে উদ্যোগী।

ভাবাবেগে ভাসিয়া যাইলে চলিবে না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী ধর্ম নয়, পরন্তু ধর্ম-বিষয়ে অজ্ঞতা, গোঁড়ামি এবং স্বার্থপরতা, যাহা কোন শ্রেণীর স্বার্থের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

ধর্মের এই অপব্যবহারই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কল্পনা আনিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ বলিলেই ধর্ম-শূন্য জড়বাদী রাষ্ট্র হইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বিশেষত ভারতের পক্ষে ঐ ভাব স্বভাব ও স্বধর্মের বিরোধী, যদিও আমাদের রাষ্ট্রানুমোদিত কোন ধর্ম নাই—তথাপি আমাদের জাতীয় ইতিহাস, চরিত্রও চিন্তাধারার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিকতার এক অন্তঃসলিলা স্রোতোধারা চিরদিন বহিয়া চলিয়াছে।

তাছাড়া আমাদের অন্তরের বিশ্বাস ও জাতীয় জীবনধারা একান্তভাবে গণতান্ত্রিক, এবং ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। যখনই কেহ সত্যশিবসুন্দরের সাধনায় নিমগ্ন, জ্ঞানের ও কল্যাণের সাধনায় নিযুক্ত, তখনই দেখি ধর্মের ভাবই সমধিক ক্রিয়াশীল। আমাদের ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করিতে হইলে রাষ্ট্র-

ব্যাপারে অন্তরের স্বাধীনতাপ্রসূত ধর্মনিরপেক্ষতার সহিত সমাজব্যাপারে সর্বধর্মের উপর সশ্রদ্ধ মনোভাবকেই আমাদের জাতীয় ধর্ম করিতে হইবে।

ধর্মের প্রতি ভারতীয় মনোভাব কোন আধুনিক রাষ্ট্রনীতির বিরোধী নহে, বরং অনুযায়ী। ধর্ম কোন মত, সম্প্রদায়, আচার বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিন্ন নয়। ধর্ম শুধু মাত্র বিচার বা বিশ্বাস দ্বারা নির্ণীত হয় না,ধর্ম একটা অনুভূতি — যাহা প্রতিফলিত হয় জীবনে, চরিত্রে, কাজে-কর্মে। ধর্মজীবন এক রূপান্তরিত জীবন—উন্নততর, বিকশিত, অন্তরের সম্পদে সুশোভিত—প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে ইহা এক সাংস্কৃতিক জীবন। ধর্ম এক অতীন্দ্রিয় শক্তি—যাহার ফল প্রত্যক্ষ হয় জীবনের স্তরে স্তরে, কায়মনোবাক্যে।

ধর্ম যখন অন্তরের অনুভূতির জিনিস,তখন শুধু মাত্র বাহিরের আচার বা বিচার দ্বারা উহা লাভ করা যায় না, সেজন্য প্রয়োজন শ্রদ্ধা ও সাধনা। আমাদের প্রয়োজন মৌখিক ধর্মশিক্ষা নয়, প্রয়োজন এই আধ্যাত্মিক সাধনা—যাহা মানুষের মনকে প্রস্ফুটিত করে, মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে—যে মানুষ মুক্ত মহান্, একাধারে সাগরের মত গভীর ও আকাশের মত সীমাহীন।

প্রত্যেককে নিজের খাদ্য পরিপাক করিতে হয়, নিজের পথটুকু নিজে চলিতে হয়, নিজের চোখ দিয়া দেখিতে হয়, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-মন সহায়ে সব অনুভব করিতে হয়—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধিশক্তি সহায়েই আত্মবোধও লাভ করিতে হইবে।

মতুয়ার ধর্মবুদ্ধি বরাবর স্বাধীন চিন্তা করিতে মানা করিতেছে, এবং জিজ্ঞাসার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, আর প্রবুদ্ধ মন বারংবার বলিয়াছে,অন্ধভাবে কোন মত বা ব্যক্তিকে অনুসরণ করিও না, তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনও হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত অন্ধের মত অনুসরণ করিবার লোক থাকিবে ততদিন তাহাদের গর্তে ফেলিবার লোকেরও অভাব হইবে না। স্বাধীন চিন্তা, বিচার ও জিজ্ঞাসা—ইহাই সত্য লাভের সোজা পথ। দেশকালের রঙ্গমঞ্চে মানুষকে কি অভিনয় করিতে হইবে? কোথায় তাহার আদি? কোথায় তাহার অন্ত? ধর্মই মানুষের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার জীবনের পরিপূর্ণতা আনিতে,জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইতে সক্ষম। জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজন না মিটিলে জীবনই যে নিরর্থক। সংশয়-দোলায় চঞ্চল মনকে, সন্দেহদাহে দগ্ধ জীবনকে শান্ত শীতল করিতে না পারিলে কিসের শিক্ষা?—কিসের কৃষ্টি?

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ধর্মমত প্রচার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ মত-প্রচার (তা ধর্মেরই হউক আর ধর্মবিরোধীই হউক) মানুষের মনের প্রশ্নকে জাগ্রত করে না—উহা স্বীয় 'মতবাদে'র লগুড়াঘাতে জিজ্ঞাসা স্তব্ধ করিয়া দেয়—উহাতে মূর্খের বিরোধ বাড়ে বই কমে না—উহা বুদ্ধির বোধনকারী বিদ্যাকেন্দ্রের উদারভাবের পরিপন্থী। আজ এক মত প্রবল, কাল আর এক মত তাহার স্থান অধিকার করিবে, শিক্ষাক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে—অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন তাহা নষ্ট হইবে। সমাধানের জন্য যে শ্রদ্ধা একান্ত আবশ্যক তাহা অন্তর্হিত হইবে।

ভারতীয় ধর্মের দার্শনিক মনোভাব মতুয়ার বুদ্ধির ঊর্ধ্বে মানব-মনকে তুলিয়া লয়। আজ আবার দেখা যায় বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। এক গোঁড়া মতবাদের সহিত লড়াই করিবার জন্য আর এক একদেশদর্শী মতবাদ খাড়া হইয়াছে। সামঞ্জস্যের জন্য প্রয়োজন এই মতবাদীয় মনোভাব বর্জন। সত্যের বিচার সম্ভব—উন্মুক্ত উদার মনের সহায়ে, শিক্ষার উদ্দেশ্য এইরূপ মন প্রস্তুত করা।

মানুষে মানুষে—বিরোধের মূলকারণটি হইল ভুলবোঝা, নির্বিচারে বিশ্বাস, আব পুরুষানুক্রমে ঐ বিশ্বাস সঞ্চারিত করায় ক্রমে ধারণা হইয়া যায়: এগুলি স্বতঃসিদ্ধ, দৈবলব্ধ সত্য—অতএব সর্বতোভাবে বক্ষণীয়, এবং অজ্ঞানান্ধকাবে সমাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে আমার এই দুর্লভ আলোক ছড়াইতে হইবে, মুক্তির একমাত্র পথেব বার্তা যে কোন উপায়ে হউক সকলের কর্ণগোচর করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

প্রত্যেকেই এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ধর্মক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতামূলক প্রচাবকার্য যুগ যুগ ধবিয়া মানুষের মনের ও সমাজের যে কত ক্ষতি করিয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে। ইহাব প্রতিরোধ কবিয়া প্রতিকার কবিতে পারে—সুস্থমনের সন্দেহবাদ অর্থাৎ সরল ও সবল মনের জিজ্ঞাসা, এমনকি সাময়িক নাস্তিকতা, নিজের ও পরেব সকল মতেব স্বাধীন সমালোচনা। যিনি ধর্মেব প্রকৃত বহস্য জানিয়াছেন তিনিই বিপ্লবী, কালবৈশাখীর মত পুবাতনের রাজ্যে ঝড় তুলিযা, জালজঞ্জাল দূর করিয়া নূতন ভাবরাশিব বৃষ্টিধাবায় দৌত প্লাবিত করিযা তিনি নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া যান। যিনি যুগান্তকারী তিনিই যুগপ্রবর্তক। সমাজকে আঘাত করিয়া, তাহার জড়তা দূর করিযা তিনি তাহাকে জাগ্রত জীবন্ত কবিয়া চলিয়া যান। সমসাময়িক সমাজ তাঁহাকে না বুঝিলেও পরবর্তী ইতিহাস বুঝিতে পাবে: কে আসিয়াছিল, কেন আসিয়াছিল? ধর্ম, ধর্ম-আন্দোলন ও ধর্মীয় নেতাগণ জীবন ও সমাজ হইতে পৃথক নয়—জীবনেরই একটা বিস্ময়কর বিচিত্র বিকাশ, যাহার তড়িৎ-স্পর্শে ঘুমন্ত জীবন জাগিয়া উঠে।

অপরের মত ও ধর্মকে শ্রদ্ধা করাই বিনয়ের শিক্ষা। এক ঈশ্বরই সমগ্র সত্য জানেন, মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কতটুকু জানিতে পারে? সেই অন্ধের হাতী দেখার মতোই মানুষের সত্যানুভূতি। সকল ধর্মেই এই সব উদারভাবের কথা আছে: সত্য এক, ঋষিরা তাহাকে বহুভাবে বলিয়া থাকেন (ঋগ্‌বেদ), সূত্রে মণিগণের মতো সকলই আমাতে গ্রথিত (গীতা), আমাব পিতার ভবনে অনেক ঘর আছে (খৃষ্ট), সকল জাতিকেই ধর্মগ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে, সকলের কাছেই দূত প্রেরিত হইয়াছে (কোরান), 'বুদ্ধ আমি একা হই নাই। তোমরাও বুদ্ধ হইতে পার' (বুদ্ধ), 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা' (শ্রীরামকৃষ্ণ)—এই সকল কথার মর্মানুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি, ধর্মের মধ্যে বিরোধ-দর্শন করে কাহারা ও কেন। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব' দর্শন করিতে শিখিলেই ভেদ-বিবাদের অবসান। এই শিক্ষাই আজ সর্বাগ্রে এবং সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন।

শুধু মাত্র পরমত-সহিষ্ণুতা নয়—পরমতও আমারই মতের আর একটা দিক, যেদিকটা আমার চোখে পড়ে নাই, দেশকালপাত্রভেদে আমারই ধর্ম এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—এই ভাবে তাহাও গ্রহণ: 'not merely toleration but acceptance'—ইহাই হইল এ যুগের নব-ধর্ম-প্রবক্তাব মর্মবাণী।

মতের গোলকধাঁধা অতিক্রম করিয়া যখন আমরা সত্যেব পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ কবি—তখন বুঝি—এতক্ষণ কি লইয়া কোথায় ঘুরিতেছিলাম, বুঝি, সকল বৈচিত্র্যের পিছনে একটি একত্ব রহিয়াছে—তরঙ্গের তলদেশে সাগরের মতো, মেঘের উর্ধ্বলোকে আকাশের মতো সত্য চিরন্তন এক ও অদ্বিতীয়। প্রতীয়মানতার সহস্র বৈচিত্র্য তাহাকে এতটুকু ক্ষুব্ধ করে না, ক্ষুণ্ণ করে না।

ইতিহাসের সকল দুর্যোগের মধ্য দিয়া, উত্থানপতনের বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়া ধর্মের এই বিশ্বজনীনতাই ভারত শিক্ষা দিয়া আসিতেছে।

দেশকাল জাতির সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ শান্ত, সংশয়শূন্য, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

তাই তাহারই কোলে আসিয়া জুটিয়াছে—সকল ধর্মের পথিকেরা, এমনকি ধর্মহীন বা ধর্ম-বিরোধী সন্তানকেও ভারত-জননী তাঁহার স্নেহ-ক্রোড়ে লালনপালন করিয়াছেন, সেও স্বাধীনভাবে তাহার মতপ্রচার করিয়াছে।

ইতিহাসের উদয়-উষা হইতেই বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন রুচি আচার ও প্রথা লইয়া এখানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—সকলেরই আশ্রয় মিলিয়াছে—এই ভারতের বক্ষে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিতে ইচ্ছা হয়, ভারত একটা ভৌগোলিক দেশমাত্র নয়—ভারত বিশ্বমনের এক অপূর্ব বিকাশ।

* * *

বিভিন্ন ভাষা যেমন একই মনের ভাব ব্যক্ত করে, বিভিন্ন ধর্মও তেমনই একই মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে, এই ভাবে দেখিলে আমরা বুঝি—ধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব লুক্কায়িত, প্রত্যেক ধর্ম যেন এক একটি ভাষা, যাহা সেই অরূপ অস্পর্শ অশব্দকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, শেষে পরাস্ত হইয়া দুর্বল মাধ্যম—ভাষারই দ্বারা বলিতেছে, সেই বস্তু বাক্যমনের অগোচর।

প্রত্যেক ধর্ম যেন এক একটি পথ—কোনটি চওড়া বড় রাস্তা, কোনটি অলি গলি—কোনটি বা মধ্যপথেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু সকলেরই চেষ্টা, উদ্দেশ্য—সেই সত্যের শিখরে আরোহণ করা।

ঈশ্বর যদি সকলের পিতা ও সৃষ্টিকর্তা—তবে তাঁহার ভালবাসা একটি ধর্মগোষ্ঠী-মধ্যেই সীমাবদ্ধ—মনে করা কি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? তাঁহার অসীম প্রেমে সকলেই আশ্রয় পাইবে, পাইবে কেন, পাইয়া আছে—এইটুকু বুঝিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু চেষ্টা করিবে, তাহার অনুরূপ শান্তি সে লাভ করিবে।

ভারত বহু জাতির মতো বহু ধর্মের মিলন-স্থল ও আবাসভূমি, তাই ভারতেরই রঙ্গমঞ্চে বিশ্বধর্মের মিলন-নাট্য অভিনীত হইবে। অতএব ভারতের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই জানিতে হইবে—বিশ্বমানবতার মহাকাব্যে ভারতের অংশ কতটুকু।

* * *

অনেকের ধারণা ধর্মের পরিবর্তে একটু নীতি-শিক্ষা দিলেই ত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে নীতি একটা শক্তির মতো, উহাকে ভাল বা মন্দ যে কোন ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে—সাহস শৃঙ্খলা বাধ্যতা স্বার্থত্যাগ এগুলি সৈন্যদের গুণ, আবার দস্যুদলেও এগুলি সমাদৃত। একই শক্তি দুই বিপরীত দিকে ধাবিত হইলে একটিকে বলি গুণ, অপরটিকে বলি দোষ—একটিকে বলি পুণ্য, অপরটিকে বলি পাপ।

অতএব নীতিকে সুপথে চালিত করিতে হইলে আরও কিছু শিক্ষা দরকার: ভাল কি, মন্দ কি? পাপ কি, পুণ্য কি? কোথা হইতে এগুলির উদ্ভব, কোথায় ইহাদের লয়? এগুলির উত্তর পাওয়া যাইবে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে, যাহার অপর প্রচলিত নাম 'ধর্ম'। শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে এই অধ্যাত্ম-সাধনা বাদ দিলে আমাদের ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করা হয়। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশকে অস্বীকার করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ গঠিত হইবে বালুকাস্তূপের উপর।

দেশকালের ঊর্ধ্বে সত্যশিবসুন্দরের আদর্শ ধরিতে শেখা, চিনিতে পারা—নিশ্চয়ই শিক্ষার শেষ সার্থকতা। দেশকালের মধ্যে, ব্যক্তির পরিধিতে যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ তাহা অসম্পূর্ণ। দেশকালের পরিবর্তনের পারে যে অপরিবর্তনীয় সত্য রহিয়াছে, পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই যাহার আস্বাদ পাওয়া যায়—শিক্ষা সেই সত্য, সেই শিব, সেই সুন্দরকে জীবনে আনিয়া দিবে, একের ভিতর দিয়া বহুর জীবন মধুময় শান্তিময় জ্ঞানময় আনন্দময় করিয়া তুলিবে।

দুঃখের বিষয় ধর্ম সাধারণত যেভাবে শেখানো হয়, তাহাতে বিভেদ বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি। তবে সকল ধর্মের সাধারণ সত্যগুলি উন্মুক্তকণ্ঠে ছোট বড় সকলের কাছেই ঘোষণা করা যাইতে পারে, তাহার ফলে শান্তির পথই প্রশস্ত হইবে। দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতি মৌলিক

সুনীতিগুলি সকল ধর্মেই স্বীকৃত, এগুলি শুধু মুখস্থের মতো শেখাইলে কিছু হইবে না, আদর্শ জীবনে পরিণত করিয়া ছাত্রদের চোখের সামনে ধরিতে হইবে, তাহারা উহার উপকারিতা বুঝিয়া অনুকরণ করিবে, জীবনে গ্রহণ করিবে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের কি প্রয়োজনীয়তা? এ প্রশ্নের উত্তরে আবার বলিতে হয়—ধর্ম-নিরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীন নয়, বিভিন্ন ধর্মদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র কোনও ধর্মের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নয়, রাষ্ট্র সর্বধর্মনিরপেক্ষ, তাই তাহাকে প্রত্যেকটি ধর্মের গোপন গভীর কথা জানিতে হইবে—অজ্ঞ থাকিলে চলিবে না, বিরাট উদার ভাবের ভাবুক হইতে হইবে—কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কে নিমগ্ন হইলে চলিবে না, মাতা যেমন সকল সন্তানকে জানেন ও ভালবাসেন—রাষ্ট্রও তেমনি দেশে আচরিত সকল ধর্মকেই জানিবেন ও পালন করিবেন।

পাঠ্যসূচীর মধ্যে ধর্মকে ঢুকাইলেই ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে না, সপ্তাহে ২।১ ঘণ্টা বক্তৃতায়ও ইহার কিছুই বোধগম্য হইবে না, নীতি শিক্ষা দিলেই নৈতিক উন্নতি হয় না, উপদেশ ও শিক্ষা এক জিনিস নয়। উপদেশ যায় মুখ হইতে কানে, —আর শিক্ষার গতি জীবন হইতে জীবনে, ধর্ম-ভাবের সঞ্চরণ হৃদয় হইতে হৃদয়ে।

যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রকৃতই ধর্মশিক্ষা দানে সমুৎসুক—তাহাদের পরিবেশ সরল সুন্দর উদার উন্মুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তদুপরি থাকিবে একটি আত্মনিবেদনের ভাব, জীবনে যাহার প্রভাব চিরস্থায়ী। সকালে সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য নীরব উপাসনা বা ধ্যান-ভজন সারাদিনের নানামুখী চিন্তা হইতে মনকে একাগ্র করিতে পারে, যাহার সাহায্যে আমরা মনের শান্ত কেন্দ্রে স্পর্শ—একটি ক্ষণের জন্যও যদি লাভ করিতে পারি, দিনান্তে যদি ক্ষণেকের জন্য বুঝিতে পারি, আমার এই দেহ একটি মন্দির, আমার অন্তর্যামী—যিনি সকলের অন্তর্যামী—তিনি সেখানে বিরাজমান, তবে সারাদিন সারারাত্রি ধরিয়া সারা মনে সারা প্রাণে শান্তিধারা ঝরিতে থাকে।

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই ত এই অন্তর্যামী দেবতা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করিয়া দেওয়া। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা সকল জ্ঞানের শেষে দিলেন আত্মজ্ঞান—'তৎত্বম্ অসি'। এই অন্তরের শিক্ষাদ্বারা জীবনের অন্তর বাহির আলোকিত হয়, ইহার অভাবে সকলই অন্ধকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি : এক জ্ঞানই জ্ঞান, নানা জ্ঞান অজ্ঞান। আত্মজোপম ছাত্রদিগকে, জাতির সন্ততিগণকে শিক্ষা দিবার নাম করিয়া ডাকিয়া আনিয়া এই আসল জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা না করিয়া নানা জ্ঞান বিতরণের আয়োজন কতদূর সার্থক ও সম্পূর্ণ? ধর্মের অর্থই হইল অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে ফুটাইয়া তোলা। যদি কাহারও ভিতরে কোন ভাব না থাকে বাহির হইতে জোর করিয়া তাহাতে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় না। জীবন ফুটিয়া ওঠে ফুলের মতো ভিতরের প্রেরণায়, বাহির হইতে সাহায্য করা যায়, এইমাত্র।

বই পড়াইয়া ধর্মভাব দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা, উপদেশ দিয়া সুনীতি-সম্পন্ন করার চেষ্টাও তথৈবচ, বুদ্ধির চালনা হৃদয়কে স্পর্শ করে না, বরং বেশি বুদ্ধি ও চিন্তা হৃদয়ের সুকুমার ভাবরাশি বিনষ্ট করিয়া জীবনে একটা যান্ত্রিক গতি আনিয়া দেয়, চিন্তা কথা কাজ—সব সংবেদনহীন যন্ত্রের মত চলিতে থাকে।

ছাত্রদের প্রয়োজন সদ্‌ভাবরাশির অনুশীলন, যেটুকু তাহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে, বরণ করিয়া লইবে, সেইটুকুই তাহাদের জীবনের অঙ্গ হইয়া যাইবে। উপায়—তাহাদের সামনে আদর্শ তুলিয়া ধরা; কোনরূপ আদেশ বা বাহ্য আচরণ হইতে নয়,

অভিভাবক ও শিক্ষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও দৈনন্দিন জীবন হইতে ছাত্রেরা যাহা শেখে, শতশত বক্তৃতা বা উপদেশে তাহা শিখিতে পারে না।

ছোটবলায় নিছক নীতিপুস্তক অপেক্ষা নীতি-মূলক গল্প ও স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ছেলেরা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে ও সেগুলি হইতে অনেক কিছু ভাব ও চিন্তা সংগ্রহ করে। এই সকল বই ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের চোখে তুলিয়া ধরিতে হইবে—শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধার্মিক, সাধু মহাপুরুষদের জীবন। কে জানে কোন্‌টি তাহার কখন ভাল লাগিবে এবং কোন্‌টি হইতে সে তাহার জীবনরস সংগ্রহ করিবে?

আরও একটু বড় হইলে—ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাস,ধর্ম-সংস্কারকদের জীবনী ও চিন্তারাশি—তাহাদের মধ্যে গল্পচ্ছলে অবশ্যই পরিবেশন করিতে হইবে। পরে ইচ্ছা হইলে তাহারা সেগুলি গ্রন্থাগার হইতে পড়িয়া লইতে পারে।

ক্রমশঃ শ্রদ্ধাশীলভাবে তাহারা বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থগুলি পড়িতে শিখিবে এবং সকল ধর্মই যে মূলতঃ একসুরে বাঁধা—এইটি উপলব্ধি করিয়া নিজেই একজন শান্তির দূতে পরিণত হইবে। শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার নয়, বিশ্বজনীনতার প্রস্তুতি, তাই যখন বই পড়াইতে হইবে, তখন কোন এক বিশেষ ধর্মের বই না পড়াইয়া গীতা, উপনিষদের সহিত ধম্মপদ—বাইবেলের সহিত কোরান এবং গ্রন্থসাহিবও ছাত্রদের হাতে তুলিয়া ধরা উচিত।

আরও পরে ধর্মের দার্শনিকতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে। বড় বড় চিন্তাশীল মনীষী, বড় বড় সাধকেরা কি ভাবিয়াছেন, কি অনুভব করিয়াছেন? বিজ্ঞান কি জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছে? ধর্ম ও দর্শনই বা কি বলে? উন্মুক্ত মন লইয়া এই সকল চর্চায় তাহাদের উৎসাহিত করা যায়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনাসক্ত আলোচনার মধ্যেই এই সব বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব। এইরূপ যদি হয়, তবেই আমাদের রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির উপর—সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য স্বীকৃত হইয়া—সকল ধর্মের মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষা একেবারে ধর্মহীন বা লৌকিক হইতে পারে না, কিছু না কিছু সেই সব দেহাতীত ভাব মিশিয়া যাইবেই, যাহা 'ধর্ম' নামে অভিহিত, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির প্রসঙ্গেও ধর্মভাব, ধর্ম-আন্দোলন, ধর্ম-নেতা ও ধর্ম-সংস্কারের কথা আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে, অবশ্য তাহাকে ধর্মশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা হয় না। কোনও বিশেষ ধর্ম-প্রবর্তক বা বিশেষ ধর্মগ্রন্থ কেন্দ্র করিয়া যে শিক্ষা, তাহাকেই কেহ কেহ ধর্মশিক্ষা বলেন, তাঁহাদের ধারণা ঐ উপায়েই ধর্মের প্রভাব জীবনে চিরস্থায়ী হইবে ঐ সকল ধর্মপ্রবর্তকের দিব্য জীবন ও বাণী মনকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং আদর্শ জীবন গঠনে উৎসাহিত করিবে। আমাদের মনে হয়, শুধুমাত্র একটি বিশেষ ধর্মের উপর জোর না দিয়া বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে—প্রচলিত সকল ধর্মের মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী যদি স্তরে স্তরে আলোচিত হয় তবেই সমধিক কল্যাণ, তবেই এক উদার মানব-সমাজের অভ্যুদয় সম্ভব।

বেদের মর্মকথা, উপনিষদের সিদ্ধান্ত, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, কংফুছে জরথুষ্ট্র ও সোক্রাতেসের শিক্ষা, খৃষ্টের সুসমাচার, শংকর রামানুজ ও মধ্বের দর্শনধারা, মহম্মদ কবীর নানক ও চৈতন্যের ভক্তি ও বিশ্বাস, সর্বশেষ—এ যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়-ভাব-সমুদ্রের সহিত যথাসম্ভব পরিচয়ও এতদুদ্দেশ্যে একান্ত প্রয়োজন।

স্বামীজী-প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অন্নদানন্দ-সংকলিত

স্বামী অখণ্ডানন্দের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভিন্ন, একই আত্মা যেন যুগ্ম ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণে যাহা বীজভূত স্বামীজীতে তাহাই অঙ্কুরিত, স্বামীজী যেন রামকৃষ্ণ-সূত্রের ভাষ্য। একই মহাশক্তি কখন রামকৃষ্ণরূপে, কখন বিবেকানন্দরূপে তাঁহার জীবনের সঙ্কট-মূহূর্তে দর্শন ও প্রেরণা দান করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিয়ত চালিত করিত। তাই তাঁহার জীবনে ঠাকুরের মত স্বামীজীর প্রভাব এত গভীর, এত ব্যাপক।

স্বামী অখণ্ডানন্দের মুখে স্বামীজীর প্রসঙ্গ সে কত মধুর লাগিত তা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই অনুভব করিযাছেন। তাঁহার নিজেরই ভাষায় এ প্রসঙ্গ অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইবে:

"বেলুড়ে একদিন তখনও রাত আছে, উঠে পড়েছি, উঠেই স্বামীজীকে দেখতে ইচ্ছা হ'ল। স্বামীজীর ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছি, ভেবেছি স্বামীজী ঘুমুচ্ছেন। উত্তর না আসলে আর জাগাবো না। স্বামীজী কিন্তু জেগে আছেন—ঐটুকু টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে . . .

"Knocking knocking who is there ?
Waiting, waiting Oh brother dear "'*

* * *

সারগাছি আশ্রমে একদিন স্বামীজীর কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিতেছেন:

স্বামীজীর কথা কি বলব? তাঁর কাছে আমি এতটুকু। দেখ, মঠে এমন দিনও গেছে যে আলোচনা করতে করতে রাত দুটো বেজে গেছে স্বামীজী বিছানায় শোন নাই, চেয়ারে বসেই বাকী রাতটা কাটিয়েছেন। আমাদের সকলের আগে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জামাটা পরে গঙ্গার ধারে পূর্বদিকে বারান্দায় বেড়াচ্ছেন।

আমি চিরকালই ভোরে উঠি—অতি ভোরে উঠে দেখি তিনি ঐ রকম বেড়াচ্ছেন। স্বামীজীর গর্ভধারিণীর মুখেও শুনেছি বালককালে এবং বড় হয়েও (ঠাকুরের কাছে যাবার আগেও) কখনও বেলা অবধি ঘুমান নাই, কখনও নয়, অতি ভোরে উঠতেন।

মঠে স্বামীজী ভোরে উঠে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করবার নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। নিজেও আমাদের সঙ্গে গিয়ে ধ্যান করতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের চারদিন জ্বর, জল-সাগু খেয়ে আছেন। স্বামীজী ধ্যান করতে ঠাকুরঘরে যাবার সময় তাঁকেও ডাকলেন, বললেন, ওরে আয়, জ্বর—তার আর কি? ধ্যান করবি চল্। তোরা যদি জ্বর হয়েছে বলে ধ্যান না করিস—লোকে তোদের দেখে কি শিখবে? বলে তাঁকে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন।

আর একদিনের কথা বলিতেছেন: মঠ তখনও নীলাম্বর মুখুয্যের বাগানে—একদিন দুটো পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত আলোচনা হয়েছে: পুনর্জন্ম আছে কি না—মানবাত্মার অধোগতি হয় কি না। স্বামীজী তর্ক লাগিয়ে দিয়ে মধ্যস্থ হ'য়ে চুপ ক'রে হাসছেন। আর যে পক্ষ পারছে না—তাদের নতুন যুক্তি দিয়ে উস্‌কে দিচ্ছেন। দুটোর পর আলোচনা ভেঙ্গে দিলেন তারপর সব ঘুম। চারটে বাজতে না বাজতেই স্বামীজী আমাকে তুলে দিলেন—দেখলুম এর মধ্যেই তিনি সব

---

* গানটির বাকী অংশ:

*"Once for all—Oh brother receive me !
Once for all Oh sinner believe me !
Into the cross thy burden fall,
Once for all, O, once for all !

সেরেস্থরে পায়চারি করছেন। আর গুন গুন ক'রে গান গাইছেন। আমায় বললেন, লাগা ঘণ্টা, সব উঠুক, শুয়ে থাকা আর দেখতে পারছি না। আমি তাও একবার বললুম—'এই চুটোব সময় সব শুয়েছে, ঘুমোক না একটু।' স্বামীজী কঠোর স্বরে বলছেন—কি, চুটোব সময় শুয়েছে বলে ছটাব সময় উঠতে হবে নাকি? দাও আমাকে, আমি ঘণ্টা দিচ্ছি—আমি থাকতেই এই। ঘুমোবার জন্যে মঠ হ'ল না কি?

তখন আমি খুব জোরে জোরে ঘণ্টা দিলাম। সব ধড়মড় ক'রে উঠেই চীৎকার—'কে বে, কে রে?' আমায় বোধহয় ছিঁড়েই ফেলত, কিন্তু দেখে আমার পেছনে স্বামীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তখন সব উঠে পড়ল।

* * *

জনৈক আশ্রমবাসীকে বলিতেছেন: দেখ, তোমাদেব মত বয়সে আমাদের কেউ মাবলে একটি কথা বলতাম না। স্বামীজী কত গালমন্দ দিতেন। সব চুপচাপ হজম করতাম। স্বামীজী মহাবুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর রাগ একেবারেই ছিল না। তিনি 'অক্রোধপরমানন্দ' ছিলেন। রাজপুতানায় গেছি। সেখানে নাপিত আমায় কামাচ্ছে আর বলছে, 'মহারাজ, আপনাদের স্বামীজীব তুলনা নেই, আমরা মূর্খ, তার পাণ্ডিত্যেব বিষয় কি বুঝব? অমন ক্রোধ সম্বরণ করতে কাউকে দেখিনি। পণ্ডিতেরা তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানসূচক উত্তর দিচ্ছে—আর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাব প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। শেষে যারা তার নিন্দা করতে এসেছিল তারাই তাঁর গোলাম হ'য়ে গেল।'

কোন বিষয় শিক্ষা করতে হলে আমাদের মনে হ'ত না, ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ওর কাছে কি শিখব? স্বামীজীর মত পণ্ডিত, তিনিও খেতড়ীতে নারায়ণদাসের নিকট পাণিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। খেতড়ীতে তাঁর চেয়ে সম্মানের যোগ্য কে ছিল? রাজার গুরু বলেও বটে, আবার নিজের ত্যাগ তপস্যা পাণ্ডিত্যেও বটে। তিনি আমায় বলেছিলেন, 'নারায়ণদাসের কাছে ছাত্রেব মতন পড়া শুরু ক'রে দিলাম।'

মন একাগ্র হলে বাহ্যজগতেব সম্বন্ধ লোপ হয়ে যায়। স্বামীজীর এই অবস্থা হ'ত। যখন রাজেন্দ্র মিত্রেব লেখা বৌদ্ধযুগেব ইতিহাস পড়তেন, তখন কিছুক্ষণ পড়ার পর বই পড়ে থাকত। তাঁর মন এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলে যেত। স্বামীজী বলতেন—'ঘড়, বাড়ী, বই, চেয়াব, বেঞ্চ সব উড়ে যেত—কিছুই নেই—এক অনন্তরাজ্যে আমার সত্তা হারিয়ে যেত।' শংকরাচার্য ও বুদ্ধদেবেরও এই অবস্থা হ'ত।

* * *

১৮৯৮ খৃঃ যখন কলিকাতায় ভয়াবহ প্লেগ শুরু হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন স্বামীজীর সঙ্গে দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

স্বামীজী অমন রসিক পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি—একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না, চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হ'ল, কিন্তু তাঁর রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না। একটা বালিশে মাথা গুঁজে বসে রইলেন সারাদিন! তারপর শুনলাম কলকাতায় প্লেগ—তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে—শুনে অবধি এই। সে সময় স্বামীজী বলেছিলেন, সর্বস্ব বিক্রী করেও এদের উপকার করতে হবে। আমরা যে গাছতলার ফকীর সেইখানেই যাব।

স্বামীজীর কি প্রাণ! তার শতাংশের একাংশ আমাদের কারও নেই? আমরা তো তাঁর গুরুভাই, অন্য পরে কা কথা। দেশের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে বলতে স্বামীজী কেমন হয়ে

যেতেন। আমি তখন তাঁকে জিগ্যেস করতাম, ভাই, কেন দেশ জাগছে না? তার উত্তরে তিনি বলতেন,'ভাই, এ যে পতিত জাত। এদের লক্ষণই এই।' আহা স্বামীজীর তুলনা নেই!

*　　*　　*

স্বামীজী-প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ আরও বলিয়াছেন: স্বামীজী যখন যে ভাবের উপর জোর দিতেন, তখন মনে হ'ত সেইটিই সত্য একমাত্র সত্য। মঠে প্রায়ই এ-রকম হত। তাই হঠাৎ কেউ এসে তাঁর ভাব ধরতে পারত না।

যেদিন সেবাধর্মের কথা উঠল সেদিন এমন বললেন যে মনে হ'ল—নিষ্কাম কর্মযোগই একমাত্র পথ—আর সব মিথ্যা, ভুল। যেদিন শাস্ত্রপাঠ কি ধ্যান-ধারণার কথা উঠল সেদিন আবার আর এক ধরন, মনে হ'ত জ্ঞানের পথ বা ধ্যানের পথই পথ, আর সব বাজে কাজ। সেদিন স্বামীজীকে মনে হ'ত—বুঝিবা সাক্ষাৎ শঙ্কর অথবা বুদ্ধ। আর যেদিন তিনি রাধারাণী, গোপীভাব বা প্রেমভক্তির কথা বলতেন সেদিন তিনি সম্পূর্ণ আর একটি মানুষ,—বলতেন: Radha was not of flesh and blood She was a froth in the Ocean of love (শ্রীমতী রাধা রক্তমাংসের নয়, তিনি প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ!)

এ কথা তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছি, হয়তো আপন মনে বলছেন, আর জোরে জোরে পায়চারি করছেন।' অথচ সাধারণতঃ কেউ রাধাকৃষ্ণ বা গোপীপ্রেম আলোচনা করলে থামিয়ে দিতেন, বলতেন, 'শঙ্কর পড়, শিবের ভাবে ভরে যাও।' ত্যাগ, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম—এগুলির ওপরই জোর দিতেন।

*　　*　　*

স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণের কথায় বলিতেছেন: 'এক জায়গায় স্বামীজী গেলেন বনের পথ দিয়ে, আমাকে বললেন—একটু ঘুরে যেতে, কিছু দূরে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা, দেখি স্বামীজী একা—কিন্তু হাসছেন, কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন, চোখে মুখে কি এক আনন্দের ভাব। জিগ্যেস করলাম, 'ভাই, কার সঙ্গে কথা কইছিলে?' তিনি চুপ ক'রে শুধু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

স্বামীজী ও আমি একসঙ্গে যেতে যেতে পাহাড়ে এক জায়গায় দেখি এক সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত, আর সজোরে নাক ডাকাচ্ছে। স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'ওরে! বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে—দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে। তবে যদি এর কোন কালে কিছু হয়।'

এই সব দেখে শুনেই তিনি বলতেন, 'সত্ত্বের ধুয়া ধ'রে দেশ তমঃ-সমুদ্রে ডুবতে বসেছে, এদের বাঁচাতে হ'লে চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারী রজোগুণ'। তাইতো কর্মের ওপর এত জোর।

পরোপকারে কাহার উপকার?—আমার নিজের—এইতো স্বামীজীর কর্মযোগ—সেবাধর্ম। * * সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন। আত্মজ্ঞান হলে পর বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যায় সেই অনুভূতি—'ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু—সর্বভূতে সেই প্রেমময়।

°　　°　　°

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীবসেবা শিবসেবা। জীব আর আছে কে? —সবই তো শিব।

*　　*　　*

স্বদেশী-যুগে দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকের দল তাঁহার নিকট স্বামীজীর কথা শুনিতে আসিত—তাহাদের স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া

স্বামীজীর কাজে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাহারা বৎসর বৎসর আশ্রমে আসিয়া নিজেরাই স্বামীজীর জন্মোৎসব করিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, —সারারাত স্বামীজীর গান গাইতে গাইতে তারা উৎসবের আয়োজন ক'রত।

'গুরুগত প্রাণ, গুরু ধ্যান জ্ঞান, গুরুপদে মন দেহ সমর্পণ' এই গানটি তিনি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন,নিজেও তন্ময় হইয়া গাহিতেন, গাহিতে গাহিতে তাঁহার অন্তরে স্বামীজীর স্বরূপটি যেন ফুটিয়া উঠিত।

স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর কথা উঠিলে প্রায়ই বলিতেন: এযুগে ঠাকুর স্বামীজীই প্রত্যক্ষ দেবতা। ঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি দেখা দেবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল। ঠাকুর কিন্তু এত সহজ নয়।

এযুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে। এইজন্য দেখছ না—লোকে স্বামীজীর ভাব আগে নিচ্ছে। এই সব সেবাকায, রিলিফ, দেশপ্রেম—এর ভেতর দিয়েই field (ক্ষেত্র) তৈরী হবে, চিত্তশুদ্ধি হবে। তারপর Spiritual (আধ্যাত্মিক)—সবে তো জীবসেবা আরম্ভ—প্রেম এখনো বহুদূর।

* * *

'Hand, Head and Heart (হাত, মস্তিষ্ক ও হৃদয়)—তিনটিরই চর্চা করতে হবে—স্বামীজীর ভিতর তিনটিই ফুটেছিল, আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথমটি থেকে। স্বামীজীর মত Spiritual (আধ্যাত্মিক) আমরা না হতে পারি—তাঁর মত heart or intellect (হৃদয় ও বুদ্ধি) না থাকতে পারে, কিন্তু হাতের কাজটার দিক দিয়ে তো আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি। মঠে তিনি এতবড় হাণ্ডা মেজেছিলেন, এক ইঞ্চি পুরু ময়লা। আমরা কি একটি বাটিও পরিষ্কার করতে পারি না?

তিনি মঠের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন। তা জানো? একদিন গিয়ে দেখেন খুব দুর্গন্ধ—বুঝতে আর বাকি রইল না—গামছাটা একটু মুখে বেঁধে দুহাতে বালতি নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সব দেখতে পেয়ে বলে, 'স্বামীজী আপনি!' স্বামীজী হাসি হাসি মুখ, বলছেন, 'এতুক্ষণে স্বামীজী আপনি!!'

'স্বামীজী, স্বামীজী' কর—স্বামীজী ত Principleএর (উচ্চনীতির) একটি প্রতিমূর্তি—কাল slide-এ যেসব কথা তাঁর দেখলে—তিনি তাঁরই প্রতিমূর্তি। তিনি রক্ত-মাংসে তৈরী ছিলেন না—idea (ভাব) দিয়ে গড়া—তিনি রাধা সম্বন্ধে যেমন বলতেন, 'Radha was a froth in the Ocean of love. She was not of flesh and blood'—তেমনি তিনিও। Principle (নীতি) বড় ভয়ানক জিনিস। তার জন্য সব ত্যাগ করতে হয়—Principle-ই ত ideal (নীতিই ত আদর্শ)।

একটু পরে আবার বললেন—স্বামীজীর যে এই দেশপ্রেম—এ অত সোজা নয়। এ Patriotism (প্যাট্রিয়টিজম্) নয়—এ দেশাত্মবোধ। সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ, তাই দেহেরই সেবাযত্নে বিভোর। তেমনি স্বামীজীর হচ্ছে দেশাত্মবোধ—তাই সারাদেশের সুখ-দুঃখ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে তাঁর চিন্তা। দেশাত্মবোধই তাঁর শেষ নয়, এর পরও আছে বিশ্বাত্মবোধ—জগতের সকল জীবের জন্য চিন্তা—তাদের জ্ঞান ভক্তি মুক্তি কি ক'রে হবে—সেও তাঁর চিন্তা। সবার মুক্তি না হ'লে তাঁর মুক্তি নেই।

স্বামীজীর সর্বজীবে ভালবাসা সম্বন্ধে বলিতেছেন:

স্বামীজী শেষ দিকটায় মানুষের সংশ্রব এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন—মঠে এক প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা করেছিলেন—চিনে হাঁস (যশোমতী), রাজহাঁস (বোম্বেটে), পাতিহাস, নানা রকমের

পায়রা, কুকুর, সারস, বেড়াল, ষেড়া ইত্যাদি পুষেছিলেন। তাদের যত্ন ক'রে খাওয়াতেন, আদর করতেন—একদৃষ্টে সস্নেহে তাকিয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোধন নিয়ে কি রকম খেলা করতেন—এই দৃশ্য দেখলে তার অনেকটা ধারণা হয়। তখন স্বামীজীর মুখচোখের ভাব কি অদ্ভুত রকম বদলে যেত—তা আর কি বলব! একেই বলে জীবে প্রেম, বিশ্বপ্রেম!

* * *

স্বামীজীর কথা বলিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল এক অবর্ণনীয় প্রেম-প্রীতির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুজ্জল হইয়া উঠিত। বক্তার জীবন্ত অনুভূতি প্রাণস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব গাম্ভীর্য—সব মিলিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও অধিকতর আগ্রহান্বিত করিত। আশ্রমে কাজের জন্য বেলুড় মঠে তিনি বেশী থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু যখন আসিতেন তখন মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার মুখ হইতে স্বামীজীর কথা শুনিতে চাহিতেন। একদিন এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া সমাজগঠন সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারা ব্যক্ত করিতেছেন:

স্বামীজী ইসলামের সামাজিক উদারতা পছন্দ করতেন। তিনি বলিতেন—'Islamic body with Vedantic brain'—তার মানে মুসলমান হয়ে বেদান্ত পড়া নয়, এর মানে সমাজ হবে ওদের মত উদার, ওদের সমাজে গ্রহণ আছে, বর্জন নেই, যদি একবার গৃহীত হয়, তা হলে ত্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে গ্রহণ নেই—যেমন ইহুদীদের, পরন্তু ত্যাগ আছে। ফলে আমরা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। জাঠরা, শিখরা, ঠিক ঠিক উদার বটে, কিন্তু তাদের সমাজ খুব ছোট এবং অশিক্ষিত। তিনি মুঘল বক্তকে বলতেন, 'আগুন সুরা'—তলোয়ারের মত ধর, আগুনের মত উষ্ণ। স্বামীজী—শরীর ও মস্তিষ্ক ঐ দুটোর সমবায় চাইতেন, বলতেন, 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক চাই, সে হ'ল হিন্দু ব্রাহ্মণদের, কিন্তু তাদের Physique নেই, অর্থাৎ চিন্তাকে কাজে পরিণত করবার দৈহিক শক্তি নেই, হাজার বছর দাসত্ব ক'রে দেহে ঘুন ধরে গেছে।'

স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিতে লাগিলেন:

স্বপ্নে দেখলুম—স্বামীজী বহরমপুরের রাস্তা দিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে চলেছেন—প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকিরের দেহ—কোমরে কেবল লোহার শিকল ও কৌপীন, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা—তার মাথায় একটা লোহার বল—সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চার জন শিষ্য।

জিগ্যেস করলুম, 'এ রকম বেশ কেন?' বললেন, 'এ রকম শরীর নইলে কাজ ক'রব কি ক'রে? তোদের বাংলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে। জানলি, আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদারভাব ছড়াচ্ছি, তাই এদের ফকীর সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' বললাম, 'ওরা কারা?' এক এক ক'রে চার জনকে দেখাতে লাগলেন—ইরাণ, তুরাণ, খোরাশান, আফগান। জিগ্যেস করলুম, 'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?'

বললেন, 'এইরকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।' জিগ্যেস করলুম, 'এখন তুমি কি করতে চাও?' বললেন,—'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়। বেদ, মহাভারত পড়ে দেখ এরা তোদেরই জাতভাই। কিন্তু আর একটা শক্তি ক্রমাগত চেষ্টা করছে যাতে মিলটা না ঘটে উঠে।'

এই স্বপ্নটি স্বামী অখণ্ডানন্দের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং ইহার কথা তিনি বারংবার বলিতেন ও বুঝাইতেন: এইবার তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের জাগরণ হবে। পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত সংঘর্ষে প্রাচ্য জাতিদের জাগরণ হচ্ছে এবং চীন জাপান ও ভারতের অগ্রগতি কেহ রোধ করতে পারবে না।

শঙ্কর-দর্শনে 'মিথ্যা'

[অগ্রহায়ণ-সংখ্যার পর]

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্কর কিভাবে তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ব্যবহারিক দিক্ থেকে জগতের সত্যতা স্বীকার করেছেন, পূর্ব প্রবন্ধে তা সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি একই ভাবে বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পারমার্থিক সত্তা না থাকলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে।

যেমন, ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যেও, শঙ্কর বলছেন: "প্রাক্ সদাত্মপ্রতিবোধাৎ স্ববিষয়েঽপি সর্বং সত্যমেব স্বপ্নদৃশ্যা ইবেতি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যে, শঙ্কর সংসারের ব্যবহারিক সত্যতার বিষয়ে অতি সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেছেন—(৩.৫.১)। পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, বাহ্যতঃ জ্ঞানী অজ্ঞানী, মুক্ত বদ্ধ, সকলেরই আচার আচরণ ব্যবহার প্রভৃতি একই, অর্থাৎ—একই ভাবে ভেদমূলক, অথবা সংসারের অস্তিত্বে বিশ্বাসমূলক। তাহলে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে জগতের বিলয়সাধন আর হ'ল কিরূপে? উত্তরে শঙ্কর বলছেন:

"অস্তি চায়ং ভেদকৃতো মিথ্যাব্যবহারঃ যেষাং ব্রহ্মতত্ত্বাদন্যত্বেন বস্তু বিদ্যতে, যেষাং চ নাস্তি। পরমার্থবাদিভিস্তু শ্রুত্যনুসারেণ নিরূপ্যমাণে বস্তুনি—কিং তত্ত্বতোঽস্তি বস্তু, কিংবা নাস্তীতি, ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বসংব্যবহারশূন্যমিতি নির্ধার্যতে, তেন ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। ন হি পরমার্থাবধারণনিষ্ঠায়াং বস্ত্বন্তরাস্তিত্বং প্রতিপদ্যামহে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'অনন্তরমবাহ্যম্' ইতি শ্রুতেঃ। ন চ নামরূপব্যবহারকালে তু অবিবেকিনাং ক্রিয়াকারকফলাদি সংব্যবহারো নাস্তীতি প্রতিষিধ্যতে। তস্মাদ্ জ্ঞানাজ্ঞানে অপেক্ষ্য সর্বঃ সংব্যবহারঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকশ্চ, অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা। সর্ববাদিনামপরিহার্যঃ, পরমার্থসংব্যবহারকৃতো ব্যবহারঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য ৩।৫।১)

উপরে উদ্ধৃত অংশটি শঙ্কর-বেদান্তের গূঢ়ার্থ উপলব্ধির দিক্ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে অদ্বৈতমতবাদে ব্যবহারিক জগতের প্রকৃত স্থান ও মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকৃষ্টভাবে।

প্রথমতঃ, স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, যিনি অদ্বয়-ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং যিনি তা করতে পারেননি তাঁরা উভয়েই বাহ্যতঃ—জাগতিক দিক্ থেকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা-প্রণালীর দিক্ থেকে একই প্রকারের আচার-ব্যবহার করেন, যেমন—অন্নপানাদি গ্রহণ, স্নানাদি সম্পাদন, নিদ্রাগমন, উত্থাপন, গমনাগমন, কথোপকথন প্রভৃতি। সেই দিক্ থেকে জ্ঞানী অজ্ঞানী, মুক্ত বদ্ধ—কেহই সংসারের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না, যেরূপ সুবিখ্যাত সুধীপ্রবর কুমারিল ভট্ট বলেছেন—'জগত্তু ঈদৃক্, ন তু অনীদৃক্'—জগৎ এই রকমই, অন্যরকম নয়।

সেজন্য প্রত্যক্ষদৃষ্ট এই জগৎকে কেহই শূন্য, অসৎ, স্বপ্ন বা মানসিক চিন্তা ও কল্পনামাত্র বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার অসংখ্য বস্তুজাত নিয়ে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত, কেহই তাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারবে না। এই হ'ল সর্ববাদিসম্মত প্রথম অবশ্যস্বীকার্য তত্ত্ব।

দ্বিতীয়তঃ, তা সত্ত্বেও জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর, মুক্ত ও বদ্ধের জগৎ প্রত্যক্ষ করার মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ আছে। যিনি জ্ঞানী ও মুক্ত, তিনি

জগৎকে দর্শন করেন জ্ঞানের দৃষ্টিতে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও সত্য বস্তু সত্যই আছে কিনা, সেই বিচারে প্রবৃত্ত হন নিবিষ্ট চিত্তে, এবং পরিশেষে সমগ্র জগৎকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলেই প্রত্যক্ষ করেন। সেজন্য, প্রকৃতকল্পে তাঁর তাঁর জগদ্দর্শন ব্রহ্মদর্শনেরই নামান্তর মাত্র,—ঘটপটাদি তাঁর নিকট ঘটপটাদি নয়, স্বয়ং ব্রহ্ম। এরূপে,জগতের মধ্যে বাস করেও,জগৎকে প্রত্যক্ষ করেও তিনি অদ্বয়ব্রহ্ম-দ্রষ্টা। বলাই বাহুল্য, যিনি অজ্ঞানী ও বদ্ধ, তাঁর প্রত্যক্ষ এরূপ নয়।

তৃতীয়তঃ, জ্ঞানী ও মুক্ত এবং অজ্ঞানী ও বদ্ধের আচার-ব্যবহার এক হলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীজাত। জ্ঞানী ও মুক্ত এক্ষেত্রে জানেন যে, এই সকল ভেদমূলক আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপাদি অসত্য, কিন্তু সাধারণ সাংসারিক দিক্ থেকে প্রয়োজনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই তিনি ঐ সকল কর্মে প্রবৃত্ত হন। অজ্ঞানী ও বদ্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য পৃথক।

এরূপে এই জগতে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যক্ষ ও তজ্জনিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীমূলক আচার-ব্যবহার আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এস্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, শঙ্কর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় স্তরেরই অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন বিভিন্ন অধিকারীর দিক্ থেকে। সেজন্য তিনি স্পষ্টতম ভাবে বলেছেন:

"ন চ নামরূপব্যবহারকালে তু অবিবেকিনাং ক্রিয়াকারকফলাদিসংব্যবহারো নাস্তীতি প্রতিষিধ্যতে।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য ৩.৫.৯)

অপর পক্ষে, নাম-রূপ-ব্যবহারকালে অথবা সাংসারিক জীবনে সাধারণ অজ্ঞব্যক্তিদের যে ক্রিয়াকারকফলাদিরূপ সংব্যবহার অথবা সাধারণ উপকরণসহকৃত, সকাম কর্ম—যা এই জগৎকে সত্যরূপে গ্রহণ করার ফলেই নির্বাহিত হয়—তাদেরও অস্তিত্ব নিষেধ আমরা করছি না।

এরূপ স্পষ্টতম উক্তির পরেও, শঙ্কর যে জগৎকে সম্পূর্ণরূপে অসত্য বলে বর্জন করেছেন—একথা যে কেহ মনেও স্থান দিতে পারেন সেইটাই আশ্চর্য।

শঙ্কর জগৎকে শূন্য, অসত্য, ক্ষণিক বা মানসিক চিন্তা, ভাব ও কল্পনামাত্র রূপেই গ্রহণ করেছেন বলে তিনি 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'—এই অভিমতও বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত। যেমন, বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর সুবিখ্যাত সাংখ্য-সূত্র-ভাষ্য "সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যে"র প্রারম্ভে পদ্মপুরাণ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন:

'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁকগর্হিতম্।
কর্ম-স্বরূপ-ত্যজ্যত্বমত্র চ প্রতিপদ্যতে॥
সর্ব-কর্ম-পরিভ্রংশো নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥'

অর্থাৎ এস্থলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে বলছেন যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ ক'রে তিনি অসৎ শাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত—মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করেন। এই মায়াবাদ শ্রুতিবাক্য সমূহের লোকগর্হিত কদর্থ ক'রে সর্বকর্ম ত্যাগের উপদেশ দিয়েছে, পরমাত্মা ও জীবের একত্ব-প্রতিপাদন করেছে, এবং ব্রহ্মের নির্গুণ পররূপ প্রদর্শিত করেছে, এবং এইভাবে কলিযুগে সমগ্র-জগতের বিনাশ সাধন বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেছে। যা 'মহাশাস্ত্র' তা বেদার্থ-প্রপঞ্চক, কিন্তু মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক ও জগতের নাশকারণস্বরূপ।'

অবশ্য, বৌদ্ধমতানুসারে জগতের স্বরূপ কি,

সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শঙ্কর যে শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী, ক্ষণবাদী বৌদ্ধ নন—তা সুনিশ্চিত। তাঁর সুবিখ্যাত 'তর্কপাদে' (ব্রহ্মসূত্র—ভাষ্য ২।২), তিনি বিশদভাবে বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করেছেন। এরূপে, তিনি ২।২।১৮—২৭ সূত্রভাষ্যে সর্বাস্তিবাদ, ২।২।২৮—৩১ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ এবং ২।২।৩১—৩২ সূত্রভাষ্যে শূন্যবাদ খণ্ডন করেছেন।

শঙ্করের মায়াবাদ যে অবৈদিক—এই মতও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। বেদোপনিষদে স্পষ্টতমভাবে অদ্বৈতবাদ বা একতত্ত্ববাদের নির্দেশ আছে, এবং শঙ্কর সেই একতত্ত্ববাদ বা একাত্মবাদকেই স্বীয় অপূর্ব মনীষা বলে একটি পরিপূর্ণ মায়াবাদরূপ মতবাদে পরিণত করেন। যা হোক, এক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে বৌদ্ধমত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন-প্রসঙ্গে তিনি জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন। বিজ্ঞানবাদ-মতে, স্বতন্ত্র জড়জগৎ বলে কিছুই নেই—জগৎ মানসিক বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-প্রবাহমাত্র। শঙ্কর বলছেন যে বিজ্ঞানবাদ-মতে জাগ্রদ্ বিজ্ঞান স্বাপ্ন বিজ্ঞানের ন্যায়ই বাহ্য বস্তু বিনাই উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত, যেহেতু জাগ্রদ্-জ্ঞান স্বপ্ন-জ্ঞান ধর্মতঃ ভিন্ন। কারণ, জাগ্রদ্-দৃষ্ট বস্তু অবাধিত, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বাধিত। নিদ্রাভঙ্গের পরেই স্বপ্নদর্শক পুরুষ স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে স্বাপ্ন-জ্ঞান ভ্রান্ত-জ্ঞানমাত্র, স্বপ্নদৃষ্ট দ্রব্যাদি কাল্পনিক, মিথ্যা দ্রব্যাদিমাত্র: একই ভাবে, মায়াসৃষ্ট দ্রব্যাদিও যথাকালে বাধিত ও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু জাগ্রৎকালে আমরা সংসারের যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সে সকল বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট ও মায়াসৃষ্ট বস্তুসমূহের ন্যায় বাধিত ও অসত্য প্রমাণিত হয় না। স্পষ্টতমভাবে, শঙ্কর বলছেন:

'অত্রোচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তি। কস্মাৎ? বৈধর্ম্যাৎ। বৈধর্ম্যং হি ভবতি স্বপ্ন-জাগরিতয়োঃ। কিং পুনঃ বৈধর্ম্যম্? বাধাবাধাবিতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য। ন চৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে।' (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।২।২৯)

এই সূত্র-ভাষ্যের শেষ পংক্তিটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাগ্রৎ-প্রত্যক্ষ যে স্বপ্ন-প্রত্যক্ষের সমতুল নয়, জাগতিক পদার্থসমূহ যে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ-সমূহের সমতুল নয়, জাগ্রৎ-প্রত্যক্ষ ও জাগতিক পদার্থসমূহ যে স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের ন্যায় প্রত্যহ বাধিত হয় না—এই প্রমাণের জন্য শঙ্কর অত্যুৎসাহে এই সূত্রভাষ্যশেষে একথাও বলে ফেলেছেন, "জাগ্রৎকালে স্তম্ভপ্রমুখ যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, সে সকল বস্তু কোন অবস্থাতেই বাধিত হয় না।"

বলা বাহুল্য যে, শঙ্করের স্বমতানুসারেই মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানকালে, জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জাগতিক সকল বস্তুই বাধিত হয়ে যায়। কিন্তু উপরের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা শঙ্কর এই তত্ত্বই প্রমাণিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে: জগৎ শূন্যও নয়, অসত্যও নয়, মানসিক জ্ঞানমাত্রও নয়, কল্পনাও নয়, স্বপ্নও নয়, সাধারণ মায়াসৃষ্ট বস্তুও নয়, সাধারণ ভ্রমও নয়। সেজন্য, স্বল্প কয়েকজন মুক্ত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে, অন্যান্য অসংখ্য সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে জগতের জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। এরূপে কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করও জগতের ব্যবহারিক, আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করেছেন।

বৌদ্ধমত নিবারণ ক'রে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-কারিকায় (২১৪।৯৯) গৌড়পাদ বলছেন:

ক্রমতে হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ।
সর্বে ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্॥

এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর বলছেন: জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্ব-মদ্বয়-

মেতৎ ন বুদ্ধেন ভাবিতম্। যদ্যপি বাহ্যার্থ-নিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্যম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষেব বিজ্ঞেয়-মিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ, জ্ঞান-জ্ঞেয-জ্ঞাতৃ-ভেদ-রহিত নির্বিশেষ এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মা বা ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধদেব বলেননি। যদিও বাহ্য বস্তু অস্বীকার এবং জ্ঞান-মাত্র স্বীকার করার জন্য বৌদ্ধ মতবাদকে অদ্বৈত মতবাদের অনুরূপ বলে বোধ হতে পারে, তথাপি প্রকৃতকল্পে অদ্বৈত-ব্রহ্ম-তত্ত্ব একমাত্র বেদান্তদর্শনই প্রপঞ্চনা করেছে, বৌদ্ধদর্শন নয়।

শঙ্কর সত্যই 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ছিলেন কি না—সে আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের মতে, সাধারণ জগতেও ঘট-পটাদি বস্তুর স্বতন্ত্র বাহ্য অস্তিত্ব নেই, তারা তথা-কথিত প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যক্ষ-প্রবাহই বা জ্ঞান-ধারা-মাত্রই—এই মত শঙ্করের একে-বারেই নয়। কারণ, তাঁর মতে সাধারণ জগতে, ঘট-পটাদির প্রত্যক্ষকারী থেকে স্বতন্ত্র বাহ্য অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে—ব্যবহারিক দিক্ থেকে।

শঙ্কর যেমন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ছিলেন না, তেমনি শূন্যবাদী বৌদ্ধও ছিলেন না, সুনিশ্চিত। বৌদ্ধমতবাদ-খণ্ডনের পরিশেষে, তিনি স্পষ্টতম-ভাবে বলছেন :

'এবমেতৌ দ্বাবপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরা-কৃতৌ বাহ্যার্থবাদিপক্ষো বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ। শূন্য-বাদিপক্ষস্তু সর্ব-প্রমাণ-বিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরা-করণায় নাদরঃ ক্রিয়তে। ন হ্যয়ং সর্ব-প্রমাণ-প্রসিদ্ধো লোকস্য ব্যবহারোঽন্যৎ তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽ-পহ্নোতুং অপবাদাভাবে উৎসর্গ-প্রতিষিদ্ধেঃ।' (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য– ২।২।৩১)

অর্থাৎ, বাহ্যার্থবাদী (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক) বৌদ্ধমত ও বিজ্ঞানবাদী (যোগাচার) বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হ'ল। কিন্তু শূন্যবাদী (মাধ্যমিক) বৌদ্ধমত সর্বপ্রমাণবিরুদ্ধ বলে, তা খণ্ডনের জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজনই নেই। সর্ব-প্রমাণপ্রসিদ্ধ লোকব্যবহারকে বা প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎকে অসিদ্ধ বা অসত্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে তখনই—যখন অপর কোনও এক বিরোধী-তত্ত্বের স্থির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়—যতদিন তা না করা যায়, ততদিন প্রত্যক্ষসিদ্ধ তত্ত্ব এবং সাধারণ ব্যবস্থাকে সত্যরূপেই গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। বৌদ্ধ-মতানুযায়ী 'শূন্য' সেরূপ তত্ত্ব নয়, সেজন্য শূন্য-দ্বারা জগৎ কদাপি বাধিত হয় না।

তাঁর স্বভাব-সুলভ সরল উপমা প্রদান ক'রে শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন :

'কিং বহুনোক্তেন, সর্ব-প্রকারেণ যথা যথায়ং বৈনাশিক-সময় উপপত্তিমত্ত্বায় পরীক্ষতে, তথা তথা সিকতাকূপবদ্ বিদীর্যত এব, ন কাঞ্চিদপ্য-ত্রোপপত্তিং পশ্যামঃ, অতশ্চানুপপন্নো বৈনাশিক-তন্ত্রব্যবহারঃ।' (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।২।৩২)

অর্থাৎ, অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নেই—যে যে দিক থেকেই বৌদ্ধমত পরীক্ষা করা হয়, সেই সেই দিক থেকেই এই মতবাদ বালুকাময় কূপের ন্যায় বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। কোনো দিক্ থেকেই বৌদ্ধ মতবাদের যৌক্তিকতা দৃষ্ট হয় না। সেজন্য বৌদ্ধ শাস্ত্র অযৌক্তিক।

এরূপে শঙ্কর বৌদ্ধমতবিরোধী ছিলেন সম্পূর্ণ-রূপে। সেজন্য নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, জগতের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদের প্রপঞ্চক হয়েও শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার ক'রে নিয়ে-ছেন নিঃসঙ্কোচে। তিনি জগৎকে 'মিথ্যা' বলেছেন কেবল এই অর্থেই অর্থাৎ কেবল পারমার্থিক দিক থেকেই।

এই কারণেই শাঙ্কর বেদান্তেও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের ন্যায় প্রমা, অপ্রমা, প্রমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। এক-

দিক্ থেকে—পারমার্থিক দিক্ থেকে, সমগ্র জগৎই 'অপ্রমা', ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান-মাত্র হলেও, অন্য-দিক্ থেকে—ব্যবহারিক দিক্ থেকে প্রমা ও অপ্রমার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। যেমন, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান প্রমা, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান অপ্রমা। সে জন্যই সুবিখ্যাত অদ্বৈতবেদান্ত-গ্রন্থ ধর্ম-রাজা-ধ্বরীন্দ্র-কৃত 'বেদান্ত-পরিভাষা' অদ্বৈতবেদান্তানু-যায়ী ষষ্ঠ প্রমাণ বিশদভাবে আলোচনাপূর্বক বলছেন :

'অথ নিরূপিতানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যং দ্বিবিধম্—ব্যাবহারিক-তত্ত্বাবেদকত্বং, পারমার্থিক-তত্ত্বাবেদকত্বঞ্চেতি। তত্র ব্রহ্ম-স্বরূপাবগাহি-প্রমাণ-ব্যতিরিক্তানাং সর্বপ্রমাণানামাদ্যং প্রামাণ্যম্ তদ্বিষয়াণাম্ ব্যবহার-দশায়াং বাধাভাবাৎ। দ্বিতীয়ন্তু জীব ব্রহ্মৈক্যপরাণাং, তদ্বিষয়স্য জীব-পরৈক্যস্য কালত্রয়াবাধ্যত্বাৎ'।

(বেদান্ত-পরিভাষা—৭)।

অর্থাৎ, পূর্বে নিরূপিত প্রমাণের প্রামাণ্য দ্বিবিধ—ব্যাবহারিক তত্ত্ববিষয়ে প্রামাণ্য ও পার-মার্থিক তত্ত্ববিষয়ে প্রামাণ্য। যে প্রমাণদ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না সে প্রমাণের প্রামাণ্য ব্যবহারিক। এই প্রমাণের বস্তু ঘট-পটাদি ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য। যে প্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ বা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অবগত হওয়া যায়, সেই প্রমাণের প্রামাণ্য পারমার্থিক—তা কোন কালেই বাধিত হয় না।

এরূপে শঙ্কর-দর্শনের 'মিথ্যা'-তত্ত্ব সত্যই একটি অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব। অবশ্য, 'Reality' এবং 'Appearance', 'সত্তা' এবং তার 'আভাস', 'Noumenon' এবং 'Phenomenon', 'বস্তু' এবং তার 'বাহ্যরূপ'—এই দুটির মধ্যে প্রভেদই দর্শন-শাস্ত্রের প্রারম্ভিক ভিত্তি, যেহেতু যা আমরা সাধারণভাবে সত্য বলে প্রত্যক্ষ করছি, তা-ই যদি সত্যই সত্য হ'ত, তাহলে সত্য বস্তু বা বস্তুর স্বরূপ কি—এই দার্শনিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উদয়ই হ'ত না। সেজন্য, সাংসারিক দিক থেকে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য যে পারমার্থিক দিক থেকে ঠিক সেই ভাবেই সত্য নয়—এ কথা জগতের প্রায় সকল দার্শনিককেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেহই শঙ্করের মতো সাহস ভরে, দৃঢ়তার সঙ্গে, যুক্তি-বিচার-সহকারে এই পরিদৃশ্যমান অথচ অনিত্য জগতের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করতে অগ্রণী হননি। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাকুশল, মননশীল, তর্ক-বিচার-নিপুণ শঙ্করের অদ্বৈতব্রহ্মবাদ এবং জগন্মিথ্যা-বাদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

একটি প্রণাম

শ্রীশান্তশীল দাশ

একটি প্রণাম হয়ে আমি
রইবো তোমার পায়ের কাছে,
আর কিছু নয় পরাণ আমার
এই টুকু যে নিত্য যাচে।
কতই পেলাম এই দুনিয়ায়,
হিসাব কিছুই মিললো না হায়,
না-পাওয়ারই ব্যথার বেদন
মনের কোণে নিত্য বাজে।

সকল চাওয়া শেষ করেছি
এবার শুধু এইটুকু চাই,
একটি প্রণাম হয়ে তোমার
চরণতলে এক পাশে ঠাঁই ;
অনেক পূজার আয়োজনে,
তোমার রাতুল ওই চরণে,
আমার প্রণাম-প্রদীপ যেন
উজল শিখায় নিত্য রাজে।

কার্যে পরিণত বেদান্ত*

স্বামী গম্ভীরানন্দ

আপনাদের আহ্বান যখন পাই তখন মনে হইয়াছিল—আপনারা সাধারণভাবে শুধু বক্তৃতা শুনিতে চান না, পরন্তু আপনাদের নির্বাচিত বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে চান। তাই মুখে বক্তৃতা না করিয়া আমার বক্তব্য লিখিয়া আনাই উচিত মনে করিয়াছি।

আর এক কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমিও আপনাদেরই মত ছাত্র—আজও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মর্ম পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছি, এইরূপ দাবি করিতে পারি না। সুতরাং আমার বক্তব্যের মধ্যে অস্পষ্টতা ও অপূর্ণতা থাকা অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ আমাদের সময় অল্প। এই বিরাট বিষয়কে সব দিক হইতে ফুটাইয়া তুলিতে যে সময় ও পরিশ্রম আবশ্যক, তাহার এখন একান্ত অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব ও পূর্ণত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনবেদ ও সামাজিক পরিকল্পনা বা 'কার্যে পরিণত বেদান্তে'র কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-বিষয়ে পূর্বাচার্যেরা অনেক কথা বলিয়াছেন,অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মবাদী স্বামীজীর সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কোথায়—তাহা বোঝা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদী স্বামীজী এবং পূর্ববর্তী আচার্যদের মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য যেখানে তত্ত্বকে বিশুদ্ধরূপে নিষ্কাশিত করিয়া দেখাইতে বদ্ধ-পরিকর, স্বামীজী যেখানে সেই তত্ত্বকে সর্বানুস্যূতরূপে দেখিয়া কার্যে প্রয়োগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প। আচার্য (শঙ্কর) যেখানে প্রতিপদে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ দেখাইতেছেন, স্বামীজী সেখানে কার্যক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়-স্থাপনে যত্নপর। আচার্যের দৃষ্টিতে জ্ঞানের রূপটি যেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ব্রহ্ম, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেখানে উহা মানবের উন্নতিপথের পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ। অতএব স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে শঙ্করাচার্যকেও কিছুটা বোঝা আবশ্যক, আমি সেখান হইতেই আরম্ভ করিতেছি।

স্বামীজীর পথ উপনিষদ্ ও গীতা-নিরপেক্ষ নহে, এই সকলই স্বামীজীর দর্শনের ভিত্তি, অতএব উহাদের সহিতও স্বামীজীর সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বশেষে আমাদের বিবেচ্য স্বামীজীর রচিত পরিকল্পনা। আমরা এই ভাবেই স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতেছি।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত নরনারায়ণ-সেবার আকর এই অদ্বৈত বেদান্ত, এবং মানব-সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও এই অদ্বৈত-ভূমির উপরই প্রসারিত। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে: যে অদ্বৈত বেদান্তকে এক কথায় বর্ণনা করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—সেই অদ্বৈতবাদের জগদতীত তত্ত্বের সহিত ইহ জগতে নরনারায়ণ-সেবার বা সামাজিক অভ্যুদয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে? আধুনিক কালে কোন কোন মনীষী ইহাও বলিতেছেন যে ভারতের ধর্মগুলি সংসার-বিমুখ, উহার মূলীভূত দার্শনিক মতগুলির পরিবর্তন না ঘটিলে ঐ ধর্মগুলি কিরূপে জাগতিক উন্নতির প্রেরণা দিবে?

আপত্তি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরের হইলেও

---

* গত ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের 'বিবেকানন্দ পাঠচক্রে' প্রদত্ত ভাষণ।

তাহাদের মধ্যে একটা মৌলিক সাদৃশ্য আছে। উভয় প্রশ্নই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইতেছে যে, নেতিমূলক বেদান্ত বা যে কোনও সংসারবিমুখ ধর্মমত কোন ইতিমূলক চেষ্টার খোরাক জোগাইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে, অথচ চরম নেতিপরায়ণ অদ্বৈত বেদান্তই স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের এবং কার্যধারার ভিত্তি। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁহাকে সযত্নে অদ্বৈতমতে উপদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং অদ্বৈতের শেষ সীমা নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়া ঘোষণা করিলেন, 'অদ্বৈত সব শেষের কথা, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর'। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখিতেন না।

পূর্বাচার্যদের জীবনেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই অবিরোধই লক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্য জ্ঞানী ছিলেন—এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, এবং বর্তমান যুগে তিনি অদ্বৈত দর্শনের সর্বপ্রধান আচার্য—ইহাও সর্ববাদিসম্মত, অথচ জ্ঞানলাভের পরও তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য গ্রন্থরচনা, মঠস্থাপন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া, তীর্থভ্রমণ, ভক্তিমূলক স্তোত্রাদি রচনা প্রভৃতি কার্য করিলেন, এই অসামঞ্জস্যের একটা সমাধান প্রয়োজন। এবং সেই সমাধানের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈতের মিলনক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

অদ্বৈতবাদী আচার্য দেখিলেন, জ্ঞানলাভের পরও ব্রহ্মজ্ঞানীরা উপদেশাদি দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উপদেষ্টাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার না করিলে তদুপদিষ্ট জ্ঞানের প্রামাণ্যই ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদের জীবন দেখিয়া এবং শাস্ত্রের বচন শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে, 'জীবন্মুক্তি' নামক এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়াও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ক্রিয়া করা সম্ভবপর, অথচ যুক্তি-দৃষ্টিতে দ্বৈতাদ্বৈতের মিলন অসম্ভব। তাই এই অবস্থার ব্যাখ্যাকল্পে 'প্রারব্ধ', 'অজ্ঞানলেশ', 'বাধিতের অনুবৃত্তি' ইত্যাদি কথার অবতারণা করা হইল। আবার কেহ কেহ বলিলেন, জ্ঞানীর নিজের দৃষ্টিতে—তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে করেন বলিয়া মনে হয়। ব্যাখ্যা যাহাই হউক আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর ক্রিয়া আছে, যদিও সে ক্রিয়া ঠিক আমাদের মত নহে, উহা লোকসংগ্রহ প্রভৃতি উদ্দেশ্যের দ্বারা, প্রারব্ধের দ্বারা বা ভগবদাদেশের দ্বারা নিয়মিত। এই কাজ থাকা ও না-থাকার অবস্থা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে প্রকাশ করিলেন :

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন॥

আর দৃষ্টান্ত দিলেন :

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

আর একটি দৃষ্টান্ত পাই রাজর্ষি জনকের জীবনে—'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।'

ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শঙ্করাচার্য বলিলেন যে, 'সংসিদ্ধি' কথাটা চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভ দুই অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। যদি বলি 'চিত্তশুদ্ধি'ই অর্থ, তবে জনকের পক্ষে কর্মদ্বারা সংসিদ্ধিতে অবস্থিত হওয়া কিছু অযৌক্তিক নহে। আর যদি জ্ঞানলাভই সংসিদ্ধির অর্থ হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানলাভের পরও কোনও কারণে জনকের কর্মত্যাগ হয় নাই, কর্মসহই তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এখানেও জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। এই কর্ম ও কর্ম-

শূন্যতার মাপকাঠি হিসাবে শঙ্কর গ্রহণ করিলেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান থাকা বা না-থাকা। যেখানে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান নাই, সেখানে 'নৈতৎ কর্ম যেন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়েত' উহা তো কর্মই নয় যে, উহাকে জ্ঞানের সঙ্গে জুড়িয়া জ্ঞান-কর্ম-সংমিশ্রণের তর্ক তুলিবে। আর বহি-দৃষ্টিতে যে অবস্থা ক্রিয়াযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, সত্যদৃষ্টিতে উহা জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। রাজর্ষি জনক সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈত বেদান্তের অনুভূতিতে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও কর্মসম্ভাবনার একটা যুক্তি এখানে পাওয়া গেল। আবার মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন আচার্যগণ যখন জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহাদের বিচার চলিয়া-ছিল জাগতিক ক্ষেত্রে নহে, প্রত্যুত তাত্ত্বিক ভূমিতে। তত্ত্বদৃষ্টিতে জ্ঞানের সহিত কর্মসন্ন্যাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বাহ্যত্যাগের উপর তাঁহারা তেমন জোর দেন নাই। স্বয়ং শঙ্করাচার্যের বিচারধারাও এখানে প্রধানতঃ মানসিক অবস্থাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আমি কর্ম করিতেছি এবং আমি নিষ্ক্রিয় আত্মা—এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে পর্বতপ্রমাণ অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান বর্তমান। তবু উপনিষদের চিন্তাধারাও ব্যবহারক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শঙ্কর-ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি মুণ্ডকোপনিষদের 'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ' (৩।২।৪) সন্ন্যাসরহিত তপস্যা জ্ঞানলাভের কারণ নহে—এই শ্রুতির ব্যাখ্যাকল্পে বলিলেন, 'শ্রুতিতে তো ইন্দ্র, জনক, গার্গী প্রভৃতির আত্ম-লাভের কথা আছে? সত্য কথা। সন্ন্যাস বলিতে যে সর্ব-ত্যাগরূপ আন্তর সন্ন্যাস বুঝায়, তাহা তাঁহাদেরও ছিল, কারণ স্বত্বাভিমান তাঁহাদের ছিল না। বস্তুতঃ এখানে সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্ন-ধারণরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে।'

আবার সিদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকে—ইহাই চিরাচরিত প্রথা। তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণের ভূমিকা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য লিখিলেন, 'অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে সর্বত্রই কৃতার্থ ব্যক্তিদের যাহা লক্ষণ তাহাই সাধনরূপে উপদিষ্ট হয়, কারণ ঐগুলি যত্নসাধ্য।' ফলতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্তব্যাতীত হইলেও নানা কারণে তাঁহারা কর্তব্যপরায়ণ বলিয়া যে লোক-প্রতীতি হয়, সেই সিদ্ধাবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক অগ্রসর হইতে পারেন। এই জন্য গীতা-মুখে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাচার্যদের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মে থাকিয়াও 'কর্ম না করা'-রূপ আচরণের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন।

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন জগৎ 'বাধিতের অনুবৃত্তি'রূপে প্রকাশিত হয়, তখন উহার সহিত তাঁহারা কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন? মায়া-রচিত বিশ্বকে তাঁহারা স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, অর্থাৎ মনোরাজ্যে তাহার স্বপ্নসদৃশ ছায়াপাত হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া অবজ্ঞাভরে মনকে তাহা হইতে সরাইয়া লইতে পারেন, অথবা তাহাকে ঐশী শক্তির বিকাশ মনে করিয়া তাহার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়াও উদাসীন থাকিতে পারেন। শঙ্করাচার্য মায়াকে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—এই ঔদাসীন্যের স্থলে মায়োপহিত ভগবানের এই অপূর্ব রূপের প্রকাশ দেখিয়া তাহার সহিত একটি প্রীতির সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারেন। অদ্বৈত-বাদীদের মধ্যে এই সর্বপ্রকার মনোভাবই দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের নামে এমন বহু ভক্তিমূলক স্তোত্র প্রচলিত আছে, যাহা সন্ন্যাসীরাও শ্রদ্ধা-সহকারে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি স্তোত্রে আছে :

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবৈবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গো ন ক্বচন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ ॥

মধুসূদন সরস্বতীও সজ্ঞানে জ্ঞান এবং ভক্তির মিলন সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে এই শ্লোকটি প্রচলিত আছে :

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢাস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

শ্রীধরস্বামীও এই পথেরই পথিক। আর শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন :

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

এই আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, অদ্বৈতভাব পরম্পরার ক্ষেত্রে ও এমন কয়েকটি স্থল আছে যেখানে সিদ্ধের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একই সঙ্গে বিকাশ অন্ততঃ ব্যবহারিক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং সাধকের জীবনে উহা সজ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে। আর সহজেই মনে হয় অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মতে এই সক্রিয় অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম, নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার মূল এবং অটুট ভিত্তি হইতে পারে। আর কোনও মতবাদের মধ্যে সেরূপ সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি এবং সত্যের প্রতি অবিচল অভিযানের জন্য আহ্বান পাওয়া যায় না। সিদ্ধির স্থিরতার সহিত সাধনার অবিরাম অগ্রগতি একমাত্র অদ্বৈতের মধ্যে নিহিত আছে, সে আলোচনায় আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতেছি। প্রথমে অধ্যাত্মক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের প্রয়োগের কথাই ধরা যাক।

উপনিষদুক্ত অদ্বৈত সাধনার আলোচনায় অগ্রসর হইলে দুইটি বিশেষ বাক্য আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—বৃহদারণ্যকের 'নেতি নেতি' এবং ছান্দোগ্যের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই দুইটি বাক্য আপাততঃ বিরোধী মনে হইলেও শঙ্করাচার্যের মতে উভয়ই একার্থক। প্রথম বাক্য নেতি-মুখে যেমন ব্রহ্মের পরিচয় দেয়, দ্বিতীয়-বাক্যও তেমনি ব্রহ্মেরই পরিচয় দেয়, সর্বের নহে। তত্ত্বের দৃষ্টিতে তাহাই বটে। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রেও কি তাহাই? তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জ্ঞান স্ববিরোধী অজ্ঞানের নাশক হয়। এই অজ্ঞান-নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী বলিয়া বা সহগামী বলিয়া আর কোন কিছু স্বীকৃত হইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞান অন্যনিরপেক্ষভাবে অজ্ঞানের নাশ করে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশিত হন, তাঁহার প্রকাশের জন্য আর কোন ইতিমূলক প্রচেষ্টা নিরর্থক।

মন্দান্ধকারে রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সে ভ্রম নিরাশের জন্য আলোক আনা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা রজ্জুতে প্রকাশরূপ কোন নূতন ধর্মের আবির্ভাব হয় না। নেতিমুখে বিচার করিয়া যখন সর্বত্যাগ হইয়া গেল, তখন ব্রহ্ম আপনিই প্রকাশ পাইবেন।

এদিকে ছান্দোগ্য বলিলেন, 'এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয় ও তাঁহাতে জীবিত থাকে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। মানুষ ভাবরূপী। সে ইহজীবনে যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব সে তদ্ভাবে-ভাবিত-হওয়া-রূপ দৃঢ় উপাসনা অবলম্বন করিবে।' আর উপাসনার পদ্ধতি দেখাইতে গিয়া উপনিষদে বলা হইল, 'হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক, কিংবা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরিক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর —এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর। যিনি

সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিত্তমান, ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম।' স্তরে স্তরে বিবিধ-রূপে আত্মার সহিত ব্রহ্মের এই যে ঐক্য স্থাপন ও ঐক্যানুভূতি ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে ধ্বনিত হইয়াছে :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

উপনিষদের উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব-স্থাপনের একটি ক্রমিক ধারা এবং তদবলম্বনে অদ্বৈতবাদের উপর মানব-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত পাইলেন। তিনি দেখিলেন এবং উল্লেখ করিলেন কিভাবে ছান্দোগ্যোপনিষদের সত্যকাম জাবাল স্বীয় গুরু হারিদ্রুমত গৌতমের আদেশে গভীর অরণ্যে গরু চরাইতে গিয়া এই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'র সাক্ষাৎকার পাইলেন। বৃষ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'পূর্ব দিক ব্রহ্মের এক অংশ, পশ্চিম দিক এক অংশ, উত্তর দিক এক অংশ, দক্ষিণ দিক এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'প্রকাশবান' নামক চারিকলা-বিশিষ্ট এক চতুর্থাংশ।' অগ্নি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'পৃথিবী এক অংশ, অন্তরিক্ষ এক অংশ, দ্যুলোক এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' নামক চতুষ্কল একটি চতুর্থাংশ।' হংস তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'অগ্নি এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'জ্যোতিষ্মান্' নামক একটি চতুর্থাংশ।' মদ্‌গু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'প্রাণ এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রোত্র এক অংশ মন এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'আয়তনবান্' নামক চতুষ্কল একটি চতুর্থাংশ।' শঙ্করাচার্যের মতে এখানে বৃষ ইত্যাদি শব্দে দিকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এই মত অস্বীকার না করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া সত্য-কাম যখন গোচারণরূপ সাধারণ কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন বৃষ অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃত প্রাণী ও বস্তুগুলিও মুখর হইয়া তাঁহাকে 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্মে'র সন্ধান দিতে বাধ্য হইল। ছান্দোগ্যের পরবর্তী উপাখ্যানটিও অনু-রূপ। গুরু শিষ্যকে উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন। তবু শিষ্যের পরিচর্যায় তুষ্ট অগ্নিসকল তাঁহাকে ব্রহ্মোপদেশ দিলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম', আর প্রত্যেক অগ্নি পৃথক পৃথক উপদেশ দিলেন। গার্হপত্য অগ্নি বলিলেন, 'পৃথিবী,অগ্নি,অন্ন ও আদিত্য আমার তনু। আদিত্য-মণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনিই আমি।' অন্বাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) বলিলেন, 'জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রবৃন্দ ও চন্দ্রমা (আমার তনু)। চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি।' আহবনীয়াগ্নি বলিলেন, 'প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ (আমার তনু), এই যে বিদ্যুন্মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি।' এখানেও স্বাভাবিক ভাবে শিষ্যের হৃদয়মধ্যে স্বতই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র প্রকাশ সংঘটিত হইল।

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, ভূমা। বহু রূপে বহু শব্দে তাঁহার এই সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা আছে এবং বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন উপনিষদে বিবিধরূপে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সর্বত্র আত্মানুভূতির বিধি রহিয়াছে। এবং অনুভূতির মধ্যে একটা ক্রমিক অগ্রগতিও স্বীকৃত হইয়াছে—ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে এই অবিরাম অভিযান। দৈনন্দিন সাধারণ বস্তুও এই সর্বব্যাপী দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে পারে নাই। তৈত্তিরীয়কে অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই সকল

দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অন্ততঃ ঔপনিষদিক যুগে ব্রহ্মোপসনাকে এই ভাবে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া লওয়া হইয়াছিল—সমস্ত জীবন এক উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইহার আরও ইঙ্গিত বা প্রমাণ পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোনিষদের পুরুষ-যজ্ঞে। সেখানে (৩।১৬) বলা হইয়াছে, 'পুরুষই যজ্ঞ, তাহার প্রথম চব্বিশ বৎসর আয়ুই প্রাতঃসবন, বসুগণ পুরুষযজ্ঞের প্রাতঃসবনে অনুগত আগত, প্রাণ সমূহই বসু। অতঃপর যে চুয়াল্লিশ বৎসর আয়ু উহা মাধ্যন্দিন সবন। অতঃপর যে আটচল্লিশ বৎসর আয়ু উহা তৃতীয় সবন ইত্যাদি। তারপর বলা হইয়াছে (৩।১৭)। সেই পুরুষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং সুখের অভাব ইহাই তাঁহার দীক্ষা। অতঃপর তাহার আহার পান ও আনন্দোপভোগ দীক্ষার পরবর্তীকালে লভ্য আহারাদির তুল্য। তাঁহার তপস্যা, দান আর্জব অহিংসা ও সত্যবাদিতা পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণা। ইহা যেন কতকটা আপনাদের সুপরিচিত বাংলা গানেরই অনুরূপ :

শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান।
আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে।

ইহার পরে তৈত্তিরীয়কে যখন মন্ত্রোচ্চারিত হইল 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব' তখন স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে উহার সহিত সুর মিলাইয়া বলা সহজ হইয়া পড়িল, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, আর্তদেবো ভব' ইত্যাদি। ইহা উপনিষদের চিন্তাধারারই পরিণতি এবং ইহা অদ্বৈত বেদান্তের চতুঃসীমার মধ্যেই সাধনের আধুনিকতম ব্যবস্থা।

কিন্তু ইহাতেও বিবেকানন্দের প্রাণে শান্তি আসিল না। উপনিষদের যুগে যে চিন্তাধারা এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, উহার পরিসমাপ্তি উহাতেই হইতে পারে না, উহার গতিবেগ এখানেই অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করিলে আমাদিগকে আরও দূরে, বহু দূরে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে :

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

ইহা শুধু শাস্ত্রে নিবদ্ধ না থাকিয়া সামাজিক এবং প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধ হওয়া এবং কার্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। আবার পুরুষসূক্তে ব্রহ্মের প্রাতিস্বিক প্রকাশের ঊর্ধ্বে যে সামূহিক দৃষ্টি বর্ণিত হইল তাহাও প্রণিধানযোগ্য। মন্ত্রে বলা হইল :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

এই যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বিরাটের বিকাশ, ইহা শুধু ধ্যানের বিষয় বা তত্ত্বের প্রকাশক না হইয়া বাস্তব জগতে পূজার বিষয় হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মবাদ ও জীবনের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান বাঞ্ছনীয়। বিবেকানন্দ তাই লিখিলেন :

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণশরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীভাবতী (সরলা দেবী)

সেবার পূজার সময় মা কলিকাতাতেই ছিলেন। ভক্তদের বেশী দর্শন করিতে দেওয়া হইত না। অষ্টমীর দিন ভক্তেরা আসিয়া মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। মাও সকলকে খুব আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। জগদ্ধাত্রী-পূজাতেও মা জয়রামবাটী গেলেন না। কিন্তু পূজার যাবতীয় জিনিস সুন্দরভাবে গুছাইয়া জয়রামবাটী পাঠাইলেন। পূজার দিন কলিকাতায় থাকিলেও তিনি উপবাস করিলেন এবং তিন পূজা হইয়া গেলে সন্ধ্যার পর জলগ্রহণ করিলেন। পূজা নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে খবর আনিলে তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

মায়ের অসুস্থতার জন্য পূজার সময় ভক্তেরা তেমন প্রসাদ পান নাই বলিয়া শরৎ মহারাজ মায়ের অনুমতি লইয়া তাঁহার জন্মতিথি উৎসব ঘটা করিয়া করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেদিন মাকে লইয়া সকলে খুব আনন্দ করিয়াছিলেন। মা একটু ভাল আছেন বলিয়া সকলেই খুশী। ঐ সময়ে একটা মজার ঘটনা হইয়াছিল। রাধুর দুইটি বিড়াল ছিল, সে একটিকে 'রঙ্গ' অপরটিকে 'রমণী' বলিয়া ডাকিত। বিড়াল দুইটি খুব ভাল ছিল, কোন খাবারে কখনও মুখ দিত না, রাধু কিংবা গোলাপ-মা খাইতে দিলে খাইত: মাও বিড়াল দুইটির খুব যত্ন করিতেন। একদিন সকালবেলা তাঁহার বিছানা নোংরা করিয়া দেওয়াতে রাসবিহারী মহারাজ রঙ্গকে লইয়া গিয়া দূরে ফেলিয়া আসিলেন। মা উহাতে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও মা, একি গো। সকালবেলা রাসবিহারী একি করলে? ওরা সাধু, ওদের কোন মায়া নেই।" রাধু এবং গোলাপ-মারও খুব কষ্ট হইয়াছিল। তিন চার মাস পরে বিড়ালটি আবার উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে চেহারা আর নাই, এবং দুর্বলতার দরুন কয়েকদিন বাদে রাস্তায় মরিয়া যায়। গোলাপ-মা তাহাকে গঙ্গায় দিয়া আসিয়া বলিলেন, 'মা, এর কিন্তু উৎসব করতে হবে।' মা বলিলেন, 'হ্যাগো, বিড়ালটি কোন শাপভ্রষ্ট ভক্ত ছিল।' গোলাপ-মা সকলের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিলেন। তের-দিনের দিন একেবারে বিরাট উৎসব। বেলুড় মঠ হইতে সাধুরা আসিয়া কালীকীর্তন করিলেন। সকলে খুব আনন্দ করিয়া ভূরিভোজন করিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, 'বেরালের কী ভাগ্যি, মার বাড়ীতে তার উৎসব হ'ল।' সেদিন কালীকীর্তন এমন জমিয়াছিল যে যখন সাধুরা 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' গাহিতেছিলেন, মা ঘর হইতে বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন, তবে একথাও বলিলেন, 'আহা, ঠাকুরের গান শুনে কান ভরে আছে। তিনি কি চমৎকার গাইতেন। এ সব গান—এখন শুনতে হয় তাই শুনি, কীর্তন এখন আর তেমন লাগে না।'

রাধুর তখন সন্তান-সম্ভাবনা। আবার ৩।৪ মাস পর তাহার বায়ুরোগ হইল, সে কেবল নির্জন জায়গায় থাকিতে চায়, শব্দ সহ্য করিতে পারে না। সে দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। মায়ের কিন্তু পাগল মেয়েকে লইয়া দেশে যাইবার মোটেই ইচ্ছা নাই। তখন বেলুড়ে থাকাই ঠিক হইল, মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের স্কুল বাড়ীতে থাকলে হয় না?' আমি বলিলাম, 'সুধীরাদিকে জিজ্ঞেস ক'রে এসে বলব।' প্রথমে সুধীরাদি একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন, কারণ বোর্ডিং

তখন ৫০ নং বোসপাড়া লেনে ছিল। জায়গা অল্প, অথচ মেয়ে প্রায় ৩০টি ছিল। তবু সব ব্যবস্থা করিয়া সুধীরাদি মাকে বোর্ডিং-এ আসিয়া থাকিবার জন্য উদ্বোধনে জানাইতে গেলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, তাঁহাদের বেলুড়ে যাইবার সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। সুধীরাদির মনে উহাতে কষ্ট হইয়াছিল। আমারও মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়া দুঃখ হইয়াছিল। পরদিন সকালে কিন্তু ৭টা ৮টার সময় চন্দ্র আসিয়া খবর দিল, মা ১১টার সময় নিবেদিতা বোর্ডিং-এই থাকিবার জন্য আসিতেছেন। আমাদের তখন কী আনন্দ! মা আসিয়াই বলিলেন, 'এখানে আসাটা বেশ হয়েছে, সবই কাছে হ'ল।'

নিবেদিতা স্কুলের উপর মা চিরদিনই খুব প্রসন্ন ছিলেন, সেখানে যে সব মেয়েরা থাকিত তাহাদের খুব ভাল বাসিতেন। তাহাদের কোন রকম অসুবিধা শুনিলে মার খুব কষ্ট হইত। একদিন আমি আর সুধীরাদি মার কাছে উদ্বোধনে বসিয়া আছি। মা স্কুলের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, বোর্ডিং-বাড়ীটি বড় ছোট, মেয়েদের বড় কষ্ট হয়। মা তখনই সহানুভূতির সুরে বলিলেন, 'তাইত মা, বড় কষ্ট, একটুখানি জায়গা হলে বেশ হয়।' ঐ সময় গণেন মহারাজ * কী কাজে ঘরে ঢুকিতেই মা আবার বলিলেন,'গণেন, এদের একটু মাথা গুঁজবার জায়গা ক'রে দাও।' তিনি বলিলেন, 'তা মা, আপনি বললেই হয়।' 'আমি ত বলছি, একটু জায়গা ক'রে দাও।' তারপরেই স্কুল-বাড়ীর জন্য নিজস্ব জমি ক্রয় করা হয়। ৫০নং বাড়ীতে থাকা-কালে মাকেও একদিন ঐ জায়গা দেখাইয়া আনা হয়। মা জায়গা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেই স্থানেই বর্তমান নিবেদিতা-স্কুল ও সারদা-মন্দির (বোর্ডিং) হইয়াছে।

* উদ্বোধনের তদানীন্তন কার্যাধ্যক্ষ।

বোর্ডিং-এ মা বেশ আনন্দে ছিলেন। ভক্তের ভিড় নাই, লোকজনের আসা বারণ. যোগেন-মা, গোলাপ-মা বিকালে একবার অল্পক্ষণের জন্য মায়ের সংবাদ লইতে আসিতেন। একদিন বিকালে যোগেন-মা আসিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি এখানে এসেছ বলে—খুব রাগ করছিল। বলে, মার ওখানে যাওয়া কেন? আর কি জায়গা ছিল না? মঠে গেলেন না কেন?—ইত্যাদি বলে খুব রাগারাগি করছিল।' মা সব শুনিয়া বলিলেন, '—র এত রাগ কেন? সুধীরা আমার মেয়ে, আমি তার কাছে এসেছি। এত বিদ্বেষ-ভাব ত ভাল নয়। আমি এখানে বেশ শান্তিতে আছি।'

মা যখন আমাদের কাছে নিবেদিতা বোর্ডিং-এ ছিলেন,তখন আমাদের কী আনন্দেই না দিনগুলি কাটিয়াছিল। স্কুল-বাড়ীতে ঠাকুরের শুধু পূজা হইত, ভোগের ব্যবস্থা ছিল না। মা যখন ছিলেন, তখন ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। প্রথম দিন তিনি নিজ হাতে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়াছিলেন। স্কুল বাড়ীতেও মা ২।৩টি মেয়ে-ভক্তকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কিছুদিন থাকার পর রাধুর বায়ুরোগ আবার বাড়িয়া গেল। সে দেশে যাইবার জন্য মাকে অস্থির করিয়া তুলিল। মা কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। সে দেশে যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'এই পাগলা মেয়েকে এই অবস্থায় কি ক'রে দেশে নিয়ে যাই? এখানে বেশ শান্তিতে ছিলাম। এমন মেয়ে মানুষ করেছিলুম—নিজেও শান্তিতে থাকে না, আমাকেও শান্তি দিচ্ছে না, আমার হাড় একেবারে জ্বালিয়ে খেলে।' রাধুকে বলিলেন, 'চল্, তবে তোকে দেশে নিয়েই যাই।' আমাদের বলিলেন, 'কী আর করব মা? আমাকে আর এখানে থাকতে দিলে না।' বোর্ডিং-বাড়ীর

সামনেই একটা গালার কল ছিল। সকালবেলা ওখানে লোকজনের খুব গোলমাল হইত। রাধু ঐ গোলমাল শুনিলেই ক্ষেপিয়া যাইত। তাই মা বিরক্ত হইয়া রাধুকে লইয়া উদ্বোধনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আবার আমাদের বলিতে লাগিলেন,—'মা, আমি এখানে যেমন শান্তিতে ছিলুম, এ-রকম অনেক দিন থাকিনি।' উদ্বোধনে শরৎ মহারাজকে যাইয়া বলিলেন, "আমার দেশে যাওয়াই ঠিক—রাধু যখন কিছুতেই এখানে থাকবে না। এখানে থাকলে ও আরও ক্ষেপে যাবে, আর দিন দেখে কাজ নেই, আমি 'মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা' ক'রে রওনা হয়ে যাই।" মায়ের খুব ইচ্ছা ছিল আমিও সঙ্গে যাই। কিন্তু সুধীরাদি বলিলেন, 'এখনও ত রাধুর ছেলে হতে দেরি আছে মা, তার কিছুদিন আগে সরলা আপনার কাছে যাবে।' মা এত হঠাৎ জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন যে ভক্তেরা পর্যন্ত মায়ের দর্শন পান নাই, সকলেই তজ্জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন। যাইবার সময় মা যোগেন-মাকে বলিয়াছিলেন, 'যোগেন, এবার ঠাকুর এখানে রেখে যাই।' যোগেন-মা উত্তর দিলেন, 'মা, তুমি ঠাকুর ছেড়ে কি থাকতে পারবে? তুমি তো কখনও ঠাকুর ছেড়ে থাকোনি।' মা বলিলেন, 'সে কথা ঠিক।' এই বলিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়াই গেলেন। মার জয়রামবাটী পর্যন্ত যাওয়া হইল না। কোয়াল-পাড়া আশ্রমে যাইয়া রাধু সেখান হইতে আর যাইতে চাহিল না। মা বাধ্য হইয়া সকলকে (রাধু, মাকু, নলিনী ও ছোট মামীকে) লইয়া কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমেই রহিয়া গেলেন। রাধু, মাকু—দুই ভাইঝিই আসন্নপ্রসবা, তাই মায়ের খুব চিন্তা। রাধু জগদম্বা আশ্রমের ঘরেও থাকিতে চাহিল না। কেশবানন্দ স্বামীর পুরানো বাড়ীর একটি গোয়াল-ঘরে যাইয়া রহিল। সেখান হইতে আর কোথাও বাহির হইত না। ঐ জায়গাটি খুব নির্জন ছিল।

মা দেশে যাইবার কিছুদিন পর কাশী সেবা-শ্রমে মেয়েদের ওয়ার্ডে মেয়েরাই সেবা করিবে, এই উদ্দেশ্যে ওখানকার কাজের ভার আমার উপর দিবার জন্য সুধীরাদি, আমাকে সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া যান। কিন্তু মা ব্যস্ত হইয়া কোয়ালপাড়া হইতে চিঠি লিখিলেন, 'যত শীঘ্র হয় সরলাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।' পূঃ শরৎ মহারাজ কালিকানন্দ স্বামীকে জানাইলে তিনি পরদিনই আমাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। আসিবার আগে আমি পূঃ হরি মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। আমি রাধুর সেবার জন্য মায়ের কাছে যাইতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কি গো, মার কাছে যাচ্ছ? বেশ, বেশ, এস। কী মহাশক্তি জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন। যে মনকে আমরা এখানে (নিজের কণ্ঠদেশ দেখাইয়া) ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, সেই মনকে তিনি সেখানে 'রাধু রাধু' ক'রে জোর ক'রে নাবিয়ে রেখেছেন। বোঝ ব্যাপারটি কী। জয় মা মহাশক্তি।'—বলিয়া তিনি বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা আসিয়াই আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এবং মায়ের জন্য ফল মিষ্টি ইত্যাদি আমার সঙ্গে দিলেন। ঐ সময় কৈলাসের পথে গারবিয়াং নামক স্থান হইতে একটি ভুটিয়া মেয়ে আসিয়া স্কুল-বাড়ীতে ছিল। শরৎ মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'এই মেয়েটির নাম রুমা দেবী, এ তোমার সঙ্গে যাবে। তুমি মাকে বলবে—একে দীক্ষা দিতে। ও অনেক দূর থেকে এসেছে।' আমি, রুমা ও অন্য দুইজন ভক্ত সব গোছগাছ করিয়া পরদিন সকালের গাড়ীতে মায়ের কাছে যাইবার জন্য রওনা হইলাম এবং পরদিন সকাল ৯টার সময় কোয়ালপাড়া পৌঁছিলাম। মা বাহিরের ঘরে মেজেতে শুইয়া আছেন। একটু

জ্বরও হইয়াছে। আমরা যাইতেই আনন্দিতা হইয়া বলিলেন, 'মা এলে? দেখো মা, কী ভাবে পড়ে আছি। রাধুকে দেখো মা, কী ভাবে কী হবে? তুমি এসেছো, আমি বাঁচলুম মা।' আমরা প্রণাম করিতেই রুমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই মেয়েটি?' আমি বলিলাম, 'পূঃ মহারাজ আপনাকে চিঠি লিখেছেন। এ কৈলাসের ওদিক থেকে এসেছে, আপনি একে দীক্ষা দেবেন।' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ, শরৎ আমাকে চিঠি দিয়েছে। তা বেশ, কদিন অপেক্ষা করতে বলো, আমি সেরে উঠি, একে দীক্ষা দেবো।'

তারপর রাধুকে দেখিবার জন্য সেই পুরানো বাড়ীতে গোয়াল-ঘরে গেলাম। তাহার বায়ু-রোগ খুব বাড়িয়াছে, তাহাকে একেবারে উন্মাদের মত দেখিলাম। মাকে বলিলাম, 'মা, এ যে বিপরীত কাণ্ড। কলকাতায় এর চেয়ে ত ভাল ছিল।' মা বলিলেন, 'তাই ত মা, কী যে হবে মা, তাই ভাবছি, আমাদের সঙ্গে যে সাধু (স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ) আসিয়াছিলেন, তিনি মায়াবতীতে থাকেন, কথা ছিল তিনিই যাইবার সময় রুমাকে লইয়া যাইবেন। কিন্তু রুমার তখনও দীক্ষা হয় নাই। মাকে ঐকথা বলা হইলে মা সেইদিনেই তাহাকে দীক্ষা দিলেন। সে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিল। দীক্ষার পর যখন রুমা ঘর হইতে বাহির হইল, মনে হইল যেন সে আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মা বলিলেন, 'মেয়েটী বলতেই সব বুঝে নিলো। কোথায় কৈলাস আর কোথায় কোয়ালপাড়া। ঠাকুরের কী কাণ্ড মা।' বলিয়াই হাত জোড় করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় রুমার কী আকুল ক্রন্দন। মাও তাহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামী ছোট একটী সিঙ্গাপুরের আনারস আমার কাছে দিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই আনারসটী সম্পূর্ণ মাকে খাওয়াবে।' আমি মাকে বলিলাম, 'মা, এই আনারসটী সবটা আপনাকে খেতে হবে, মহারাজ বলে দিয়েছেন।' মা খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'রাখাল পাঠিয়েছে, রাখাল পাঠিয়েছে? খাবো বৈকি মা।' দুই দিনে অল্প অল্প করিয়া সত্য সত্যই সম্পূর্ণ আনারসটী মাকে খাওয়াইয়াছিলাম এবং পূঃ রাখাল মহারাজকে সেই খবর জানাইয়াছিলাম।

রাধুর ঐ অবস্থা, তারপর আবার ভক্ত-সমাগম। মাকে সব দিক সামলাইতে হইতেছে। ইহারই মধ্যে আবার জয়রামবাটীতে মামুর শিশু-পুত্র ন্যাড়ার ডিপ্থিরিয়ায় মৃত্যু হয়। ঐ সংবাদ শুনিয়া মা একেবারে সাধারণ মানুষের মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, যেই মনে পড়িল ঠাকুরের ভোগ হয় নাই, রাত হইয়া গিয়াছে এবং ভক্তদের ও আমাদের কাহারও খাওয়া হয় নাই, তখনই উঠিয়া চোখমুখ ধুইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ও মা, এখনও ঠাকুরের ভোগ হয়নি? চল, ঠাকুরের ভোগ দিইগে চল, সব খেতে চল।' যেন কিছুই হয় নাই।

রাধুর বায়ুরোগ একই ভাবে আছে। সে ঐ গোয়াল-ঘর ছাড়িয়া কিছুতেই অন্যত্র যাইবে না। তাহাকে লইয়া ঐরূপ অশান্তি চলিলেও মা থাকাতে আমাদের সব সময়ই আনন্দে কাটিত। একদিন একটি পাখী আসিয়া ঘরের পাশের গাছটিতে বসিয়াছে। মা বালিকার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও পাখী, বলতো রাধুর খোকা হবে না খুকী হবে?' পাখীটি ডাকিয়া উঠিল, 'খোকা, খোকা, খোকা।' মা খুশী হইয়া বলিলেন, 'ও মা, রাধুর তবে খোকা হবে গো।' তার কিছুদিন পরেই রাধুর একটি পুত্রসন্তান হইল। মার কৃপায় সব কিছুই নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। মাও নিশ্চিন্ত হইলেন।

আমার ওখানকার কাজ শেষ হইয়াছে, এদিকে স্কুলে কাজ পড়িয়াছে। সুধীরাদি আমাকে তাড়াতাড়ি স্কুলে ফিরিয়া আসিবার জন্য জানাইলেন। এত তাড়াতাড়ি আমার আসা মায়ের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্কুলের প্রয়োজন শুনিয়া আর আপত্তি করিলেন না। কাশী হইতে শান্তানন্দ স্বামী ও হরানন্দ স্বামী মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মা তাঁহাদের সঙ্গে আমাকে কলিকাতা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

আমার কামারপুকুর দর্শন হয় নাই বলিয়া মা আমাকে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে দিয়া কামারপুকুর দর্শন করিতে পাঠাইলেন। চারিটি টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'দুইটি টাকা রঘুবীরকে ও একটি শীতলা-মাকে দিয়ে প্রণাম করো, আর একটি জয়রামবাটী হয়ে ফিরবার সময় মাকুর যে ছেলে হয়েছে তাকে দিয়ে দেখবে।'

মাকে ছাড়িয়া আসিবার সময় আমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। মাও খুব কাঁদিয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'মা, তুমি তো সব দেখে গেলে, শরৎকে সব ব্যাপার বলো।' যত দূর গাড়ী দেখা যায়, মা অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

মা শ্রাবণ মাসে কোয়ালপাড়া হইতে বাধুদের লইয়া জয়রামবাটি গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াই তাঁহার শরীর আবার বেশী খারাপ হইতে লাগিল। শরৎ মহারাজের কাছে চিঠি আসিল। ইতিমধ্যে কাশী সেবাশ্রমে বিশেষ কাজ পড়ায় তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইল। তাই উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিয়াই মহারাজ মাকে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুব অসুস্থ ও দুর্বল শরীর লইয়া মা উদ্বোধনে আসিলেন।

আমরা স্কুল হইতে যাইয়া মার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম। পূঃ শরৎ মহারাজ মায়ের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, 'তুমি মায়ের সেবার জন্য এসে থাকো।'

আমি আবার মার সেবার জন্য উদ্বোধনে গেলাম, আনন্দ ও কষ্ট দুইই হইল। মায়ের কাছে থাকিব বলিয়া আনন্দ, কিন্তু মার শরীর এত অসুস্থ, কী হইবে,—ভাবিয়া কষ্টও হইল।

কবিরাজী, ডাক্তারী, কোন চিকিৎসাতেই কিছু ফল না হওয়ায় সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পূঃ শরৎ মহারাজ মায়ের কোষ্ঠী পরীক্ষা করাইলেন এবং জ্যোতিষীদের নির্দেশ অনুসারে পনর দিন ব্যাপিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন। অবস্থার কিন্তু কোন উন্নতি দেখা গেল না। ক্রমশঃ মায়ের তাঁহার ভাইঝিদের উপর তীব্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাতে সকলেরই মন খুব বিষণ্ণ হইয়া গেল। মায়ের অসুখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সর্বক্ষণ শরীর জ্বালা করিত বলিয়া সারাদিন তাঁহাকে হাওয়া করা হইত, সুধীরাদি বোর্ডিং-এর মেয়েদের দুইজন করিয়া পালাক্রমে সেবা করিবার জন্য পাঠাইতেন। বাইরের লোকজনের ভিড় মা পছন্দ করিতেন না।

জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ীতে কূয়া খনন করা হইয়াছে। হরিপ্রেম মহারাজ একটি শিশিতে করিয়া তাহার প্রথম জল মায়ের জন্য আনিয়াছিলেন। মা খুব আনন্দের সঙ্গে ঐ জল একটু খাইলেন। কিশোরী মহারাজ মায়ের শোবার ঘর সিমেন্ট করাইতেছেন শুনিয়া মা বলিলেন, 'আমি কি আর জয়রামবাটী যাব?' মা যেন ঐ সময় একেবারে বালিকার মত হইয়া গিয়াছিলেন, আর সর্বক্ষণ 'যাই, যাই' করিতেন। একদিন আমাকে বলিলেন, 'মা, এবার আমি যাই।' ললিতবাবু আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাকেও বলিলেন, 'ললিত, আমি যাই।'

ললিতবাবু বলিলেন, 'মা আমরা কি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, তুমি কেবল যেতে চাইছ?' মা বলিলেন, 'না বাবা, তোমরা কী কষ্ট দেবে? ঠাকুরের কাজ যা, তা তো হয়ে গেছে, আর কেন?' ললিতবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, 'তুমি চলে গেলে আমরা কি ক'রে থাকব?' মা বলিলেন, 'ভয় কি বাবা? ঠাকুর আছেন।' শেষকালে যেদিন শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শরৎ, আমি চললাম, যোগেন, গোলাপ, এরা আর সব রইল, দেখো।'—তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে আনন্দের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।*

* শ্রীশ্রীমা ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭ (২১শে জুলাই, ১৯২০) মঙ্গলবার মহাসমাধি লাভ করেন।

মিনতি*

শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায়

হে প্রভু তোমার চরণে আমার একটি মিনতি শোনো ঃ
অন্যেরে যেন সান্ত্বনা দিই, নিজে নাহি চাই কোনো।
মোর কথা কেহ বুঝিল কি না তা সংবাদ নাহি রাখি
অন্যের কথা, অন্যের ব্যথা, আমি যেন বুঝে থাকি।
আমাকে কে ভালবাসে কি না বাসে, হিসাব না লয়ে কিছু—
মোর ভালবাসা বিতরিতে ফিরি সবাকার পিছু পিছু।
তোমার দয়ায় মনে রাখি যেন ঃ যেবা দেয় প্রাণভরে—
পাওয়ার পাত্র পূর্ণ হইয়া তারই উছলিয়া পড়ে।
মনে রাখি যেন ঃ অন্যের দোষ যতই করিব ক্ষমা—
হাজারো আমার ত্রুটির বদলে তোমার করুণা জমা
তত হবে প্রভু! আরও যেন আমি দিবানিশি মনে রাখি ঃ
পরের জন্য প্রাণ দেওয়া নহে মিথ্যা, সে নহে ফাঁকি ;
সে নহে মৃত্যু, নহে নিবে যাওয়া, সেত নহে অবসান,
তারই মাঝে পাব অবিনশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ!

* St Francis of Assisi-র (সেণ্ট ফ্র্যান্সিসের) ভাবাবলম্বনে।

মহাপীঠ কামাখ্যাধাম

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ভারতবর্ষে তীর্থস্থানের সংখ্যা নগণ্য নহে। অগণিত তীর্থসমূহের মধ্যে একান্নটি পীঠস্থান, কামাখ্যা ইহাদের শীর্ষস্থানীয়। গৌহাটি শহরের অনতিদূরে কামাখ্যা-পর্বত, এই পর্বতের শীর্ষদেশে মহামায়ার—কামাখ্যা মাতার মন্দির, ইহা মহাশক্তিপীঠরূপে গণ্য।

তীর্থস্থান মাত্রেরই কোন না কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মহাশক্তি-পীঠ কামাখ্যার বৈশিষ্ট্য অসাধারণ: কামাখ্যা-মন্দিরে কোন মূর্তি নাই, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নিরবয়ব বিশ্বজননীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। কামাখ্যা-পর্বতের শীর্ষতম দেশে ভুবনেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ভুবনেশ্বরীর সুউচ্চ প্রাঙ্গণ হইতে চতুষ্পার্শ্বের সুবিশাল প্রকৃতির দৃশ্য কখনও ভুলিবার নহে, পৃথিবীর গাত্রদেশে ইহার দ্বিতীয় উপমা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। অনতিদূরে তীক্ষ্ণস্রোত ব্রহ্মপুত্র নদের বিস্তীর্ণ বক্ষের উপর দ্বীপমধ্যে উমানন্দ ভৈরব বিরাজমান। উমানন্দের চারিদিকে অপূর্ব পরিবেশ মনকে আপনা হইতেই ভাবময় রাজ্যে আকর্ষণ করে, সৃষ্টির আদি-অন্তসম্পর্কে মনে জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে, অনন্তের অব্যক্ত সুখস্পর্শ অন্তরকে আলোড়িত করে। উমানন্দ যেন ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া ভুবনেশ্বরীর সান্নিধ্যে ধ্যানমগ্ন হইয়া বিরাজমান। এই দৃশ্যের আকর্ষণ অসাধারণ। ইহার মোহিনী-আকর্ষণে বার বার কামাখ্যা-দর্শনে গিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রথমবার কামাখ্যা-দর্শন কালেই সেখানকার অতুলনীয় ভৌগোলিক পরিবেশ আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে।

১৯৩৭ সালে দ্বিতীয়বার কামাখ্যা দর্শন করি, গৌহাটি পৌঁছিয়া প্রথমে ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে উমানন্দ, অপর পারে অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি মনোরম তীর্থসমূহ নৌকাযোগে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে কামাখ্যা-পর্বতে আরোহণ করি। পাণ্ডা-পরিবারের যুবকদের সংস্পর্শে আসিয়া তন্ত্র-সাধনার প্রধান ক্ষেত্র কামাখ্যা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তৃতীয় বার ১৯৪৮ সালে কামাখ্যা-দর্শনকালে তথায় চারি দিন অবস্থান করি। তখন অবাধে কামাখ্যা-পর্বতের উপর বিচরণ করি এবং সেখানকার প্রকৃতি—গাছ-পালা, জীবজন্তু, পর্বতবাসীদের সামাজিক ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে নিজের কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগ পাই।

মন্দির

কামাখ্যামন্দির প্রস্তরনির্মিত, ইহার বহির্গাত্রে বহু খোদাই-করা মূর্তি আছে কিন্তু অভ্যন্তরে কোন মূর্তি নাই। মূল মন্দিরের সংলগ্ন ভোগ-মন্দির ও নাটমন্দির। এই তিনটি মন্দির জুড়িয়া একটিতে পরিণত হইয়াছে। ভোগ-মন্দিরে প্রধান প্রবেশদ্বার বর্তমান। মন্দির-প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা মর্মর প্রস্তরে আবৃত। প্রবেশদ্বারের দুই দিকে মর্মর পাথরের বেঞ্চ। ভোগমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বামদিকে মূল কামাখ্যা-মন্দিরের সিঁড়ি পাওয়া যায়। দশ বারটি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলে মহাপীঠ দর্শন হয়। মূল পীঠস্থানের অর্থাৎ মহামুদ্রার পার্শ্বে লক্ষ্মী-সরস্বতীর পীঠ। এই দুইটিই সোনার টোপরে আবৃত। পীঠস্থানে অবিরাম গুপ্ত ঝরনার স্রোত প্রবাহিত; জল-

নিষ্কাষণেরও গুপ্ত পথ বিদ্যমান। মূল মন্দিরে প্রবেশকালে উপর দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে ইহার নির্মাণে বিশাল প্রস্তর-ফলক ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের শীর্ষদেশে অর্থাৎ চূড়ায় সোনার কাজ রহিয়াছে।

ভোগমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রাচীর-গাত্রে খোদাই করা একাধিক মূর্তি বিদ্যমান। তাছাড়া অষ্টধাতু-বিনির্মিত একটি দেবীমূর্তিও মধ্যস্থলে বিরাজিতা। নাটমন্দিরে উৎসবাদির সময়ে ভিড় হয়। সেখানে ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী সাধারণতঃ কুমারীপূজা করিয়া থাকেন। কুমারীপূজা কামাখ্যা-তীর্থের একটি বৈশিষ্ট্য।

কামাখ্যা-মন্দিরের চারিদিকে চত্বর। মন্দির-প্রাঙ্গণে বহির্দেশে আম্রতারকেশ্বর সিদ্ধেশ্বর কামেশ্বরাদি শিবমন্দির ও দশমহাবিদ্যার মন্দিরাদি বর্তমান।

মন্দিরগুলিতে প্রস্তর অথবা ঝরনা ব্যতীত কোন মূর্তি নাই। একমাত্র তারার মন্দিরে অতিদীর্ঘ একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। কামেশ্বর মন্দিরমধ্যে গঙ্গা অর্থাৎ ঝরনার জলধারা প্রবাহিতা, এই জল ব্যবহার্য। কামেশ্বর ও ছিন্নমস্তার মন্দিরের দেবস্থান দর্শন করিতে হইলে প্রদীপের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মোট বারোটি মন্দির চোখে পড়ে। তন্মধ্যে একমাত্র বগলার মন্দিরের উপরে টিনের ছাউনি। অন্য-গুলি প্রস্তর-নির্মিত ও প্রাচীন। তাছাড়া 'নর্মট' নামক একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কামাখ্যা-মন্দিরের পশ্চিমদিকে অনতিদূরে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় বর্তমান। তন্ত্র-শাস্ত্রমতে অন্য বহু পবিত্র দেবস্থান বর্তমান, কিন্তু-গুপ্তপীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর পূজা অর্চনাও মহামায়া কামাখ্যার মন্দিরেই সম্পাদিত হয়।

জঙ্গলাকীর্ণ কামাখ্যাপর্বতের স্থানে স্থানে সাধুসন্ন্যাসীদের একাধিক আশ্রম বর্তমান। নির্জন সাধনার পক্ষে আশ্রমগুলি প্রশস্ত বলিয়াই মনে হয়। একমাত্র আত্মজিজ্ঞাসু ও কৌতূহলীরাই ঐ সকল আশ্রমে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কামাখ্যাপর্বতের উপর যথা তথা বিচরণকালে প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে খোদাই-করা মূর্তি চোখে পড়িয়াছে, কারুকার্যখচিত বহু প্রস্তরফলক এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত ও সিঁড়ি সমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। এই প্রস্তর ফলকগুলি মনে হয় কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ। কামাখ্যার এই প্রাচীন ভাস্করশিল্প সম্বন্ধে কোন গবেষণা হইয়াছে কিনা জানিনা, তবে এ সম্বন্ধে তীর্থবাসী-দের ঔৎসুক্য সামান্য বলিয়াই মনে হইল।

মহাপীঠ কামাখ্যার পৌরাণিক ও আধুনিক ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক, আর কামাখ্যা-পর্বতের ভৌগোলিক পরিবেশও বিশেষ উপভোগ্য। ব্রহ্মপুত্র-নদের দক্ষিণ তীরে শৈলমালা-পরিবেষ্টিত প্রাচীনতম ঐতিহাসিক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামক রাজধানীর অর্থাৎ বর্তমান গৌহাটি শহরের দুই মাইল দূরে নৈঋত কোণে কামাখ্যাপর্বতের উপরে মহামায়া কামাখ্যাদেবী বিরাজিতা। কামাখ্যাপর্বতের পৌরাণিক নাম 'নীল শৈল' সতীদেহের যোনি-মহামুদ্রা নীলশৈলের উপর পতিত হইয়াছিল।

ইতিহাস

শ্রীহট্টের স্বনামধন্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পদ্মনাথ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'প্রবন্ধাষ্টক' গ্রন্থে কামাখ্যার ইতিহাস এইরূপ :

'এদেশে বহুকাল হইতে কামাখ্যা-মন্দিরের নির্মাণ ও আবিষ্কারের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই, ভূতপূর্ব কুচ-বিহারাধিপতি বিশ্বসিংহ মেচ ও কোচ জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া কামতাপুর অধিকার করিলে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণ বল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া গৌহাটিতে উপস্থিত হইলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় পরিশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও অনুচরভ্রষ্ট হইয়া নীলশৈলোপরি উপস্থিত হইলেন। অধুনা যেমন এই স্থান বহুজনাকীর্ণ হইয়াছে, তখন এ প্রকার ছিল না। তখন তথায় অতি সামান্য মেচ ও কোচ জাতীয় কতিপয় লোকের আবাসভূমি ছিল। পিপাসিত অনুচরভ্রষ্ট রাজা বিশ্বসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা শিবসিংহ সেই মেচ বস্তিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া তাঁহারা বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক বটবৃক্ষের তলে এক বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। সেইস্থানে একটি মাটির ঢিপিও ছিল, বৃদ্ধা ঐ বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন।

"পথশ্রমে ক্লান্ত ও পিপাসিত ভ্রাতৃদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা তাঁহাদিগের যথোচিত সেবাশুশ্রূষা করিলেন। ভ্রাতৃযুগল ঐ মাটির ঢিপি ও তথায় উত্থিত জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা বলিল, উহা তোমাদের আরাধ্য দেবতা। তচ্ছ্রবণে রাজা ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে প্রণামপূর্বক সহচরগণের সহিত পুনর্মিলনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহামায়ার মাহাত্ম্যে অল্পকাল পরেই রাজসহচরবৃন্দ তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় সেই দেবতার এবম্প্রকার মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেই দেবতার পূজাদি সম্বন্ধে বৃদ্ধাকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন যে, তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে ছাগাদি বলি, সিন্দূর ও স্ত্রীলোকের পরিধেয়, রক্তবস্ত্রালঙ্কারাদি দিতে হয়। ইহা শুনিয়া রাজা মনে মনে অনুমান করিলেন যে ইহা নিশ্চয়ই কোন শক্তিপীঠ। অনন্তর তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে মহামায়ার কৃপায় যদি তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হয়, তাহা হইলে তিনি সোনার মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিবেন।

"রাজা যথারীতি মহামায়ার পূজা করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার পর ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি ভগবতীর এরূপ মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি একটি পণ্ডিত-সভা স্থাপনপূর্বক বহু পণ্ডিত আহ্বান করিয়া তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যন্ত সমস্ত বলিয়া তথায় কোন্ পীঠ অপ্রকটিত আছে তাহা নির্ণয় করিতে বলেন। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্রোদ্‌ঘাটনপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে উক্ত স্থানটি কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান। বৃত্তান্তে কথিত পূজাদির বিবরণ ও রাজার অনুমানের সঙ্গে মিলিয়া যাওয়ায় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল এবং তিনি পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত লোকজন সমভিব্যাহারে সেই পর্বতে গমনপূর্বক পূর্বোক্ত বটগাছটি কাটিয়া তাহার তলায় মাটির ঢিপি ও ঝরনা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে কিছুদিন পরে যোনিমুদ্রা-সহ একখানি পীঠ বাহির করিলেন, পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত মিলিয়া গেল। বৃদ্ধা মহারাজকে যে জল খাওয়াইয়াছিলেন, তাহা মহাসমুদ্রের জল। খনন করিতে করিতে কামাখ্যা-মন্দিরের নিম্নার্ধও বাহির হইল। এবম্প্রকার শাস্ত্র-কথিত তথাকার সমস্ত পীঠ আবিষ্কৃত হইলে পর রাজা মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত অর্ধমন্দিরোপরি অবশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন ও সোনার পরিবর্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে এক রতি করিয়া সোনা দিলেন।

"রাজা বিশ্বসিংহ যে মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খৃঃ) প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। সেই

সময়ে বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ-প্রদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি ভগ্নমন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। ১৫৫৫ সালে (১৪৭৭ শকে) কার্যারম্ভ করিয়া ১৫৬৫ সালে (১৪৮৭ শকে) কার্য শেষ হয়। পরে তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবতী কামাখ্যা দেবীর এবং তদানুষঙ্গিক কামরূপস্থ সমস্ত দেব-দেবীর সেবাপূজাদি নির্বাহার্থ কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় ও নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে ব্রাহ্মণাদি আনাইয়া যথাযোগ্য কার্যে সকলকে নিয়োজিত করেন। এই তীর্থবাসিগণ তদবধি এই স্থানে বাস করিতেছেন। মহারাজ নরনারায়ণের কীর্তিখ্যাপক একটি প্রস্তরফলক কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বারদেশে অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। যে মন্দিরে ভোগমূর্তি (ভ্রমণাদির জন্য ধাতু-বিনির্মিত মূর্তি) বিরাজমান, সেই মন্দির-গাত্রে নরনারায়ণ, তদীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজের মূর্তিযুগলও কীর্তিকাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতেছে।"

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রাজা বিশ্ব-সিংহ পীঠদেশ আবিষ্কার করার সময় পুরাতন একটি মন্দিরের নিম্নার্ধ বাহির হইয়াছিল। সেই মন্দির কখন কে নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় যে তন্ত্রসাধনার এই মাহাত্ম্য-পূর্ণ পীঠস্থানে আরও প্রাচীনকালে মন্দির ও বসতি ছিল।

প্রবাদ আছে যে ভোগরাগাদির সময়ে দেবী ভগবতী মন্দিরে প্রকটিত হইতেন। রাজা নরনারায়ণ পূজারীর নিষেধসত্ত্বেও লুকাইয়া দেবীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে মহামায়া কামাখ্যার অভিশাপে কুচ-বিহারের রাজার বংশধরগণ এই মহাপীঠ দর্শনে বঞ্চিত আছেন।

আরোহণ-পথ

কামাখ্যা-পর্বতে আরোহণ করিবার কয়েকটি পথ বিদ্যমান। সম্প্রতি জাতীয় সরকার বহু অর্থব্যয়ে যাত্রী-সাধারণের সুবিধার জন্য একটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

গৌহাটি হইতে কামাখ্যা-মন্দিরে যাইবার রাস্তাটিতে প্রস্তরময় সিঁড়ি রহিয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন পথ। ইহার দুই পার্শ্বে সাধু-সন্ন্যাসীদের কুটির দেখিতে পাওয়া যায়। সারি-বদ্ধ অতি প্রাচীন গোলঞ্চ-ফুলের গাছ রাস্তার দুইদিকে শোভা পাইতেছে। উপরে উঠিবার এই রাস্তাটি এক মাইল দীর্ঘ।

অন্য রাস্তাটি পাণ্ডু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 'গণেশ' নামক স্থান পর্যন্ত রাস্তাটি কাঁচা অর্থাৎ মেটে। গণেশ-স্থানটিতে একটি বিরাট গণেশের প্রস্তরময় মূর্তি আছে। গণেশ হইতে উপরে উঠিবার পথ দুইটি—একটি মেটে, অপরটিতে পাথরের সিঁড়ি বর্তমান।

পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্র-ঘাট হইতে উপরে উঠিবার পথও একটি আছে। যে সকল যাত্রী উমানন্দ ভৈরব ও অশ্বক্রান্ত দর্শন করিয়া নৌকা-যোগে এই ঘাটে অবতরণ করেন, তাঁহাদিগকে এই পথ বাহিয়াই মন্দিরদেশে যাইতে হয়। রাস্তাটি প্রাচীন ও মেটে কিন্তু চলিবার পক্ষে ভাল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পথটি উপরে উঠিয়াছে, কোন স্থানই খাড়া নহে, সেজন্য চলার ক্লান্তি অপেক্ষাকৃত কম অনুভূত হয়। আমিনগাঁও ও পাণ্ডু হইতে নৌকাযোগে এ ঘাটে পৌছিয়া উপরে আসা যায়। কামাখ্যা-পর্বতবাসীরা প্রয়োজনের তাগিদে দিনে কখনও দুই-তিনবার ঐ সকল পথে যাতায়াত করেন। বলা বাহুল্য অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে এক মাইল খাড়াই পথ বাহিয়া চলাফেরা করা মোটেই সহজ নয়।

কুণ্ড ও ঝরনা

কামাখ্যা-পর্বতের উপরে কয়েকটি কুণ্ড আছে। অমৃতকুণ্ড, ঋণমোচন-কুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, সৌভাগ্য-কুণ্ড, গয়াকুণ্ড, ভৈরবীকুণ্ড ও চন্দ্রাবতী পুষ্করিণী। ময়মনসিংহের সেরপুরের রাণী তারামণি অমৃতকুণ্ড খনন করাইয়াছিলেন। চন্দ্রাবতী-পুষ্করিণীটি ভাগলপুরের মহারাজার পুত্রবধূ চন্দ্রাবতী খনন করাইয়াছিলেন। অন্যান্য কুণ্ড কে কখন খনন করাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। প্রাচীন-কালে পর্বতের উপরে জলাভাব ছিল। তাহা মিটাইবার জন্যই কুণ্ডসমূহ নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু কুণ্ডের জল পানোপযোগী নয়। অবশ্য পর্বতগাত্রে কয়েকটি ঝরনা বিদ্যমান, ইহাদের জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ইদানীং দুইটি পাকা ও একটি কাঁচা কূয়া খনন করা হইয়াছে। কিন্তু পর্বতবাসীদের জলাভাব এখনও দূরীভূত হয় নাই। বড় বড় উৎসব উপলক্ষে যখন সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়, তখন জলকষ্টের আর অবধি থাকে না।

কুণ্ডসমূহের মধ্যে সৌভাগ্যকুণ্ডটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার ঘাট পাথরে বাঁধাই করা এবং ইহার জলে পুণ্যকামী যাত্রী-গণ শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া সৌভাগ্য কামনা করিয়া থাকেন। ইহার জলে পাঁচ ছয় শত বৎসরের কচ্ছপ আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

জীবজন্তু ও গাছপালা

পূর্বেই বলিয়াছি—তৃতীয়বার কামাখ্যা-দর্শন-কালে চারদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অনতিকাল পরে পাণ্ডার অতিথিশালায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। পথক্লান্তিতে রাত্রিবেলা বেশ সুনিদ্রা হয়। অতি প্রত্যূষে ধুপধাপ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। দরজা খুলিয়া দেখি, বিরাট বাঁদরের দল সদর্পে ও সশব্দে ঘরবাড়ী প্রকম্পিত করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে যাইতেছে। বাঁদর সেখানকার অধিবাসীদের প্রভূত ক্ষতি করে। ফলমূল ও তরকারি যথারীতি ফলাইয়াও অধিবাসীরা সামান্যই ভোগ করিতে পারে। কিন্তু কেহই পর্বত হইতে বাঁদর তাড়াইবার চিন্তা করে না।

কামাখ্যা-পর্বতের উপরে ঘুরিবার কালে দুইটি বাঘের ফাঁদও চোখে পড়িয়াছে। এক সময়ে সেখানে বাঘের উপদ্রব ছিল। এখনও কদাচিৎ দুই একটা বাঘ ফাঁদে ধরা পড়ে। ভুবনেশ্বরীর মন্দির-পথে চলিবার কালে একটি পাতা ফাঁদ চোখে পড়িয়াছিল, কামাখ্যা-পর্বতের পশ্চিমাঞ্চলে জঙ্গলমধ্যে আর একটি ফাঁদ দেখিতে পাইয়াছিলাম। পর্বতের উপর হরিণও আছে। উল্লেখযোগ্য এই যে কামাখ্যা-পূজায় ছাগ ও শ্বেত পারাবত অনেক সময় উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু বলি দেওয়া হয় না। সেজন্য মন্দিরের ছাদে সিঁদুর-পরা বহু শ্বেত পারাবত দেখা যায়। উৎসর্গীকৃত ছাগগুলিকে দিনকয়েক লোকজনের রক্ষণাবেক্ষণে রাখা হয়। ক্রমে নির্জন পর্বতে ছাগগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেজন্য অর্ধবন্য বহু ছাগ এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কামাখ্যা-পর্বতের উপরে বহু নারিকেল গাছ দেখা যায়। এক স্থানে একটি প্রাচীন কালের বাগানও আমার চোখে পড়িয়াছে। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, পীচ, বদরী, জলপাই, তেঁতুল, বাতাবিলেবু, লেবু, ডালিম, পেঁপে প্রভৃতি ফল—যাহা সচরাচর আসামের ভূমিতে জন্মায়, সকলই পর্বতে বর্তমান। কিন্তু বাঁদরের উৎপাতে সকল গাছের ফল সেখানকার অধিবাসীরা উপ-ভোগ করিতে পারে না। বন্য গাছ-গাছড়াও অসংখ্য।

এই মহাশক্তিপীঠে পূজা-অর্চনা সর্বদাই লাগিয়া আছে। দূর দেশান্তর হইতে বহু যাত্রী

কামাখ্যা-দর্শনে গিয়া থাকেন। সেজন্য এখানে ফুলের চাহিদাও অসামান্য। মন্দির-প্রাঙ্গণে ফুল-বিক্রেতারা বিভিন্ন ফুলের পসরা লইয়া বাজার বসায় এবং নির্দিষ্ট হারে ফুল বিক্রয় করে। কামাখ্যা-পর্বতবাসী একদল ফুলমালী একমাত্র ফুলের ব্যবসা দ্বারাই জীবিকা অর্জন করে। পর্বতগাত্রে গোলঞ্চ-ফুলের গাছ অসংখ্য। দর্শনার্থী মাত্রেরই তাহা চোখে পড়ে। তাছাড়া মালতী, গোলাপ, যূঁথি, বকুল, চাঁপা, নাগেশ্বর, জবা, করবী, টগর, কেতকী, শেফালী, কামিনী, গাঁদা প্রভৃতি বহুবিধ ফুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। মালীরা সযত্নে বাগান করিয়া থাকে। তবু পূজার্থীদের ফুলের চাহিদা মিটাইবার জন্য পর্বতের নিম্ন দেশের বাগান হইতে মালীরা ফুল সংগ্রহ করে।

পর্ব ও উৎসব

এই শক্তিপীঠের প্রধান পর্ব অম্বুবাচী। তখন মন্দিরের চারিদিকে মেলা বসে। বহু সাধুসন্ত ও সহস্র সহস্র যাত্রী অম্বুবাচীর মেলায় সমবেত হন। অন্যান্য পর্ব ও যোগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'দেবধ্বনি,' দুর্গোৎসব, পুষ্যাভিষেক ও বাসন্তীপূজা। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে পুণ্যকামী স্নানার্থীর বিপুল সমাগম হয়। যাত্রীরা স্নানান্তে কামাখ্যা দর্শন করিয়া থাকেন।

'দেবধ্বনি' উৎসবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ পঞ্জিকায় ইহার উল্লেখ নাই। এই উৎসবকালে পীঠস্থানের কায়স্থ অধিবাসীদের কাহারও কাহারও মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ ঘটে। ফুলমালা, সিন্দূর ও ধূপকাঠি ধারণ করিয়া দৈবশক্তিসম্পন্ন কায়স্থগণ বিশেষ ধরনের গীত ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তখন কেহ কেহ দৈববাণী করেন। কামরূপে বহু যাত্রী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

জনবসতি ও সমাজ-জীবন

কামাখ্যা-পর্বতে তিন সহস্র লোকের বাস। প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণ ও পাঁচশত কায়স্থ পরিবার দ্বারা কামাখ্যার সমাজ গঠিত। মায়ের মন্দিরের উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ-বসতি, পশ্চিমদিকে ফুলমালী ও নাপিতদের পাড়া। দক্ষিণে কায়স্থ-পাড়াটি 'হেমতলা' বলিয়া খ্যাত। পূর্বে পর্বতের উচ্চতম দেশে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। সেখানে যাইবার পথের পার্শ্বে দারভাঙ্গার মহারাজের একটি বাংলো আছে। কামাখ্যার অধিবাসীদের একজনও নিরক্ষর নয়। পাণ্ডাদের সৌজন্য ও অতিথেয়তা সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। সমাজ-জীবনে এতগুলি গুণের বিকাশ নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়।

কামাখ্যা-পর্বতের নীচে সমতলভূমির বৃহত্তর লোকসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন পার্বতবাসীদের সমাজ-জীবন স্বভাবতই কতকটা স্বতন্ত্র ধরনের। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা শাস্ত্রীয় বিধান-মতে এই শক্তি-পীঠের পূজা-অর্চনাদির জন্য কান্যকুব্জ, কাশী প্রভৃতি হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ-পরিবার আনাইয়া কামাখ্যা-পর্বতের উপরে বসতি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বর্তমান পাণ্ডাসমাজ তাঁহাদেরই উত্তর-পুরুষ। বৈবাহিক যোগসূত্র বহির্জগতের সঙ্গে নাই বলিলেই চলে। যজন-যাজন ও অধ্যাপন ইহাদের কাজ। কিন্তু বহির্জগতের প্রগতিও পর্বতবাসীদের জীবনে ক্রিয়াশীল। ইহার কারণ, সর্বভারতের সর্বশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ হিন্দু কামাখ্যা-দর্শনে গিয়া থাকেন। যাত্রী সংস্পর্শে পাণ্ডারাও বহির্জগতের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। অথচ বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ভৌগোলিক ব্যবধান বর্তমান থাকায় কামাখ্যার সমাজ-জীবনের কতক-গুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উচ্চশিক্ষিত পাণ্ডা-পরিবারে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ডাক্তারি, ওকালতি বা শিক্ষকতা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কেহ কেহ বিদেশে গমনও

করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শারদাচরণ শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন।

কামাখ্যা-পর্বতের উপরে পাঠশালা, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল আছে। একটি প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় বিদ্যমান, ইহাতে ছাত্রীর সংখ্যাও অনেক।

লেখাপড়া-জানা অনেক পর্বতবাসী ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিসে কাজ করেন। ক্রমবর্ধমান পর্বতবাসীর পক্ষে নিছক পৈতৃক জীবিকার উপর নির্ভরশীল হইয়া সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ফলে আমার ধারণা হইয়াছে যে পৈতৃক ব্যবসায়ে অনেকেই বিমুখ হইয়া উঠিতেছেন। বহির্জগৎ তাহাদিগকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছে।

কামাখ্যার শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষা প্রগতির ধারক বলা চলে। তাহাদের উদ্যোগে 'কামাখ্যা সমাজ-মঙ্গল-সমিতি' স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাপীঠদেশের রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা ও অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে এই সমিতি অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রচুর কাজ করিয়া থাকে। সমিতির সভ্যদের সমবেত প্রচেষ্টায় পাথর ভাঙ্গা, রাস্তা তৈরি ও মেরামত, নূতন নূতন নালা তৈরি ও পরিষ্কারের কাজ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। পাণ্ডা-সমাজের এই সমবেত শ্রম-পরায়ণতা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই সমিতির উদ্যোগে কামাখ্যা-পর্বতের উপরে একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে। পর্বতবাসীদের শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধনে ইহার দান অসামান্য।

সমগ্র ভারতের উন্নতি আজ সকলেরই কাম্য! কিন্তু স্বাধীন ভারতে আজও প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। দেশের হিতকামী সকলকেই আজ প্রাদেশিকতার বিষময় ফল সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। একদা ভারতের তীর্থসমূহই ছিল সবপ্রদেশের অধিবাসীদের প্রকৃত মিলনক্ষেত্র। এদেশবাসীর হৃদয়তীর্থে সেই মিলনশক্তির বাণী আজও কি পৌছে নাই?

'ত্বয়া হৃষীকেশ—'

শ্রীদিলীপকুমার রায়

'হৃদয়ে থেকে যাবে যেমনি, হৃষীকেশ, চালাও—জীবনে সে তেমনি চলে'
কহিল রাজা, 'তাই গোবধও করালে হে আমাকে দিয়ে নাথ, মৃগয়াছলে।'
ভাবিত হৃষীকেশ বিপ্ররূপ ধরি মিষ্ট সুরে পুছে: 'বলো তো রাজা,
বিশাল রাজধানী রচিল কে সে?'—'আমি।'—'চোর পাপিষ্ঠেরে কে দেয় সাজা
'কে আর আমি ছাড়া?' —হাসিল রাজা।—'মরি, রচিল কে বা ঐ স্বর্ণবেদী?'
'সে আমি।' 'মগধের বালা স্বয়ংবরা?'—'আমিই জিনিয়াছি লক্ষ্য ভেদি।'
'চণ্ডে কে শাসিল?'—'আমারি কীর্তি যে—শোনো নি?'—'শুনেছি গো,' শ্রীহরি বলে,
'কীর্তি সবি তব—কেবল গোবধেরি অকীর্তিটি হৃষীকেশের গলে।'

পদ্মপুরাণ

[উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা]

অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায

প্রাচীন কাল হইতে যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ হিন্দু-ধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে তন্মধ্যে পুরাণের স্থান বেদের পরেই। আধুনিক গবেষণানুযায়ী প্রচলিত পুবাণসমূহের অতি অল্প কয়টিরই উৎপত্তি অতি প্রাচীনকালে হইযাছে, কিন্তু পুবাণসাহিত্যের মূল সন্ধান বেদসংহিতাব উদ্ভবকালেই পাওয়া যায়। অথর্ববেদের দুইটি সূক্তে 'পুবাণ' কথাটিব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, একটিতে (একাদশ—অধ্যায় ৭ ২৪) ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুঃর ন্যায় ইহারও উৎপত্তি অতি পবিত্র বলা হইয়াছে, অন্যটিতে (পঞ্চদশ অধ্যায়—৬ ১১-১২) 'ইতিহাসের' সহিত পুরাণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

বহু বৈদিক সাহিত্যে যেমন শতপথব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ, বৃহদা-বণ্যকোপনিষদ্ ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ তৈত্তিরীয়-আবণ্যক, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতিতে কথনও 'ইতিহাসেব' সহিত, কথনও বা স্বতন্ত্রভাবে পুরাণেব বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যেভাবে পুরাণ ও ইতিহাসেব নাম উহাতে উক্ত হইযাছে তাহাতে এগুলি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধাবণা করা খুবই দুরূহ।

উপরে কথিত গ্রন্থসমূহে পুরাণ ও ইতিহাসেব যুক্ত উল্লেখ হইতে মনে হয় যে উভয় শব্দই বহু প্রাচীনকালের কাহিনী সম্পর্কে প্রযোজ্য হইত, সম্ভবতঃ 'ইতিহাস' বলিতে প্রাচীন উপাখ্যান ও জনপ্রিয় গাথা এবং পুরাণ বলিতে প্রাচীন গল্প ও আখ্যান বুঝাইত। যাহা হউক বৈদিক যুগে কোন বিশেষ শ্রেণীর কাহিনী বুঝাইতে যে 'পুরাণ' বা 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ হইত না, তাহা বোঝা যায়।

শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌতসূত্রেব টীকাতে বরদত্তসূত আনর্ত্তীয় একটি সূত্রে (ষোড়শ অধ্যায় ২'২৭) উল্লিখিত 'পুবাণ' বথাটি 'বাযুপ্রোক্ত' পুরাণ (বাযুপুবাণ) বলিযা ধরিযাছেন, কিন্তু এই টীকাকার খুব প্রাচীন নহেন বলিযা তাঁহার মতামত বিশেষ গ্রাহ্য নহে। একজন পণ্ডিত[১] মনে কবেন—অথর্ববেদে (নবম ৫ ১৯৯) কথোপ-কথনকাবীরূপে নাবদের উপস্থিতিব পরিকল্পনা পুবাণ হইতে লওয়া হইযাছে। পঞ্চবিধলক্ষণযুক্ত এই পুরাণসমূহের উদ্ভবকালকে যত প্রাচীনই মনে করা হউক না কেন, ইহা কথনই বৈদিক যুগে হইতে পারে না।

পুরাণেব উল্লেখ বেদ ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়,[২] কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই প্রাচীন

---

১ ভি আর, রামচন্দ্র দীক্ষিতর—The Purana Index Vol I ভূমিকা পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য।

২ রামায়ণ (বঙ্গবাসী প্রেস সংস্করণ) ষষ্ঠ সর্গ ১০৯ ৩, সপ্তম সর্গ ৪৩ ১, ৪৭ ২৪, ৭২ ৪- প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক দুইটিতে হয়ত পৌরাণিক সাহিত্য বুঝাইতে 'পুরাণ' কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ—৯, ১—২

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ যথা শ্রুতম্॥
ঋত্বিগ্ ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্॥

অমরেশ্বর ঠাকুরসম্পাদিত রামায়ণে ঐ শ্লোক দুইটি এইরূপ :

এবমুক্তো নৃপতিনা সুমন্ত্রো বাক্যমব্রবীৎ।
নরেন্দ্র শ্রূয়তাং তাবৎ পুরাণে যন্ময়া শ্রুতম্॥
সনৎকুমারো ভগবান্ যথাবৎ প্রোক্তবান্ পুরা।
ভবিষ্যং বিদুষাং মধ্যে তব পুত্রসমুদ্ভবম্॥

উপকথা বা আখ্যান বুঝাইতেই 'পুরাণ' কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে, বিশেষ কোন 'পুরাণ' গ্রন্থ বুঝাইতে নহে।

'পুরাণৈশ্চৈব বেদৈশ্চ পঞ্চরাত্রৈস্তথৈব বা।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্ ॥'[৩]

এই শ্লোকটিতে 'পুরাণ' শব্দটির বহুবচনে প্রয়োগ পুরাণ-সাহিত্যের বহুলতা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু 'পুরাণের' প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য বিচারকালে এই শ্লোকটির উত্তরকাণ্ডে[৪] অবস্থিতি এবং পাঞ্চরাত্রের উল্লেখ ইহার মূল্য বহু পরিমাণে কমাইয়া দেয়, কারণ রামায়ণের অধিকাংশ সংস্করণেই[৫] উত্তরকাণ্ডকে কৃত্রিম বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রামায়ণের মত মহাভারতেও 'পুরাণ' শব্দটি প্রায় প্রাচীন আখ্যান ও উপকথা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গ্রন্থ বুঝাইতেই 'পুরাণ' কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে।[৬] মহাভারত-কার যে পুরাণসমূহকে উহাদের উন্নতির কালে অথবা অন্য কোন অবস্থায় জানিতেন তাহা যে শুধু উহার দুইটি শ্লোকে[৭] পরোক্ষে মার্কণ্ডেয় পুরাণের উল্লেখ হইতে বোঝা যায় তাহা নহে, অন্যত্রও 'বায়ুপ্রোক্ত পুরাণ' (বায়ুপুরাণ) এবং 'মাৎস্যক পুরাণের' (মৎস্য-পুরাণ) কিছু কিছু বর্ণনীয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৮] যদিও মহাভারতে বর্ণিত ঐ অংশ-সমূহের অতি অল্পই বর্তমান বায়ু[৯] ও মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায় তবু মহাভারতের ঐ অংশ রচনা-কালে এই দুইটি পুরাণগ্রন্থ যে বহু প্রচলিত ছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য মহাভারতে পুরাণসমূহের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে মহাভারত

গোরেসিও-সম্পাদিত বাংলা সংস্করণের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'পুরাণে'র স্থলে 'পুরাণম্' রহিয়াছে। ভগবদ্ দত্ত এবং গল্ এ শ্লে_জেলের উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গদেশীয় সংস্করণের তৃতীয় পংক্তিতে 'সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা কথিতবান্ কথাম্' রহিয়াছে।

পুরাণে সুমহৎ কার্যং ভবিষ্যং হি ময়া শ্রুতম্।
দৃষ্টং মে তপসা চৈব শ্রুত্বা চ বিদিতং মম ॥

(টি আর কৃষ্ণাচার্যের সংস্করণ—চতুর্থ সর্গ ৬২ ৩ এবং বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রীর সংস্করণ চতুর্থ সর্গ ৫৪ ৪ দ্রষ্টব্য)

৩ রামায়ণ—সপ্তম ৫৩ ১৬, 'পঞ্চরাত্রৈঃ' স্থলে টি আর কৃষ্ণচার্য সংস্করণে 'পাঞ্চরাত্রৈঃ' পাঠ আছে।

৪ রামায়ণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ মনে করেন যে সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ডই পরবর্তীযুগে রামায়ণের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

৫ টি. আর. কৃষ্ণাচার্য সংস্করণ (উত্তরকাণ্ড—প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৭) এবং বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী সংস্করণ (উত্তর কাণ্ড—১৫৭ পৃঃ)

৬ মহাভারত (বঙ্গবাসী সংস্করণ) চতুর্থ ৫১, ১০ ক দ্রষ্টব্য: 'বেদান্তাশ্চ পুরাণানি ইতিহাসং পুরাতনম্ ॥'

একাদশ ১৩২—বাক্যন্ধীতা বেদান্তে শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
শ্রুতানি চ পুরাণানি রাজ-ধর্মাশ্চ কেবলাঃ ॥

দ্বাদশ—২৯৪ ৭, ৩৩৪ ২৫, ৩৩৯, ১০৬ এবং ৩৪১ ৬ দ্রষ্টব্য।

৭ ঐ এক—২ ১৯৩ 'মার্কণ্ডেয় সমস্যা চ পুরাণং পরিকীর্ত্যতে।

ঐ তৃতীয় —১৯১, ৩৫ (পুনা সংস্করণ তৃতীয় ১৮৯, ৩১)
তথা কথাং শুভাং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
বিস্মিতাঃ সমপদ্যন্ত পুরাণস্য নিবেদনাৎ ॥

পুনা সংস্করণে প্রথম পঙ্ক্তিটি (মার্কণ্ডেয় সমস্যা চ) নাই।

৮ মহাভারত তৃতীয় ১৯১ দ্রষ্টব্য (বিশেষতঃ ১৬নং শ্লোক)
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতমতীতা নাগতং ময়া।
বায়ুপ্রোক্তমনুস্মৃত্য পুরাণমৃষি-সংস্তুতম্ ॥

ঐ তৃতীয় ১৮৭ দ্রষ্টব্য ৫৬ খ-৫৭ শ্লোক—
তপসা মহতা উক্তঃ সোঽথ স্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥
"সর্বাঃ প্রজাঃ মনুঃ সাক্ষাদ্ যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
ইত্যেতন্ মাৎস্যকং নাম পুরাণং পরিকীর্তিতম্ ॥

উপরের পঙ্ক্তি পাঁচটি পুনা সংস্করণ তৃতীয় ১৮৯ ১৪ এবং তৃতীয় ১৮৫.৫২, ৫৩ ক দ্রষ্টব্য।

(৯) মহাভারতে (তৃতীয় ১৯১) 'বায়ুপ্রোক্ত পুরাণে'র উল্লেখ—ভি এস্ সুকৃথংকর-রচিত-'আরণ্যক পর্বন্' (পুনা)-এর ভূমিকা (পৃঃ ১৫) দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ পুরাণের বিধিসমূহের সহিত পরিচিত ছিল। স্বর্গারোহণ-পর্বের যে তিনটি শ্লোকে (৫ ৪৫, ৪৬ এবং ৬ ৯৪) অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহা মহাভারতের সব সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপিতে নাই, কাজেই এইগুলির প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।[১০] অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ সম্পর্কে 'হরিবংশের তৃতীয় শ্লোক (তৃতীয়-১৩৫) সম্বন্ধেও এই এক কথাই প্রযোজ্য।[১১]

উপরে আলোচিত রামায়ণও মহাভারতের সাক্ষ্য হইতে খৃষ্টজন্মের পূর্বেই পুরাণের উৎপত্তি প্রমাণিত হইলেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু কয়েকটি গ্রন্থে খৃষ্টজন্মের বহুপূর্বেই পুরাণের অবস্থিতি যথার্থরূপে প্রমাণিত হয়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ—৬০০ হইতে ৪০০[১২] মধ্যে রচিত 'গৌতম-ধর্মসূত্র' যদিও নির্দিষ্টরূপে কোন পুরাণ-গ্রন্থের নাম করে নাই, তথাপি দুইটি স্থলে 'পুরাণ' কথাটির উল্লেখ করিয়াছে,[১৩] এবং তাহার মধ্যে অন্ততঃ একবার নির্দিষ্ট কোন পুরাণ-গ্রন্থ বা গ্রন্থসমূহ বুঝাইতে গৌতম 'পুরা' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। 'গৌতম-ধর্মসূত্রের' পর কিন্তু ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দের[১৫] পূর্বে রচিত 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে' পুরাণ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃতি আছে এবং এক ক্ষেত্রে স্পষ্টতই 'ভবিষ্যৎ পুরাণে'র উল্লেখ আছে, যাহা নিশ্চয়ই বর্তমান 'ভবিষ্য পুরাণের' প্রাচীন সংস্করণ হইবে। কিন্তু আপস্তম্ব উদ্ধৃত 'ভবিষ্যৎ পুরাণের' দুইটি পঙ্ক্তি 'ভবিষ্য পুরাণ' বা অন্য কোন প্রচলিত পুরাণে পাওয়া যায় না।[১৫] 'পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি' পঙ্ক্তিটির অনুরূপ একটি পঙ্ক্তি বায়ু-পুরাণে[১৬] পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা হইতেই আপস্তম্ব বায়ু পুরাণ জানিতেন কিন্তু ভ্রমবশতঃ 'বায়ু' লিখিতে 'ভবিষ্যৎ' লিখিয়াছেন মনে করা সমীচীন হইবে না। ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতাদের মধ্যে মনু 'পুরাণ' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করিয়াছেন[১৭] এবং মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, কুল্লুক ভট্ট এবং অন্যান্যদের মতে এই কথাটির অর্থ হইল—ব্রহ্মা এবং পঞ্চবিধ লক্ষণযুক্ত অন্যান্য পুরাণসমূহ।[১৮] স্মৃতি-গ্রন্থের টীকা এবং নিবন্ধসমূহে উল্লিখিত ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা বৃহস্পতির একটি শ্লোক পাওয়া যায়, উহাতে ধর্ম ও অর্থ শাস্ত্রের সহিত পুরাণ শব্দটিও বিশেষ কোন গ্রন্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে চতুর্দশ ধর্মের সহিত পুরাণের নামও যুক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির

১০, ১১ আর সি হাজরা-রচিত Puranic Records on Hindu Rites and Customs (পৃঃ ২৩ পুস্তকে মহাভারত এবং হরিবংশের উক্ত শ্লোকগুলির প্রামাণ্য পূর্ণ আলোচিত হইয়াছে।

১২ পি. ভি কানে, History of Dharmasastra, I, পৃঃ ৪৫।

১৩ গৌতম ধর্মসূত্র ৮'৬ (বাকোবাক্যেতিহাস পুরাণ কুশলঃ) এবং ১১ ১৯ (তস্য চ ব্যবহারোবেদো ধর্মশাস্ত্রাণি অঙ্গান্যুপবেদাঃ পুরাণম্)। গৌতম ধর্মসূত্রের টীকাতে হরদত্ত এবং মস্করি উভয়েই গৌতম-ব্যবহৃত 'পুরাণ' শব্দটিকে ব্রহ্ম, ব্রহ্মার্থ ও অন্যান্য পুরাণ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৪ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এ জি বুলের এই পঙ্ক্তিগুলি 'ভবিষ্য পুরাণে' খুঁজিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। Indian Antiquary, ১৮৯৬ পৃঃ ৩২৩—২৮ দ্রষ্টব্য।

১৫ দ্রষ্টব্য বায়ুপুরাণ ৮.২৪ থ (আনন্দাশ্রম, সংস্করণ) (প্রবর্তন্তি (ন্তে) পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি)।

১৭ স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥ ৩২৩২

১৮ মেধাতিথির টীকা দ্রষ্টব্য—পুরাণানি ব্যাসাদি-প্রণীতানি সৃষ্ট্যাদিবর্ণনরূপাণি।' কুল্লুকভট্টের টীকা—'পুরাণানি ব্রহ্মা পুরাণাদীনি' প্রভৃতি।

১৯ 'পূর্বাহ্নে তামধিষ্ঠায় বৃদ্ধামাত্যানুজীবিভিঃ। পশ্যেৎ পুরাণধর্মার্থ শাস্ত্রাণি শৃণুয়াৎ তথা॥ ১ ১১৫ বৃহস্পতি স্মৃতি (কে.ভি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার কর্তৃক পরিশোধিত—গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ নং LXXXV)

প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরার্কের মতে যাজ্ঞবল্ক্য-লিখিত শ্লোকে 'পুরাণ' শব্দটি ব্রহ্ম ও অন্য পুরাণসমূহ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।[২০] যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির আরও তিনটি শ্লোকে[২১] 'পুরাণ' শব্দটির উল্লেখ আছে এবং সর্বত্রই টীকাকারগণ কোন নির্দিষ্ট পুরাণগ্রন্থ[২২] বুঝাইতেই আলোচ্য শব্দটির প্রযোগ দেখাইয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য 'পুরাণ' শব্দটি পুরাণ সাহিত্য বুঝাইতেই ব্যবহার করিয়াছেন।[২৩] একক্ষেত্রে 'পৌরাণিক সূত'[২৪] শব্দের উল্লেখ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে কৌটিল্য সূতদের প্রথম উৎপত্তি ও কর্তব্য সম্পূর্ণ-রূপে অবগত ছিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত পুরাণ-গুলিতে পুরাণকারদের বর্ণনীয় বিষয়ের প্রধান অংশই এই সূতগণ অধিকার করিয়াছে। কৌটিল্যের আমলে পুরাণ-পঠন অতীব জনপ্রিয় ছিল, কারণ তাহার একটি বিবরণীতে দেখি পুরাণ-অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজকোষাগার হইতে সহস্র পণ[২৫] বৃত্তিলাভ করিতেন এবং এইরূপে রাজদরবারে বিশেষ স্থান লাভ করিতেন। পৌরাণিক সূত এবং মাগধ সম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র ও তৎকালে প্রচলিত পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান প্রমাণ করে। 'পুরাণ' সম্পর্কে অনুরূপ চিত্তাকর্ষক সংবাদ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়; সেখানে ভরত 'ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি'র প্রদর্শনকালে পূর্ব ভারতের অনেক স্থানের নাম করিয়াছেন, পুরাণে ইহা ও উহার অন্যান্য অংশ বলা হইত—তাহাও দেখাইয়াছেন।[২৬] অন্যত্র ভরত ভারতবর্ষকে 'কার্যক্ষেত্র' বলিয়াছেন এবং বিভিন্ন বর্ষে (দেশে)[২৭] পর্বতসমূহের অবস্থানের উল্লেখ পুরাণের উক্তি হইতে করিয়াছেন। সপ্তবিংশতি সর্গে 'পুরাণ' শব্দটির বহুবচনে উল্লেখ—ভরতের পুরাণকে ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ-হিসাবে মানিবার প্রয়াস ভিন্ন অন্য কিছু নহে।[২৮]

পুরাণ-সাহিত্যের উৎপত্তি যে অতি প্রাচীন কালে, তাহা বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ হইতেও জানা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ 'ললিত-বিস্তরে'র নাম করা যাইতে পারে, ইহাকে একটি মুদ্রিত

---

২০ দ্রষ্টব্য—বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরার্কের টীকা (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১ ৩)

২১ দ্রষ্টব্য—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১ ৪৫ ('বাকোবাক্যং পুরাণং চ' প্রভৃতি), ১.১০১ ('বেদার্থা পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ' প্রভৃতি) এবং তৃতীয় ১৮৯—যতো বেদাঃ পুরাণানি—প্রভৃতি।

২২ বিশ্বরূপ, বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরার্কের টীকা দ্রষ্টব্য

২৩ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (আর সমশাস্ত্রীর সংস্করণ—মহীশূর ১৯২৪) ১ ৫ ৩.৭ ৫ ৩ (পৃঃ ২৪৭), ৫ ৬ (পৃ. ২৫৭) এবং ১৩ ১ (পৃঃ ৩৯৫)।

২৪ ঐ ৩৭ (পৃঃ ১৬৫) দ্রষ্টব্য—'পৌরাণিকস্বন্য-সূতো মাগধাশ্চ ব্রহ্মক্ষাত্রাদ্ বিশেষতঃ।

২৫ ঐ ৫ ৩ (পৃঃ ২৪৭) দ্রষ্টব্য—'কার্তান্তিক-নৈমিত্তিক-মৌহূর্তিক-পৌরাণিকসূত-মাগধাঃ পুরোহিত-পুরুষঃ সর্বাধ্যক্ষাশ্চ সাহস্রাঃ।'

২৬ নাট্যশাস্ত্র (নির্ণয়সাগর ১৩ ৩২ ৩৫)

অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ বৎসাশ্চৈবোড্রমাগধাঃ।
পৌণ্ড্রা নৈপালিকাশ্চৈব অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ॥
তত্রবঙ্গসমজ্ঞেয়া মলদা মল্লবর্তকাঃ।
ব্রহ্মোত্তরা প্রভৃতয়োর্ভাগবামার্গবাস্তথা॥
প্রাগ্জ্যোতিষাঃ (প্রাগ্‌জ্যোতিষাঃ) পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
প্রাগাঃ প্রাবৃতয়াশ্চৈব যুঞ্জন্তি হ্যোড্রমাগধীম্ (হ্যোড্রমাগধীম্)॥
অন্যেপি দেশা এভ্যো যে পুরাণে সংপ্রকীর্তিতাঃ।
তেষু প্রযুজ্যতে হ্যেষা প্রবৃত্তিস্ত্বৌড্রমাগধী॥

এম্. আর কবি (বরোদা ১৯৩৪) ১৩. ৪৫ ৪৮ দ্রষ্টব্য

২৭ ঐ ১৮ ১৪৫ এবং ১০০ দ্রষ্টব্য

যে তেষামপি বাসাঃ পুরাণবাদেষু পর্বতাঃ প্রোক্তাঃ।
সংভোগস্তেষু ভবেৎ কর্মারম্ভো ভবেদস্মিন্॥

২৮ শূরা বীভৎস রৌদ্রেষু নিযুদ্ধেষাহবেষু চ।
ধর্মাখ্যানপুরাণেষু বৃক্তাস্তস্তি সর্বদা॥ ঐ ২৭, ৫৮

সংস্করণে [২৯] 'মহাপুরাণ' বলা হইয়াছে। তথায় বোধিসত্ত্ব কোন্ কোন্ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন তৎপ্রসঙ্গে নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, ব্যাকরণ [৩০] প্রভৃতির নাম করা হইয়াছে, ইহা হইতে তৎকালে পুরাণ-সাহিত্যের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয়। 'মিলিন্দপঞ্হে' গ্রীকরাজা মিনন্দর এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে, তথায় রাজা মিনন্দরের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবরণী এই ভাবে বর্ণিত আছে: 'বহু কলা ও বিজ্ঞানে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, যেমন ধর্ম ও লৌকিক নিয়ম, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন, অঙ্ক, সঙ্গীত, চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ এবং ইতিহাস। * *'[৩১] অন্যত্র ব্রাহ্মণ-দের সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে: '* * অথবা যেমন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপুত্রের কায ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, দেহের শুভ লক্ষণের জ্ঞান, উপকথার পুরাণের (পুরাণম্) এবং শব্দ-কোষ-সংকলনের জ্ঞান-সম্পর্কীয় * *।'[৩২] এখানে লক্ষণীয় যে এই দুইটি ক্ষেত্রের একটিতে বিদ্যার একটি বিশেষ বিভাগ বুঝাইতে 'পুরাণ' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইতেই তৎকালে একাধিক পুরাণের প্রচলন প্রমাণিত হয়।

বৌদ্ধ লেখকদের ন্যায় জৈন লেখকগণও সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'পুরাণ' নামে অভিহিত করেন। এই সব লেখকের মধ্যে জৈন সন্ন্যাসী বিমলসূরী প্রাচীনতম, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে [৩৩] 'পউম চরিঅ' রচনা করেন এবং একাধিকবার উহাকে 'পুরাণ' বলিয়া অভিহিত করেন। ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রবি সেন নামধেয় একজন জৈন গ্রন্থকার সংস্কৃতে পদ্মপুরাণ এবং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে গুণভদ্র তাঁহার 'উত্তর পুরাণ' রচনা করেন। খৃষ্টজন্মের পর হইতেই জৈনরা যে পঞ্চবিধ-লক্ষণযুক্ত সংস্কৃত পুরাণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন তাহা এই গ্রন্থগুলির নামকরণ এবং বিষয়বস্তু হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়।

'বেদ', 'মহাকাব্য', 'সংস্কৃত', বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য হইতে পুরাণ-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সব তথ্য উপস্থাপিত করিলাম। এই তথ্যগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখি, খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই এই সাহিত্য বিদ্যমান ছিল এবং সেই পুরাকালেই একাধিক পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তৎকালে জনগণ পদ্মপুরাণ বা অষ্টাদশ পুরাণের কোন একটির সহিত পরিচিত ছিল—এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

---

২৯ এস্ লেফ্‌ম্যান সম্পাদিত 'ললিতবিস্তর' দ্রষ্টব্য—অথ শ্রীললিতবিস্তরো নাম মহাপুরাণম্।

৩০ ঐ (আর এল্ মিত্র, সম্পাদিত ১৮৭৭)
নিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে ব্যাকরণে * * সর্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম দ্বাদশ সর্গ পৃঃ ১৭৯

৩১ দ্রষ্টব্য The question of King Milinda (টি ডব্লিউ রাইস্ ডেভিডস্ কর্তৃক পালি হইতে অনূদিত—অক্সফোর্ড ১৮৯০) ১ ৯ পৃঃ ৬

৩২ ঐ চতুর্থ ৩, ২৬ (ভি. ট্রেন্‌ক্‌নার সম্পাদিত পালিগ্রন্থ পৃঃ ১৭৮ * * ইতিহাসং পুরাণম্ * *)

৩৩ এইচ. জেকবি'র মতে 'পউম চরিঅ' খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে লিখিত।

বন্দনা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

অমিত প্রতিভা তুমি—অস্তিত্বের আদিম উচ্চার।
পরিশুদ্ধ দেবতারও হৃদয়ের সন্নিহিত ধ্যান,
বিশ্বের বন্দনা তুমি, আকাশের আলোর অম্লান
তোমাতে সে পরিণত, স্ব স্বরাট্ স্বরাজ্য তোমার :
জেনেছে যে জীবনের অতিশায়ী আশ্চর্য চেতনা
অমৃতের অধিকারে মন তার মুক্তি-কলস্বনা ॥

হেতুবাদহীন এক রূপাতীত রহস্যের ঢেউ
নির্দ্বন্দ্ব যেখানে 'শ্রেয় প্রেয়'র পরম সমাহার,
শ্রেষ্ঠের লাবণ্যে স্নিগ্ধ—তার মত দেখেনিক কেউ।
প্রত্যহের এই সব বোধি-বুদ্ধি বিচিত্র ব্যাপার
তারই সে শক্তির উৎসে স্নাত এই স্বপ্নের পৃথিবী :
যে মহৎ জেনেছে এ সত্যের সৌর স্বরলিপি
তারই হাতে অমৃতের একমাত্র আদি অধিকার ॥

তার কেউ প্রভু নেই , সে একক আত্মার অতীত,
রূপাতীত হয়ে তবু রূপময় রাজ্যের প্রতীক।
প্রাণের প্রকাশ-তীর্থে—সে করুণ-উৎসের অভীক
নাম-রূপে বোনা বিশ্ব—এ যে তারই আত্মচরিত ,
জীবনে জীবনে তারই শিল্পের সহজ সম্মতি।
সৃষ্টির অতীত হয়ে মহৎ সৃষ্টির অধিপতি :
হৃদয়ে জেনেছে যারা এই স্বচ্ছ শুভ্র অনুভব
অমৃতের আভিজাত্যে মরণ মেনেছে পরাভব ॥

বিশ্বকর্মা গড়েছে যে রূপময় নিখিল বিশ্বের
প্রতি রূপ,—প্রতি জনচিত্তে তার উজ্জ্বল আসন,
এই সে দেবতা—যার হিরন্ময় আদি ব্যাকরণ
এখানেই—প্রতি মনে, মনীষায়, প্রতি হৃদয়ের
স্বাদে গড়া পরিব্যাপ্ত তনু তার অণুতে অণুতে।
প্রতি বস্তু-উপমায় তাই বুঝি এত অন্বেষণ,
অদম্য স্পর্শের স্পৃহা মরুজাত হৃদয়-মরুতে :
অনুভাবী ছাড়পত্রে দেবব্রত মনের স্বাক্ষর
যে পেয়েছে—অমৃতে সে নব-জন্মা অমর ভাস্বর ॥

আণবিক যুগে ধর্ম *

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বুঝিতে চায় ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে, বস্তুগতভাবে। প্রথম অবস্থায়, এই অনুসন্ধান বহুলাংশে মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত—এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারাই সীমাবদ্ধ ছিল। ভয়ের দ্বারা নয়—কৌতূহল ও জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত বহিঃপ্রকৃতির নিয়মিত এবং অবিচ্ছিন্ন গবেষণা গত সার্ধ-ত্রিশতাব্দীর ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। এই অল্প সময়ের মধ্যেই—আধুনিক বিজ্ঞানের অর্জিত শক্তিই মনুষ্যজীবনে দ্রুত-পরম্পরায় যুগান্তকারী বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছে। বাষ্প-যুগের পর আসিয়াছে বিদ্যুতের যুগ, এখন আমরা আণবিক যুগে প্রবেশ করিতেছি।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অনুশীলন একপ্রকার অসাধারণ নৈতিক সাধনা ও বুদ্ধির আনন্দ। কিন্তু সভ্যতার সেবায় যে বিজ্ঞান তাহার আলোচ্য বিষয় মানুষ, যে মানুষ আবেগ ও অনুভূতির কেন্দ্র—যে মানুষ শরীরের সুখ, চারুকলার সৌন্দর্য, যুক্তিসম্মত জ্ঞান ও সামাজিক আনন্দ চায়। সভ্যতার সহায়তা-কল্পে বিজ্ঞানের যে ক্ষমতা—তাহা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হইয়াছে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা ও প্রকৃতির শক্তি কতটা তাহার আয়ত্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা। পরমাণু-বিজ্ঞানই এই অভূতপূর্ব জ্ঞান ও অপরিমিত শক্তি আধুনিক মানবকে দিবে বলিয়া মনে হয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধি এখনই অর্জিত। বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করার সমীকরণ আবিষ্কার দ্বারা, তাহারই সিদ্ধান্ত-স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত বস্তু ও শক্তির দ্বৈত ভাব দূর করিয়া বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান পূর্বেই অণুবিজ্ঞান ও আণবিক যুগের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। গত পনর বৎসর দেখা গিয়াছে তত্ত্ব কার্যে পরিণত হইতেছে। আণবিক ও উদজান বোমার নির্মাণ-পদ্ধতিতে অণুর বিভাজন ও সংযোজনের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহাতেই মানুষের সেবার ও অগ্রগতির বিপুল শক্তির উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি-নিরপেক্ষ শুদ্ধ আদর্শের দৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সম্মুখে ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল চিত্রই তুলিয়া ধরিতেছে। ইহা খুব মনোমুগ্ধকর—পৃথিবীতে সর্বজনীন সুখের ভিত্তি-স্থাপনের সম্ভাবনা। স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে পূর্বকালের স্বপ্ন আর স্বপ্ন বা কল্পনা থাকিবে না। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রিত মানব-বুদ্ধি দেখাইয়াছে বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব হইতে সারা বিশ্বের মানবকে মুক্ত করিবার এবং মানুষের অভাব বিপদ ও ভয় দূর করিবার ক্ষমতা তাহার আছে।

কিন্তু যখন এই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শদৃষ্টি হইতে নামিয়া বাস্তব পরিবেশের কথা চিন্তা করা যায়, তখন উন্নতির আশা আকাঙ্ক্ষা নূতনতর ভয় ও দুর্ভাবনায় মলিন হইয়া যায়। এই সকল ভয়ের কারণ—বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি মানুষের ঘৃণা হিংসা ও যুদ্ধের প্রবৃত্তিকে কমায় নাই, বরং

---

* ১৭।৯।৫৭ তারিখে দিল্লীর আকাশ-বাণীতে প্রচারিত ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ।

বিজ্ঞান ও শিল্পের জন্য ঐ প্রবৃত্তিগুলি এত বাড়িয়াছে যে তাহারা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করিতে সমর্থ। তাছাড়া ঐ প্রবৃত্তি এখন আর শুধু মাত্র প্রবৃত্তি-রূপেই নাই, এই শতাব্দীর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধে উহা ক্রমবর্ধমানভাবে জ্বালামুখী হইয়া উঠিয়াছে এবং অভূতপূর্ব ধ্বংসশক্তি সহায়ে তৃতীয় এবং ভীষণতর বিস্ফোরণের জন্য সকলকে সন্ত্রস্ত করিতেছে। ধন্য এই অণুবিজ্ঞান-প্রসূত পদার্থসমূহ!

যে বিজ্ঞান মানুষকে বহিঃপ্রকৃতিজাত ভয় হইতে মুক্তি দিয়াছে সে আজ এই নূতনতর ভয়ের সম্মুখে অসহায়। আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বহিঃপ্রকৃতিতেই প্রকৃতির সবটুকু নিঃশেষিত হয় নাই, প্রকৃতি বলিতে মানবের অন্তঃপ্রকৃতিকেও বুঝায়, যাহা বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা আরও বিরাট, আরও গভীর, আরও রহস্যময়, এই তত্ত্ব যাঁহারা বুঝেন তাঁহারা বিজ্ঞানের এই অসহায় ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হন না। আধুনিক মানবের এই নূতনতর ভয়ের উৎস—মানবের অন্তঃপ্রকৃতিতেই অবস্থিত। শান্তির উদ্দেশ্যে, না যুদ্ধের জন্য—বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর বহিঃপ্রকৃতির বিজ্ঞানের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে অন্তঃপ্রকৃতির বিজ্ঞানের কাছে—যাহার অপর নাম 'ধর্ম'। পৃথিবীর প্রত্যেকে বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইলেও এই সমস্যা মানুষকে পীড়িত করিবে। অনুরূপ চিন্তা করা শুভেচ্ছা মাত্র। সমকালীন কয়েকজন মনীষী—বাট্রাণ্ড রাসেলও—এইরূপ আশা করেন, কিন্তু তাহাদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট তথ্য নাই, এবং মানব ও পৃথিবীকে সমগ্র ভাবে দেখিতেও তাঁহারা পারেন না। সমপর্যায়ের বিখ্যাত অন্যান্য বিজ্ঞানী ও মনীষী আছেন—যাঁহারা দৃশ্যমান জগতের পিছনে তত্ত্ব নির্ধারণের যন্ত্র হিসাবে এবং মানুষকে সুখ দিবার উপায় হিসাবে বিজ্ঞানের অপারগতা হৃদয়ঙ্গম করেন।

তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞান মানুষকে সুখী করিতে পারে না, তবে সুখের উপাদান-কারণগুলি সংগ্রহ করিতে পারে। আইনষ্টাইন বলিয়াছেন: বিজ্ঞান প্লুটোনিয়মের ধর্ম বদলাইয়া দিতে পারে—কিন্তু মানুষের দুষ্ট স্বভাব পরিবর্তিত করিতে পারে না। মানুষের এই অন্তর্জগৎ-শাসনের ব্যাপারেই, তাহার প্রবৃত্তিগুলি শুদ্ধ করিতে, তাহার উদ্দেশ্যগুলিকে মহৎ করিতে, তাহার কর্ম-শক্তিকে সমাজকল্যাণে নিযোজিত করিতে 'ধর্ম' একটি অতুলনীয় শক্তি, মানব-জীবনের ক্রম-বিকাশে ও পরিপূর্ণতা আনয়নে—ধর্মের দিব্যবাণী বিশেষ অর্থপূর্ণ। বাট্রাণ্ড রাসেল দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: উপায় সম্বন্ধে মানুষের কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষের বোকামি,—এ দুই-এর দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝখানে আজ আমরা অবস্থিত। মানুষের জ্ঞান যত বাড়িতেছে—সেই পরিমাণে যদি তাহার প্রজ্ঞাও না বাড়ে তবে জ্ঞানের বৃদ্ধিতে তাহার দুঃখই বাড়িবে। *

পবিত্রাণকারী এই প্রজ্ঞার সন্ধানই ধর্মের সন্ধান, তবে এ ধর্ম অন্ধ বিশ্বাস বা ক্রিয়াকাণ্ড নয়, এ ধর্ম পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভের সন্ধান, ভয়হীন অভিযান। জীবনের যে কোন স্তরেই প্রজ্ঞা এক অখণ্ড-দৃষ্টির অনুভূতি,—যেখানে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ও অনুভূতি একটি ক্রিয়াশীল ঐক্যে সম্মিলিত হয়। প্রজ্ঞা মানুষকে যথার্থ সুখ দেয়, ফলে প্রজ্ঞাই মানুষের সমগ্র জীবনকে এক অখণ্ড ভাবে গ্রথিত করে। এই প্রজ্ঞাই উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার জয়টিকা। মানুষের অন্তরে নিহিত এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যকে

* We are in the middle of a race today, between human skill as to means and human folly as to ends, unless men increase in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrow—Bertand Russel (Impact of Science on Society, Chapter—7.)

উন্মুক্ত করাই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব। বহিঃপ্রকৃতির বিজ্ঞানবাজি—অতি প্রাথমিকভাবে ছাড়া মানুষের অন্তরের এই সম্ভাবনাকে বিকশিত হইতে সহায়তা করে না, নিতান্ত বেদনা সহকারে আমরা এই মহা সত্য বুঝিতেছি—মানুষ বুদ্ধির দিক দিয়া বয়স্ক হইলেও মনের দিক দিয়া বয়ঃসন্ধিকালে এবং আধ্যাত্মিকতার মাপ-কাঠিতে শৈশবাবস্থায় থাকিতে পারে। আধ্যাত্মিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক সকল দিক দিয়া মানুষের পূর্ণ বিকাশই সমগ্র জীবনকে সংহত করিয়া পবিত্রাণ-পরায়ণা প্রজ্ঞার আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে।

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পুষ্টির অভাবই আমাদের বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার যুগে ভয় ও মন-কষাকষির কারণ। মানুষের অন্তর্নিহিত মৃত্যুহীন ভাব ও জীবনে উহা বিকশিত করিবার চেষ্টা হইতেই ধর্ম তাহার শক্তি লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'মানবের অন্তরে নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করাই ধর্ম'। বেদান্ত-দৃষ্টিতে ধর্ম অন্তর্জীবনের বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধক। বর্তমান পৃথিবীতে ইহাই বেদান্তের দার্শনিক অবদান। বেদান্তের মতে, চরিত্রের পূর্ণতা-প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য—বিজ্ঞান বা ধর্ম, রাজনীতি বা সাহিত্য-কলা—সবই উপায়মাত্র। বেদান্তের এই আলোকে দেখিলে ধর্ম বিশ্বজনীন হইয়া সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার ভাব বিকীরণ করে, এবং বিজ্ঞান গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক হইয়া যায়। ধর্মের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরমতাসহিষ্ণুতা ও সংঘর্ষের হেতু সাম্প্রদায়িক ভাব পোষণ করে না, ধর্মের এইরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীই সমাসন্ন আণবিক যুগের যৌক্তিক মনোভাবের উপযুক্ত, এবং এ যুগের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাইতে সক্ষম। মানুষের ঐক্যই এ যুগের চরম প্রয়োজন এবং কার্যে ইহা পরিণত করিতে হইবে ধর্ম ও বিজ্ঞান—উভয়ের জ্ঞান ও প্রচেষ্টাকে একত্র মিলিত করিয়া।

ভাঙা হাটে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ছড়ালাম সম্বল যা সারা দেশময়
কুড়াবার, উঠাবার, গুটাবার এসেছে সময়।
গুটাইতে হবে পাততাড়ি,
টানিতে জালের কাঁঠি লাগে বড় ভারী।
বুঝিনি আসিবে তাড়া তাগিদের এত কড়া কড়া
মেলেছিনু চারিপাশে ঠুনকো পসরা।
সবি তো গুটাতে হয় ভেঙে চুরে, লোকসান লাভ
বুঝে সুঝে করিতে হিসাব।
নাই আর অবসর এক লহমাও
ঘন ঘন ঘণ্টা বলে, গুটাও উঠাও।
এই তো সংসার—
উর্ণনাভ জালের বিস্তার!

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

গত ২২শে ফেব্রুআরি ভোর রাত্রে ৬৯ বৎসর বয়সে দিল্লীর বাসভবনে আজীবন দেশসেবক ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যু-সংবাদে দেশবাসী মর্মাহত। দিল্লীতেই জুম্মা মসজিদের নিকট তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

*   *   *   *

মৌলানা আজাদের পণ্ডিত পিতা বৃহৎ শিষ্যমণ্ডলীর ধর্মনেতা বলিয়া বিভিন্ন দেশে মান্য ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের পর তিনি ভারত হইতে মক্কায় চলিয়া যান এবং সেখানেই জনৈকা আরবী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মক্কাতেই আবুল কালাম জন্মগ্রহণ করেন। বালককালেই আবুল কালামের প্রতিভা সকলকে বিস্মিত করে, মুসলিম শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি কায়রো যান, সেখান হইতে পিতার সহিত ১৯০৭ খৃঃ কলিকাতা চলিয়া আসেন, স্থানীয় শিষ্যদের আগ্রহে তাঁহার পিতা কলিকাতাতেই স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। এখানেই আবুল কালামের প্রতিভা সমধিক বিকশিত হয়, এবং তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কৈশোর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে একটি উর্দু পত্রিকা সম্পাদন করিয়া তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহার লিখিত কোরানের ভাষ্য ইসলামী সাহিত্যে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। যেখানেই উর্দু, আরবী ও ফার্সী পঠিত হয় সেখানেই আবুল কালামের গ্রন্থাবলী সমাদৃত।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও তাঁহার দান অতুলনীয়, ১৯১৭ খৃঃ হইতে বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো তিনি শেষ পর্যন্ত পুরোভাগে তাহার কার্যস্থলে ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্কটকালে তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি, এবং ব্রিটিশ সরকারের সহিত শেষ বোঝাপড়ার সময় তিনিই ছিলেন ভারতের মুখপাত্র। পরাধীনতা-মুক্ত দেশকে কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টাতেই—তাহার জীবনের শেষ দশ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে।

বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু কৃষ্টির মিলনভূমি ভারতের তিনি ছিলেন একজন যথার্থ প্রতিনিধি। নিজ নিজ ধর্ম ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়াও যে মানুষ মানবতার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া দেশের ও বিশ্বের সেবা করিতে পারে—মৌলানা আজাদের জীবন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সমালোচনা

Dharma—as visioned and voiced by Buddha—By Jagadish Chandra Chatterjee, Published by Goopta Prakashanee 8, Gupta Lane, Calcutta-6

(ধর্ম—বুদ্ধ যে ভাবে দেখিযাছেন ও বলিযাছেন)। মূল্য আট আনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ভারতীয় দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত। যৌবনে তিনি কাশ্মীরের Director of Oriental Research and Archaeology ছিলেন। পরে আমেরিকায় অনেক দিন বাস করিযাছিলেন এবং সেখানে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার Hindu Realism, Kashmere Shaivism এবং India's Outlook on Life পণ্ডিত-সমাজে সমাদর লাভ করিযাছে। আলোচ্য পুস্তিকায় তিনি বুদ্ধের নির্বাণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিযাছেন।

বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মমত কি ছিল,যে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। মিসেস রাইস্ ডেভিডস্ ও ওলডেনবার্গ বলিযাছেন, বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের অর্থ ঐকান্তিক বিনাশ। বিশপ বিগানডেট বলিযাছেন যে বৌদ্ধধর্মে নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টার পুরস্কার বিনাশের অতল সমুদ্র। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা স্বীকার করেন না। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বুদ্ধ যে নির্বাণের কথা বলিয়াছেন তাহা অনন্ত বিজ্ঞান, শূন্য নহে।

বুদ্ধ মানব-জীবনকে নিছক দুঃখময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'অনন্ত কাল ধরিয়া এই সংসার-স্রোত চলিয়াছে। কখন ইহার আরম্ভ হইল, কখন অজ্ঞানমোহে অভিভূত জীব বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষায় শৃঙ্খল পরিযা বাহির হইযা ভ্রমিতে আরম্ভ করিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। শিষ্যগণ, চারি মহাসাগরের জলরাশির সহিত তোমাদের অশ্রুরাশির যদি তুলনা কর, তোমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথে যাহা তোমরা ভয় করিয়াছ তাহাই তোমাদের ভাগ্যে ঘটিযাছে, আর যাহা তোমরা চাহিয়াছ তাহা পাও নাই বলিযা যে অশ্রুরাশি তোমাদের নেত্র হইতে বিগলিত হইযাছে, তাহার যদি তুলনা কর, তাহা হইলে কোনটি অধিক বলিয়া মনে হইবে? মাতার মৃত্যু, ভ্রাতার মৃত্যু আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু, সম্পত্তি নাশ, এ সকল যুগে যুগে তোমরা ভোগ করিযাছ, এবং যুগে যুগে এই সকল ভোগ করিবার সময় চারি মহাসাগরের জলরাশি হইতে অধিকতর অশ্রু তোমাদের নেত্র হইতে প্রবাহিত হইযাছে, কেননা তোমরা যাহা চাহ নাই, তাহাই তোমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, এবং যাহা চহিযাছ তাহা পাও নাই।' (সংযুক্ত নিকায) মানবের এই দুঃখের নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কারের জন্যই সিদ্ধার্থ গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যে নির্বাণের কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি ঐকান্তিক আত্মনাশ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, 'বুদ্ধের মতে আত্মহনন ভিন্ন দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় নাই, এবং তিনি আত্মহত্যার উপায়ই দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধের বচন উদ্ধৃত করিযা এই মতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিযাছেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল:

বুদ্ধ বলিয়াছেন, "লোকের অন্তে (লোকস্স অন্তম্) গমন করাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। অনন্ত আকাশপথে ধাবমান হইয়া এই লোকের অন্ত পাওয়া যায় না। যেখানে কাহারও জন্ম হয় না, কাহারও মৃত্যু হয না, যেখানে কাহারও কোনও পরিবর্তন হয় না, সেখানে পদব্রজে যাওয়া যায় না। আবার সেখানে পৌছিতে না পারিলে দুঃখের অন্তও হয় না।—(সংযুক্ত নিকায়) এই লোক (বিশ্ব) মানুষের দেহের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞান ও অনুভূতি-সমন্বিত দেহের মধ্যেই এই বিশ্ব উদ্‌ভূত হয়, এবং তাহার মধ্যে বিলীন হয়। যে পথে গমন করিলে লোকের (বিশ্বের) বিলয হয়, তাহাও দেহের মধ্যেই অবস্থিত।"

এইরূপ কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে : দেহের মধ্যে এক দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে। বহিঃস্থ আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়ই তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণ এবং দেহবান আত্মার যাহা আছে ও যাহা নাই, সমুদায়ই ইহাতে নিহিত। (ছান্দোগ্য --৮।১)

বুদ্ধ বলেন, লোকের উদ্‌ভবই (লোক-সমুদয়) দুঃখের উদ্‌ভব (দুঃখ-সমুদয়) [সংযুক্ত নিকায়, নিদান-সংযুক্ত], এবং লোকের অন্তই দুঃখের অন্ত বা নির্বাণ। যেখানে কাহারও জন্ম হয না, কাহারও মৃত্যু হয় না, কাহারও পরিবর্তন হয় না, তাহা নির্বাণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, লোকের অন্ত দেহের মধ্যে, সুতরাং নির্বাণও দেহেরই মধ্যে। বুদ্ধ নির্বাণকে তথাগতের বিজ্ঞান বলিয়াছেন। ইহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, ইহার কোনও নিদর্শন নাই (অনিদস্সন), ইহার স্থান নির্দেশ করা সম্ভব নহে, ইহা অনন্ত ও 'সর্বতোপহম্'—(যাহা অন্য সমস্ত পদার্থ অপসারণ করে)। ইহার মধ্যে পার্থিব কোনও বস্তু নাই। হ্রস্ব বা দীর্ঘ, স্থূল বা সূক্ষ্ম,ভাল বা মন্দ, নাম বা রূপ কিছুই ইহার মধ্যে নাই।

এই 'তথাগত বিজ্ঞান'ই যে নির্বাণ—বুদ্ধঘোষ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এই তথাগত বিজ্ঞানকে বুদ্ধ অনির্দেশ্য বলিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বৈনাশিক (Nihilist) বলিত। বুদ্ধ উহা বলিয়াছেন, কিন্তু মুক্ত পুরুষের গতি যে অনির্দেশ্য মহাভারতের শান্তি-পর্বেও এক শ্লোকে (১৮১,১৯) তাহা পাওয়া যায়। যথা :

শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যতে তথা জ্ঞানবিদাং গতি॥

—আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীদিগের এবং জলস্থ মৎস্যদিগের গতির যেমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, জ্ঞানবিদ্‌গণের গতিও তেমনি।

বুদ্ধ বলিয়াছেন, নির্বাণ পরম সুখ এবং 'অনির্দেশ্যমনন্তং সর্বতোপহং বিজ্ঞানম্'—ইহার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভাব নাই। যাহারা অজ্ঞ অথবা বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাহারাই নির্বাণকে বলে বিনাশ (অলগদ্দুপমা সুত্ত)। ত্রিশজন যুবককে বুদ্ধ এই নির্বাণের অনুসন্ধান করিতে এবং 'আত্মা' রূপে আবিষ্কার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই নির্বাণ সমস্ত পরিবর্তন ক্ষয় ও বিনাশের অতীত এবং 'স্কন্ধ'সমূহ হইতে ভিন্ন—(বিনয়পিটক মহাবগ্‌গো)। এই আত্মাকেই বুদ্ধ তাহার শিষ্যদিগকে 'আত্মদ্বীপ' করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যে দ্বীপ কোন প্লাবনে বিধ্বস্ত বা অভিভূত হয না।

পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র। ইহা গ্রন্থকারের সংকল্পিত আটখানি খণ্ডের প্রথম খণ্ড। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মূল্যবান্। দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া গ্রন্থকার বুদ্ধের উপদেশ যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা যে পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা বুদ্ধের উপদেশের মর্ম বুঝিতে উৎসুক তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

—শ্রীতারকচন্দ্র রায়

The Beggar Princess—Dilip Kumar Roy and Indira Devi, Kitab Mahal, Allahabad 177 pages, Board bound, Price Rs 3/- Foreword by Sir C P. Ramaswami Aiyar Introduction by Dr Sisir Kumar Ghose

সর্বজন-পরিচিতা পরম ভক্তিমতী রাজরাণী মীরার বিষয়ে নাটকাকারে এই গ্রন্থখানি লিখিত। কাশ্মীরের এক আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে সাধিকা তপতী সাধক অসিতকে ভগবৎসঙ্গীত শুনাইতে শুনাইতে ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। ভাবে তিনি অনসূয়া ও মীরাবাঈকে দেখিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া তপতী পরিচয় জানিতে চাহিলে মীরাবাঈ নিজের পরিচয় দিলেন। এই পরিচয় নাটকাকারে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মীরার পিতা রতন সিংহের রাজদরবার, রাধাকৃষ্ণের দর্শন, সনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব, বালগোপাল-বিগ্রহ-লাভ, উদয়পুরাধিপতি ভোজরাজের সহিত মীরার বিবাহ, বালগোপালের নিত্য দর্শনলাভ ও তাহার সহিত কথোপকথন, ভোজরাজের বিরক্তি, তানসেনের আবির্ভাব, ভোজরাজের মৃত্যু, তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমের রাজ্যলাভ, আকবরের আবির্ভাব, গোপালকে মুকুটদান, বিক্রমের মীরাকে বিষ-প্রদান, বিষের ক্রিয়া না হওয়া, মীরার উদয়পুর ত্যাগ, ভিখারিনীর বেশে বৃন্দাবনে গমন, গুরু সনাতনের অনুসন্ধান, দস্যুকর্তৃক আহত হওয়া, যমুনায় তনু ত্যাগ করিতে যাওয়া, পিতা রতন সিংহের আগমন ও রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ, ভিখারিনী মীরার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া যাইতে অসম্মতি, সবশেষে শ্রীকৃষ্ণের চরণে ও গুরুদেবের চরণে আত্মোৎসর্গ—এই সকল দৃশ্য আছে। পরম ভক্তিমতী মীরার জীবন-কাহিনী সারা দেশে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সঞ্চার করিয়াছে। এই গ্রন্থখানিও তাহাই করিবে।

—স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

নবপ্রকাশিত পুস্তক

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ : (আদর্শ ও ইতিহাস)—স্বামী তেজসানন্দ প্রণীত, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৪৭, মূল্য ৸৹ (৭৫ ন প)। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

লেখকের 'Ramakrishna Movement Its Ideal and Activities' পুস্তকখানি দেশে বিদেশে সুপরিচিত। ঐ প্রামাণ্য পুস্তক অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গত বৎসর উদ্বোধনের দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান পুস্তিকা তাহারই বর্ধিত সংস্করণ।

অধ্যায়-পরিচয় :

১। ঐতিহাসিক পটভূমিকা। ২। সঙ্ঘ-স্রষ্টা। ৩। সঙ্ঘের সূচনা। ৪। বেদান্তের বিজয়-অভিযান। ৫। বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা। ৬। সঙ্ঘের আদর্শ। ৭। নব্যভারত গঠনে বিবেকানন্দ। ৮। সঙ্ঘের প্রসার। ৯। বেদান্ত ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৩তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিপুল আনন্দ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠানসহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। উপনিষৎপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, দশাবতারের পূজা, ভোগরাগ, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পাঠ, কালী-কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী তেজসানন্দ সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথ প্রকৃষ্টভাবে অনুসরণ করিলেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হইবে। স্বামী গম্ভীরানন্দ বাংলায় এবং স্বামী বিমলানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন ও বাণী সরল ও সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। সকাল হইতে অগণিত নরনারী মঠে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১০ হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয়। শেষরাত্রে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ ১৩ জনকে সন্ন্যাস-ব্রতে এবং ১৭ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ২৩শে ফেব্রুআরি সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপের একপার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সুবৃহৎ পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি জনসাধারণের দর্শনের জন্য সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল সারাদিন ভজন-কীর্তনাদির দ্বারা উৎসব-স্থল মুখরিত রাখেন। উষাকাল হইতে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা, বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতি, ভজন-কীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও দর্শন-সম্বন্ধীয় কথা বিদ্যুৎযোগে সম্প্রসারিত হয়। বেলা ১২টা হইতে ৪॥টা পর্যন্ত ৪০ হাজার দর্শনার্থীর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের সময় হইতে দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করিয়া জনতা বাজি-পোড়ানো দর্শন করে। সারাদিনে প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

শ্রীসারদা মঠঃ দক্ষিণেশ্বর—গত ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীসারদা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে অহোরাত্র বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোর ৫টা হইতে উপনিষদ্ আবৃত্তির সঙ্গে উৎসবের সূচনা হয়। সকাল ৭টা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীদশা-বতার-পূজা ও হোম হয়। চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদির পর বেলা ১০॥ হইতে ১২॥ পর্যন্ত সমবেত ভক্ত মহিলাদের সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ করা হয়। পরে প্রায় ৪৫০ জন ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। রাত্রিতে শ্রীশ্রীদশ-মহাবিদ্যা-পূজা হোম এবং কালীকীর্তন হয়।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমঃ ২০শে ফেব্রুআরি প্রত্যূষ হইতে মঙ্গলারতি, ভজন, বেদ-পাঠ, ⁄চণ্ডীপাঠ, সর্ব্ব অবতারের পূজা, রাত্রে ⁄কালীপূজা, ঠাকুরের জীবনী আলোচনা প্রভৃতি হইয়াছিল। উপস্থিত আড়াই হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর ভজন-সঙ্গীত হয়। পরবর্তী দুইদিন বৈকালে 'বামন ভিক্ষা' পালাকীর্তন হয়। সন্ধ্যারতির পর ২১শে

শ্রীছোটেলালজী তুলসীদাসী রামায়ণ সহযোগে "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সন্তচরিত্র" হিন্দীতে ব্যাখ্যা করেন, ২২শে সাধুগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-শতনাম সঙ্কীর্তন করেন। ২৩শে রবিবার দ্বিপ্রহরে ভাণ্ডারার পর বৈকালে জনসভার সভাপতিত্ব করেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীএম্, সি, বিজ্ঞাযত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার শ্রীআর, কে, ত্রিপাঠী হিন্দীতে, শ্রীসিতেশরঞ্জন দাসগুপ্ত ইংরেজীতে এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন।

রাঁচী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমঃ গত ২০শে ফেব্রুআরি এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি এবং 'বিহার সঙ্গীত ভবন' কর্তৃক ভজন-গীতি হয়। দ্বিপ্রহরে এক ভক্ত-সম্মিলনীতে স্বামী বীরানন্দ স্বস্তিবাচন পাঠ করিলে জনৈক বিহারী হিন্দী-কবি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি হিন্দী কবিতা পাঠ করেন এবং আদিবাসী বক্তা শ্রীরামনারায়ণ হিন্দীতে ও স্বামী সুন্দরানন্দ বাংলায় সংক্ষেপে সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। অতঃপর প্রায় তিন হাজার ভক্ত পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে ভজনান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্যামলাতালঃ গত ২০শে ফেব্রুআরি শ্যামলাতাল (আলমোড়া) বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা ভোগ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ভজন কীর্তন হয়।

২৩শে ফেব্রুআরি সাধারণ উৎসব-দিবসে প্রাতে ভজনের পর পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে গ্রামবাসীরা সমবেত হইতে থাকে। দূরের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠাকুর-স্বামীজীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের শিক্ষকগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হয়। ওদিকে বিরজানন্দ বাংলো হইতে নগর-কীর্তন বাহির হইয়া শোভাযাত্রা আশ্রম-বাড়ীতে আসে এবং কিছুক্ষণ ভজনাদির পর সুখীঢাংয়ের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদেবের পৌরোহিত্যে সভার অধিবেশন হয়। বালকবালিকাদের আবৃত্তি সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-পাঠের পর স্থানীয় শ্রীযুক্ত গোপাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র সিংহ (পাঁচটি পঞ্চের সভাপতি) হিন্দীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বাণী সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। স্বামী আত্মস্থানন্দও আলোচনায় যোগদান করেন। সভাশেষে প্রায় তিন শত নরনারী ও শিশুর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে বালকবালিকাদের হাস্যকৌতুকের আসরও আনন্দদায়ক হইয়াছিল। কলিকাতার বিশিষ্ট ভক্তগণের উপস্থিতি ও হাওড়া 'নদের নিমাই সমাজে'র সুললিত ভজন-কীর্তন উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিল। লোহাঘাটের মহকুমা-শাসক মহাশয় সকালে এই উৎসবে যোগদান করেন।

মেদিনীপুরঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৮ই ফাল্গুন (২০-২-৫৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব আনন্দপূর্ণ ও শুচি-সুন্দর অনুষ্ঠান সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম এবং সন্ধ্যারতির পর একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী অন্নদানন্দ ও কলিকাতা জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা, কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পরবর্তী রবিবারে সাধারণ উৎসবের দিনে প্রায় ৫০০০ নরনারী প্রসাদ পান। প্রখ্যাত কথক শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুই দিন রামায়ণের কথকতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। ১৪ই ফাল্গুন আশ্রমে একটি বিরাট জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে ঝাড়গ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের সুললিত প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা)

মঙ্গলারতি, স্তবপাঠ, পূজা হোম সহকারে স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়। পরবর্তী রবিবার—উৎসবে কীর্তন ভজনের পর সমবেত সভায় স্বামী বেদাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে ১৩০০ নরনারী প্রসাদ ধারণ করে। স্থানীয় কীর্তনদলের যোগদান উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ভোরে মাঙ্গলিক নহবৎ সানাই মঙ্গলারতি ও ভজন হয়, পরে পত্রপুষ্প-মাল্যদ্বারা শোভিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তি সহ একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগারতির পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে নাম-সংকীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হয়, সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পরে রামায়ণ-কণ্ঠহার শ্রীঅনাথবন্ধু দাসাধিকারীর রামায়ণ-গান কীর্তনে প্রায় ছয় সহস্রাধিক লোক সমাগম হইয়াছিল।

গড়বেতা (মেদিনীপুর): স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক, শ্রীশ্রীকথামৃত-পাঠ ও সন্ধ্যায় সমবেত ভজন অগণিত জনসমাবেশে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে দ্বিসহস্রাধিক ভক্ত পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বলরাম মন্দির: কার্য-বিবরণী

মাস	বিষয়	বক্তা
নভেম্বর:	গীতা—	স্বামী সাধনানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—	,, প্রেমরূপানন্দ
ডিসেম্বর:	স্বামী প্রেমানন্দ—	,, জীবানন্দ
	শ্রীশ্রীমা—	,, ধ্যানাত্মানন্দ
	যীশুখৃষ্ট—	,, নিরাময়ানন্দ
	স্বামী শিবানন্দ—	,, দেবানন্দ
জানুআরি:	স্বামী তুরীয়ানন্দ—	,, জীবানন্দ
	স্বামী বিবেকানন্দ—	,, গম্ভীরানন্দ
	রামায়ণ—অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী	
ফেব্রুআরি:	স্বামী ব্রহ্মানন্দ—	স্বামী অচিন্ত্যানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা	,, পুণ্যানন্দ
	আচার্য বিবেকানন্দ	,, ধ্যানাত্মানন্দ
	ভগবান রামকৃষ্ণদেব	,, গম্ভীরানন্দ

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর জন্মোৎসব

বঙ্গট (মধ্য আন্দামান)

১২ই জানুআরি আন্দামানে স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা হইতে পরের দিন বেলা ১২টা পর্যন্ত কীর্তন হয়, পূজাশেষে স্বামীজী ও ঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী (মান্দ্রাজী) এবং আরও দুএকজন বক্তৃতা করেন। তারপর প্রায় ৫০০ লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আন্দামানে এই প্রথম উৎসব। এতদুপলক্ষে উৎসবের উদ্যোক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সম্পর্কে সকল প্রকার পুস্তক পোর্ট ব্লেয়ার এবং অন্যান্য স্থানে উপহার দেন—যাহাতে লোকে এই সকল ভাব জানিতে পারে।

জব্বলপুর:

গত ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুআরি স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক স্বামীজীর জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ।

১৫ই সন্ধ্যা ৫॥টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি লইয়া একটি শোভাযাত্রা জব্বলপুরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করার পর জব্বলপুরের মেয়র পণ্ডিত ভবানীপ্রসাদ তেওয়ারীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ 'স্বামীজীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব' সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। পরদিবস প্রাতে পূজা হোম, রামনাম কীর্তন, প্রসাদ বিতরণের পর জনসভায় (সভাপতি) বাবু মনমোহনদাসজী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, অধ্যাপক রজনীশ চন্দ্র মোহন এবং কুমারী সুশীলা শর্মা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

সন্ধ্যায় স্থানীয় ভি বি ক্লাবে এক বিরাট জনসভায় (সভাপতি) মধ্যপ্রদেশের বিধান সভার স্পীকার পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবে, ডক্টর নিকল, এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে ইংরেজীতে ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন।

উৎসবান্তে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ থামাবীয়া হরি-মন্দির-প্রাঙ্গণে "জাতি-সংগঠনে ধর্মের স্থান" নির্দেশ করেন।

কিশোর-কল্যাণ পরিষদ : কলিকাতা

স্বামী বিবেকানন্দের জাতি-গঠন ও সমাজ-সেবার মহান আদর্শে কিশোর ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ কিশোর-কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এই বছর ৩রা ফেব্রুআরি থেকে এক সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন হয়।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানসূচী নিম্নে দেওয়া হ'ল

তারিখ	বিদ্যালয়	বক্তা
৩রা	কলিকাতা বিদ্যাভবন (গ্রে স্ট্রীট)	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
৪ঠা	মেট্রোপলিটন বালিকা বিদ্যালয়	ব্রহ্মচারিণী ইলা
৫ই	চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল (বালিগঞ্জ)	স্বামী নিরাময়ানন্দ
৬ই	মধুসূদনপাল-চৌধুরী হাইস্কুল (ব্যাটরা)	,, জীবানন্দ
৭ই	বহুবাজার ট্রেনিং স্কুল	,, সাধনানন্দ
৮ই	জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী বিদ্যালয়	,, লোকেশ্বরানন্দ

সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর (হুগলী)

গত ২৬শে জানুআরি রবিবার ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। প্রভাতে স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা পল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। দ্বিপ্রহরে পূজা ও ভোগের পর বৈকালে একটি জনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ। তিনি ও প্রধান অতিথি শ্রীতামসরঞ্জন রায় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করিয়া বিশেষভাবে তাঁহার মানব-কেন্দ্রিক জীবনদর্শন ও অভী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। পরে বিবেকানন্দ পাঠাগারের পক্ষ হইতে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য ও বার্ষিকক্রীড়া প্রতি-যোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

আজমীর

স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হয়।

বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বচনামৃত-পাঠ ও ব্যাখ্যা, স্থানীয় সরকারী অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভজনগানের পর শ্রীহনুমান প্রসাদ শ্রীবাস্তব, পণ্ডিত কিষণলাল দ্বিবেদী ও স্বামী আদিভবানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

তেজপুর (আসাম)

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৮ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৩তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রত্যূষে চণ্ডীপাঠ, পূর্বাহ্ণে ষোড়শোপচারে পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর প্রসাদ-বিতরণ ও সন্ধ্যায়

আরাত্রিকের পর এক মহতী ধর্মসভায় প্রবীণ জননায়ক শ্রীমহাদেব শর্মার সভাপতিত্বে প্রবন্ধ-পাঠ ও কবিতা-আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য "শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় তাঁর তত্ত্ব- ও তথ্যপূর্ণ ভাষণে সকলকে উৎসাহিত করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শিকাগো : ছাত্রসভা

শিকাগোস্থিত নর্থ ওয়েষ্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ছাত্রদের প্রচেষ্টায় গত ১লা মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় এবট হলে একটি সভার আয়োজন হয়। এই সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমেরিকার এবং ফ্রান্স, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বন্ধুগণও ছিলেন। মিঃ কার্ল ক্রীশ্চেনসেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান যুগে মানব-জীবনে বহু সমস্যার মধ্যে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুসরণেই সম্ভবপর। বক্তৃতায় বক্তার গভীর চিন্তাশীলতা ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ ক্রীশ্চেন সেন শিকাগোস্থিত বেদান্ত সমিতির একজন একনিষ্ঠ কর্মী।

সভার শেষে উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ছাত্রদের প্রচেষ্টায় এইরূপ সভা এই প্রথম।

—ইণ্ডিয়া-এসোসিএশন অব শিকাগোর জনৈক ছাত্র-প্রতিনিধি প্রেরিত।

নানা স্থানে উৎসব :

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা উৎসবের বিস্তারিত সংবাদ পাইয়াছি :

বাবুগঞ্জ (হুগলী), শান্তি সংঘ—শিবপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-সংঘ—কদমতলা (হাওড়া), সাতগেছিয়া (বর্ধমান), খেপুত (মেদিনীপুর), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (পূর্ব পাকিস্তান)।

আণবিক অস্ত্র-বিরোধী সর্বধর্ম-সম্মেলন

গত ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট্ হলে তিন দিবসব্যাপী আণবিক অস্ত্রবিরোধী একটি সর্বধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিবসের সভাপতি শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ আণবিক অস্ত্রপ্রয়োগকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বলেন, এই ঘৃণ্য অস্ত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী অভিযান গড়িয়া তোলা উচিত। বর্তমানে ধর্মীয় সংস্থা-গুলির উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে।

ঐ দিন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এতদুপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, সেখানে একপাশে আণবিক বোমার ধ্বংসলীলার চিত্র ও অপর পাশে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রেম ও শান্তির বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত বলেন, ধ্বংসের ও হিংসার উন্মত্ত পথ হইতে মানুষকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে শান্তির ও প্রেমের পথে। ডক্টর কালিদাস নাগও সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিবসের সভাপতি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিমলানন্দ বিজ্ঞানের যুগে ধর্মের নব-রূপায়ণের কথা বলেন। অতঃপর ডক্টর বি. ডি নাগচৌধুরী বৈজ্ঞানিকের নূতন সমস্যা—আবি-ষ্কারের প্রলোভন এবং বৃহত্তর মানবতার প্রতি কর্তব্য-বোধের উল্লেখ করিয়া আশা প্রকাশ করেন—মানবতার জয় হইবে। ডাঃ সুবোধ মিত্র আণবিক বিস্ফোরণের অনিষ্টকর পরিণামের বিষয় বুঝাইয়া বলেন, এবং কিভাবে আণবিক শক্তি মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হইতেছে তাহারও উল্লেখ করেন। অতঃপর 'জাপানে আণবিক বোমা'র আলোকচিত্রটি দেখানো হয়।

শেষ দিবসে প্রাতঃকালীন অধিবেশনে মৌলানা আলি হাসনাই-এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন ধর্মের পক্ষ হইতে কয়েকজন বক্তৃতা করেন। সমাপ্তি-অধিবেশনে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে আণবিক অস্ত্র-প্রস্তুতকারী জাতিসমূহের নিকট তিনটি আবেদন করা হয়—(১) বিনা শর্তে নির্মিত অস্ত্র ধ্বংস করা হউক (২) পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করা হউক (৩) আণবিক শক্তিকে জনকল্যাণে ব্যবহার করা হউক। রেভাঃ বেসিল ম্যাম্বয়েলের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণ অধিবেশনের পর সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

শ্রমিক ও বেকার

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (International Labour Organisation) মতে বর্তমানে পৃথিবীর শ্রমিকদের সম্মুখে বেকার ও মুদ্রাস্ফীতিই প্রধান শত্রু।

বিভিন্ন দেশের তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যুদ্ধোত্তর কালে গত বৎসরই সর্বাপেক্ষা বেশী 'দিন' নষ্ট হইয়াছে, এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে অধিকতর। সম্প্রতি-কালের তুলনায় ১৯৫৭ খৃঃ শেষভাগে বেকারও ব্যাপক হইয়াছে।

ভারতে কর্মখালির সন্ধানী-আবেদন (job applications) ১৭% বাড়িয়াছে, সিংহলে ঐ বৃদ্ধি ১৬%, পাকিস্তানে ঐ সংখ্যা একটু নামিয়াছে। জাপান, বার্মা ও ফিলিপাইন্‌স্‌-এ বেকার একটি বিষম সমস্যায় পরিণত। উত্তর আমেরিকায় উহা ভয়ের কারণ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে (U S A) আর্থনীতিক পশ্চাদপসরণ ঘটিলেও বড় রকমের মন্দা দেখা দেয় নাই। গত নভেম্বরে কানাডায় বেকার-সংখ্যা পূর্ব বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণের অধিক হইয়াছিল। ব্রিটেনে ১৯% বেকার-বৃদ্ধি হয়। পশ্চিম জার্মানিতে বৎসরের শেষে অত্যধিক বেকার দেখা যায়, ১৯৫৬-ডিসেম্বর অপেক্ষা ১১% বেশী, সংখ্যা ১২,০০,০০০।

বেকার অপেক্ষা অনেকে মুদ্রাস্ফীতিকেই ভয়ের চক্ষে দেখিতেছেন। ভোগ্যপণ্যের দাম গড়ে ১৯৫৬-এর তুলনায় ৩.৭% বাড়িয়াছে। আয়র্লণ্ড, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ফিনলণ্ড, আর্জেন্টিনা, ইস্রায়েলে দ্রব্যমূল্য যত বাড়িয়াছে, শ্রমিকবেতন সে পরিমাণে বাড়ে নাই।

ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড প্রভৃতি দেশ মুদ্রাস্ফীতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ল্যাটিন আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি সর্বাধিক।

১৯৫৭ খৃঃ শ্রমিকদের সামাজিক স্বার্থরক্ষা-কল্পে প্রচেষ্টা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপীয় দেশ-গুলিতে কিছু কিছু নিয়ম পরিবর্তিত হওয়ায় শ্রমিকদের বেশ কিছু লাভ হইয়াছে।

উৎপাদনের দিকে দেখা যায়—শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন বাড়িতেছে। শ্রমিক-বিরোধে ব্রিটেন, ভারত, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, আর্জেন্টিনা ও ব্রেজিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মানব-দিবস (man-day) নষ্ট হইয়াছে।

[I L O Report হইতে সংকলিত]

‘ইহাই সনাতন ধর্ম’

ন হি বেবেন বেবানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥

অক্‌কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদবিযং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং॥

—ধম্মপদম্

শক্রতা কখনও শক্রতা দ্বারা শান্ত হয় না, বৈবাচবণের পবিবর্তে প্রয়োজন প্রেমানুশীলন। ঘৃণার দ্বাবা কখনও ঘৃণার লোপ হয় না, প্রেমের দ্বাবাই বিদ্বেষ শমিত হয়—বৈর হয বিদূরিত। ইহাই সনাতন নিয়ম বা ধর্ম।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বাবা, কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করিতে হইবে।

অধিকাংশ মানুষ এইভাবে চলিতে পারিলে জগতে হিংসার পরিবর্তে আসিবে করুণা, দ্বন্দ্বের স্থান অধিকার করিবে মৈত্রী ও দ্বেষেব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রেম।

মানবপ্রেমিক বুদ্ধের মুখে ভারতের এই চিবন্তনী বাণী মানুষকে যথার্থ কল্যাণ ও শান্তির পথে যুগ যুগ ধরিয়া আহ্বান করিতেছে।

কথাপ্রসঙ্গে

বৈশাখের পুণ্যমাসে

নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আমরা প্রার্থনা করি, 'অযমারম্ভঃ শুভায় ভবতু'। আবার প্রার্থনা করি, 'সর্বে সত্ত্বা সুখিতা ভবন্তু', উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে—চতুর্দিকে সকল প্রাণীর প্রতি কল্যাণ-চিন্তা বিকীরণ করিয়া আমরা নূতন বৎসর আরম্ভ করি।

চৈত্রের কঠোর তপস্যার পর বৈশাখের পুণ্যমাসে ভক্তহৃদয় ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের জন্য উদ্গ্রীব। বৈশাখ মাস ধর্মের মাস, ব্রত-পালনের মাস, পূজাপাঠ ও সেবার মাধ্যমে মানুষ সারা মাস ধরিয়া বৈকুণ্ঠবাসের কল্পনা করিয়া থাকে। সর্বপ্রকার কুণ্ঠাবিহীন জীবনযাপনই তো বৈকুণ্ঠবাস। তাহারই অপর নাম আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। ভক্তের বৈকুণ্ঠ ও জ্ঞানীর মুক্তি একই পরমার্থের দুইটি বিভিন্ন দিক্।

বৈশাখের পূর্ণিমাতে আমরা স্মরণ করি ধর্ম-বুদ্ধ-সংঘের ঘনীভূত মূর্তি ভগবান্ তথাগত বুদ্ধকে। যিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রমাণ করিলেন অতীন্দ্রিয় সত্য এবং সুদীর্ঘ জীবন দ্বারা প্রচার করিলেন 'সদ্ধর্ম'—যাহা ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিল তাহার শাশ্বত স্বধর্মে—ত্যাগ ও তপস্যার ধর্মে, আর সতত-বিবদমান মানবজাতিকে শিখাইল মৈত্রী-করুণার শান্ত সংযত শিক্ষা। ভারতের আলোক এশিয়ার আলোক। আবার এশিয়ার আলোক জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছে। 'পূর্ব দিক হইতেই আবার আলোক আসিবে'—এ কথা যুগে যুগে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। পূর্ব দিক উদয়াচলের দিক্। সভ্যতাভিমানী মানুষ আজ আণবিক বিজ্ঞানজাত অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন—আত্মপরের হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য। অহঙ্কারে মত্ত, ক্ষমতাগর্বে গর্বিত মানব জানে না—এরূপ উত্থান পতনেরই পূর্বাভাস। এই যুগসন্ধিক্ষণে হে সম্বুদ্ধ! স্বার্থকেন্দ্রিক জীবন-স্বপ্ন হইতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর। মাতা যেমন তাঁহার সকল সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন, সকল সন্তানের সুখের জন্য চেষ্টা করেন, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া সন্তানকে রক্ষা করিতে চান—আমরাও যেন সেইরূপ সকলের কল্যাণেই নিযুক্ত থাকি। বুদ্ধের ধর্ম বিশ্বমানবতার ধর্ম, শুধু মাত্র একটি গ্রন্থে বা ব্যক্তিতে বিশ্বাসের ধর্ম নয়, ইহা অনুভূতির ধর্ম, সাধনার ধর্ম—সিদ্ধির ধর্ম। যেখানে মানুষ আছে, মানুষের মন আছে—সেখানেই বুদ্ধের আবেদন। বুদ্ধ মানুষকে আহ্বান করিয়াছেন মানুষ হইতে—ইহাই মনুষ্য-ধর্ম। মানুষ যথার্থ মানুষ হইবে, কিন্তু কিভাবে? বুদ্ধ তাহাই দেখাইয়া গেলেন: ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা! সুনীতির পথেই মানুষের ক্রমোন্নতি।

বুদ্ধের জন্মমাসে আবার আমরা প্রার্থনা করি: সকল মানুষ উন্নত হউক, সকল মানুষ সুখী হউক, সকল মানুষ সংসারের জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দুঃখ দেখিয়া উদ্বুদ্ধ হউক বহুজন্ম-দুর্লভ সম্বোধি লাভের জন্য, পরমানন্দ-সুধাম্বুধি নির্বাণের জন্য।

বৈশাখের পুণ্য মাসে আমরা স্মরণ করি জলন্ত ভাস্করসম জ্ঞানঘন মূর্তি আচার্য শঙ্করকে—যাঁহার আবির্ভাবে সংশয়-কুতর্ক-জাল সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মতো ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং ঔপনিষদ ব্রহ্মপুরুষ স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। ভারত আবার আত্মজ্ঞানে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কোটি গ্রন্থের সিদ্ধান্ত শ্লোকার্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন শঙ্কর সুস্পষ্ট ভাষায়: 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—এ কথা কে বুঝিল, কে বুঝিল না, কে মানিল, কে মানিল না—সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। নির্ভীক ভাবে, স্পষ্ট ভাবে সত্য ব্যক্ত হইয়াছে: 'সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, জগৎ আজ আছে, কাল নাই, এবং জীব সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নয়।' 'তুমি জানো, আর নাই জানো, তুমি রাম'—কি আশার বাণী, কি আশ্বাসের বাণী, কি অমৃত-বাণী। আপাতদৃষ্টিতে মরণধর্মা জীব। তুমি শোক করিও না, দুঃখ করিও না, ওঠ, জাগ, তুমি আত্মা, তুমি ব্রহ্ম! 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—আত্মজ্ঞানীই মৃত্যুময় শোকসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

ছাত্রদের আচরণ

এত দিন জানা ছিল—শিক্ষাই একটি সমস্যা, কিন্তু অধুনা দেখা যাইতেছে সমস্যা-কণ্টকিত বঙ্গদেশে পরীক্ষাও একটি বার্ষিক সমস্যায় পরিণত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে। ইহা একদিক দিয়া আনন্দের সংবাদ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন শোনা যায়—কোন প্রশ্ন-পত্র কতকগুলির ছাত্রের মনোমত হয় নাই বলিয়া তাহারা প্রথমে সামান্য কারণে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষা-কেন্দ্র ত্যাগ করিয়াছে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষা পণ্ড করিয়াছে, কোথাও বা সে দৌরাত্ম্য গুণ্ডামির পর্যায়ে পঁহুছিয়াছে, তখন আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতিগণ—যাঁহারা ছাত্রদের মন লইয়া গবেষণা করেন—তাঁহারা এ বিষয়ে কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। সামান্য ভূমিকম্পের কারণ ও কেন্দ্র নির্ণয়ের জন্য আজকাল কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আকাশে মহাজাগতিক রশ্মির সামান্যতম ভগ্নাংশও আজ ধরা পড়িতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষের মন আজও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল না।

চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ-নির্ণয়ের আজকাল নানাবিধ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে—এক ভাবে না হইলে আর এক ভাবে রোগ এবং রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া আধুনিক চিকিৎসকগণ রোগকে সর্বত্র সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে না পারিলেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বৈজ্ঞানিক রোগনির্ণয়-প্রণালী ও রোগপ্রতিষেধক আধুনিক ঔষধসমূহ।

বর্তমান ছাত্র-সমাজে নানাস্থানে প্রকট যে অশিষ্ট আচরণ—তাহার সমস্ত দোষ ও দায়িত্ব ছাত্রদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। ইহা অনস্বীকার্য যে ইহা একটি সামাজিক ব্যাধি,—নিয়মিত ভাবে নিয়মিত সময়ে ঐ ব্যাধি তাহার বহির্লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। ইহার কারণ-নির্ণয়ের জন্য একটি সর্বতোমুখী বৈজ্ঞানিক পন্থা অবশ্য অবলম্বনীয়। ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইহার প্রতীকার সম্ভব নয়, সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিলে মনে হয়—অচিরেই এই অসন্তোষের কারণ নির্ণীত হইবে, এবং তখন সেই সকল কারণ দূর করা এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর ঐরূপ না হয় তজ্জন্য প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইবে।

কলেরা বসন্তের জন্য যথাসময়ে যেমন প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ ব্যবস্থা সার্থক হইয়া থাকে, আমাদের মনে হয় ছাত্রদের অশিষ্ট-আচরণরূপ সংক্রামক ব্যাধিও ঐ ভাবে দূর করিতে হইবে। যদি ব্যাপকভাবে ছাত্রদের মনোগত আশা-আকাঙ্ক্ষা জানিবার আয়োজন করা হয়—তবেই ছাত্রমাত্রের আচরণ সুন্দর শোভন রূপ ধারণ করিবে, এবং প্রতিটি ছাত্র কর্তব্য-পরায়ণ নাগরিকে পরিণত হইবে। ছাত্রদের গুণ্ডা বলিয়া গালি দিলে নিয়মনিষ্ঠ নাগরিকের সংখ্যা বাড়িবে না, কমিতেই থাকিবে। ছাত্রজীবনের পরম প্রয়োজন—সাহায্য ও সহানুভূতি, ছাত্রেরা চায় বড়দের মতো বা বড়দের চেয়েও বড় হইতে। তাই বড়দের কর্তব্য—এ বিষয়ে তাহাদের প্রথমে উৎসাহদান, পরে সাহায্যদান। তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমিত না করিয়া তাহাদের শুনাইতে হইবে স্বামীজীর অস্তিভাবোদ্দীপক কথা—'You are good, but be better'—শুনাইতে হইবে, 'Have faith that you are born to do

great things'—তুমি ভাল, আরও ভাল হও। বিশ্বাস কর, তুমি মহৎ কার্য করিবার জন্য জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ।

আমাদের দেশে শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষার আড়ম্বরই বেশী, যদি প্রয়োজন হয় তো সুচিন্তিত ভাবে ইহার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। প্রতিবৎসরই শোনা যায়—পরীক্ষা-গ্রহণ এক বিরাট সমস্যা, তাহার পর অল্পসময়ে ঠিকভাবে অসংখ্য খাতা দেখা,যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির করা সকলই কঠিন ব্যাপার। সর্বশেষে দেখা যায়—প্রায় অর্ধেক ছাত্র বিফল হইয়াছে। ব্যর্থ ছাত্রদের অর্থ সময় ও সামর্থ্যের বিরাট অপচয়, তদুপরি ভগ্নমনোরথ হওয়ার জন্য যৌবনোন্মুখী ছাত্রদের চিন্তা ও উদ্যম সবল পথ ছাড়িয়া বক্রপথে চলিবে—ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। শিক্ষাবিদ্, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিষয়ে ভাবপ্রাপ্ত সকলকে আমরা আহ্বান করি—তাঁহারা শুধু ভবিষ্যৎ শিক্ষাপদ্ধতি ও ভবন-পারিপাট্যের কল্পনাতেই সমগ্র শক্তি ব্যয়িত না করিয়া ছাত্র জীবনকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার সহিত পরীক্ষা-পদ্ধতিরও একটি সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করুন। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাও যেমন বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় অচল—তেমনি কেরানি-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ-প্রবর্তিত ঐ পরীক্ষাপদ্ধতিও আজ অচল, তাই দেখা যায় বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌গণ যথাকালে সাবধান হইলে এই রোগ আর ব্যাপক হইবে না, পরন্তু ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত আচরণও আশানু-রূপ উন্নতি লাভ করিবে।

কাহারও মতে বিভিন্ন রাজনীতিক আদর্শের উত্তেজনার আবর্তে এবং অস্বাভাবিক পরিবেশে ছাত্রসমাজ আজ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত,তাই উচ্ছৃঙ্খল। কেহ কেহ মনে করেন কারিগরী শিক্ষা দিলেই সমস্যার সমাধান হইবে, বেকার-ভীতি ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই ছাত্রদের অসন্তোষের কারণ। তাঁহাদের মতে উচ্চ-শিক্ষার স্তরে ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই—ছাত্রদের আচরণ আয়ত্তে আনা সম্ভব হইবে। এ বিষয়ে একদেশদর্শী বা আত্মসন্তুষ্ট না হইয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এ বৎসর জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য:

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ যত বাড়িতেছে মানবতার শিক্ষা তত কমিতেছে, ইহা বোধ করিতে হইবে।

ইতিহাস ও সমাজের ক্রমবিকাশ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের পদ্ধতি অনুযায়ী চলে না। বই পড়িলে বা যন্ত্রকুশলী হইলেই মানুষ শিক্ষিত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি আধ্যাত্মিক গুণ—যেগুলি তাহাকে বিপদে শান্ত রাখিবে, এবং অপরের সহিত ব্যবহারে তাহাকে ন্যায়-পরায়ণ করিবে।

তাঁহার মতে—অগভীর স্বার্থপর চিন্তাই মানুষের মনকে ছোট করিয়া দেয়, উন্মুক্ত দৃষ্টিই সমাজে বহুলপ্রচলিত দুর্নীতি দূর করিতে পারে। 'বিজ্ঞান ও যন্ত্রের দ্রুত উন্নতিই মানুষকে অসৎ-কার্যে প্রলুব্ধ করিতেছে'—এই মন্তব্য করিয়া তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন: অসদুদ্দেশ্য-মুক্ত নূতন মানবসমাজ কিভাবে সংগঠিত হইবে?

'শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিবার প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের ও শিল্প-বিস্তারের জন্য যন্ত্রকুশলী সরবরাহ করিতেছে। জলাধার-নির্মাণ, রেল-লাইন বাড়ানো,অধিক ফসল ফলানো

—প্রভৃতি দেশের ঐহিক মান উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু আরও প্রয়োজনীয় এমন কিছু আছে, যাহার উপর আমাদের প্রাচীন ঋষিরা জোর দিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা শুধু জীবিকার সংস্থানই করিবে না—মানুষের মনকে মুক্তও করিবে।

'শিল্প ও বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে এমন কিছু শিক্ষা দিতে হইবে—যাহা দ্বারা বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত ব্যবহারের মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, এবং শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—সদ্ব্যবহার-শিক্ষণ। ঐহিক উন্নতি নিষ্ফল, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর চিন্তা ও চরিত্র গঠিত না হয়।'

চিন্তা ও চরিত্র গঠনে দেশবাসীর বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের রুচি-সংগঠনে প্রেস, রেডিও এবং সিনেমার প্রভাব অসামান্য। আমাদের রুচি বিকৃত হইতেছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনই সচেতন না হইলে আমাদের রুচি আরও বিকৃত হইয়া পড়িবে। ধর্ম-নীতিসম্মত ঐহিক উন্নতি আমাদের লক্ষ্য, যদি তা না হয় তবে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বার্থপর ভোগপরায়ণ 'মানুষ' নামের অযোগ্য একটি জীবে পরিণত হইব।

সর্বশেষে অবশ্য বক্তব্য শিক্ষকদের আচরণ। তাঁহারা যেন দলীয় রাজনীতির হুজুগ হইতে দূরে থাকেন, সংকীর্ণ রাজনীতিতে মগ্ন হইলে তাঁহারা জাতির শিক্ষক হইবার যোগ্যতা হারাইবেন, এই পুণ্য বৃত্তির সুনাম নষ্ট হইবে। শিক্ষকেরাই সভ্যতার বিবেকধ্বনি এবং কৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাদের এই গুরু দায়িত্ব যদি তাঁহারা পালন করিতে পারেন—তবে তাঁহারাই ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক ভাব ও গুণাবলী সঞ্চারিত করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে অভিভাবকদের যে জন্মগত দায়িত্ব রহিয়াছে তাঁহারা যদি সে-টুকু স্বীকার করিয়া নিজ দায়িত্ব পালন করেন, তবে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে যাহা শিখিবার সুযোগ পাইবে না উপযুক্ত অভিভাবকের সাহচর্যে তাহা শিখিতে পারিবে। ছাত্রের জীবন ও আচরণ গঠনে রাষ্ট্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেরই সম্মিলিত দায়িত্ব রহিয়াছে, একজন নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করিলে বা অবহেলা করিলে অপর দুইজনও পঙ্গু হইয়া যায়। পরস্পর দোষারোপ না করিয়া, সময় নষ্ট না করিয়া এই অধঃপতিত জাতির পুনরুত্থানের জন্য, ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্রগণের মানসিক পুনর্বাসনের জন্য সম্মিলিতভাবে সুচিন্তিত উপায় এখনই অবলম্বনীয়।

ভারতের ভাষা-সমস্যা

ভাষা-সমস্যা লইয়া ঝড় ভারতে লাগিয়াই রহিয়াছে, কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে ঘূর্ণিবায়ুর মতো উহা ঘুরিতেছে। সাম্প্রতিক ঝড়ের কেন্দ্র দক্ষিণ ভারত—তাহারই আঘাতে বঙ্গোপসাগরের কূলেও ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়া—মনে হইয়াছিল—এবার প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উহা মিলাইয়া গেল। কিন্তু মিলাইয়া যায় নাই—কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া এখনও উহা ঘুরিতেছে।

ঝড় উঠিয়াছে কখনও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র-গঠন ব্যাপারে, কখনও ভারতের সর্বজনবোধ্য সাধারণ ভাষা (Common language) কি হইবে এই প্রশ্নে, কখন 'জাতীয়' ভাষার (National language) মর্যাদা লইয়া। সাম্প্রতিক ঝড় উঠিয়াছে 'সরকারী ভাষা' (Official language) সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া, সমস্যাটি যদিও প্রশাসনিক তথাপি প্রশ্নটি সমগ্র জাতীয় জীবন লইয়া।

ভাষার ব্যাপারে শান্ত ও নিরপেক্ষ মন লইয়া আলোচনা করা এক রকম অসম্ভব বলিলেই

চলে, তথাপি এ সমস্যার আশু সমাধান যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য আলোচনাও তিক্ত না হইয়া—যত বিভিন্ন দিক দিয়া হয় ততই সমাধানের সুবিধা।

সর্বপ্রথম জানিতে হইবে—সমস্যার স্বরূপ কি? তার পর অবশ্য জ্ঞাতব্য—সমাধানে বাধা কি?

সমস্যা: ভারত-রাষ্ট্র এক সংবিধানে বদ্ধ কতকগুলি রাজ্য (states)। মোটামুটি তাহাদের প্রত্যেকটির একটি প্রধান ভাষা আছে। দুএকটির একাধিক প্রধান ভাষা আছে, যথা: বোম্বাই পঞ্জাব, আসাম, বিহার। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা দান রাজ্যের ভাষার মাধ্যমেই চলিবে। এইরূপ বিভিন্ন রাজ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নত চৌদ্দটি ভাষাকে জাতীয় ভাষার (National language) সম্মান দেওয়া হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্র প্রত্যেকটিরই উন্নতি সাধন করিতে প্রতিশ্রুত।

এ পর্যন্ত কোন সমস্যা নাই সমস্যা পরবর্তী স্তরে, সেখানে প্রশ্ন:

(১) কেন্দ্রের সহিত রাজ্যগুলির সম্বন্ধ কি ভাষায় চলিবে?

(২) কেন্দ্রের ও সরাসরি কেন্দ্রাধীন বিভাগ-সমূহের কাজকর্ম কি ভাষায় চলিবে?

(৩) একটি রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের আলোচনার মাধ্যম কি হইবে?

(৪) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বা আলাপ-আলোচনায় আমরা কি ভাষা ব্যবহার করিব?

(৫) বিদেশে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ব্যক্তিরা ও কূটনৈতিকরা সভায় বা সম্মেলনে কোন্ সাধারণ ভাষায় আলাপ করিবেন?

(৬) উচ্চতম বিজ্ঞানশিক্ষা ও সর্ব ভারতীয় চাকরির পরীক্ষাগুলির মাধ্যম কোন্ ভাষা হইবে?

এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন করা যায়: এখন কি ভাষায় এগুলি চলিতেছে? সর্বজন-বিদিত উত্তর—ইংরেজী। এই উত্তরের পর আবার প্রশ্ন উঠিয়াছে—ইহা কি সমীচীন? —কারণ ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা, দেশের শতকরা একজনও ভাল ইংরেজী লিখিতে বা বলিতে পারে না, সে-ক্ষেত্রে ঐ ভাষাকে ঐ মান দেওয়া চলে কি করিয়া। অবশ্য যতদিন অন্য ভাষা না পাওয়া যাইতেছে ততদিন কেহই ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না, আর এ কথা তো ঐতিহাসিক সত্য—সংস্কৃতের পর এক ইংরেজীই সর্বভারতীয় চেতনা জাগ্রত করিতে বা সর্বভারতীয় ভাব সংগঠন করিতে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করিয়াছে, অতএব সংস্কৃতকে যখন ভারতের জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় নাই—এবং যে কোন কারণেই হউক দেওয়া সম্ভব হইতেছে না—তখন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইংরেজীকেই উহা দিতে হইবে, যতদিন না উপযুক্ত কোন ভারতীয় ভাষা পাওয়া যায়, কাহারও মতে ইংরেজী এখন আর বিদেশী ভাষা নয়—উহা একপ্রকার ভারতীয় ভাষাই এবং বহু ভারতবাসীর মাতৃভাষা। আবার কেহ বলিয়াছেন —বিদেশী বলিয়া যদি যন্ত্রপাতি, ঔষধ-পথ্য, মোটর বা এরোপ্লেন পরিত্যাজ্য না হয়—তবে এই বিশ্ব-

ব্যাপী ভাব আদান প্রদানের এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যম, আধুনিক রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি ও প্রশাসন চালাইবার স্বষ্ঠু যন্ত্রস্বরূপ এই ইংরেজী ভাষাই বা বর্জনীয় কেন ?

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় বিদেশী পণ্য আমরা বর্জন করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ নিজেদের পণ্য রপ্তানি করিবার জন্য অবশ্যই বিদেশী পণ্য আমদানি করিতেছি। কেহ বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণ জাতীয়তার যুগ কাটিয়া গিয়াছে, এক অখণ্ড-মানবজাতির যুগের দ্বারদেশে আমরা উপনীত। ইংরেজী কাঠামোর আধুনিক গণতন্ত্র চালাইতে ইংরেজী ভাষাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার না করিলে উহা হঠাৎ কোন্ সময় অচল হইয়া পড়িবে, তখন আবার উহাতে গতি সঞ্চার করিবে কে ? এই সকল প্রশ্নও আজ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মন আলোড়িত করিতেছে।

বুদ্ধাবির্ভাব

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

অন্ধকার বর্ধনের বন,
নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রি, সমাচ্ছন্ন রেখেছে ভুবন।
বাতাস ঘুমায়ে আছে, নাহি নড়ে বৃক্ষপত্র দল,
আকাশে তারার দীপ ভেদ করি দূর নভস্তল—
জ্বলিছে নিষ্কম্প প্রায়।
কোন দিকে কোন ধ্বনি নাহি শোনা যায়।

ধ্যানে মগ্ন মহর্ষি দেবল,
পার্শ্বে তাঁর উপবিষ্ট স্থির অচঞ্চল
সেবা-রত ধীমান্ নালক—
একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁর—তরুণ বালক।
সহসা নিঃসীম নভে টুটি সর্ব আঁধারের কালো,
জ্বলি' উঠে জ্যোতির্ময় আলো।
আঁখি মেলি' চাহিলেন ঋষি—
আলোর কমল যেন
ফুটিয়াছে মহা নভে ভরি চতুর্দিশি।
এ নহে চন্দ্রের ভাতি, অরুণের কনক-কিরণ,
বিদ্যুতের স্থির-দীপ্তি—তার সাথে না হয় তুলন।
এ আলোর দীপ্তি-রশ্মি-ধারা—
বুঝি কোন্ দেবতার আগমন করিছে ইসারা!
যোগের আসন ত্যজি'
কহিলেন তপোধন বালকে সম্ভাষি—
"ভগবান বুদ্ধদেব ধরাতলে আসি
লভিবেন নব-জন্ম—সমাগত সেই শুভক্ষণ,
কপিলবাস্তুতে আমি চলিলাম করিতে দর্শন।"

আঁকা-বাঁকা বন-পথে মিলাইয়া গেলেন দেবল,
নালক রহিল বসি' একা সেথা,
হৃদি তার কোন্ ভাবে হইল উচ্ছল।
অপরূপ দৃশ্য এক দেখা দিল ধ্যান-নেত্রে তার :

হিম'লয়-গিরি হ'তে বহু উর্ধ্বে—
জাগিয়া উঠিল এক আলোর বিস্তার।
মাঝে তার সিন্দূরের টিপ সম
উঠে সূর্য হ'য়ে মনোরম।
চাহিয়া আছেন স্থির—শুদ্ধোদন সেই দৃশ্য পানে।
হেন কালে মায়া দেবী
নৃপতিরে সম্ভাষিয়া মধুর আহ্বানে

কহিলেন সানন্দ অন্তরে
সুমধুর স্বরে :
মধুর স্বপ্নের ঘোরে এতক্ষণ ছিনু মুহ্যমান।
কি দৃশ্য দেখিনু আহা।
সেই সুখে গেছে ভরি প্রাণ।
দ্বিতীয়া চাঁদের মত হস্তী এক শুভ্র শ্বেত-কায়,
অঙ্কে মোর নেমে এল
ভরি দিক্ জ্যোতির আভায়।
তারপর কোথা গেল—
খোঁজ নাহি পেল মোর বিভ্রান্ত নয়ন,
কহ রাজা, এ কেমন অদ্ভুত স্বপন ?

রাত্রি শেষ হ'ল ক্রমে প্রভাত-উদয়ে,
জাগিয়া উঠিল পৃথ্বী নবরূপে রূপায়িত হ'য়ে।
কপিলবাস্তুর মাঝে দিকে দিকে প'ড়ি গেল সাড়া,
রাজরাণী স্বপ্ন-ঘোরে
পেয়েছেন কোন্ ভাবী মঙ্গল-ইসারা।
সভামাঝে বসিলেন রাজা শুদ্ধোদন,
আলো ক'রি স্বর্ণ-সিংহাসন।
পাত্রমিত্র চতুষ্পার্শ্বে, দ্বারদেশে প্রহরীর দল,
মধ্যভাগে খড়ি আর পুঁথি হস্তে নির্বাক বিহ্বল
উপবিষ্ট গণৎকারদল—করিছেন স্বপ্নের গণনা,
তাঁদের অন্তরে জাগে যেন কোন্ দৈবের প্রেরণা।
কহিলেন সবে সমস্বরে :
শুন রাজা, পরম সৌভাগ্য তব
সমুদিত পুত্র জন্ম তরে।
পুত্র হবে গুণবান্ রূপবান্ মহৈশ্বর্যময়,
ধর্মে হবে মহীয়ান্—ধরার বিস্ময়।
জীবেরে সে দিবে শান্তি—দুঃখহারী সারা নিখিলের
মিথ্যা কভু নাহি হবে, এই মহা বচন শাস্ত্রের।
চারিদিকে উঠে মহা আনন্দের ধ্বনি,
আনন্দের স্রোত বহে ভাসাইয়া সমগ্র ধরণী !

লুম্বিনীর রম্য উপবন,
আসন্না পূর্ণিমা রাত্রি
বিঘোষিছে বুঝি কোন্ অপূর্ব লগন।
সহচরী-হস্ত ধরি মায়াদেবী ভ্রমণের তরে,
উপনীত সেই স্থলে হরিষ অন্তরে।
দিবা ক্রমে হ'ল শেষ, থেমে গেল বিহঙ্গের গান,
পশ্চিম দিগন্ত পানে দীপ্ত সূর্য হ'ল অস্তমান।
পৃথিবীর এক পারে দিবসের চিতা-বহ্নি জ্বলে,
অন্য পারে বৈশাখের
পূর্ণ-শশী উদয়ের সমারোহ চলে।
দাঁড়ালেন রাজরাণী বাম-হস্তখানি তাঁর
রাখি এক শালের শাখায়,
অন্য হস্ত রাখিলেন কটিদেশে
পথশ্রম লাঘব-আশায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আকাশের মহাবক্ষে ফুটে উঠে তারকার মালা,
সহসা উঠিল চন্দ্র রশ্মি-জালে ক'রি বিশ্ব আলা।

বুদ্ধের জনম হ'ল সেই মহা পবিত্র লগনে,
আরেক চাঁদের রূপ দেখা দিল মাটির ভুবনে।
মধুর পরশে তাঁর
জুড়াইল পৃথিবীর যুগ যুগ ব্যথা।
ধ্বনিয়া উঠিল শঙ্খ
দিকে দিকে ঘোষি' সেই অপূর্ব বারতা।

নালক আশ্চর্য হ'য়ে দেখে সব অপলক চোখে,
সে যেন জাগিয়া আছে
অন্য এক জ্যোতির্ময় আনন্দের লোকে।
মেঘে মেঘে বেজে ওঠে দেবতার দুন্দুভির রব,
বায়ুর বীজনে বহে নন্দনের অমৃত-সৌরভ।
বুদ্ধের জনম হ'ল
ঊর্ধ্ব হ'তে স্বর্গ যেন নেমে এল মাটির ধরায়
দেবতার কৃপা-দৃষ্টি ফুল হ'য়ে ফুটিল ধূলায়।

সংসার ও ঈশ্বর*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
[সহাধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন]

সংসারে এসেছি, আবার সংসার থেকে চলে যেতে হবে। এই যে সংসার-চক্র ঘুরছে—এই যে চক্রব্যূহ—এর থেকে বেরোবার উপায় কি? কি ক'রে শান্তিধামে পৌছানো যায়? সে শান্তি-ধাম কোথায়? সকল ধর্মের অবতার-পুরুষেরা একই কথা বলছেন—ভগবানই সেই শান্তিময় ধাম। তাঁকে বাহিরে খুঁজে পাওয়া যায় না, ভিতরে খুঁজতে হয়।

সংসারে থেকে কিভাবে তাঁকে খোঁজা যায়, কিভাবে ঠিক ঠিক চলা যায়—কেমন ক'রে তাঁকে ভালবাসা যায় এ সম্বন্ধে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে,—আমি তখন দক্ষিণ ভারতে—বাঙ্গালোরে থাকতাম, সেখান থেকে আমি ত্রিবাঙ্কুর হয়ে ত্রিবেন্দ্রামে একটি ভক্তের বাড়ীতে পাঁচ-সাত দিন ছিলাম। ভক্তটি বেশ পণ্ডিত, তাঁর পাঁচ-ছটী ছেলে-মেয়ে। তাঁর মুখে একই কথা—'এ সংসার ঠাকুরের—আমার নয়, সব তাঁর—তাঁর—শুধু তাঁর।' শুনলুম। মনে হ'ল সকলেই তো এরূপ বলে থাকে, কিন্তু সকলে কি বোঝে? তিনি জজ্‌ ছিলেন। একদিন আদালত থেকে ফিরে এসে বললেন, 'চলুন, আপনাকে ঠাকুরঘর দেখাই।' গেলুম তাঁর সঙ্গে। ঠাকুর দর্শন ক'রে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, দক্ষিণ দেশে প্রণাম মানেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। দেখলুম যেন তাঁর হুঁশ্‌ নেই। তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে আবার সেই কথা—'ঠাকুরই সব। তিনিই আমাকে এই সব দিয়েছেন। এরা আমার কেউ নয়। এরা আমার কে?' তারপর ঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন: এ সব তো তাঁর। তা হলে আমার কি রইল? আমার কি কেউ নেই? আবার তাঁকে দেখিয়ে বলছেন—আমার শুধু উনি। আমি শুধু কর্তব্য পালন করছি।

সংসারে থাকতে হলে কিভাবে থাকবে হবে—কিভাবে সংসার পালন করবে—এই ভক্তের উক্তি থেকে শেখো। কথাগুলি সুন্দর, দেখ দেখি—ভাবটি কি মধুর। কেউ আমার নয়, সব তাঁরই—একমাত্র তিনিই আমার। ভগবান আমার, এরা সব ভগবানের। যে দিন আমরা এই ভাবে চলতে পারব, সে দিনই আমাদের ঠিক ঠিক চলা হবে।

আর একটি মহিলার সঙ্গে দেখা হয় কাশীতে। ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বংশে তাঁর জন্ম। অদ্বৈত গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। সেই গোস্বামী বংশেই এঁর জন্ম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বংশে জন্ম শুনেই এই মহিলাটির উপর আমার শ্রদ্ধা হ'ল। তাঁকে একটা প্রশ্ন করলুম, 'আপনার ছেলে-মেয়ে আছে, আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনি কি ছেলেমেয়ের চেয়ে ঠাকুরকে বেশী ভালবাসেন?' প্রশ্নটি শুনে তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই। ছেলে-মেয়ে তো সঙ্গে আনিনি। আমি একা এসেছি—একা যাব। এই সব ছেলে-মেয়ে—সবই তো তাঁর। তিনি দিয়েছেন, তিনি যখন ইচ্ছা নিয়ে নেবেন। আমার কিছু বলবার নেই। একমাত্র ভগবানই চিরকাল

* গত ২৮শে জানুআরি নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ: শ্রীঅনন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত

আমার। কখনও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ নেই, তাই তাঁকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসি। সংসারে আমি খালি কর্তব্যটি পালন করে যাচ্ছি।'

কেমন সুন্দর ভাব। এই ভাবটিই হ'ল কর্মযোগের 'যোগ'। সব সময় এটা থাকে না। সাধনার দ্বারা এই ভাবটি আনতে হয়। সর্বদা সত্যাসত্য বিচার করতে হয়। অসত্যটি ত্যাগ ক'রে সত্যটি গ্রহণ করতে হয়। দেখ দুটি জিনিস আছে—(১) আমি ও আমার, (২) তুমি ও তোমার। প্রথমটি হচ্ছে অসত্য—অজ্ঞান, তাই সে বন্ধনের হেতু। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সত্য—জ্ঞান, তাই সে মুক্তির হেতু। এই দ্বিতীয় 'তুমি তোমার' ভাবটিই হ'ল আসল ভাব সংসারে থাকবার পক্ষে। এই ভাবটি নিয়ে সংসার কর, তা হলেই অনাবিল শান্তি পাবে। মীরার জীবন দেখ না। সংসারের সুখৈশ্বর্য মীরার নিকট আলুনী বোধ হ'ল গিরিধারীকে পেয়ে। 'আমি-আমার' মানে সংসার আর সংসার মানেই কাম-কাঞ্চন। ঠাকুর বলতেন, কাম-কাঞ্চন মিথ্যা। তার ভিতর বৃথাই আনন্দ খুঁজছ। তুলসীদাস বলতেন, 'জোরু, জমি ও রূপয়া' শাশ্বত আনন্দ দিতে পারে না। সংসারে যা কিছু সব নশ্বর। কিছুই চিরকাল থাকবে না, তাই অশান্তি।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার ইচ্ছা ক'রে একদিন যাজ্ঞবল্ক্য জ্যেষ্ঠা মৈত্রেয়ীকে আহ্বান ক'রে বললেন—'মৈত্রেয়ি! আমি তোমাদের দু'জনের ভিতর আমার বিষয়-সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিতে চাই।' মৈত্রেয়ী তাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান, এ বিষয় দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব কি?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না, বিষয় কখনও অমৃতত্ব দিতে পারে না—সে শুধু ভোগ-সুখের জন্য।' মৈত্রেয়ী বললেন—যা দিয়ে আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমার কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?' কি সুন্দর ভাব! আজকাল কি কোনও স্ত্রী কোনও স্বামীকে এরূপ প্রশ্ন করবেন?

ত্যাগই সব। ত্যাগই আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র। ত্যাগই আমাদের সঞ্জীবিত রেখেছে। মুসলমান শাসন এবং ইংরেজ শাসনের ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়েও তাই আমরা টিকে আছি। ধন-সম্পত্তি আমাদের পরমার্থ দিতে পারে না। টাকা শুধু ভোগ আনে—ভোগ বৃদ্ধি করে। ত্যাগেতেই প্রকৃত শান্তি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আবার এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন এক হাতে টাকা এবং এক হাতে মাটি নিয়ে 'মাটি টাকা, টাকা মাটি' বলে উভয়ই গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। সংসারে সুখের মাঝে দুঃখ আছে—ছায়ার মত একটার পেছু আর একটা। অনাবিল সুখ সংসারে পাওয়া যায় না। তাই বৈদিক যুগের শিক্ষাই ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, 'তুমি তো আমার প্রীতিভাজন আছই। সম্প্রতি তুমি আমার প্রিয় প্রশ্ন করে প্রিয়তরা হলে।' যাজ্ঞবল্ক্য আবার বুঝাতে লাগলেন—ভালবাসার মূলে কে রয়েছেন? ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। পতির জন্যই পতি প্রিয় নয়, আত্মার জন্য প্রিয়। এই আত্মার জন্যই আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি. এই আত্মার জন্যই পতি পত্নীকে ভালবাসে, পত্নী পতিকে ভালবাসে, মাতা পিতা সন্তানকে ভালবাসে। তুমি আমার ভিতরে তাঁকে দেখতে পাও—আমি তোমার ভিতরে তাঁকে দেখতে পাই। আত্মাকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না—ভগবান সকলের ভিতর আত্ম-স্বরূপে রয়েছেন। তিনি আছেন বলেই সবই সুন্দর, সবই ভাল, সবই প্রিয়।

তিনি আনন্দের খনি। সংসারের ভিতর বিষয়ের মধ্যে শাশ্বত আনন্দ চাও তো সে ভুল —মহাভুল। আমরা আমিত্বের উপাসনা করছি। তিনি কত কাছে—কত নিকটে, আমারই দেহে তিনি বসে আছেন, কিন্তু আমরা হৃদয়ের দরজা বন্ধ ক'রে তাঁকে বার ক'রে দিয়েছি। আমরা বহির্মুখী হয়েছি, তাঁকে চাচ্ছি না। বাহিরে শান্তি খুঁজি, কিন্তু তিনি তো ভিতরে। দেখ না, এক একটি ইন্দ্রিয়ই এক এক প্রাণীর পক্ষে মৃত্যুর কারণ হয়। পতঙ্গ রূপ-দর্শন ক'রে আগুনে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরে, জিহ্বার আস্বাদনের জন্য মৎস্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কর্ণের তৃপ্তি সাধনের জন্য হরিণ এসে দাঁড়ায় বাঁশী শুনতে—ব্যাধ তাকে মেরে ফেলে। উপনিষদ্ বলেন, পৃথিবীর জীবকে তিনি বহির্মুখী ক'রে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমাদের খুঁজতে হবে তাঁকে অন্তর্মুখী হয়ে। ঠাকুর বলতেন :

'আপনাতে আপনি থাকো মন
যেয়ো নাকো কারো ঘরে।
যা চাবে তা বসে পাবে,
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥"

দেখনি, ঠাকুরকে কোথাও যেতে হয়নি। সব পেলেন তিনি নিজের ভিতরে।

তাই বলি, ডুব দাও। সংসারের মায়া-মোহ ছাড়িও না। বল দেখি, আমার বলতে এ সংসারে কি আছে? কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। সেই গোস্বামী-বংশজ ভক্ত মহিলাটির কথা ভাব। কেমন সুন্দর বলেছেন—'একা এসেছি, একা চলে যাব।' এই ভাবটি সব সময়ে জাগ্রত রাখবে। আমার সঙ্গে যাবে শুধু ধর্ম, সত্য ও সাধনা—আর কিছুই যাবে না। তাই ধর্মাচরণ করতে হয়, সাধনা করতে হয়, ভিতরে ডুব দিতে হয়, সত্যের পূজা করতে হয়। কিন্তু আমরা করি মিথ্যার পূজা—ভোগের পূজা, বাসনার পূজা। এতে ভোগের উপশম হয় না, বাসনার তৃপ্তি হয় না।— —ভোগের দ্বারা ভোগের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি শিখা বর্ধিত হয়, তেমনি ভোগের দ্বারা ভোগের বৃদ্ধিই হয়।

তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেন ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করতে—'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।' ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্ত করতে ধাবিত হ'য়ো না—জ্বলে পুড়ে মরবে। ঠাকুরের সেই দৃষ্টান্তটি পড়োনি? একটা চিল একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল দেখে বহু কাক তার পেছু নিল। চিলটা এদিক ওদিক প্রাণপণে উড়েও নিজেকে সামলাতে পারল না। কাকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই লাগল। অগত্যা সে মাছটাকে ফেলে দিয়ে একটা গাছের ডালে বসে পড়ল। তবে তার শান্তি হ'ল। এই কামনা-বাসনাই হচ্ছে মাছ আর জ্বালা-যন্ত্রণা হচ্ছে চিলগুলো। যত সব যন্ত্রণা এই কামনা-বাসনার জন্য।

ঠাকুর নিজের জীবন দ্বারা কি শিখিয়েছেন, একবার ভেবে দেখ না। মথুর বাবু তাঁর একজন বড় সেবক। তিনি ভাবলেন, তাঁর অবর্তমানে কে ঠাকুরের সেবা করবে। তাই তিনি একদিন ঠাকুরকে বললেন—তাঁর নামে ষাট হাজার টাকার জমিদারি লিখে দেবেন। ঠাকুরকে যেন বৃশ্চিক দংশন করল। তিনি বললেন, "সে কি? আমার মা, আবার আমার জমিদারি। মাকে পেয়ে আমার সব ভরে গেছে। মা-ই তো আমার সব দেখবেন। রক্ষা কর বাবা' ছোট ছেলেকে কি আর কিছুর জন্যে ভাবতে হয়? মা-ই তো তার সব দেখেন।"

ঠাকুর আমাদের এই ত্যাগ-ভাব শিখিয়ে গেছেন। এই ত্যাগ চাই। একদিকে ত্যাগ, অপরদিকে গ্রহণ। ভোগ-বাসনা ত্যাগ, ভগবান-কে গ্রহণ। দেখ না, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন—

ইন্দ্রিয়-সংযম কর, অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ত্যাগ কর, আর আমার সঙ্গে যুক্ত হও, মৎপর হও। ভগবানের সঙ্গে যোগ মানেই ভগবানের উপাসনা। নিত্য তাঁর উপাসনা করবে। বিবেকটি-কে সঙ্গে রাখতে হবে। বিবেক জাগ্রত রাখবে—মন উন্মুক্ত রাখবে—তাঁর কথাই ভাববে। ভাবনা থেকেই ভাব, ভগবানের সঙ্গে ভাব।

আবার জ্ঞান চাই। যাঁকে ভাবব, যাঁর উপাসনা করব, তাঁর স্বরূপের জ্ঞান চাই। ভগবান বলতে আমাদের কি ধারণা? তাঁর তিনটি ভাব বা স্বরূপ আছে:

(১) নিগুর্ণ-নিরাকার। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলেছেন:

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া॥

এই ভাবটি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কোটির মধ্যে দু-একজন বা এই ভাব নিয়ে থাকতে পারেন। এই ভাবে তিনি 'অবাঙ্-মনসোগোচর'।

(২) দ্বিতীয় ভাব—তিনি সৃষ্টিকর্তা। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন—আমাদের সবলকে সৃষ্টি করেছেন। এখান থেকে উপাসনা আরম্ভ।

(৩) তৃতীয় স্বরূপটি 'অবতার'—মনুষ্য-শরীর নিয়ে যখন তিনি আসেন—যেমন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি। গীতার কথা:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

—যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতাররূপে অবতীর্ণ হই।

মনুষ্য-শরীরে আবার তাঁকে উপাসনা করা যায় বিভিন্ন ভাবে—বাৎসল্যভাবে, দাস্যভাবে, সখ্যভাবে ইত্যাদি। ভাবাতীত অবস্থা সাধারণের ধারণার বাইরে। অবতার-পুরুষকে নিয়ে মেশা-মেশি চলে। তাঁকে আপনার ক'রে ভালবাসতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলছেন দেখ না। "মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।" —আমার জন্যই কর্ম কর, আমাকেই আশ্রয় কর, আমারই ভক্ত হও। ভগবানকে ভালবাসলে সকলকে ভালবাসা হয়। ভগবান চান প্রীতি। যেখানে প্রীতি সেখানে ভগবান। মীরা কিনেছিলেন ভগবানকে প্রীতি দিয়ে। তাই তো বলছেন মীরা: প্রীত করনা চাহীয়ে মনুয়া, প্রেম করনা চাহীয়ে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।'

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ঘরে এসেছেন। বিদুর-পত্নী আনন্দে আত্মহারা। কোথায় তাঁর বসন, কোথায় তাঁর লজ্জা,—তিনি যে কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে বিভোর। শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিলেন খুদ। সেটাই কৃষ্ণ খুব খুশী হয়ে খেলেন। কেন? তাতে যে বিদুর-পত্নী প্রীতি মাখিয়ে দিয়েছিলেন।

এই প্রীতিই হ'ল আসল জিনিস—ভক্তি-যোগের 'যোগ'। তাঁকে আপনার ক'রে নাও: তাঁর উপর শ্রদ্ধা আনো। দেখনা, শ্রদ্ধাবলে ঠাকুর তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হলে নিষ্ঠা হবে, নিষ্ঠার পর ভক্তি, ভক্তির পর ভাব। ভগবানকে ভালবাসতে হবে। ভক্তি না হলে কিছুই হবে না। তিনি অন্তর্যামী অন্তরে বাস করেন। মনের কোণ-কানাচ সবই তাঁর জানা। তিনিই আমাদের চালাচ্ছেন।

'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥'

তাই তাঁর শরণাগত হতে হবে—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'। শরণাগত হলে কি হবে?—'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।' তাঁর প্রসাদ হবে—কৃপা হবে। কৃপা হলে পরাশান্তি পাবে, সদ্গতি প্রাপ্ত হবে। তাঁর কৃপা বিনা কিছুই হবার জো নেই। 'কৃপা' মানে কি? 'কৃ' মানে করা, 'পা' মানে

পাওয়া। সুতরাং 'কৃপা' মানে 'ক'রে পাওয়া'। কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হবে—খাটতে হবে। তবে তো তিনি কৃপা করবেন, কৃপা ক'রে আমাদের ভার লাঘব করবেন।

শোনোনি যীশুখ্রীষ্টের সেই আশ্বাস-বাণী—তুমি পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত হয়েছ তো আমার কাছে এস—আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। শ্রীকৃষ্ণও তো তাই বলছেন—অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ঠাকুরও বলছেন: আমায় বকলমা দাও, আমমোক্তারি দাও।—আমাদের পক্ষে শুধু বকলমা দেওয়া, বাকী তিনি দেখে নেবেন। এই হচ্ছে শান্তির উপায়। শরণাগতি! শরণাগতি!! ধন-ঐশ্বর্য কি শান্তি দিতে পারে? না—কখনো না।

নেপালের মহারাণী একবার বেলুড় মঠে এসেছিলেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়। অগাধ ঐশ্বর্য তাঁর। মাথা থেকে পা পর্যন্ত হীরে-সোনা দিয়ে মোড়া। ঘরে ঢুকতেই তিনি দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, আমায় প্রণাম ক'রে কাঁদতে লাগলেন—বললেন, 'আমি জ্বলে পুড়ে মরছি—বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জ্বলছি। মহারাজ, দয়া ক'রে বলুন, শান্তি কিসে পাব?' তাঁর কান্না দেখে আমার চোখে জল এল। ভাবলুম, তাই তো, ঐশ্বর্য মানুষকে শান্তি দিতে পারে না।

ঠাকুর বলতেন: 'শুনে শেখা, দেখে শেখা, ঠেকে শেখা।' লালাবাবু মস্ত জমিদার ছিলেন। কত ঐশ্বর্য তাঁর। তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে একদিন একদল মেছুনী হাট থেকে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। বেলা পড়ে এসেছে দেখে তারা বলাবলি করছিল—'বেলা গেল'। কথা দুটি লালাবাবুর কানে গেল। তিনি ভাবলেন, 'তাইতো, আমি কি করছি? আমারও তো বেলা গেল।' মুহূর্তের ভিতর তিনি সব ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেন।

আবার দেখে শেখা। শ্রীশ্রীমার জীবনটি দেখ না। এই তো ১৯২০ সালে দেহ রাখলেন। তিনি তো ইচ্ছা করলে রাজরাজেশ্বরী হয়ে থাকতে পারতেন। সমগ্র জগৎ যাঁর পূজা করছে তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব ছিল? তিনি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে থাকতেন সামান্যা নারীর মতো। তাঁকে দেখে কেউ চিনতে পারত না—ইনি সকলের মা—জগতের মা। নিবেদিতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে তাঁর কাছে বসে থাকতেন। মাও তাঁর ভাষা জানতেন না, তিনিও মায়ের ভাষা জানতেন না। অথচ সেই নির্বাক সান্নিধ্যের ভিতরই নিবেদিতার মন-প্রাণ ভরে যেত—তিনি সব কিছু পেয়ে যেতেন। এঁদের জীবন দেখে ত্যাগভাবের শিক্ষা গ্রহণ কর। সংসারে আছ, সুতরাং সংসারের কাজ-কর্ম করতেই হবে। কিন্তু মনটা যেন সর্বদা ভগবানের দিকে থাকে। এই ভাবটি বজায় রাখবে যে আমার ভগবান ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁকে নিয়ে সংসার করতে হবে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া হবে। একমাত্র তিনিই তো আমাদের চিরকালের। বাকী যা কিছু—টাকা বল, নাম-যশ বল, বিষয়-সম্পত্তি বল—সব অশাশ্বত, অসত্য। তাই ঠাকুর একদিন হৃদয়কে বলেছিলেন, হৃদু, ঐটাই (কাঞ্চন) যদি সত্য হ'ত, তা হলে সারা কামারপুকুরকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিতে পারতুম।

ঠাকুরের এই কথার মর্মটি ভাবো। তাঁর বইগুলি ভাল করে পড়বে। কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিত তাঁর কাছে আসতেন। ঠাকুর লেখা-পড়া তো কিছু জানতেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ, তাই সকলের সমস্যার সমাধানই তিনি ক'রে গেছেন।

শেষে তুলসীদাসের একটি কথা বলি: 'তুমি কাঁদলে ভূমিষ্ঠ হবার সময়, কিন্তু তখন অন্য সবাই হেসেছিল। তুমি এমনি ভাবে জীবন যাপন কর, যাতে যখন তুমি সংসার থেকে চলে যাবে, তখন যেন হাসতে হাসতে হাসতে যেতে পার এবং সকলে তোমার জন্যে কাঁদে।'

হে বৈশাখ! হে ভৈরব!

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সংখ্যাতীত শতাব্দীর যাত্রাপথে পরিক্রমা করি
হে সন্ন্যাসী। আবার এসেছ হেথা নবরূপ ধরি।
হে বৈশাখ! হে ভৈরব। নবীনেরে দাও আজি ডাক,
স্পর্শে তব অসত্যের সহস্র জঞ্জাল দূরে যাক,
আশার তোরণ-দ্বারে আদর্শের শুভ উদ্বোধন
কর আজি আশাবরী সুরে। আনন্দের আলিম্পন
দাও এরে অন্তরের স্তরে,—ধরণীর ঘরে ঘরে
সভ্যতার পশ্বাচারে যেথা, আশ্রয় বিদ্রূপ করে
আশ্রিত জনেরে, সেথা এসে সত্যরূপে, প্রেমরূপে,
দূর করো অকল্যাণ যত। অর্চনার গন্ধ ধূপে
ভাগবত প্রেরণার প্রীতিরসে করগো উৎসব
সংসারের আয়তনে,—শান্তি সুখ হবে কি সম্ভব?

শ্মশান-মথিত ভূমে পথের কুক্কুর সম যাত্রী
করে কোলাহল সদা, স্বার্থগৃধ্নু হয়ে। দিবারাতি
জনারণ্যে ওঠে হাহাকার, কান পেতে শোনে কারা
কাঁদে? বিষায়েছে বায়ু কোথা? দিকে দিকে দিশাহারা
দিনগুলি বর্ণহীন, নামে বিভীষিকা গ্লানি লয়ে,
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ হোলো জীবন-মৃত্তিকা। দুঃখ সয়ে,
ক্ষয়ে যায় পাষাণ হৃদয়,—বলো সান্ত্বনা কোথায়?
এক মুষ্টি অন্নতরে বুভুক্ষু যে বিশ্বপানে চায়!

হে বৈশাখ। হে ভৈরব। জীবনের উপকণ্ঠে মোর
এস আজি, চিত্ত-মেঘমায়া ভেদি ঝরে অশ্রুলোর
এ দুটি নয়নে। কৃপা-ঘন দেবতার পথ চেয়ে
দিন মোর কেটে যায় বিরহের গানগুলি গেয়ে।
কোথা কোন্ হৃদিকুঞ্জে প্রেমপুষ্পে গুঞ্জরে মধুপ।
সেথা কি দেখাবে মোরে সুন্দরের মধুর স্বরূপ?

প্রকৃত ধর্ম

শ্রীমতী লীলা মজুমদার

মৃত্যুর পর যদি আমাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনও অস্বাক্ষরিত চিহ্ন রেখে যেতে না পারি, তা হ'লে আমাদের বেঁচে থাকার মূল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। শুনেছি, চীনদেশে প্রবাদ আছে যে এ জীবনটাকে সার্থক করতে হ'লে—হয় একটা বই রচনা করতে হয়, নয় একটা বাড়ী তৈরী ক'রে যেতে হয়, নয় তো একটা গাছ পুঁতে যেতে হয়। অর্থাৎ এমন কিছু ক'রে যেতে হয় যা আমাদের অবর্তমানেও মানবজাতির সেবায় লাগবে—সে জ্ঞানালোকই হোক, আশ্রয় আচ্ছাদনই হোক বা যাই হোক না কেন।

খ্যাতির লোভে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা, অথবা ঘাট বাঁধানো কি পান্থশালা স্থাপনা নয়—যাদের চোখে দেখব না, সেই সব মানুষদের জন্য দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে নামগান করবার একটা জায়গা, নদী-তীরে হাত মুখ ধুয়ে শরীর মন শীতল করবার জন্য খান কুড়ি সিঁড়ি, অচেনা জায়গায় এসে মাথা গুঁজবার একটি আশ্রয়—এও মানুষের সেবা।

বিধাতার দুজ্ঞে'য় ন্যায়-বিধানে কারও অর্থবল বা বুদ্ধিবল থাকে বেশী, কারও কম। তাতে কিছু এসে যায় না। ভবিষ্যতের সেবার জন্য একটা চিহ্ন রেখে যেতে হ'লে বেশী কিছু মূলধন লাগে না, যেটুকু আমাদের আছে তাই যথেষ্ট। দেশের সেবা করবার জন্য একটি সরল সত্যবাদী ছেলে কিংবা মেয়ে রেখে গেলেও হবে, কিংবা পরের ছেলে-মেয়েকে দুটো ভালো কথা শিখিয়ে দিয়ে গেলেও হবে, নিদেন নিজের একটা কাজ দিয়ে একজনের মনে আশা রোপণ ক'রে দিলেও হবে, একটি লোককে অক্ষর চিনতে শিখিয়ে দিলেও হবে—এমন কিছু কাজ যা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে না, মাটির নীচে গাছের বীজের মতো ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে একদিন কাউকে না কাউকে ছায়া ও মিষ্টি ফল দেবে।

নিজে খেয়ে পরে নিজের দেহের আরাম খুঁজে বেড়ানো এক রকম স্বার্থপর কাজ, কেবল নিজের আত্মার সদ্গতি করবার চেষ্টাও আর এক রকম স্বার্থপরতা। আমি আজ এ খাব না, কাল ও খাব না, এ সময় আমাকে নিরিবিলি বসতে হবে, অতএব আমাকে বিরক্ত কোরো না, ও লোকটা কেবল সাংসারিক সাহায্য চায়, অতএব ওকে পরিহার ক'রে চলতে হবে, আমি এখন আত্মচিন্তায় আছি—এমন ধর্মে কার কি বা এসে যায়?

বাইবেলে আছে—যে লোক দিনরাত শুধু 'ভগবান ভগবান' করে, প্রকৃত ভক্ত সে নয়। যে ভগবানের আদেশ পালন করে, তাঁর অভিপ্রেত কাজ করে, সে-ই হ'ল প্রকৃত ভক্ত। তা হ'লে নাস্তিকও ভালো ভক্ত হতে পারে যদি সে সেবা-পরায়ণ হয়। ধর্ম বলতে স্তবস্তুতি বা ভগবানের চাটুবাদ বোঝায় না।

'সংসার-ধর্ম' কথাটি আজকাল আর শোনা যায় না, বরং মানুষের মনে একটা ধারণা জন্মে গেছে ও 'সংসার' আর 'ধর্ম' দুটি বিরোধী বস্তু, তাই সংসার করা আর ধর্ম করা—এই দুটি অনুষ্ঠানকে অনেকেই আলাদা ক'রে রাখে। দিনের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যে যেটুকু সময় হয়তো ধর্মের জন্য নির্ধারিত করা গেল, সেটুকু সময়ের জন্য একটা অন্য মানুষ হয়ে যেতে হবে, হাতমুখ ধুয়ে,

শুদ্ধ কাপড় পরে যেমন দেহটাকে শুচি ক'রে নেওয়া গেল, তেমনি ঐটুকু সময়ের জন্য মনটাকেও শোধন ক'রে নিতে হয়, মুনি ঋষিদের লেখা ভালো ভালো কথাগুলি পড়তে হয়, শুনতে হয়, নিজেকেও যথাসাধ্য তার উপযোগী ক'রে তুলতে হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ঐ সময়টুকুর জোরে দিনের বাকি অংশটুকু ঘোর বৈষয়িকভাবে কাটিয়ে দেওয়া হয় এবং সকাল-বিকেলে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করি, সারাদিন নির্ভয়ে ঠিক তার উল্টোরকম কাজ করি। দু'বেলা পূজো করা আছে, আত্মার জন্য তো আর সে-রকম ভাববার কারণ রইল না।

কেউ কেউ আরও একটা ভালো উপায় অবলম্বন ক'রে থাকেন। হাজার হোক দুবেলা পূজোয় বসা তো আর কাজের মানুষের পক্ষে সব সময় সুবিধা হয় না। তার চাইতে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ রেখে দিয়ে একাধারে ব্রাহ্মণ সেবা আর বাড়িশুদ্ধ সকলের আত্মার সদ্গতি হয়ে গেলে মন্দ কি। তাছাড়া এখানে ওখানে নিয়মিতভাবে দান করা রইল, লোক খাওয়ানো হ'ল, এ সবেরও তো একটা সুফল পুঁজি থাকবে।

এমনি ক'রে আমরা সাধারণতঃ সংসারের আর ধর্মের উভয়ের দাবি মেটাবার চেষ্টা ক'রে থাকি, আর ধর্ম দ্বারে দ্বারে উপোসী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অথচ অভিধানে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ লেখা আছে—সৎকর্ম, সদাচার, কর্তব্য, সমাজ-হিতকর বিধি, অর্থাৎ পূজো করা আর ধর্ম পালন করা এক নয়।

পূজো করবার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মে ছেদ পড়তে পারে না—নিরন্তর পালন ক'রে যেতে হয়। ঐ যে চীনে প্রবাদটির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানেও এই রকম ধর্মেরই ইঙ্গিত আছে। এ ধর্মে নিজের জীবনটাই হ'ল পূজার একমাত্র উপকরণ।

কত রকম দুর্বলতা দিয়ে গড়া মানুষের দেহমন, কত রকম ছোট বড় ক্ষুধা তৃষ্ণা, কত রকম চাহিদা। সব সময় সে চাহিদা উপেক্ষা করাও শক্ত। কিন্তু তাই দিয়ে যেমন জীবন সার্থকও হয় না, তার জন্য ব্যর্থও হয় না। জীবনকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখলে আত্মার উন্নতি হয় না। এমনকি, যদি এ জীবন আত্মার একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রই হয়, নিজস্ব এর একটি মূল্য না থাকে, তা হলেও তাকে অমরত্বের উদ্বোধন-ক্ষেত্র মনে করতে হয়। তার বিকাশের চেষ্টা করতে হয়। জীবনের কাছে ঋণী থেকে আত্মার দাবি মেটানো কেমন কথা?

তিমির রাত্রি

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হেরিয়াছি নিশাচর অরণ্য গুহায়
হিংস্র ক্রূর বন্যদল করে হানাহানি,
রসনা লোলুপ নিত্য স্বার্থলালসায়
নৃশংস বর্বর তারা ঘৃণ্য পশু জানি।

অরণ্যে নাহিকো আর আরণ্যের স্থান,
শ্বাপদেরা রহে তাই মানুষের সাথে,
বৃথা দম্ভ সভ্যতার গর্ব অভিমান—
মানবতা চূর্ণ আজ মানব-আঘাতে।

ধরণীরে করে গ্রাস বঞ্চিত ক্রন্দন—
মানুষ আহুতি আজ বিলাস-আহবে,
নিত্য হেরি জিঘাংসার ক্রম-বিবর্ধন,
নগরে অরণ্য করে মানব-দানবে।

*

জ্যোতির্ময়। জ্বালো তব প্রেমের আলোক
হিংসার তিমির-রাত্রি অপগত হোক্।

ভারত-ইতিহাসে বুদ্ধদেব

ব্রহ্মচারী বিপ্রচৈতন্য

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতং।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥—জয়দেব

ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে সময়ে সময়ে হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান (rebel child of Hinduism) আখ্যা দেওয়া হয়। মনে হয় সে আখ্যা কেবল আপাতদৃষ্টিতেই সত্য।

বুদ্ধদেব সমসাময়িক প্রচলিত ধর্মে বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন, আমরা জানি। কিন্তু সেই ধর্মের স্বরূপ কি? সে ধর্ম মুখ্যতঃ ছিল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, যে ক্রিয়াকাণ্ডে যাগ-যজ্ঞ বলিদান-দক্ষিণা-পৌরোহিত্য-স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গি-ভাবেই ছিল সংশ্লিষ্ট। বুদ্ধদেব ঐগুলির অসারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বর্গলাভের পরিবর্তে তিনি নির্বাণকে চরম আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানবহুল যাগযজ্ঞের স্থলে শুদ্ধ সংকল্প, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ জীবিকা, শুভ ধ্যান, সম্যক্ সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গিক মার্গকে এবং মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতি ভাবনাকে সাধনরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম বিশেষ কোন আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দিত না—তাঁহার ধর্ম কেবলমাত্র মানুষকে পবিত্র হইতে, সংযত হইতে, সেবাপরায়ণ হইতে এবং সর্বোপরি সর্বভূতে প্রেমপরায়ণ হইতে নির্দেশ দিত। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেব প্রায় নীরব ছিলেন। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিক্লিষ্ট শোক-মোহ-কাম-ক্রোধে জর্জরিত মানুষের মর্মন্তুদ দুঃখের কিসে আশু ও সম্যক্ নিরসন হয়—ইহাই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের সকল ক্রিয়াকলাপের একমাত্র লক্ষ্য। সনাতন ভারত ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মকেই ধর্মের প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে, কিন্তু এই প্রধান অবষ্টম্ভগুলির সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের কি মত ছিল—তাহা তিনি সুস্পষ্ট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মত ছিল যেন এইরূপ: এইসকল জটিল তত্ত্বারণ্যে প্রবেশের কি প্রয়োজন? মানুষ যদি প্রেম-মৈত্রীর অনুশীলন দ্বারা আপনার বাসনা-কামনার বিনাশ করিতে পারে, তবেই ত সে অনায়াসে অশেষ দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, মনুষ্যজীবন সার্থক হয়। জীবনের সার্থকতা লাভ হইলে বৃথা বাগাড়ম্বরের উপ-যোগিতা কোথায়?

বুদ্ধ-প্রচারিত এই তথ্যগুলি আলোচনা করিলে স্বতই মনে হয় বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান বলা বুঝিবা সঙ্গত। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করিলে এ উক্তি অসম্পূর্ণ উক্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। বরং বিপরীতক্রমে এই প্রতীতিই দৃঢ় হইবে যে বৌদ্ধধর্ম সনাতন ধর্মেরই দেশকালোপযোগী অভিনব সংস্করণ মাত্র।

ধর্মকে শুষ্ক বিচার-বিশ্লেষণে নিবদ্ধ না রাখিয়া বুদ্ধদেব দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। জীবনের প্রতি-ক্ষণে অনুভূত দুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরম প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধধর্মের সূচনা। হিন্দুধর্মের সহিত পরিচিত পাঠক জানেন আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক মানুষের ত্রিধা-বিভক্ত সর্বপ্রকার দুঃখের উপশমই এখানেও ধর্মের প্রয়োজন বলিয়া গৃহীত। সুতারং মূল প্রয়োজনে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য নাই।

এই প্রসঙ্গে দুঃখনিবৃত্তিরূপ অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সমস্ত দুঃখ

(মনে রাখিতে হইবে বৈষয়িক সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং প্রতিক্রিয়া-উৎপাদক বলিয়া উহাও দুঃখেরই পর্যায়ভুক্ত) নিবৃত্ত হইলে সাধক যে অবস্থা লাভ করেন বুদ্ধদেব তাহাকে 'নির্বাণ' বলিয়াছেন। সুখদুঃখ-নিবৃত্ত অবস্থাকে প্রাচীন ধর্মে 'ব্রাহ্মী স্থিতি' 'ঈশ্বরলাভ' 'মোক্ষ' প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা হইয়াছিল। প্রশ্ন জাগে—হিন্দুধর্মের 'মোক্ষ' ও বুদ্ধ-বিঘোষিত 'নির্বাণ' কি একই অবস্থার নামভেদ অথবা বস্তুতই তাহারা স্বতন্ত্র ?

বিষয়টি জটিল ও দীর্ঘ-আলোচনা-সাপেক্ষ। তবে বুদ্ধোত্তর যুগে এবং অদ্যাবধি নিরপেক্ষ বুধমণ্ডলী এ সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধাবন ও গবেষণা দ্বারা ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন দেখা যায় যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য 'মুক্তি' 'ব্রহ্মানুভূতি' বা 'আত্মজ্ঞান' এবং ভগবান তথাগত-প্রচারিত 'নির্বাণ' একই অবস্থার বিভিন্ন নামকরণ মাত্র। একই বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে দৃশ্য রূপও ভিন্ন প্রকার হয়—ইহা ত আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং অধ্যাত্মসাধনার চরমভূমিতে উপনীত হইয়া মানুষ যে অনুভূতি অর্জন করিবে তাহাই বা বিভিন্ন সাধকের নিকট কেননা বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইবে ? দার্শনিকগণ তাই বলেন ঃ যে অনুভূতিকে অস্তিবাচক (positive) ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া বৈদান্তিকগণ 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' বা 'ব্রহ্ম' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—সেই একই অনুভূতিকে নাস্তিবাচক (negative) ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া বুদ্ধদেব 'নির্বাণ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্বাণ যে শূন্যকে (zero) বুঝায় না, বুঝায় একটি ভাবমূলক (positive) অবস্থাকে—এ ধারণা বুদ্ধোত্তর যুগে ক্রমশই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবাবরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে দেখা যায়। বাসনার নিঃশেষ বিলুপ্তিতেই যে ব্রহ্মানন্দ, ইহা ত বেদান্তেরই মত। আর ইহাও ত বেদান্তেরই মত যে ব্রহ্মানন্দ-উপলব্ধি প্রকাশের যোগ্য মানবীয় ভাষা কিছু নাই,—ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, ব্রহ্ম (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়) অনুচ্ছিষ্ট, ব্রহ্ম অনির্দেশ্য।

'নির্বাণ' ও 'মুক্তি' সমার্থক বলিয়া স্বীকার করিলে এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বৌদ্ধ-মতবাদ বেদবিরোধী নয়। বেদের কর্মকাণ্ডকে উহা অস্বীকার করিতেছে সত্য, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত—যাহা আত্মার স্বরূপ, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বেদের চরম সিদ্ধান্তসকলকে প্রকাশ করিয়াছে—তাহার সহিত ইহার মৌলিক প্রভেদ নাই। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বুদ্ধদেব আত্মা বা ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা বড় একটা করিতেন না। দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ-সাধনে কর্মকাণ্ডের ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞের অনুপ-যোগিতা যেমন বিনাদ্বিধায় স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বেদান্তের তথ্যগুলি সেভাবে অস্বীকার বা স্বীকার করেন নাই। আত্মা, মুক্তি, বা অনুরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি বলিতেন 'আমি যাহা বলিয়াছি, যাহা প্রকাশ করিয়াছি তাহাই তোমাদের নিকট ব্যক্ত হউক, যাহা প্রকাশ করি নাই তাহা অপ্রকাশিতই থাকুক।' ইহা হইতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে বুদ্ধদেব যদিও বেদান্তের ধর্মই অন্য ভাষায় বা ভাবাবরণে প্রচার করিয়াছিলেন, তথাপি যুগ-প্রয়োজনে লোকহিতার্থে উভয় ভাবধারার অন্তঃসঞ্চারিত ঐক্যটিকে জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাই লিখিয়াছেন—'যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি ? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার

অতুলনীয় সহানুভূতিতে). তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে, নাই তাঁহার intellect (প্রতিভা) এবং heart (হৃদয়বত্তা), যাহা জগতে আর হইল না।' (পত্রাবলী) আর, বলিয়াছেন—'Sakya Muni came not to destroy but he was the fulfilment, the logical conclusion, the logical development of the religion of the Hindus' (Chicago Address)—শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নহে। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি, স্বাভাবিক বিকাশ হইলে যাহা হয় তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু কি সেই যুগপ্রয়োজন—যাহার জন্য তিনি আপাতভাবে বেদান্তের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন?—তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং এজন্য সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার একটা সামগ্রিক রূপও মানসপ্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

ভারতের ঐতিহ্য এমন এক প্রাণচঞ্চল সত্তা—যাহার যৌবন আজিও উৎক্রান্ত হয় নাই। তাই দেখি স্মরণাতীত কাল হইতে সে আপনার দেহটিকে পারমার্থিক সত্যানুসন্ধান রূপ মহত্তম ব্রতে এমনভাবে সুগঠিত করিয়াছে যে কালের কুটিল আবর্তে নানা ব্যাধি, নানা জীর্ণতা যখনই আসিয়াছে তখনই সে অতি বিস্ময়কর কৌশলে—হয়ত বা ইহাতে দুই চার শতাব্দী সময় লাগিয়াছে—নিশ্চিতভাবে সে ব্যাধি দূর করিয়া উঠিয়াছে। ইহা ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য—কেবল হিন্দু ঐতিহ্য নামে ইহাকে বিশেষিত করিলে ভুল হইবে। ভারত-ইতিহাসের এইরূপ একটি সঙ্কটকালকে বৌদ্ধধর্ম অচিন্ত্য কৌশলে কাটাইয়া দিয়াছে। আমরা জানি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ধর্ম ছিল ক্রিয়া-বহুল। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখলাভ তখন চরমকাম্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এই নিখিল বিশ্বের অন্তরালে অবস্থিত চরম সত্যটি জানিবার জন্য যে বিবিদিষা, নিয়ত আবর্তমান জন্মমৃত্যু-চক্রের পরপারে যাইবার জন্যে যে মুমুক্ষুতা—ধর্মের মধ্যে তাহার স্থান ক্রমশঃ বড়ই শিথিল, বড়ই বিরল হইয়া পড়িতেছিল। এইরূপ অবস্থা আর কিছুকাল চলিলে ভারতে মোক্ষধর্মের হয়ত বা বিলুপ্তিই ঘটিত। বুদ্ধদেব তাই আবার মোক্ষ-ধর্ম প্রচার করিলেন—কিন্তু আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি সাধারণের দুর্বোধ্য তত্ত্বপ্রচার করিলে পাছে ধর্মের মর্ম আবার দুর্গম শব্দারণ্যে পথ হারাইয়া ফেলে এই আশঙ্কায় তাহাদের উল্লেখও করিলেন না। আত্মা ও মুক্তি সম্বন্ধে অবতারণা করিলে তৎকালীন পণ্ডিতম্মন্যদের সহিত যে বাগ্‌যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল তাহাও তিনি এইভাবে এড়াইয়া গেলেন।

তবে আত্মা, মুক্তি বা ব্রহ্মবিষয়ে তূষ্ণী অবলম্বনের ইহা ব্যতীত অন্যতর হেতুও ছিল। মনে রাখিতে হইবে বুদ্ধের সময়ও আর্য সভ্যতা সমগ্র-ভারতে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আর্য ও অনার্য সভ্যতা তখন পাশাপাশি অবস্থান করিতেছিল। উভয় সভ্যতার জীবনাদর্শও ছিল স্বতন্ত্র। আর্য সভ্যতা 'ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব-লাভ' রূপ আদর্শে গঠিত (অবশ্য কালবশে আর্য সমাজেও সে আদর্শ যে ম্লান হইতেছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে),কিন্তু অনার্য সভ্যতা ছিল ভোগৈকসর্বস্ব। সুতরাং আর্য ও আর্যেতর জাতির সংমিশ্রণের ফলে যে নূতন ভারত তৎকালে মাথা তুলিতেছিল,যে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল—তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শ সংশয়াকুল হইয়াছিল। সে নবীন সমাজ সনাতন ত্যাগাদর্শে দীক্ষিত হয় নাই। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভোগ ও ত্যাগ দুই

পরস্পরবিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাত ভারতভূমিতে উপাসন্ন হইয়াছিল। কি করিয়া আর্যেতর অবৈদিক সভ্যতাকে ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া পরমার্থ সত্যানুসন্ধানে বা জাতীয় জীবন-লক্ষ্যে অভিমুখী করা যায়—তাহা ছিল এক মহাসমস্যা। বেদ-উপনিষদের পুনঃপ্রচার দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ছিল অল্প, কেননা আর্যেতর সভ্যতা বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী ছিল না। অথচ সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান ব্যতিরেকে "জীবনাদর্শের এই ঘোর সংঘর্ষে কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী আর্যসমাজ কোন-মতেই জয়লাভ করিতে পারিত না, এমনকি রণে ভঙ্গ দিয়া মৃত্যুযবনিকার পারে (উহাকে) সরিয়া যাইতে হইত। আর্য ও অনার্যের এই ঘোর সংঘর্ষে সনাতন ধর্মের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি আবার প্রকাশ পাইল,—যুগাবতার ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং উভয় সভ্যতার মধ্যে সংযোগ-সাধক মহা-সেতুরূপে আবির্ভূত হইলেন।"* সনাতন ধর্মের মর্ম তিনি গ্রহণ করিলেন—কিন্তু তার বাহ্যরূপ, তার ভাবভূষণ, শব্দমালা (terminology) পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, যাহাতে অনার্য সভ্যতা উহাকে বিনাদ্বিধায় আপনার কণ্ঠের হাররূপে গ্রহণ করিতে পারে। "আর্য সমাজের গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া (ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম বাচক সাধারণের দুর্বোধ্য তত্ত্ব পরিহার করিয়া) প্রবল নিবৃত্তির আদর্শের দ্বারা অনার্যের স্বভাবকে এমন পরিবর্তিত করিয়াছিলেন যে দশ-শতাব্দীর পর আর্য ও অনার্যের পূর্ব ব্যবধান লুপ্ত হইয়া গেল।'* আর্যভারতের ত্রৈবর্ণিক সমাজ তথা অনার্য ভারতের শত শত জাতি উপজাতি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি', 'সংঘং শরণং গচ্ছামি' বলিয়া নিবৃত্তিরূপ ত্যাগাদর্শের পতাকা-তলে সমবেত হইল, ভগবান বুদ্ধদেবের সারথ্যে ভারতের ত্যাগাদর্শ সেই মহাসংগ্রামে শুধু আত্ম-সংরক্ষণই করিল না, ভোগাদর্শকে পরাভূত করিয়া তাহার আশ্রিত বিপক্ষ সমাজকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া অদ্ভুতভাবে 'আত্মপ্রসারণ' করিল। যদি ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব না ঘটিত তবে ভোগোৎকর্ষই আর্য-অনার্যমিশ্রিত নব সমাজের লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু 'ভারত-ভাগ্যবিধাতা' তাহা ঘটিতে দিতে পরাঙ্মুখ।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভগবান শংকরাচার্যের সময় যে বিশাল সমাজের (আর্য অনার্য ব্যবধান তখন লুপ্তপ্রায়, সমস্ত ভারত তখন হিন্দু বা বৌদ্ধসমাজে রূপান্তরিত হইয়াছে বলা যায়) রূপ ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করি এবং যে সমাজ অচিরে হিন্দুসমাজ আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার অঙ্গসন্নিবেশ করিয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধ। কেহ কেহ মনে করেন বৌদ্ধধর্ম ভারত ত্যাগ করিয়াছে,—ইহা কেবল বাহ্য দৃষ্টিতেই প্রতিভাত। ভারতে বুদ্ধের নির্বাণসাধনা অল্পসংখ্যক লোকে করে সত্য, কিন্তু নির্বাণ তো একটা ভাবাদর্শ—যাহা মুক্তিরই নামান্তর। মুক্তির আদর্শকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ নির্বাণের আদর্শকেই অবলম্বন করিয়া আছে, আর বৌদ্ধধর্মের অপরাপর সমস্ত বৈশিষ্ট্য—তাহার তীব্র বৈরাগ্য, মাতৃ-সুলভ জীবপ্রেম, সেবাপরায়ণতা, তাহার যোগের উচ্চ উচ্চ তথ্য সমস্তই হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ আজিকার হিন্দুধর্ম প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণ। হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে শ্রীভগবানের অবতারজ্ঞানেই পূজা করেন। তাই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বুদ্ধদেবকে ও তাঁহার ধর্মকে পর বলিয়া দেখিলে চলিবে না,—তাঁহার ধর্মকে নিজেদের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার মহদুদার বাণী, তাহার অপূর্ব জীবপ্রেম ও হৃদয়বত্তা নিজ নিজ জীবনে যথাসাধ্য সঞ্চারিত করিতে হইবে।

---

*ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

সম্যক্ ব্যায়াম

[বৌদ্ধ সাধনা]

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, এম্-এ

ভগবান্ তথাগত জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণগ্রস্ত জীবকুলকে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ নির্বাণ লাভের নিমিত্ত যে আর্য অষ্টাঙ্গিক সাধন-মার্গ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ষষ্ঠস্থানীয় সাধনটির নাম 'সম্যক্ ব্যায়াম' (সম্মা বায়ামো, Right Effort)। 'সম্যক্ ব্যায়াম' অর্থে প্রবল পরাক্রম সহকারে সর্বতোভাবে চেষ্টা-প্রয়োগ বুঝায়। নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়ে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে :

(১) অনুৎপন্ন অকুশল চিন্তা যেন উৎপন্ন হইবার অবকাশ না পায়, তজ্জন্য রুচি উৎপাদন, অক্লান্ত চেষ্টা, উৎসাহ ও সংগ্রাম। বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরিভাষায় এই সাধনার নাম 'সংবর-প্রধান'। 'সংবর' শব্দের অর্থ বাধা দেওয়া, 'প্রধান' শব্দের অর্থ একাগ্র মনে প্রবল উদ্যম।

(২) উৎপন্ন অকুশল চিন্তা পরিবর্জনের জন্য রুচি উৎপাদন, অক্লান্ত চেষ্টা উৎসাহ ও সংগ্রাম। সম্যক্ ব্যায়ামের অঙ্গীভূত এই সাধনার নাম 'প্রহাণ-প্রধান'। 'প্রহাণ' শব্দে পরিত্যাগ বুঝায়।

(৩) অনুৎপন্ন কুশল ভাবের উৎপাদনের জন্য রুচি উৎপাদন, অক্লান্ত চেষ্টা, উৎসাহ ও সংগ্রাম। এই সাধনার নাম 'ভাবনা-প্রধান'।

(৪) ভাবনা দ্বারা উৎপন্ন কুশলের স্থিতি, বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও পরিপূর্ণ সংগঠনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রবল উদ্যম; ইহার নাম 'সংরক্ষণ-প্রধান'।

১। **সংবর-প্রধান :** দীঘ-নিকায়ের 'মহা-সতি-পট্ঠান-সুত্তে' ভগবান্ তথাগত পূর্বোক্ত চতুরঙ্গ-সমন্বিত 'সম্যক্ ব্যায়াম' সাধনার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

'কতমো চ ভিক্খবে সম্মা বায়ামো? ইধ ভিক্খবে। ভিক্খু অনুপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং অনুপ্পাদায় ছন্দং জনেতি বায়মতি, বীরিয়ং আরভতি, চিত্তং পগ্গণ্হাতি পদহতি।' (দীঘনিকায়ো—২২)

—ভিক্ষুগণ, 'সম্যক্ ব্যায়াম' কাহাকে বলে? অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশল ধর্ম যাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে তজ্জন্য ভিক্ষু চিত্তে রুচি উৎপাদন করে, অক্লান্ত চেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্তকে বলপূর্বক গ্রহণ করে ও বশীভূত করে,—ইহাকে 'সম্যক্ ব্যায়াম' বলে।

মনোমন্দিরের দ্বারে সাধককে সতর্ক প্রহরী বসাইতে হইবে, যেন নূতন কোনও পাপ তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। নূতন পাপ প্রবেশ করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিবে, কিন্তু প্রহরী প্রবল উদ্যম সহকারে তাহাকে বাধা দিবে ও পরাভূত করিতে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করিবে। সম্যক্ ব্যায়ামের অঙ্গীভূত এই প্রথম সাধনাটিকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'সংবর-প্রধান' নামে অভিহিত করা হয়।

২। **প্রহাণ-প্রধান :** 'উপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং পহানায় ছন্দং জনেতি বায়মতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পগ্গণ্হাতি পদহতি।'

যাহাতে উৎপন্ন পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ করা যাইতে পারে তজ্জন্য ভিক্ষু চিত্তে রুচি উৎপাদন করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্তকে বলপূর্বক গ্রহণ করে এবং বশীভূত করে। সম্যক্ ব্যায়ামের অন্তর্গত এই সাধনার নাম 'প্রহাণ-প্রধান'। হৃদয়-মন্দিরে এ যাবৎ যে সকল পাপ সঞ্চিত হইয়া আছে উক্ত সাধনা দ্বারা তাহাদিগকে একে একে নিষ্কাশিত করিতে হইবে।

৩। **ভাবনা-প্রধান** : 'অনুপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায় ছন্দং জনেতি বায়মতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পগ্গণ্হাতি পদহতি।'

যাহাতে অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপাদন করা যায়, তজ্জন্য ভিক্ষু চিত্তে রুচি উৎপাদন করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্তকে বলপূর্বক গ্রহণ করে এবং বশীভূত করে। সম্যক্ ব্যায়ামের অঙ্গীভূত এই তৃতীয় সাধনটির নাম 'ভাবনা-প্রধান'। সাধক প্রত্যহ কিছু-না-কিছু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করিবেন এবং হৃদয়ে নূতন নূতন পবিত্র চিন্তা উৎপাদন করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইবেন। যে দিন তাহা না হইল সেই দিনটিকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নীতি শাস্ত্রের নিম্নোক্ত বাক্যটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয় :

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ম্।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্যাৎ দানাধ্যয়ন-কর্মভিঃ॥

সঞ্চিত অঞ্জন (কজ্জল) একটু একটু করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, একটু একটু করিয়া বাড়িতে বাড়িতে বল্মীক-স্তূপ (উই-ঢিপি) নির্মিত হয়, ইহা চিন্তা করিয়া কিছু-না-কিছু দান, অধ্যয়ন ও পুণ্য কর্ম দ্বারা প্রতি দিনকে সার্থক করিবে।

৪। **সংরক্ষণ-প্রধান** : 'উপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং ঠিতিয়া অসম্মোসায় ভিয্যোভাবায় বেপুল্লায় ভাবনায় পারিপূরিযা ছন্দং জনেতি বায়মতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পগ্গণ্হাতি পদহতি, অয়ং বুচ্চতি ভিক্খবে সম্মা বায়ামো।'

যাহাতে উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ স্থিতিলাভ করিতে পারে, ম্লান না হইতে পারে, বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, বিপুল হইতে পারে, বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভিক্ষু চিত্তে রুচি উৎপাদন করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্তকে বলপূর্বক গ্রহণ করে এবং বশীভূত করে। হে ভিক্ষুগণ। ইহাকেই 'সম্যক্ ব্যায়াম' বলে।

সম্যক্ ব্যায়ামের অঙ্গীভূত এই চতুর্থ সাধনার নাম 'সংরক্ষণ-প্রধান'। সাধকের চিত্তে যে কুশল ধর্মসমূহ অর্থাৎ পুণ্য সংস্কারসমূহ সঞ্চিত আছে, সে সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন হইতে হইবে। ঐ সকলের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন বিষয়ে তাহাকে সর্বদা সচেষ্ট হইতে হইবে। অনাদরে উপেক্ষায় আমাদের ভিতরকার পুণ্যশ্রী ম্লান ও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। সংরক্ষণ-প্রধানের সাধনার দ্বারা উক্ত পুণ্যশ্রীকে সমুজ্জ্বল করিতে হইবে।

সম্যক্ ব্যায়ামের এই চতুরঙ্গ-সাধনার তাৎপর্য স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য একটি পুষ্পোদ্যানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফুল-বাগানের যথোচিত যত্ন না করাতে যথেষ্ট আগাছা জন্মিয়া বাগানটির অনিষ্ট সাধন করিল, আগাছার চাপে ফুলগাছগুলি দুর্বল হইতে লাগিল, কোন কোনটি বা মরিয়া গেল। একদা উদ্যানের মালিক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া এই দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইলেন এবং তিনি ইহার পূর্বশ্রী ফিরাইয়া আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নিম্নোক্ত চারিটি উপায় অবলম্বন করিলেন : (১) বাগানে আর একটিও নূতন আগাছা উৎপন্ন হইতে দিলেন না (সংবর-প্রধান), (২) যে আগাছাগুলি পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে সেগুলিকে একে একে উৎপাটন করিতে লাগিলেন (প্রহাণ-প্রধান), (৩) আরও নূতন নূতন ফুলের চারা আনিয়া রোপণ করিতে লাগিলেন (ভাবনা-প্রধান), (৪) যে ফুলগাছগুলি বাগানে আছে, কিন্তু অযত্নে ও আগাছার চাপে দুর্বল হইয়া গিয়াছে, সেগুলির গোড়ায় ভাল সার দিয়া যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন (সংরক্ষণ-প্রধান)। এই চতুর্বিধ উপায় অবলম্বন করাতে নষ্টশ্রী উদ্যানটি অচিরকালমধ্যে অপূর্ব

শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল। পুষ্পোদ্যান সম্বন্ধে যেই কথা চিত্তোদ্যান সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য।

বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্বে গৌতম সিদ্ধার্থ কি প্রকারে 'সম্যক্ ব্যায়ামের' সাধনা করিযাছিলেন তাহা অগ্নিবেশ নামক জনৈক ভিক্ষুর নিকট এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

হে অগ্নিবেশ। কোনও বলবান্ পুরুষ যেমন দুর্বলতর কোন পুরুষকে মাথায় ধরিয়া কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া নিগৃহীত করে, নিপীড়িত করে, সন্তাপিত করে, আমিও তেমনি পাপচিত্তকে দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিয়া তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট করিয়া নিগৃহীত করিতাম, নিপীড়িত করিতাম, সন্তাপিত করিতাম। আর তাহার ফলে আমার বগল হইতে ঘাম বাহির হইয়া পড়িত। (মজ্ঝিম-নিকায়, মহাসচ্চক-সুত্ত)

মজ্ঝিম নিকায়ের "দ্বেধা বিতক্কসুত্তে" বর্ণিত হইয়াছে তিনি কি করিয়া পাপচিন্তাকে দূর করিয়া চিত্তকে কুশল চিন্তায় পূর্ণ করিতেন।

"হে ভিক্ষুগণ। যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, যখন আমি কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম তখন আমার মনে এই প্রকার ভাবনা উদিত হইয়াছিল,—যখন মনে নানা রকমের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই সমুদয় ভাবকে দুইভাগে বিভক্ত করিনা কেন? দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে বিচার করিয়া দেখিনা কেন?

"হে ভিক্ষুগণ। এই প্রকার স্থির করিয়া কাম, ব্যাপাদ (অপরের অশুভ কামনা) ও হিংসা এই কয়েকটিকে একদিকে রাখিতাম এবং নৈষ্কাম্য, অব্যাপাদ ও অহিংসা এই কয়েকটিকে অপর দিকে রাখিতাম। তাহার পরে আমি অপ্রমত্ত, সাধনপরায়ণ ও সমাহিত হইয়া এইভাবে বিচার ও বিতর্ক করিতাম,—এই কাম-বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা নিজের অকল্যাণকর, ইহা অপরের অকল্যাণকর এবং ইহা উভয়ের অকল্যাণকর। ইহা প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং নির্বাণ-লাভে বাধা প্রদান করে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মন হইতে কাম-বাসনা বিদূরিত হইত। এইরূপে ব্যাপাদ ও হিংসা বিষয়ে চিন্তা করিয়া বুঝিতাম যে, এই সমুদায় নিজের অকল্যাণ সাধন করে, অপরের অকল্যাণ সাধন করে এবং সকলের অকল্যাণ সাধন করে। এই সমুদায় প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ করে এবং নির্বাণ-লাভে বাধা প্রদান করে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে এই সমুদায়ও মন হইতে বিদূরিত হইত। অপর দিকে যখন নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইত তখন ভাবিতাম, এই নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিজের পক্ষে কল্যাণকর, অপরের পক্ষে কল্যাণকর এবং উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। ইহা প্রজ্ঞা বর্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে এবং নির্বাণলাভে সাহায্য করে। এইরূপে অব্যাপাদ ও অহিংসা বিষয়ে বিচার বিতর্ক করিয়া বুঝিতাম, এ সমুদায় নিজের কল্যাণ সাধন করে, অপরের কল্যাণ সাধন করে এবং উভয়ের কল্যাণ সাধন করে। এ সমুদায় প্রজ্ঞা বর্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে এবং নির্বাণলাভে সাহায্য করে।

"রত্তিং চেপিনং ভিক্খবে অনুবিতক্কেয্যং অনুবিচারেয্যং, দিবসং চেপিনং ভিক্খবে অনু-বিতক্কেয্যং অনুবিচারেয্যং। রত্তিন্দিবং চেপিনং ভিক্খবে অনুবিতক্কেয্যং অনুবিচারেয্যং॥" —আমি রাত্রিতে এই প্রকার বিচার বিতর্ক করিতাম, দিবাভাগে এই প্রকার বিচার বিতর্ক করিতাম, এবং দিবারাত্রি এই প্রকার বিচার বিতর্ক করিতাম।

"হে ভিক্ষুগণ। যে যে বিষয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করা যায়, সেই সেই বিষয়ের দিকে চিত্তের গতি হয়। নৈষ্কাম্যাদির বিষয় অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে আমার কামাদি বাসনা তিরোহিত হইয়া গেল, নৈষ্কাম্যাদি ভাব বৃদ্ধি পাইল এবং এই সমুদায় ভাবের দিকেই আমার মনের গতি হইল।" (মজ্ঝিম নিকায়, দ্বেধা বিতক্ক সুত্ত)

শ্রমণ

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পৃথিবী যেন এক অন্তহীন অন্ধকারে ঘেরা
রহস্য-কুয়াসাঘন বদ্ধ কারাগার,
গিরি-আবেষ্টিত কোন মহারণ্য মাঝে।
এখানেতে হাজার তৃষ্ণার তরু অশ্বত্থ ও বট,
পরস্পর কি বন্ধনে বেঁধে আছে জট—
কোনও দিন যাব কোনও অর্থ মেলা ভাব।

ভাবি—এত ভোগ-সুখ, তবু কেন মনে তৃপ্তি নাই?
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস তপ্ত বায়ু সনে ওঠে তাই।
শান্তি নাই, ক্ষান্তি বা কোথায়? কি কারণে
তবু ঘর বাঁধা চাই এই মহারণ্য-কোণে?
এখানেতে শুধু ঘর বেঁধে চলে প্রতি দণ্ডে পলে
কি অদৃশ্য ক্রূর নিয়তির এক ইঙ্গিতের বলে।
খদ্যোত যে ক্ষুদ্র প্রাণী সেও দেখি নর্তকীর ছলে,
এতটুকু আলো নিয়া করে নৃত্য, ঝিকিমিকি জ্বলে।
শাল আর ঘন ঝাউ-বনে একটানা একমনে,
কামনার ঝিঁঝি সেও দেখি ডেকে চলে প্রাণপণে—
মহাকাল ঊর্ণনাভ ক্লান্তিহীন জাল বুনে চলে,
মৃত্যুই নিয়তি হেথা, কি অদ্ভুত নিয়মের বলে।
আকাঙ্ক্ষায় বন্দী এ পৃথিবী, বদ্ধ বন্য প্রাণ,
ছোট বড় সবে মিশে অচেতন অহল্যা পাষাণ।

আর ওই দূর নীল নভস্থলে চলে দলে দলে—
উপেক্ষিয়া পৃথিবীর কলরব আর কোলাহলে—
কোন্ করুণায় যেন ওরা উৎসর্গিয়া প্রাণ,
আলোকের দূত—শ্বেত পারাবত গাহি মুক্তি-গান
শান্তির সুষমা মেখে, গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে চলে
ধ্রুবতারা যেন ওরা ধ্রুব যাত্রাপথে, জ্বলজ্বলে
পরাপ্রকৃতি-ললাটে রাজটিকা আলোকের টিপ,
অন্ধ মনে দিতে আঁখি ঊর্ধ্বে জ্বলে আকাশ-প্রদীপ।

যদিও বা কভু করুণায় মানবের শুভাশুভে
মর্ত্যে নামে এরা, রাখে পদদ্বয় জ্যোতির নন্দন,
মুহূর্তের স্পর্শে বিবর্তিত করি' লয় সেই ক্ষণ—
পূর্ণ যাহা ছিল লোভ-হিংসা-হননে ও ক্ষোভে,
কামনা কুটিল সেই আদিম অরণ্য-কূপ মন—
মহামুক্তি-তীর্থরূপে হয় শুদ্ধ পুণ্য তপোবন।

কার্যে পরিণত বেদান্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী গম্ভীরানন্দ

বিবেকানন্দের সাধনায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এক অবিচ্ছেদ্য রূপ ধারণ করিল। ইহা কল্পনাপূর্বক প্রতীকে দেবতার আরোপ নয়, অথবা গুণ-বিশেষ অবলম্বনে মনকে বা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করা নহে। এখানে সর্বজীবে চৈতন্যরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মের দর্শন এবং তদনুরূপ উপাসনার মন্ত্র উচ্চারিত হইল। আরোপ এখানে অনাবশ্যক, এখানে সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। আবার ইহা অধুনা-প্রচলিত মানবতাব পূজাও নহে, কারণ পূজ্য এখানে 'মানবতা' নহে, পরন্তু সহস্র-শীর্ষা বিরাট পুরুষ, যিনি পূজকের সহিত অভিন্ন। বিবেকানন্দ যেখানেই দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, যেখানে তিনি জীবের সেবায় সাধককে আহ্বান করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের উপর। শঙ্কর-দর্শনে নেতি-মার্গে সকলকে বাদ দিয়া যে সাধনার আবশ্যক প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানে তাহাও পূর্তিলাভ করে, কারণ সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে গেলেই সর্বের সর্বত্ব অনেকখানি খর্ব হইয়া যায়, সর্বত্র আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মদর্শন এবং সর্বাতীত অদ্বৈতের দর্শন একার্থক হইয়া দাঁড়ায়। তখন দ্বৈতজনিত নানাত্ব-দর্শনের ফল তিরোহিত হইয়া যায়।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥

সর্বত্র আপনার সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম দর্শনের ভিত্তিতে জ্ঞানভক্তির এই মিলন বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবাকে কর্মযোগ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্মযোগে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কর্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই কর্মযোগী বলা চলে, তজ্জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস অত্যাবশ্যক নহে। কর্তব্যবোধে কর্ম করাকেও কর্মযোগ বলা চলে, এবং সে হিসাবে বুদ্ধদেব একজন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। ইহা একটি অতি চরম দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহা ছাড়িয়া দিয়া সেশ্বর কর্মযোগের কথা ধরিলেও বিবেকানন্দ-প্রচারিত সেবাধর্মের সহিত পার্থক্য সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। গীতায় কর্মযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই এই কয়টি শ্লোকে :

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

এখানে কর্মফল ত্যাগ ও ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণের কথা পাইলাম, ইহাই সাধারণতঃ কর্ম-যোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার কর্ম বলিতে অনেকে শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি বা লোকহিতকর কার্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। স্বামীজীর দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু আছে সর্বপ্রাণী এবং সর্বকর্ম, আর সেখানে শুধু ঈশ্বরে ফলার্পণ নহে, পরন্তু যাহাদের সেবা করিতেছি তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে সম্মুখে বিদ্য-মান। আবার সেবক নিজেও ব্রহ্ম। এখানে কর্তা ব্রহ্ম, উপাদান ব্রহ্ম, দাতা ব্রহ্ম, গ্রহীতা ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, ফলও ব্রহ্ম। গীতারই একটি শ্লোকে বলা যায় :

ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

গীতায় স্বামীজীর এই ভাবটি বিভিন্ন প্রকরণে বিভিন্নরূপে বিকীর্ণ হইয়া আছে বলিয়া এবং ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় গীতাশাস্ত্র গতানুগতিক কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতিতে বিখণ্ডিত হইয়া

আছে বলিয়া স্বামীজীর পরিকল্পিত সেবার রূপ ও আদর্শটি পূর্ণাঙ্গরূপে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা গীতায় সর্বব্যাপী ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন আছে, কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনটিকে শুধু দর্শন-রূপে গ্রহণ না করিয়া উহাকে জীবনের প্রতি-ক্ষেত্রে রূপপ্রদানের বিধি বা ইঙ্গিত দেখানো হয় নাই। সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতের হিতসাধনের কথা থাকিলেও একই স্থানে কর্মযোগের প্রকরণে সমদর্শন ও হিতসাধনের কথা না থাকায় প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। যথা :

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

এখানে ভজন আছে, সেবা নাই, পূজাও নাই। এ ভজন কতকটা মানসিক দর্শনমাত্র, যেমন ঠিক পূর্বের শ্লোকে আছে :

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥
(ন প্রণশ্যামি—ন অপ্রত্যক্ষতাং গচ্ছামি)

আর আছে :

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।

স্বামীজীর দর্শনে সর্বভূতে হিত নয়, সর্বভূতে ব্রহ্ম-জ্ঞানে পূজা বা সেবা। দৃষ্টি ও ফলের তফাৎ অত্যন্ত অধিক।

ফলতঃ স্বামীজীর এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর সহিত উপ-নিষদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সামঞ্জস্য অধিকতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে তিনি উপনিষদের চিন্তাধারা অবলম্বনে আরও দূরে অগ্রসর হইয়া-ছেন। সর্বভূতে সর্বক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন হইলে জীবনের মধ্যে পুণ্য ও পাপের অবিচ্ছেদ্য গণ্ডী টানিয়া মানুষ হইতে মানুষকে আর পৃথক করা চলে না। অদ্বৈতবাদী বলেন : মানুষ ভালই আছে, সে আরও ভাল হইতে পারে, তাহার গতি উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতরের দিকে, অপকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের দিকে নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে—পাপ বা পাপী বলিয়া কিছু বা কেহ নাই, আছে শুধু ব্রহ্মের স্বল্প বা অধিক বিকাশ। সমাজের কর্তব্য পাপীকে শাস্তি দেওয়া নহে, প্রত্যুত তাহার অজ্ঞান দূর করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যব্রহ্মকে প্রকাশ করার অবকাশ দেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রকে শুধু নূতন নূতন তথ্য শুনাইয়া বা তাহা গলাধঃকরণ করাইয়া স্বকর্তব্য শেষ করিতে পারে না। সেবক হিসাবে বালক-নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ আত্মার বিকাশের পথের বাধা অপসারিত করাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য। ভালবাসা অবলম্বনে তিনি সেই আত্ম-বিকাশের পথে বালক-নারায়ণের পূজারী হইবেন। গুরু অধ্যাত্মপথে শিষ্যের পরিচালক না হইয়া তাহার সত্যের পথে চলিবার সখা হইবেন। সেখানেও তিনি শিষ্য-নারায়ণের পূজারীর আসন গ্রহণ করিবেন। ব্যক্তিজীবনে প্রতিক্ষেত্রও তেমনি মন্দিরে এবং প্রতিকার্য পূজায় রূপান্তরিত হইবে। সে মন্দিরের গঠন হইবে প্রতিক্ষেত্রে বিচিত্র, আর সে পূজা হইবে প্রতিস্থানে বিভিন্ন। ধর্মের কোন বাঁধা-ধরা রূপ থাকিবে না। এখানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। এখানে প্রত্যেকের ধর্ম অর্থাৎ আত্মবিকাশের ধারা হইবে সম্পূর্ণ নিজস্ব। শুধু তাহাই নহে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা অধর্ম বলিয়া মনে হয় বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্থলবিশেষে তাহাও ধর্ম হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষে হিংসাত্মক যুদ্ধই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন, আর স্বামীজী কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, গীতা অপেক্ষা ফুটবলের মাধ্যমে তোমরা সহজে ভগবানের কাছে পৌঁছিবে। এই চিন্তাধারার মধ্যে ছিল একটা গতিশীলতা। স্বামীজীর ধর্ম একটা সজীব, গতিশীল বস্তু যে ক্রমেই স্বীয় চরম আদর্শের

দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ এই অবিরাম অগ্রগতি তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্মের প্রকৃষ্ট কষ্টিপাথর। যেখানে চলা নাই, সেখানে তিনি সত্ত্বগুণ না দেখিয়া জড়তাই দেখিয়াছেন। কারণ বর্তমান যুগে সত্ত্বের নামে জড়তারই অভিনয় চলিয়াছে। ধর্মক্ষেত্রে ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্বের সহিত মানবের পরিপূর্ণতা লাভার্থে এই অবিরাম গতি স্বীকার করা স্বামীজীর একটা নিজস্ব ব্যাপার। সকলেরই ভিতর পূর্ণব্রহ্ম—শুধু বিকাশের পার্থক্য। একদিন এই পার্থক্যকে সমূলে বিনাশ করিয়া সকলেই স্বীয় পূর্ণ ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্তমানে আমাদের উচিত এই পূর্ণ ও সর্বব্যাপী অথচ অপ্রকাশিত ব্রহ্মের প্রকাশে সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং নিজ জীবনেও তাহারই সাধন করা। স্বামীজীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া Romain Rolland লিখিয়াছেন, "Religion is never accomplished It is ceaseless action and the will to strive—the outpouring of a spring—never a stagnant pond " অবশ্য ইহা একপক্ষপাতী দৃষ্টি। স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে অন্য কথা। স্বামীজীর আর একটি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া Rolland লিখিয়াছেন, "It is the quality of thought and not its object which determines its source and allows us to decide whether or not it emanates from religion If it turns fearlessly towards the search for truth at all costs with single-minded sincerity prepared for any sacrifice, I should call it religious, for it presupposes faith in an end to human effort higher than the life of the individual, at times, higher than the life of existing society and even higher than the life of humanity as a whole."

ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর পরিকল্পিত সমাজে স্বামীজীর দৃষ্টিতে অসাম্য থাকিতে পারে না। বর্তমানে সমাজ যাহা এবং যেরূপই হউক না কেন বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগের ফলে তাহাকে বর্তমানের সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিতেই হইবে, আর বেদান্তের তথ্যগুলি শুধু পুঁথিগত হইয়া থাকিবার জন্য নহে, উহাদিগকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেই হইবে। ভারতের অবনতির কারণ আদর্শের ন্যূনতা নহে, প্রত্যুত আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার ঐকান্তিকতার অভাব। শাস্ত্র বলিলেন :

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

কিন্তু কার্যতঃ আমরা বলিলাম, "দূরমপসর রে চণ্ডাল।" গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন "সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ", কিন্তু আমরা 'পারিয়া পঞ্চম' সৃষ্টি করিয়া বলিলাম, ইহারা চলমান শ্মশান। প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্যতার সহিত বেদান্তের কোন আপস হইতে পারে না। ইহা সমাজের একটি ব্যাধি এবং প্রকৃত বেদান্তীর কর্তব্য হইবে—ইহা হইতে সমাজকে মুক্ত হইতে সাহায্য করা। আত্মায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। অতএব নারীজাতির প্রগতির মুখে বাধা প্রদান অসহনীয়। আবার আত্মা স্বাধীন। অতএব নারীরা কি করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কি কর্তব্য, তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। পুরুষের কর্তব্য শুধু শিক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞান নাশপূর্বক দূর হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করা। নারী ভগবতীরই রূপ সুতরাং তাঁহারা আমাদের পূজনীয়া। বর্তমান যুগে যে সাম্যবাদ প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই,

স্বামীজীর যুগে তাহার সূত্রপাত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি কি বলিতে চাহেন, তাহা জানিবার জন্য স্বতই আমাদের আগ্রহ হয়। ইহারও সমাধান তিনি বেদান্ত অবলম্বনেই করিতে চাহিয়াছিলেন। গীতা বলিয়াছেন :

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

বেদান্তের এই সাম্যের কথা স্বামীজী বহু স্থলে বলিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা চাই বা না চাই, সাম্য নানা বেশ ধরিয়া ভাবী সমাজে আত্মপ্রকাশ করিবেই। কিন্তু আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজী এই সাম্যকে শুধু অর্থসাম্য বা জাতিসাম্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সব সাম্য স্থলবিশেষে এবং সমাজবিশেষে কারণ-পরম্পরায় অনিবার্য হইলেও আত্মিক সাম্যই আমাদের অভিপ্রেত। আর সে সাম্যের সামাজিক নিকটতম রূপ হইতেছে কৃষ্টিসাম্য। আত্মার অধিকতর বিকাশের দ্বারা অর্থাৎ নিম্নস্তরের ব্যক্তিদেব সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনের দ্বারাই এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, উচ্চতরদিগকে নিম্নে টানিয়া আনিয়া যে সাম্য, তাহা স্বামীজীর মনঃপূত ছিল না, এবং স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাহার নিন্দাও করিয়াছেন।

এই বেদান্ততত্ত্ব অবলম্বনে তিনি ধর্মের দ্বন্দ্বও শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যদি এক হন এবং তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গী যদি বিচিত্র এবং রূপ যদি বিভিন্ন হয়,তবে বিবাদের স্থান কোথায় ? একত্বের ভূমিতে স্থাপিত বৈচিত্র্য অবলম্বনে তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে এক মনুষ্য-সমাজ স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই ভাব লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক Floyd Ross লিখিয়াছেন : The oneness of mankind is something which modern man everywhere needs to learn, if he is to move creatively into one world, where the richness of divinity does not mean an anarchy of foolish competition, but each person needs to find the meaning of that oneness in his own selfhood before he can go far in helping to build 'One World.'

একের বহুরূপে প্রকাশের তথ্য ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতেই অবগত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গৌড়পাদও স্বীকার করিয়াছেন যে, অদ্বৈত মত স্বীকার করিলে পরমতের সহিত বিরোধ করার কথাই উঠিতে পারে না। আর বস্তুতঃ অদ্বৈত অবলম্বনেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে। গৌড়পাদ-কারিকার সিদ্ধান্ত :

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে॥

শঙ্করাচার্য দেখাইয়াছেন যে, মূল তত্ত্বকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও অপর সব মতবাদের অনেকখানি অংশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, শুধু অপরমতকে সহ্য করাই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশও আবশ্যক। এই অদ্বৈতভিত্তির উপরই সর্বধর্ম-সমন্বয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াও তিনি ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম প্রকাশ সম্বন্ধে ঔদার্য ও শ্রদ্ধা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অদ্বৈত অবলম্বনেই সর্বপ্রকার বিবাদ-নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

শুধু তাহাই নহে। তাহার মতে সমস্ত নীতির সর্বোত্তম ভিত্তি হইতে পারে এই অদ্বৈতবাদ। ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বা মানবতার একত্ব বা সাম্য প্রভৃতি মতবাদ অবলম্বনে যে সৌভ্রাত্রের সৌধ গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এ-যাবৎ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এখন আত্মার মহত্ত্ব ও একত্ব

অবলম্বনে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় আগত, এবং ইহার অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ। মানবাত্মার মহত্ত্ব স্বীকারের দ্বারা মানবকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যে মর্যাদা দান করা হয় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যকারের মিলন ঘটিতে পারে। এই মিলন হইবে দাবি-দাওয়ার ফলে নহে, পরন্তু স্বীয় আত্মার বিকাশ এবং অপরের আত্মার পূজা অবলম্বনে।

মানবের অগ্রগতির মূলে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব, নিগুর্ণত্ব, অবিকারিত্ব প্রভৃতিতে আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আত্মবিশ্বাসের ফলে যে আত্ম-শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, তাহাই মানবকে হীন কর্ম হইতে নিবৃত্ত করে এবং উচ্চতর কর্মের প্রতি প্রেরণা দিয়া থাকে।

মানবজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহার কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম, অনুসন্ধিৎসুকে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য তাঁহার আকর-গ্রন্থেই যাইতে হইবে।

ভুলি নাই

'অনিরুদ্ধ'

ভুলি নাই ধরণীর কোলে প্রথম যে এসেছিনু
প্রথম সে আলোকের পানে চেয়ে থাকা
জল বায়ু আকাশের সনে প্রথম সে পরিচয়
শিশুমনে আদিম সে কত ছবি আঁকা।

ভুলি নাই মানুষের ঘরে প্রথম যে চিনেছিনু
প্রাণে প্রাণে মানুষের টান ভালবাসা
মানুষের দুটি বাহু 'পর প্রথম সে সাড়া দেওয়া
প্রথম সে মানুষের ভাষা কানে আসা।

প্রথম সে প্রভাত তপন বক্তরাঙা দিবাশেষ
মনে পড়ে ধীরে-নেমে-আসা সন্ধ্যা-ছায়া
স্তব্ধ গাঢ় নিশীথ আঁধার প্রথম সে অনুভব
নভ-তলে চাঁদ-তারকার দীপ-মায়া।

প্রথম সে পাখীদের গান তটিনীর কলকল
ভুলি নাই হৃদয় রাখিত ভরপুর
প্রথম সে গাছের মর্মর কাজ-হীন দ্বিপ্রহরে
দূর মাঠে রাখালদলের গীতিসুর।

আছে গাঁথা হৃদয়-গভীরে প্রথম যে শুনেছিনু
অজানা অমোঘ আহ্বান এ জীবনে
কেবা ডাকে কোথা হতে ডাকে কেন ডাকে
নাহি জানা
যেতে হবে শুধু এইটুকু বুঝি মনে।

মানুষের হাটবাট দিয়ে ভুলি নাই সেই চলা
সুখ দুঃখ দান-প্রতিদান অশ্রুহাসি
লাভ ক্ষতি তৃপ্তি ও বেদনা সফলতা বিফলতা
পৃথিবীর ঘাত-প্রতিঘাত রাশি রাশি।

মনে পড়ে বিজলী-চমক তমসার বুক চিরি
প্রথম সে অমৃতের লোক চোখে ভাসা
শোকহীন মোহভ্রান্তিহীন ভয়হীন ক্ষোভহীন
অন্তহীন মরণবিজয়ী ধ্রুব আশা।

একবার যাহাদের পাওয়া সে তো নয় ক্ষণিকের
সে তো নয় শুধু পথপাশে দ্রুত দেখা
সে যে আনে ক্ষয়হীন প্রীতি—বাঁধে বাসা চিরতরে
রেখে যায় মহাকাল-ভালে স্থায়ী রেখা।

তারা নয় বিস্মৃত অতীত, তারা থাকে, তারা চলে
বল দেয়, কত কথা কয় তারা সাথে,
গায় গান অফুরন্ত প্রাণ দিয়ে যায়, দিয়ে যায়
নিষ্কলুষ আনন্দ যে চিতে দিবারাতি।

যাহা কিছু দিনে দিনে এল, অথবা যা আসিতেছে
জানি জানি বিধাতার দান সে সঞ্চয়
ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না, আমাতেই আছে সব
চিরন্তন সত্যের স্বরূপ জ্যোতির্ময়।

রাণাঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবসন্তকুমার পাল

"মথুরের জমিদারি-মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর একস্থানে পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'এক মাথা করিয়া তেল, একখানি নূতন কাপড এবং উদর পূরিয়া একদিনের ভোজনদান' করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইযাছিল। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব, ১৯শ অধ্যায়, ৩৩৪ পৃঃ—নূতন সংস্করণ)

* * *

কলাইঘাট পল্লীর এই সকল দরিদ্র নরনারীর বংশধরগণ—'ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমাদের' বলিয়া যাঁহারা আজও গৌরব বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই চূর্ণী-পুলিনের বটবৃক্ষমূলে এই মহোৎসব।*

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য চরণ-রেণু স্পর্শে পবিত্র এই কলাইঘাট-তীর্থে সম্মিলিত হওয়ায় আমাদের অন্তর আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। ধরার বক্ষে মানবের জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দ পথ যখন কণ্টকাকীর্ণ হয়, গৃহে গৃহে শান্তিসমীরণ আর প্রবাহিত হয় না, পথের ধূলায় অন্ধ মানব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া দীনবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, আর জাতির মনোদর্পণ সংশয় ও বিভ্রান্তির মসী-মলিন আবরণে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন তিনি মানুষ হইয়া, অবতার হইয়া ভক্তদের লইয়া আসেন, ভক্তেরা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে আবার চলিয়া যায়: 'বাউলের দল হঠাৎ এলো, নাচলে, গান গাইলে আবার হঠাৎ চ'লে গেল। এলো, গেল কেউ চিনলে না।'

ভারতমাতার কনকাঞ্চল এই বঙ্গভূমে নগরের কল-কোলাহল হইতে দূরে—অতি দূরে কামার-পুকুর পল্লীর প্রশান্ত পরিবেশে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্যভবনে এইরূপ এক বাউল আসিয়া অবতীর্ণ হন। ভারতবর্ষ তখন অন্তর বাহির—উভয়দিক হইতে উপপ্লুত, তাই তাঁহার আবির্ভাবে ঠিক যেন কুসুমাকর-সমাগমে শীতের অবসান হইল, বনরাজি নব পল্লব, নবীন পুষ্প-মঞ্জরীতে নয়নাভিরাম শোভা ধারণ করিল

* গত ২৫শে ফাল্গুন উৎসবক্ষেত্রে নিবন্ধটি পঠিত। উৎসব-উপলক্ষে গীত শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন রচিত গানটিও একই ভাবে অনুরণিত, তাই এটিও পাদটীকায় সংযোজিত হইল। উঃ সঃ।

দ্বার হতে ফিরি গিয়াছে দেবতা আয় তোরা সবে আয়।
প্রাণের ঠাকুরে আনিব ফিরায়ে লগন বহিয়া যায়॥
এই মাটি এই পথের ধূলায়, তাঁরি পদরেখা আজও দেখা যায়।
কান পাতি শোন, নদী কলতানে তাঁরি বন্দনা গায়॥
হেথা এই গ্রামে মুক্তির আলো জ্বলেছিল একবার,
এসেছিল এক প্রাণের ঠাকুর মুক্তির অবতার।
হেথাকার প্রতি ধূলিকণা মাঝে তাঁরি পদরজঃ আজিও বিরাজে,
পরশে ধন্য হয়েছে এ মাটি তীর্থের গরিমায়

দিকে দিকে বিহগবুলের ললিত কাকলিতে ধরিত্রীবক্ষ পরিপূর্ণ হইল, জাতির মুখমণ্ডলে আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল, সেই দিন হইতে প্রকৃতই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইল।

মরমিয়া বাউল এই সন্ধিক্ষণে এমন পাগল-করা সুরে মীড় মিলাইয়া গান গাহিলেন, যাহা শুনিয়া পল্লীর নিরক্ষর জনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভিমানে অন্ধ নগরবাসী পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার চরণমূলে আসিয়া তৃষ্ণাতুরের মতো তাঁহার কথামৃত পান করিতে উন্মুখ হইয়া রহিল। তাঁহাকে তখন আমরা সম্যক প্রকারে চিনিতে পারি নাই, তিনি সবেমাত্র ডিম্‌ডিমি বাজাইয়া নিদ্রিত জগ-জনের দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিলেন, সুপ্ত বিশ্ব জাগরিত হইল, জাতির অন্তরে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। বাউল তাঁহার কোমলকণ্ঠে সবাইকে ডাক দিলেন। সুপ্তোত্থিত জগৎ নবোদিত প্রভাকরের অমল আলোক-ধারায় নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

সেদিন আজও ফুরায় নাই, ফুরাইবারও নহে, তিনি এখনও হৃদয়ের কূলে কূলে ডাকিয়া ফিরিতেছেন। দেশবাসীর পুণ্যফলে এই পল্লী কলাইঘাটার পবিত্রভূমিতে আবির্ভূত হইয়া বাউল কেবল গানই গাহেন নাই—দেশবাসীর ম্লান নেত্র নিত্য-নিরঞ্জনের জ্যোতি-বঞ্জনে অঞ্জিত ও রঞ্জিত করেন।

এই কলাইঘাট একদিন ফিরিঙ্গী বণিককুলের বিলাসের লীলাক্ষেত্ররূপে খ্যাত ছিল। দেশবাসীর সৌভাগ্যে এই স্থান ভক্তিমতী রাণী রাসমণির জমিদারিভুক্ত হয়, বিধাতার অপূর্ব বিধানে উক্ত মহিলার উপযুক্ত জামাতা মথুরবাবু দয়াল ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ-তরণীতে এই স্থানে আগমন করেন। বাউল তখন আমাদের নিকট তাঁহার শুভাগমনের রহস্য-কঠিন কবাট উন্মুক্ত করেন নাই।

ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের বিয়োগ-বেদনা ঠাকুরের অন্তর হইতে দূর করিতে ভক্তপ্রবর মথুর কত চেষ্টাই না করিতেছিলেন। বিশ্বের হৃদয়ের নিদারুণ বেদনায় অস্থির হইয়া যিনি গোলক হইতে জন্মমরণ পীড়িত ধরাতলে অবতীর্ণ, তাঁহার প্রাণের ব্যথা দূর করিবে কে? বাউল দর্শন করেন—শান্তসলিলা চূর্ণিবক্ষে কতজন সুরম্য তরণীতে বিচিত্র পাল উড়াইয়া মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যায়, তিনি দেখেন শস্য-সমৃদ্ধ প্রান্তরের চারু শোভা, বিলাসী বণিক-রচিত পুষ্পোদ্যান-বিশোভিত সুরম্য বাসগৃহ,—আর তাহারাই পার্শ্বে অদূরে ভারতীয় শ্রমিক কৃষক-কুলের জীর্ণ পর্ণকুটীর, দারিদ্র্যের করুণ দৃশ্য দর্শকের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে, সেদিকে কেহ আর ভ্রমেও ফিরিয়া চায় না। করুণাময় বাউলের দৃষ্টি এই দিকেই পতিত হইল।

এই পর্ণকুটীরবাসীরা মানুষ, কিন্তু তাহাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে উপযুক্ত বস্ত্র নাই, জীর্ণ বসনে কোন ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়া রহিয়াছে, মস্তকের রুক্ষ কেশ ঘোর দৈন্যই ঘোষণা করিতেছে। যাঁহার ইচ্ছায় মৃন্ময়ীর রসনায় চিন্ময়ীর ভাষা ফুটিয়া উঠে, পাষাণীর অন্তরে প্রাণের স্পন্দন জাগরিত হয়, তিনি কি দুঃখ-দারিদ্র্য-সমাকুল মানবের অধরে আনন্দের হাসি ফুটাইতে অক্ষম? দরিদ্রের দুঃখে দীন-দরদীর হৃদয় বিচলিত হইল।

ভক্ত মথুর বিত্তবান, আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগ্রহে চিত্তবান। হৃদয় থাকিলে অর্থ অনর্থের মূল না হইয়া বিশ্বের কল্যাণেই যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এই কথা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিতে বাউল মথুরকে আদেশ দিলেন: এই সকল শীর্ণকায়, জীর্ণ-বসনধারী নরনারায়ণকে নববস্ত্রে শোভিত কর, তাহাদের রুক্ষ কেশ স্নেহধারায় উজ্জ্বল মসৃণ কর, আর একদিন উদর পূর্ণ করিয়া

পরিতোষপূর্বক ভোজন করাও, তিনি ভক্তকে দেখাইলেন—ইহারা দরিদ্র নহে, দরিদ্রবেশধারী নারায়ণ। ইহাদের সেবা করিলে কেবল যে অর্থের সদ্ব্যয় হয় তাহা নহে, বৈকুণ্ঠ-বিহারী জগদীশ্বরও পরিতুষ্ট হন। ভক্ত ভগবানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান—এই তিন সেদিন এখানে একত্র সম্মিলিত হইল, এবং এই স্থান হইতে করুণার বন্যা কূলহারা হইয়া ছুটিতে লাগিল। সেদিন-কার সেই বাউল আজও আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, আর তাঁহার করুণা লাভে ধন্য সেই দিনের দীন দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকবৃন্দের বংশধরগণ এই উৎসবে আমাদের সহিত সম্মিলিত।

বাউল ডাকিতেছেন: তাপিত তৃষিত বিশ্ব। এস, মা ভবতারিণী বরাভয়করে অকূল পাবাবারের কূলে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এস, তাঁহার ডাকে অন্তর খুলিয়া সাড়া দাও। —তাঁহার মঙ্গলময় নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধুর বন্ধনে আমরা যেন আবদ্ধ হই।

কায়মনোবাক্যে করুণানিধান রামকৃষ্ণদেবের নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা করি—ঠাকুর! তোমার চরণধূলায় পবিত্র অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই কলাইঘাট পল্লীও পুণ্যতীর্থে পরিণত। দীন-দুঃখীর সেবা যে তোমারই সেবা—এই কথা যেন আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারি। গদাধর! আমাদের বাহুতে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও, প্রাণে সজীবতার স্পন্দন জাগরিত কর, সকলের সৃজনী শক্তি ও শুভবুদ্ধি যেন এই স্থানে মূর্ত হইয়া উঠে, দীন অভাজন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাসাদবাসী পর্যন্ত সকলে যেন এই তীর্থে আসিয়া শান্তি-ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

এস তুমি

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

হিংসার বিষে ভরা বিহ্বল জর্জর
ধ্বংসের ডাকিনীরা হানে ভীম খর্পর,
হাসে লোভ নিশাচর পশু মদ-মত্ত,
দুর্নীতি সারা দেশে করে আধিপত্য।

ভোগবাদ-পিশাচের খুনমাখা খড়্গ
অবিরাম কত প্রাণ যমে দেয় অর্ঘ্য,
কোটি কোটি নরমেধ যজ্ঞের জন্য
সাজে ঐ বিজ্ঞান,—বিধাতা বিপন্ন!

পরমাণু-রাক্ষস গ্রাসিবারে বিশ্ব
হাসে নিতি খল্ খল্, ভীতিময় দৃশ্য
দেখে ভাবী কালপটে ধাঁধা লাগে চক্ষে—
সৃষ্টির অবসান আসে বা অলক্ষ্যে।

কোথা শান্তির দূত, মহাবোধি-সত্ত্ব।
এস তুমি এ সময়, প্রলয়ের মত্ত
অভিযান রোধ ক'রে সংঘাত ক্ষুব্ধ
ধরণীর ভয় হর প্রেমগুরু বুদ্ধ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের তাত্ত্বিক প্রমাণ

অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত

ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্মেরই মূলকথা, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কিনা—ইহা লইয়া মতভেদ আছে। যাঁহাকে আমরা ভক্তিভরে পূজা করি, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি, তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ যদি না থাকে তবে এ সবই কি অন্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে না? বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণমূলক অনেক বিচার আমরা দেখিতে পাই। বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে অনেক সময়ে বেশ সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। পাশ্চাত্য দর্শনের একটি প্রসিদ্ধ ঈশ্বর-প্রমাণ সম্বন্ধেই আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য দর্শনে Ontological Proof (তাত্ত্বিক প্রমাণ) নামে একটি বিখ্যাত প্রমাণ রহিয়াছে। ঈশ্বরের ভাব বা চিন্তা (idea of God) হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব (existence of God) প্রমাণ করাই ইহার মূল কথা। এই প্রমাণটি প্রথম উদ্ভাবন করেন মধ্যযুগীয় সাধু এনসেল্‌ম্ (St Anselm)। তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক—পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তি। ঈশ্বরীয় চিন্তায় তিনি প্রায়ই নিজেকে মগ্ন রাখিতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি করিয়া যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়—এই প্রশ্ন লইয়া তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বরের চিন্তার ভিতরেই ঈশ্বরের প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর কোন সত্তা কল্পনা করা সম্ভব নয়, তাহাই ঈশ্বরের কল্পনা। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ সত্তাবান্—ইহাই তাঁহার সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞার অনুরূপ একটি চিন্তা বা কল্পনা (idea) আমাদের সকলের মনেই আছে, সুতরাং ইহার অনুরূপ সত্তাও নিশ্চয়ই বর্তমান থাকিবে। যদি ইহার অনুরূপ কোন সত্তার অস্তিত্ব না থাকে তবে বুঝিতে হইবে ইহা কখনও শ্রেষ্ঠ ভাব বা কল্পনা (highest idea) নয়। যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তাহার কল্পনা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, উহা অলীক। অন্যান্য সকল প্রকার গুণের সঙ্গে অস্তিত্বও যুক্ত থাকিবে, এইরূপ কল্পনা আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি, এবং এইরূপ কল্পনা পূর্বের অস্তিত্বহীন বস্তুর কল্পনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু হইতে পারে না তাহাই যদি ঈশ্বর হয়, তবে বুঝিতে হইবে পূর্বের কল্পনাটি ঈশ্বরের সঠিক কল্পনা নয়। অস্তিত্ব বাদ দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা করা যায় না, সুতরাং শ্রেষ্ঠভাব বা কল্পনার (highest idea) অনুরূপ বস্তুর অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

পরবর্তীকালে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত এই প্রমাণটি একটু প্রবর্তিত আকারে প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের ভিতরে একটি 'অসীমের বা পূর্ণের কল্পনা' (idea of Perfect Being) বর্তমান রহিয়াছে। এই কল্পনাটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? আমি অপূর্ণ, কাজেই আমি ইহার উৎস বা কারণ হইতে পারি না, 'কারণ' কখনও 'কার্য' হইতে ছোট হয় না। ঠিক এই কারণেই এই সসীম সম্পূর্ণ জগৎকেও ইহার কারণ বলা চলে না। সুতরাং ইহার কারণ হিসাবে একটি পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব (existence of a

Perfect Being) স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই পূর্ণ সত্তাই ঈশ্বর। দেকার্তেরও মূলকথা এই যে, অস্তিত্ব বাদ দিয়া 'পূর্ণে'র কল্পনাই করা যায় না। পূর্ণের চিন্তা বা কল্পনার ভিতরেই ইহার অস্তিত্বের ইঙ্গিত স্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

এই প্রমাণটির মূল্য কি—তাহাই এখন বিচার্য, এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যদেশে পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। যুক্তি বা বিচার হিসাবে ইহা এতই ত্রুটিপূর্ণ যে ইহাকে 'প্রমাণ' নামে অভিহিত করাও বোধহয় ঠিক হয় না। মনের চিন্তা ভাব বা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। চিন্তা বা ভাবনাদ্বারাই যদি বাস্তব পদার্থ পাওয়া যাইত তবে দরিদ্র ব্যক্তিও রাজপ্রাসাদে থাকিয়া রাজভোগ খাইতে পারিত। কোন একটি বিশেষ কল্পনা করিতে গেলে আমাকে একটি বিশেষ প্রকারে ভাবিতে হয়, অতএব আমার ভাবনার অনুরূপ পদার্থ বাস্তব জগতে থাকিবে—এ যুক্তি অচল। 'পক্ষিরাজ ঘোড়া' কল্পনা করিতে গেলে পক্ষ বা পাখাযুক্ত ঘোড়া ভাবিতে হয়, পাখা বাদ দিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়া ভাবা যায় না, অতএব পাখা-সমেত ঐরূপ একটি জীব বাস্তব জগতে থাকিবে, এ কথা যেমন অসার—অস্তিত্ব বাদ দিয়া 'পূর্ণসত্তা' বা ঈশ্বরকে কল্পনা করা যায় না, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে—যুক্তি-হিসাবে ইহাও তেমনি মূল্যহীন। পূর্ণের বা শ্রেষ্ঠের 'কল্পনা'র ভিতরে যদি অস্তিত্বের 'কল্পনা' নিহিত থাকে তাহা 'পূর্ণের কল্পনা' (idea of perfection) হইতে শুধু 'অস্তিত্বের কল্পনা'ই (idea of existence) পাওয়া যায়, প্রকৃত অস্তিত্ব (real existence) পাওয়া যায় না। এনসেল্‌মের সমসাময়িক গনিলো (Gaunilo), পরবর্তী যুগে কাণ্ট (Kant) প্রভৃতি অনেক দার্শনিক পণ্ডিতই এই সব ত্রুটি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিদগ্ধ সমাজে ইহা সুবিদিত।

একটি কথা এখানে স্বভাবতই মনে ওঠে। যুক্তি হিসাবে যাহা এত দুর্বল, যাহার ত্রুটিগুলি এত স্পষ্ট, পাশ্চাত্য জগতে ঈশ্বরের তিনটি প্রসিদ্ধ প্রমাণের ভিতরে একটি স্থান তাহার হইল কি করিয়া? সাধু এনসেল্‌ম্ ও দেকার্তের মত প্রখর ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণই বা ইহা মানিয়া লইলেন কেন?

বর্তমানকালে হেগেল-পন্থী কোন কোন দার্শনিক উক্ত প্রমাণটিকে একটু ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেতন মনের উপরেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করে। 'কোন কিছু আছে' অর্থ কোন মনের বা চিন্ময় সত্তার নিকট তাহা আছে। একটি পরম চিন্ময় সত্তার উপর সকল অস্তিত্ব নির্ভরশীল—ইহাই তাঁহাদের মতে Ontological proof বা তাত্ত্বিক প্রমাণের মূল কথা।

এইরূপ ভাষ্যে চিন্ময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে না, ইহাই বরং বোঝা যায়, কিন্তু আমাদের মনে ঈশ্বরের ভাব বা চিন্তার ভিতরেই কিভাবে তাঁহার অস্তিত্ব নিহিত আছে—ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের চিন্তা হইতে তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণের এই প্রাচীন মতবাদটীর নব্য হেগেলীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রমাণটি আমাদের নিজেদের দৃষ্টির সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না—তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

* * *

প্রথমেই মনে রাখা দরকার ঈশ্বর এই দৃশ্য জগতের মত কোন বস্তু বা পদার্থ নয়। দৃশ্য পদার্থের যে ভাবে ও যে অর্থে প্রমাণ সম্ভব, ঈশ্বরকে সেই ভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ—সাধারণ অর্থে এখানে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ প্রকারের অনুভূতির সাহায্যেই ঈশ্বরকে জানা যায়।

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁহারা সাধারণ প্রমাণসিদ্ধ হইলে পর যে ঈশ্বররের বিশ্বাস করেন, তাহা নয়, এবং যাঁহারা বিশেষ প্রকারের অনুভূতি মানিবেন না, তাঁহাদের অন্য কোন রকম প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। অনুভূতিতে তাঁহার অস্তিত্ব ও তাঁহাতে বিশ্বাস যে আমাদের জীবন ও জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়, তাহাই দেখানো যাইতে পারে। বিচার যে বিশ্বাসের বিরোধী নয়, ইহা দেখানোই বিচারের একটি প্রধান কাজ। বিচার ও বিশ্বাসের মধ্যে ব্যবধান অনুকূল যুক্তিতর্ক দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে পারে, কিন্তু একেবারে দূর হয় না। আমাদের যুক্তিতর্ক, আমাদের বুদ্ধি ও বিচার দৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণের পথে দৃশ্যের তটপ্রান্তে যদি পৌঁছিতে পারি.—অবশ্য সে প্রান্ত যে কোথায় তাহা আমরা জানি না, যতই অগ্রসর হই দেখি দৃশ্যের সীমারেখা আরো দূরে, আরো দূরে—তবুও যদি শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারি, দেখিব 'অদৃশ্য' আসিয়া তখনও ধরা দেয় নাই, মাঝখানে একটুখানি কুয়াশাচ্ছন্ন বেলাভূমি, বুদ্ধির তরণী বাহিয়া সেখানে নোঙর ফেলা যায় না। দৃশ্য ও অদৃশ্যের সীমা ও অসীমের এই মোহানাটুকু যে কুহেলীমাখা—তাহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। এখানে কিছুটা mysticism বা (রহস্য-বাদ) না মানিয়া উপায় নাই।

পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্ট তাই বলিয়াছেন, শুধু বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরপ্রমাণের চেষ্টা নিষ্ফল, শুধুই বিচারের পথে অগ্রসর হইলে বিচারে জট পাকাইয়া যায়, গ্রন্থি আর ছিন্ন হয় না। আমাদের শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যাঁহারা লৌকিক প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানেন নাই, তাঁহারা প্রমাণাভাব হেতু কেহ বা ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন, কেহবা নীরব থাকিয়াছেন। ঈশ্বর প্রমাণ করিতে গিয়া তাই আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ প্রধানতঃ শ্রুতি বা তত্ত্বদর্শীর বাক্যকেই আশ্রয় করিয়াছেন। অনুমান প্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই, তাহা নয়, কিন্তু শ্রুতিবাক্যের সমর্থনের জন্যই প্রধানতঃ অনুমান ও বিচার বিশ্লেষণের অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রমাণের প্রয়োজনেই 'শব্দ' প্রমাণটিকে পৃথকভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, ঋষি-বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে হয়, এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথে সাধনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ হয়। সাধনা-লব্ধ এই জ্ঞান এক বিশেষ প্রকারের অনুভূতি, ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান।

আমাদের মনে হয় Ontological proof বা 'তাত্ত্বিক' প্রমাণে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞানের ইঙ্গিত আছে উহাও অপরোক্ষ জ্ঞান। তাত্ত্বিক প্রমাণ এই যে—"আমাদের ভিতরে পূর্ণ সত্তা বা ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।" আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে অনুমান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই বাক্যের 'সুতরাং' শব্দটি অনুমান সূচনা করে না। এই 'সুতরাং'-টিকে আমরা দেকার্তের বিখ্যাত বাক্য 'Cogito ergo sum'-এর 'সুতরাং' এর সাথে তুলনা করিতে পারি। দেকার্ত বলিলেন, "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।" ভাষ্যকারগণ দেখাইয়াছেন এই 'সুতরাং' অনুমানমূলক নয়। যখনই আমি চিন্তা করি আমার চিন্তার ভিতর দিয়াই আমার সত্তা, আমার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ ভাবে ফুটিয়া ওঠে। এই 'আত্মজ্ঞান' একপ্রকার সাক্ষাৎ অনুভূতি। ঈশ্বরের চিন্তার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরীয় সত্তার উপলব্ধিও সাক্ষাৎ জ্ঞান। আমার মনে যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা, ঈশ্বরের যথাযথ জ্ঞান উদিত হইবে তখনই আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাক্ষাৎভাবে

জানিতে পারিব। 'যথাযথ জ্ঞান' কথাটি লক্ষ্য করা দরকার। 'ব্রহ্ম' শব্দটি শুনিলে আমরা কোন একটা ধারণা করিয়া লই বটে, কিন্তু তাহাকে যথাযথ ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না: 'তত্ত্বমসি' বাক্যটির আভিধানিক অর্থ বুঝিলেই ঐ মহাবাক্যের যথার্থ জ্ঞান হইল—বলা চলে না। তেমনি আমাদের তাত্ত্বিক প্রমাণোক্ত 'পূর্ণত্ব' বা (Perfection) 'অসীম অনন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা' (the Highest and the Infinite Being) প্রভৃতি কথা শুনিলেই বা ঐ সম্বন্ধে কোন প্রকার একটা ধারণা করিয়া লইলেই উহার যথাযথ জ্ঞান হয় না। এ জ্ঞান সাধনা-সাপেক্ষ। 'পূর্ণত্ব' 'শ্রেষ্ঠ সত্তা' বা ঈশ্বরের জ্ঞানও তাই। ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ প্রসঙ্গে দেকার্ত দেখাইয়াছেন চিন্তার ভিতর দিয়া আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎভাবে ফুটিয়া ওঠে। আত্মচৈতন্য বা আত্মজ্ঞান ও আত্মার অস্তিত্ব অভিন্ন। ঈশ্বর বা পূর্ণের বেলায়ও ঠিক তাহাই, পূর্ণ সত্তা (Perfect Being) বা ঈশ্বরের যথার্থ জ্ঞান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা অনুভূতি ভিন্ন হয় না।

তাত্ত্বিক প্রমাণে বলা হইয়াছে, 'আমার মনে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।' কথাটি আমরা একটু ঘুরাইয়াই বলিতে পারি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়াছি, তাই ঈশ্বরের যথার্থ জ্ঞান আমার আছে। মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের জ্ঞান ও অস্তিত্ব অভিন্ন। ইহাদের একটি আগে, একটি পরে নয়। তাত্ত্বিক প্রমাণে যে ভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে মনে হইতে পারে জ্ঞান হইতে অস্তিত্বের অনুমান (inference of existence from idea) করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অনুমান নয়, ইহাদের ভিতর premise-conclusion বা হেতু-প্রতিজ্ঞার সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা পূর্ণ সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি ও যথার্থ জ্ঞান একই সঙ্গে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। আমাদের মনে হয় তত্ত্বের দিক হইতে 'Cogito ergo sum'—চিন্তা বা চৈতন্যের ভিতরে আত্মার প্রকাশ, এবং Ontological proof (তাত্ত্বিক প্রমাণ)—ঈশ্বরজ্ঞান বা পূর্ণ চৈতন্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রকাশ—মূলতঃ একই সুরে গাঁথা। উভয়তই চৈতন্য ও অস্তিত্বের অভিন্নতাই মূলকথা। তাই মনে হয় 'Cogito ergo sum'-এর সাধক (দেকার্ত) মধ্যযুগীয় সাধুর তাত্ত্বিক প্রমাণটিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উপরোক্ত চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দেকার্ত একদিকে চৈতন্য ও আত্মার সহিত এবং অপরদিকে পূর্ণের জ্ঞান ও সত্তার সহিত একটা নিবিড় যোগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমাদের বৈদান্তিক চিন্তাধারায় আত্মা, চৈতন্য ও ব্রহ্মকে এক করিয়া দেখা হইয়াছে। দেকার্তের ভিতর আত্মার সহিত চৈতন্যের যেরূপ অভিন্ন সম্পর্ক দেখিতে পাই ঈশ্বরের বেলায় তাহা পাই না। দেকার্ত বলিলেন আত্মা চেতনস্বভাব। চেতন ভিন্ন আত্মা হয় না। আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থ চেতনধর্মী হয় না। আত্মা ও চৈতন্যকে তিনি এক করিয়া দেখিয়াছেন বলা চলে। কিন্তু ঈশ্বরের বেলায় তিনি বলিলেন: 'ঈশ্বরের জ্ঞান পূর্ণের জ্ঞান'। বেদান্তে যেরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান না বলিয়া ব্রহ্মকেই জ্ঞানময় বা চিন্ময়স্বভাব বলা হইয়াছে, দেকার্তও যদি সেইরূপ পূর্ণের বা ঈশ্বরের জ্ঞান না বলিয়া ঈশ্বরকেই চিন্ময় বা জ্ঞান-স্বরূপ রূপে বুঝিতে পারিতেন তবে ঈশ্বরের তাত্ত্বিক প্রমাণ ব্যাখ্যায় তাঁহার অসুবিধা হইত না। দেকার্ত তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন অন্তরে

পূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ ও ঈশ্বরের উপস্থিতি একই কথা। জ্ঞানলাভ ও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার অভিন্ন। দেকার্ত বুঝিয়াছিলেন পূর্ণের অস্তিত্ব (existence of Perfect Being) ভিন্ন পূর্ণের জ্ঞান অসম্ভব পূর্ণের অস্তিত্ব ও জ্ঞানের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে, তবুও একটু পার্থক্য—কিছুটা প্রভেদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ণ জ্ঞান (চিৎ) ও অস্তিত্বের (সৎ) অভেদ (identity of Highest Knowledge and Highest Existence) কল্পনা তিনি করেন নাই। এরূপ অভেদ কল্পনায় চৈতন্য আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন। কিন্তু এই ভেদরাহিত্য যে-জাতীয় অদ্বৈতধর্মী চিন্তার সূচনা করে খৃষ্টধর্ম প্রভাবিত দেকার্তের চিন্তাধারায় তাহা ছিল না। আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ সত্তার অভিন্নতা মানিয়া লওয়া সহজ এবং এই ভাবটি যেন ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অতি স্বাভাবিক ভাবেই মিশিয়া আছে। আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ ও ভাবধারার সহিত মিলাইয়া Ontological proof বা তাত্ত্বিক প্রমাণটিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

* * *

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করিব। আমাদের দেশে অনেক শাস্ত্রকার ও ধর্মসম্প্রদায় 'নাম' ও 'নামীর' অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। নাম জপ করাই নামীকে লাভ করার শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আমাদের ধারণা তাত্ত্বিক প্রমাণের (ontological proof) মূল-সূত্রের সহিত 'নাম-নামী' তত্ত্বের সূক্ষ্মস্তরে কিছুটা মিল আছে। তাত্ত্বিক প্রমাণের মূলকথা—ঈশ্বরের চিন্তা বা ভাবের (idea of God) ভিতর ঈশ্বরের অস্তিত্ব (existence of God) নিহিত রহিয়াছে। 'নাম-নামী' তত্ত্বের কথাও তাই—ঈশ্বরের নামেতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব। 'নাম' বলিতে আমরা শুধু একটা শব্দ বুঝিব না, নামের অন্তর্নিহিত অর্থ বা তাৎপর্যই বুঝিব। ঈশ্বরের নাম বা মন্ত্রজপ শুধু প্রাণহীনভাবে একটি শব্দের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ নয়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"—নামের অর্থভাবনাই জপ। বীজের ভিতর যে ভাবে গাছ লুকানো থাকে, নামের বা মন্ত্রের ভিতরেও সেইভাবে ঈশ্বর রহিয়াছেন। অর্থভাবনাযুক্ত জপ করিতে করিতে নামের তাৎপর্য ক্রমে ফুটিয়া ওঠে। বীজের পূর্ণপরিণত অবস্থা ফুলে-ফলে সুশোভিত বৃক্ষ। নামের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়াই জপ সাধনার উদ্দেশ্য। এই পরিণতিতে ঈশ্বরের পূর্ণানুভূতি। কথাটিকে অন্যভাবেও বলা যাইতে পারে। নামের ভিতরে নামী প্রথম হইতেই বর্তমান। নামের ভিতরে তাঁহাকে যে পাই না বুঝি না—সেটা আমাদেরই দোষ।

ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি বা মুক্তিলাভ অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি নয়। ইহা প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি। আমি ব্রহ্ম নই, পরে ব্রহ্ম হইব, মুক্ত নই, পরে মুক্ত হইব—এরূপ মনে করা ভ্রম। দশম ব্যক্তি যেমন নিজের ভ্রমের জন্যই জানিত না যে সে-ই দশম ব্যক্তি, আমিও নিজের অজ্ঞানতার জন্য জানি না যে প্রথম হইতেই আমি মুক্ত, আমি ব্রহ্ম। 'সোঽহং' প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে অজ্ঞান দূর হইলে আমার স্বরূপ আমি বুঝিতে পারি। নামের ভিতরেও তেমনি নামী প্রথম হইতেই পূর্ণভাবে বর্তমান, আমরা যে বুঝি না, সে ত্রুটি আমাদের। আমাদের অক্ষমতা, আমাদের মোহান্ধকার দূর করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। আমাদের

অক্ষমতা দূর হইলেই বুঝিব নামের ভিতরে নামী, ভাবের ভিতরে ভব, ঈশ্বরীয় চিন্তার ভিতরে ঈশ্বর বর্তমান।

সাধনার ফলে পূর্ণের যথার্থ জ্ঞান এবং পূর্ণের সত্তা অন্তরে একই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়, এবং ইহাই যে তাত্ত্বিক প্রমাণের (ontological proof) সারকথা তাহা আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় সাধক এনসেল্‌ম্ (St Anselm)—যিনি প্রায়ই আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঈশ্বরীয় চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন—তাঁহার সাধনালব্ধ তত্ত্বের সহিত ভারতীয় সাধন তত্ত্বের মিল থাকা কিছু আশ্চর্য নহে। এই মিল সত্যই আছে কিনা অথবা কতটুকু আছে এবং যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে বিচার করিলে ইহার দার্শনিক মূল্য কি দাঁড়ায়—তাহা উত্তম অধিকারী পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

জয়রামবাটী

শ্রীগোপাললাল দে

আমোদর তীরে

আমোদর নদ ? এই প্রিয় নাম বঙ্গভারতী দেহে
খোদিয়া রেখেছে চির অম্লান, কতবার কতছলে
কিশোরী সারদা এই গঙ্গায় কান্ত কোমল স্নেহে
পূত করিয়াছে। খ্যাত নাম আজ ভারতে ভূমণ্ডলে।
এত সামান্যে অসামান্য এ ? শষ্পগুল্মে ভরা,
তবু এ আমার হরিল নয়ন, ভরে মন অল্প না,
ঝিরি ঝিরি চলে দুগ্ধ কুল্যা, শ্যাম ক্ষেতে মনোহরা
স্মৃতির শরণি বেয়ে ভেসে আসে ভাবরূপ কল্পনা।
এরই তীরে শতবর্ষের আগে দুইটি জীবন-রীতি
ছোটখাট কৃতি, জীব-জন-প্রীতি, অর্থ-নাজানা বাণী,
ঢাকিয়া রেখেছে মহাজীবনের পরম-বিকাশ-স্মৃতি,
অণুযুগ তনু হরি ধরিল কি ঘুচাতে ধরার গ্লানি ?
ধন্য এ নদ, এই জনপদ, শ্যাম-কান্তি এ জাতি,
মহান্ মানব-জীবন ধন্য, ধারা বরষিল স্বাতী।

গ্রাম-মুখে

ধান্য-লোভন শ্যাম-নবঘন, পাখী-কুজনিত বন,
আলোছায়া-আঁকা পথ বেণু-ঢাকা, শতদল সরসীতে
গন্ধ-বাহন বায়ুর বীজন, মনে হয় হেন পথে
চিরদিন চলি, মধু-ভাষা-ভাষী সঙ্গী পথিক-জন:

'হের, দেখ দূরে, স্বর্লোক ফুরে, মা'র মন্দির-চূড়া
শ্যাম-পীঠিকায় নীলনভো-গায় ভাতিছে জ্যোতির্ময়'।
'ওগো নমোনম সূচনা পরম অপূর্ব পরিচয়!'
স্বরগের আলো মরতের ভালে ছড়ায় রতন-গুঁড়া।
রথ থেমে গেল। বিশাল তড়াগ, মা'র সন্ন্যাসী ছেলে
খনন করিল, মা'র স্নান-পান-পাবন সজল বায়ে
ধৌত-শুষ্ক-তনু-মন-তাপ দরশন করো মা'য়ে
ওই শোনো বাজে আরতি-বাদ্য নভে আহ্বান মেলে।
'ওগো গ্রাম-বাসী,মা'র ঘর কই?' 'মন্দির? তব পাছে।
ফিরিয়া দাঁড়াও, দেখিবারে চাও,
মা, সে তো তোমারই কাছে।'

মন্দিরে

এত মনোহর? পল্লীর তরে এ যে হেরি বিস্ময়
তনু মন ধন কত না লাগিল এ হর্ম্য-নির্মাণে,
কত মর্মর বজ্র-লেপন শিলালিম্পন-চয়,
তবু ধনিকের বিলাস নহে এ। শুদ্ধসত্ত্ব-স্নানে
জড়ায়ে ছড়ায়ে রয়েছে হৃদয়, নম্র-ভকতিময়,
আবেশ-আকুল বসিয়া পড়িনু শিলাচত্বর স্থানে,
গৃহী সন্ন্যাসী নত নরনারী পূজা-ধ্যানে তন্ময়
গর্ভগৃহের মণি-মণ্ডপে আসীনা জ্যোতিঃস্নানে।
রামকৃষ্ণের ভাব-প্রবাহিণী, নারী তবু লোকগুরু,
সন্ন্যাসী-জায়া, অজননী মাতা, অস্নাতক বাণীরূপা,
পল্লী-বাসিনী বিশ্ব-প্রেমিকা, ত্যাগী-যতি-পূজনীয়া,
স্বজনাবৃতা তবু বিরাগিণী ধ্যান-ভঙ্গিম-ভুরু,
মুক্ত, আচারী, জ্ঞানে ব্রতময়ী, দারিদ্র্যে ধন-ভূপা।
সত্য কে ইনি? নমো নমস্তে, জাগ্রত করো হিয়া।

কামারপুকুর-পরিক্রমা

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

জয়রামবাটী, শিওড়, যুলুই-শ্যামবাজার আর হলদে-পুকুর গ্রামের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখা শেষ ক'রে চললেন ভক্তেরা কামারপুকুর অঞ্চলে। ভোরবেলা রওনা হলেন সূর্যোদয়ের আগেই। সে পুণ্যক্ষেত্রের তিন মাইল পথ যেন তাঁরা ভেসে চলেছেন মেঘমালার মতো।

আমোদর পেরিয়ে অমরপুর ভুরসুবো গাঁ দুটির বাইরে দিয়ে ভূতির খালের সাঁকো পার হতেই চোখে প'ড়ল শ্রীশ্রীঠাকুরের বসতবাটী।

সুন্দর একটি চূণার পাথরের মন্দির হয়েছে, ১৯৫১ খৃস্টাব্দে রঘুবীরের মন্দিরটিও পুনর্গঠিত। তার পাশেই একতলা দোতলা দুখানি মাটির ঘর।

অক্ষয়-তৃতীয়ার দুদিন পরেই শঙ্কর-পঞ্চমীতে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবস। একটি ছোটখাট উৎসব প্রতি বছরই হয়ে থাকে এখানে, তাই জয়রামবাটী থেকে ভক্তেরা অক্ষয়-তৃতীয়ার উৎসব দেখে কামারপুকুরে আসে।

মনে পড়ে খুদিরামের কথা, কিভাবে তিনি এলেন এখানে দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দেরেগ্রাম থেকে। পরপীড়ক জমিদারের পক্ষে 'মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াতে তাঁকে প্রৌঢ় বয়সে সর্বস্বান্ত হতে হ'ল। বন্ধু সুখলালের সাদর আহ্বানে কামারপুকুরে এসে কুটির বাঁধলেন খুদিরাম সহধর্মিণী চন্দ্রমণি দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। এই সত্যনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরেই দেবতার অনুগ্রহ বর্ষিত হ'ল শতধারে, অবশেষে তা পুণ্যতীর্থে পরিণত হ'ল দেবতার আবির্ভাবে।

মন্দির উঠেছে গদাধরের জন্মস্থান ঢেঁকিশালের ওপর। শ্বেত পাথরের বেদীর সামনে খোদিত রয়েছে ঢেঁকি—সেই কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য।

মন্দিরে পূজা হয়, ঠাকুরের শয়ন হয় পশ্চিমের মাটির ঘরখানিতে। পূর্বদিকে দোতালা ঘর—আগে ছিল একতলা, সেটি এখন পূজার ভাণ্ডার। সামনে দাওয়ায় ছেলেবেলা গদাধর কত খেলা করেছেন। সকলকে কত আনন্দ দিয়েছেন। দুটি ঘরের মাঝখানে ছিল খিড়কি, তাই দিয়ে যাওয়া আসা করতেন—ধনী কামারনী, প্রসন্ন ও প্রতিবেশিনী মেয়েরা—বামুন মায়ের কাছে আসেন, গদাইকে না দেখলে তাঁদের দিন কাটে না।

বাইরে বৈঠকখানার পূর্বদক্ষিণে বসতবাটীতে ঢোকার পথে একটি আমগাছ, চারা বসিয়েছিলেন গদাধর। দেশী আম—কিন্তু খুব মিষ্টি।

বসতবাটীর উত্তরে সদর রাস্তা, তার উত্তরে হালদারপুকুর। গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এই পুকুরে নাওয়া, এর জলে রান্না—এই জল খাওয়া। এই হালদারপুকুর ঠাকুরের কত কথায় কত ভাবে ফুটে উঠেছে।

ঐ খানেই সদর রাস্তার ওপর একটি অশথ গাছ আছে—সেটিও কম নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর মা-ঠাকুরন বৃন্দাবন থেকে এসে যখন কামারপুকুরে ছিলেন, তখন গঙ্গার কথা তাঁর প্রায়ই মনে হ'ত। একদিন ভাবে দেখেন ভূতির খালের দিক থেকে ঠাকুর ঐ রাস্তা দিয়ে আসছেন—পেছনে নরেন, রাখাল, বাবুরাম ও আর সব ভক্তেরা। ঠাকুরের পা থেকে হুসহুস করে জল বেরিয়ে ঢেউ খেলতে খেলতে আগিয়ে আসছে? ঠাকুর ঐ অশথ গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে, মা দেখলেন—ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকেই গঙ্গা আসছেন, তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের দক্ষিণ কোণের গাছ থেকে মুঠো মুঠো জবা ছিঁড়ে সেই গঙ্গায় অঞ্জলি দিতে লাগলেন।

কামারপুকুর গ্রাম

সাধনার স্তরে স্তরে এগিয়ে চলেছে ভক্তদের মন। মানুষ-জন্মের লক্ষ্য ভগবানের দিকে। লীলাময় ভগবান গদাধররূপে লীলা করেছেন এখানে—এ যুগের উপযোগী, অথচ আধুনিকতার গন্ধ নেই সে লীলায়।

বসত-বাটীর কোণে কোণে, এ গ্রামের প্রতি ধূলিকণায় ছড়িয়ে রয়েছে, জড়িয়ে রয়েছে—তার স্মৃতি, দীর্ঘ সময়ের স্মৃতি। ভাবতে ভাবতে, একটির পর একটি—ভগবানের লীলার কথা ভাবতে ভাবতে ভক্তদের মন এগিয়ে চলেছে ভগবানের দিকে সংসার ভুলে, সংসারের সব কথা—সব সম্পর্ক ভুলে—নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠছে ভগবানেরই সঙ্গে, সে সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ।

এত দীর্ঘ কাল ধরে কোনও অবতার বা ধর্মগুরু এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেননি জন্মস্থানের সঙ্গে, তাই মন চাইছে আরও দেখতে—কোথায় কি আছে।

বসত-বাটীর পূর্বদিকে লাহাবাবুদের পুকুর, তার দক্ষিণে তাঁদের বাড়ী। সম্পন্ন গৃহস্থ শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহা ছিলেন—একেবারে পাশা-পাশি প্রতিবেশী। শৈশবে গদাধর কতবার এসেছেন, ছোটবেলা কারও বা কোলে পিঠে, বড় হয়ে—হেঁটে ছুটে। তাঁকে দেখলেই বাড়ীর সকলের সব কাজ ভুল হয়ে যেত। কর্তার ভুল হ'ত খতিয়ানের হিসাবের, মেয়েদের থেমে যেত ঘর-করনার কাজ, সবাই তখন গদাইকে নিয়ে ব্যস্ত। যেদিন গদাই না যেত—সেদিন কারও কিছু ভাল লাগত না। পুকুরের এ পাড় থেকে তাঁরা ডাক দিতেন, 'গদাই, গদাই!' ও পাড় থেকে সাড়া আসত, 'যাই, যাই'। গদাইকে পেয়ে যেন তাঁরা প্রাণ পেতেন।

লাহাবাবুদের বাড়ীর পূর্বদিকে বিষ্ণুমন্দির, তারই সংলগ্ন অতিথিশালা। মন্দিরে কতদিন নিবিষ্ট মনে গদাই দেখেছে দেব-সেবা ও আরতি, অতিথিশালায় দেখেছে কত সাধু-সন্ন্যাসী। তখন তার মনে কি জেগে উঠত ভবিষ্যতের ছবি—মন্দির, দেবসেবা, অতিথি, সাধু-সন্ন্যাসী!

হাতে-খড়ির পর গদাধর চলেছে পাঠশালে। সেও ঐ লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে, শুকনো তালপাতায় পাততাড়ি, মাটির দোয়াত—তায় ভুষো কালি, খাগের কলম ঝুলিয়ে গদাধর চলেছে লেখাপড়া শিখতে। লেখাপড়া বেশি এগোয় না, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে গল্প গান, তারপর শেষে আমবাগানে গিয়ে খেলা।'

এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসেছে পণ্ডিতদের সভা—বিতর্কে সহজ প্রশ্নের সমাধান হয় না, বালক গদাধর শেষে বলে দিয়েছেন—উপযুক্ত উত্তর। অবনত মস্তকে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন সেই মীমাংসা। কিন্তু এ সবের আড়ালে গদাধর দেখেছেন, পণ্ডিতদের মন পড়ে আছে 'বিদায়ী' পাবার দিকে, তাইতো তিনি শেষে বললেন, 'ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখব না।'

হালদার-পুকুরের উত্তরে ধানের ক্ষেত। 'টেকো'য় মুড়ি-গুড় নিয়ে খেতে খেতে চলেছেন গদাধর সঙ্গীদের সঙ্গে। নীল আকাশ, ঘন কালো মেঘমালা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, ঢেকে গেল সূর্য, ছুটেছেন গদাধর সঙ্গীদের নিয়ে মেঘের খেলা দেখবেন বলে। সারি সারি মেঘ আসছে—ছোট বড় মাঝারি—যেন নানা আকারের জন্তু জানোয়ার—ছেলেরা অবাক হয়ে দেখছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা বক অর্ধ-চন্দ্রাকারে উড়ে এল, ধব্‌ধবে সাদা বক উড়ে চলেছে, মেঘও উড়ছে, বকও উড়ছে। বিরাট বিচিত্র প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভাবে বিভোর গদাধর স্থির নিস্পন্দ হয়ে পড়ে গেলেন। বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য গদাধরকে সবাই ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এল। চন্দ্রাদেবী ভেবেই আকুল—ছেলের আবার একি অসুখ হ'ল! ভুলে গেছেন স্নেহময়ী জননী

পূর্বস্বপ্নের কথা—কে গদাধর, কোথা থেকে এসেছে!

লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বড় রাস্তা ধরে হাটতলার দিকে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যায় শ্রীমতী ধনীর মন্দির। জ্যোতির্ময় শিশু গদাধর কোলে—বসে আছেন ধনী কামারনী। ছোট মন্দির উঠেছে তাঁর ভিটের ওপর। শ্রীমতী চন্দ্রার চিরসঙ্গিনী ধনী, গদাধরের ধাত্রীমাতা—ভিক্ষামাতা।

ধনীর ভিটে থেকে বড় রাস্তা ধরে খানিক দূরে শ্রীপুরের হাট, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, কখন দাদা রামেশ্বরের সঙ্গে, কখন একলা গদাই আসতেন এখানে প্রতি হাটবারে। এখানেই শিখেছিলেন, পাঁচটা দোকান দেখে জিনিস পছন্দ করতে হয়, ঘুরে ঘুরে দর ক'রে জিনিস কিনতে হয়, যে জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউ নিতে হয়।

গ্রামের পশ্চিমাংশে মুকুন্দপুর, গদাধরদেব বাড়ীর পাশেই। খেলতে খেলতে কতদিন যেতেন সেখানে, দেখতেন ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে কুটছে! একজন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে, আর এক-জন গর্তে চিঁড়ে উলটে দিচ্ছে, কোলের ছেলেকে স্তন্যপান করাচ্ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে পাওনা গণ্ডার হিসাব করছে, কিন্তু নজর ঐ ঢেঁকির দিকে, না হলে হাত থেঁতলে যাবে। বলতেন, সব কাজ কর, কিন্তু মন রাখ ঈশ্বরে—নইলে থেঁতলে যাবে।

সীতানাথ পাইনদের বাড়ী, চিনুশাখারির ভিটে সব ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন ভক্তেরা, আর স্মরণ মনন করতে লাগলেন গদাধরের বাল্যলীলা।

আশে পাশে

দেখলেন ভক্তেরা কামারপুকুরের অনেক স্থান, কিন্তু শেষ আর হয় না। গ্রামের প্রতি ঘর, প্রতি পথ, প্রতি পাড়া প্রান্তর ধন্য হয়ে রয়েছে, সব জায়গায় গেছেন গদাধর। প্রত্যেকটি স্থানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভক্তেরা চললেন এবার গ্রামের আশে পাশে, একটু দূরে দূরে গদাধরের স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যস্থানগুলি দেখতে।

চললেন শ্মশানে—ভূতির খালের ধারে। হালদার পুকুরের পশ্চিমে—গাঁয়ের বাইরে, জলছে চিতা—দেখেছেন গদাধর আর ভেবেছেন—এমনি করেই শেষ হয়েছে তাঁর পুণ্যবান পিতার মর্ত্য শরীর। বৈরাগ্যের স্বাদ পেলেন এখানে পরম-বৈরাগ্যস্বরূপ শ্রীভগবান্—মানব-লীলায় পিতৃ-বিয়োগের অবসরে।

আবার দক্ষিণেশ্বরে যখন 'মাতৃবিরহে' কাতর হয়ে ডাকতেন—কাঁদতেন, 'মা দেখা দে, দেখা দে বলে মাটিতে বালিতে মুখ ঘসড়াতেন, পুনঃ পুনঃ মায়ের দর্শনের জন্য সে কি ব্যাকুল কান্না। —কামারপুকুরে এল সে খবর। চিন্তাকুলা জননী চন্দ্রা গদাধরকে দেশে নিয়ে এলেন—তখনও গদাধর ঘন ঘন যেতেন ঐ শ্মশানে—মা যে শ্মশানবাসিনী। হয়তো ঐখানে মা দেখা দেবেন—এই ভেবে। মায়ের সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী, শিবাকুল আসত সেখানে, গদাধর তাদের ভোগ নিবেদন করতেন—যার যেমন। 'মা'ও দিতেন দেখা—হ'ত অনেক কথা ছেলেতে মায়েতে। যেমন ভূতির খালের শ্মশানে, তেমনি বুধুই মোড়লের শ্মশানে যেতেন সে-বার একই উদ্দেশ্যে, দিনেও বেশ নিরিবিলি তাই যেতেন।

* * *

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥

—দেখিয়েছিলেন ঠাকুরকে এই শ্লোকটি ভৈরবী ব্রাহ্মণী চৈতন্য-ভাগবত থেকে। শিহড়ে যাচ্ছিলেন একবার ঠাকুর কামারপুকুর থেকে, যাচ্ছিলেন পালকি চড়ে—সঙ্গে হৃদয়। গাঁয়ের

খানিক দূরে এক বিশাল প্রান্তর, তার মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বট—অনেকগুলি গাছ—শীতল ছায়া দিচ্ছে; দূরে আশে পাশে জঙ্গল। ভারি ভাল লাগছিল। বেরুল কিশোর বয়সের দুটি ছেলে—খেলতে আরম্ভ ক'রল মাঠে। কখন চলে যায় দূর বনে বনফুল আহরণে, কখন আসে পালকির কাছে, হাসি গল্প—কত আনন্দের কথা, অনেকক্ষণ এইভাবে খেলবার পর আবার ঢুকে গেল দুজনে ঠাকুরের শরীরে। দেড় বছর বাদে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে এই ঘটনার কথা। উত্তর পেয়েছিলেন, 'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব, শ্রীনিত্যানন্দ আর শ্রীচৈতন্য এবার একাধারে একসঙ্গে রয়েছেন তাঁর (ঠাকুরের) ভেতর'—এই ব'লে ব্রাহ্মণী দেখিয়েছিলেন ঐ শ্লোকটি।

এই চমৎকার লীলা ছোলবেলায় আরও হয়েছিল, কত কীর্তন, কত গান, কত অভিনয় হ'ত তাঁর কামারপুকুরের গ্রামময়, মুগ্ধ হয়ে যেত সকলে দেখে শুনে ভগবানের সে লীলাখেলা।

মানিক রাজার আমবাগান

গদাধরদেব বাড়ী উত্তর-পশ্চিমে ভূতির খালের সাঁকো পেরিয়ে একটু গেলেই ভুরসুবো গাঁয়ের দক্ষিণ সীমান্তে মানিক রাজার আমবাগান, গদাধরের বাল্যলীলা-অভিনয়ের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ।

গাঁয়ের ধনী জমিদার মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাগান করেছিলেন সকলে আম খাবে বলে, মস্তবড় বাগান—মাঝখানে পুকুর, ঘন সারি আমগাছগুলি সারা বাগানে ছায়ার সৃষ্টি করেছে, রোদের সময় রাখাল গরু নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিত। বাগানের চারপাশে রাজারই দেওয়া গোচারণের মাঠ, আশে-পাশের গাঁয়ের গরুগুলি ঘাস খাবে বলে,—এতখানি হৃদয় ছিল বলেই তো দেশের লোক তাঁকে বলত 'মানিক রাজা'।

এই বাগানই হ'ল নূতন নবদ্বীপ, শ্রীবাসের আঙিনা, এ-যুগের শ্রীবৃন্দাবন। একাধারে সব—গদাধরের এবারের লীলার। কখন রামলীলা, কখন কৃষ্ণলীলা অভিনীত হয়েছে এখানে। কখন নাম-সঙ্কীর্তনের উচ্চরোলে মুখরিত, কখন ভাবে মাতোয়ারা গদাধর গেয়ে চলেছেন, সঙ্গীরা কীর্তনে যোগ দিয়েছেন, আর দেখা দিয়েছে—তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ, অশ্রু-পুলক, স্বেদ-কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব-বিকার।

ব্রজলীলায় গদাধর হয়েছেন কানাই—আর সঙ্গীরা কেউ সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম সখাবৃন্দ, গোষ্ঠবিহারে রাখালদের বৎসগাভী এনে তাদের নিয়েই খেলা হয়েছে। জলে নেমে হয়েছে জলকেলি, বনে বনে বনবিহার! কোন দিন বা মাথুরলীলায় নিজেই হয়েছেন রাই-বিনোদিনী—সঙ্গীরা হয়েছে সখীবৃন্দ, বিরহের ভাবে কেঁদে কেঁদে ডাকছেন পরাণ বঁধুয়া-কৃষ্ণকে। সখীদের মিনতি করে বলছেন, কৃষ্ণ এনে দিতে,—বলতে বলতে কতবার ভাবস্থ হয়ে গেছেন।

আনুড়,—বিশালাক্ষী

আনুড়ের বিশালাক্ষী বড় জাগ্রত দেবতা। কামারপুকুর থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। দূর দূর থেকে আসে গ্রামবাসীরা মায়ের পূজা দিতে, কেউ রোগ সারবে বলে, কেউ রোগ সেরেছে বলে, কেউ বা ভাল ফসল হবার মানত করে, কারো উদ্দেশ্য বৈষয়িক উন্নতি, কারো বা প্রার্থনা ভক্তিলাভ। দেবী বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য খুব,যিনি যা চান তিনি তাই পান। ভিড় হয় মায়ের কাছে এইজন্য যথেষ্ট। মা নিজের বলে কিছুই রাখেননি। ছেলেদের দিচ্ছেন মুঠো মুঠো দুহাত ভরে যে যা চাইছে, নিজের মন্দিরও নেই। রাখাল-বাগাল গাঁয়ের ছেলে-পিলে নিয়ে মা থাকেন মাঠের মাঝখানে, চারিদিকে বড় গাছ. তার ছায়ায় গাঁয়ের কুঁড়েখানি—খড়ে ছাওয়া,

দরজা জানালা নেই, সব খোলা। কোন মূর্তি নয়, সিঁদুর-মাখা পাথরে বিশাল চোখ, তাই বিশালাক্ষী, স্নেহের আবেগ মাখা চোখে জগতের সকলকে দেখছেন। এই চোখেরই পূজা করেন সকলে, যাতে মায়ের স্নেহদৃষ্টি ভাল ক'রে পড়ে সকলের ওপরে।

মায়ের অকৃত্রিম স্নেহের অনেক পরিচয় পেয়েছেন ভক্তেরা, মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল বলে এক ধনী ক'রে দিলেন একবার মায়ের একটি সুন্দর মন্দির। পূজার শেষে পূজারী মাকে মন্দিরে বন্দী ক'রে যান—দরজায় মজবুত তালা দিয়ে, ভক্তেরা জানালার ফাঁক দিয়ে মাকে দর্শন ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্রণামী দেন। পূজারী তালা খুলে সে সব নেন। পূজার সময় যা আসে তাও তিনিই নেন। রাখাল ছেলেরা বঞ্চিত হ'ল একেবারে, মন্দির হবার আগে তারাই ত পেত সব পয়সাকড়ি, ফলমিষ্টি। সরল প্রাণে আঘাত লাগে তাদের, অভিযোগ অভিমানের রূপ নেয়, মাকে জানায় তারা 'মা তুই সব বন্ধ করলি।' তাদের ধারণা মায়ের ইচ্ছাতেই সব হয়েছে। ছেলেরা আর এদিকে আসে না, দূরের মাঠে চলে যায়। মা পারলেন না ছেলেদের অভিমান সহ্য করতে—মন্দির ফেটে গেল রাতারাতি। আর কেউ মন্দির করতে গেলে মা স্বপ্নাদেশে মানা করেন। মুক্ত প্রান্তরে ছেলেরা আবার মাকে পেয়ে বড় খুশী।

বড় জাগ্রতা বিশালাক্ষী দেবী। স্বপ্নে জাগরণে মায়ের দেখা, মায়ের কৃপা পেয়েছেন কত ভক্ত—কত বার। তাই আসেন ভক্তেরা দূর দূর গ্রাম থেকে দল বেঁধে বেঁধে।

বোশেখ মাস ধর্ম-কর্মের সময়। ভোর হতে না হতেই হাঁটতে থাকেন গ্রামবাসীরা—বিশেষ ক'রে মেয়েরা, যেতে হয় দেবস্থানে অনেক সময় 'মানত' শোধ করতে, কখনও বা শুধু মাকে দর্শন করতেই!

চলেছেন কামারপুকুর থেকে এই রকম একটি মেয়ের দল মাকে দেখতে আনুড়ে। গাড়ী পালকিতে না গিয়ে তাঁরা চলেছেন হেঁটেই, চলেছেন দেবদর্শনে—হাতে পূজার সামগ্রী ফুল-ফল, ধূপ-দীপ—মনে দেবতার চিন্তা, মুখে তাঁরই কথা—তাঁর মহিমা-কীর্তন।

লাহাদের বাড়ীর মেয়েরাও চলেছেন, ধর্মপ্রাণ প্রসন্নময়ী যাচ্ছেন—গদাই বায়না ধরলেন, 'আমি যাব'। প্রসন্ন চিনেছিলেন গদাইকে, বলতেন, 'হ্যাঁ গদাই, তোকে সময় সময় ঠাকুর বলে মনে হয়, কেন বল্ দেখি?' সেই প্রসন্ন যাচ্ছেন, তাই চন্দ্রা ছেড়ে দিয়েছেন ছেলেকে। গদাই চলেছেন তাঁর হাত ধরে, কখন হাত ছেড়ে। মাঠের পথে আল ধরে চলেছেন সকলে। পথে যেতে মায়ের মহিমা-বিষয়ে আলাপ হচ্ছে, গানও হচ্ছে, গদাইও গাইছে, হুঁশ নেই কারো—বেলা বাড়ছে, রোদ উঠেছে, হঠাৎ থেমে গেল গদাই, গান নেই, কথা নেই, চলাও বন্ধ, হাত পা শরীর সব অবশ আড়ষ্ট, মেয়েরা ভীত সন্ত্রস্ত।

এসে গেছেন তাঁরা আনুড়ের বিশালাক্ষীর সীমানায়, তাই কি মায়ের আবেশ হ'ল? এ কথা কি ক'রে ভাবতে পারেন স্নেহ-ভরা মায়েরা? তাঁরা আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন, কেউ পুকুর থেকে জল এনে গদাইয়ের মুখে চোখে দিচ্ছেন, রোদ লেগেই এমন হয়েছে ভেবে কেউ কোলে ক'রে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসান। এত করলেন তাঁরা, কিন্তু গদাইএর জ্ঞান ফিরল না! কূল-কিনারা পাচ্ছেন না কেউ, কি করা যায়? কি ক'রে দেবীর দর্শন হবে, মানত শোধ হবে, কি করেই বা ছেলেকে নিয়ে ফেরা হবে?

শেষে প্রসন্নই কূল পেলেন, ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মা বিশালাক্ষী প্রসন্না হও,

মা রক্ষে কর। মুখ তুলে চাও মা, অকূলে কূল দাও মা!' ধীরে ধীরে গদাইএর জ্ঞান ফিরে এল, চোখ মেলে চাইল, মুখে ফুটে উঠল মিষ্টি হাসি! সুস্থ শরীর, যেন কিছুই হয়নি, প্রাণ পেলেন মেয়েরা।

মন্দিরের কাছেই এসে পড়েছেন তাঁরা, একটু হেঁটে গিয়ে পূজা দিতে লাগলেন মাকে। গদাইও গাছের ছায়ায় বসে দেখছেন সব, সুস্থ সহজ ভাবে। পূজা শেষে সবাই ফিরে এলেন মায়ের মহিমা কীর্তন করতে করতে।

* * *

কতদিন পরে আজ সেই কথা স্মরণ করতে করতে চলেছেন ভক্তেরা হালদার পুকুরের পূব পাড দিয়ে মাঠের পথে আলে-আলে,—তীর্থ-সম এই পথ!

প্রভুর লীলার শেষ নেই। ভক্তদেরও দেখার শেষ নেই, ভাবনার অন্ত নেই, স্রোতের মত আসে ভগবদ্‌ভাবনা ভক্তহৃদয়ে। যে দিকে চাওয়া যায় লীলাময়ের লীলার স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে পথে-ঘাটে, উঠানে দাওয়ায়, ঘরে মন্দিরে মণ্ডপে, এমনকি খাল বিল পুকুরে দীঘিতে, গাছপালায় পর্যন্ত। কামারপুকুরের তো কথাই নেই—সে দেশের প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে, সেখানকার প্রতি ধূলিকণায় মাখা রয়েছে অগণিত লীলা-কাহিনী। ভক্তেরা সসম্ভ্রমে প্রণাম করলেন সে মাটীকে, সে দেশকে, আর মনে মনে প্রদক্ষিণ করলেন জয়রামবাটী-কামারপুকুর-অঞ্চলটিকে!

বেদান্ত ও শঙ্কর-মনীষা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

বেদান্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয়। বেদান্তের মহান মতবাদ, অকাট্য দার্শনিক যুক্তি, অত্যদ্ভুত বিচার-প্রণালী এবং অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত জগতে অতুলনীয়। প্রাচীন যুগের ভারতীয় আর্য ঋষিগণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। বৈদান্তিক তত্ত্বের আকর-স্বরূপ উপনিষদাবলী তাঁরা তাঁদের ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা অনায়াসে বুঝতে সক্ষম হতেন ব'লে তাঁদের ভাষ্য বা টীকাদির কোন প্রয়োজন হ'ত না। তবে বিশাল আর্ষ শাস্ত্র যাতে সংক্ষেপে আয়ত্ত করা যায় এই উদ্দেশ্যে মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন ও উপনিষদের সারস্বরূপ গীতাকে বিশালকায় মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। খৃষ্ট-জন্মের পূর্বেই এইরূপে আর্যগণের মূল শাস্ত্রগুলি রচিত হ'য়ে যায়।

অপরাপর শাস্ত্রের তুলনায় গীতা কিছু সহজ-বোধ্য হলেও উক্ত শাস্ত্রত্রয়, যথা শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষৎ, ন্যায়প্রস্থান বেদান্ত-দর্শন ও স্মৃতি-প্রস্থান গীতার প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে দীর্ঘ দিন যাবৎ সম্ভব হয়নি। শাস্ত্র-পিপাসুগণের এই তৃষ্ণা দূর করবার জন্য শিবা-বতার শঙ্কর তাঁর অমর লেখনী দ্বারা উক্ত

প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব, তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভাষ্যকারের জ্ঞানজ্যোতি ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে এবং জগতে যতকাল জ্ঞানের আলোচনা থাকবে, ততকাল উহা অম্লান থাকবে।

যদিও শঙ্কর-ভাষ্যের বিরুদ্ধে ভেদবাদ-মূলক বহুবিধ গ্রন্থাদি ও মূল শাস্ত্রাদির উপর ভাষ্যটীকাদি রচিত হয়েছে, তথাপি শঙ্কর-মনীষার সৌর জ্যোতিকে কেহই কোন মত দ্বারা ম্লান করতে সক্ষম হননি। শঙ্করাচার্য ভাষ্যাদি ছাড়াও বেদান্তের প্রকরণ-জাতীয় বহুবিধ মৌলিক গ্রন্থ এবং স্তবস্তোত্র রচনা ক'রে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

তিনি এমনই একটি প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সেই তাঁর যাবতীয় শাস্ত্রপাঠ ও ভাষ্যগ্রন্থাদির রচনা শেষ হ'য়ে যায়। স্বয়ং ব্যাসদেব ছদ্মবেশে শঙ্করের ভাষ্য পাঠ ক'রে আনন্দিত হন ও তাঁকে আরও ১৬ বৎসর জীবিত থেকে অদ্বৈতবাদ প্রচার করতে আদেশ দেন ও মন্তব্য প্রকাশ করেন যে 'শারীরক ভাষ্যে' তাঁর ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্যই নির্ণীত হয়েছে। বেদান্তের প্রকৃত মর্ম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত অবগত হ'তে হ'লে শাঙ্করভাষ্য ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না, তিনি ছিলেন সমদর্শী। তাঁর ভাব ছিল সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও আকাশের ন্যায় উদার। তাঁর প্রসন্ন গম্ভীর ভাষ্য, ভাষার মাধুর্য ও সারল্য, সর্বতোমুখী প্রতিভা ও বিচারের তীক্ষ্ণতা তাঁর নামকে জগতে অমর ক'রে রেখেছে।

* * *

আত্মবোধই জ্ঞানের মূল, আত্মার নিরাকরণ অসম্ভব। যদি কেহ বলেন যে 'আত্মা নেই', তো আত্মারূপী যিনি বক্তা তাঁরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আমি নেই' এরূপ তো আর কেহ বলে না বা বলতে পারে না। স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা কেবল জ্ঞান-স্বরূপ নয়, পরন্তু আনন্দ-স্বরূপও।

শঙ্কর বেদকে চরম প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। কারণ বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। অতএব বেদপ্রামাণ্যে মানবোচিত ভ্রম-প্রমাদ থাকতে পারে না। নিত্য-জ্ঞানরাশিস্বরূপ বেদ পর-ব্রহ্মের প্রকট মূর্তি, উহার বিলয় কখনও সম্ভব নয়। বেদ ও জ্ঞানকে ঠিক ঠিক আয়ত্ত করতে হ'লে শঙ্কর-মতে আবশ্যক দ্বিজত্ব ও সন্ন্যাস। জ্ঞানলাভ ও বেদান্ত-প্রবেশ জন্য প্রয়োজন চারটি সাধন: যথা—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, (২) ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ, (৩) শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি (৪) মুমুক্ষুত্ব।

শঙ্কর-মতে কর্ম ও উপাসনা চিত্তশুদ্ধির উপায়-রূপে জ্ঞানলাভে সহায়ক, কিন্তু উহাদের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় কখন সম্ভব নয়। কর্ম দ্বারা পুণ্যার্জন হয় ও উহার ফলে স্বর্গাদি লাভ হ'তে পারে, কিন্তু উহা চরম মুক্তি নয়। সসীম কর্ম দ্বারা সীমাহীন ব্রহ্মানন্দ লাভ হ'তে পারে না। একমাত্র স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব। আমি স্বরূপতঃ কি? আমি অকর্তা, অভোক্তা বিজ্ঞানঘন অব্যয়। 'ব্রহ্মনামাবলী'তে শংকর বলছেন:

প্রজ্ঞানঘন এবাহং বিজ্ঞানঘন এব চ।
অকর্তাহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥

আবার 'আত্মবোধে' বলছেন:

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্মলঃ॥

জীবত্ব তা হ'লে কি? উত্তর: ব্যষ্টিমায়া-যুক্ত ব্রহ্মই জীব, অর্থাৎ অন্তঃকরণে ব্রহ্মের যে

প্রতিবিম্ব—তাই জীব। আর সমষ্টিমায়াযুক্ত বা মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। শঙ্কর-মত আলোচনা করতে হ'লে আমাদের চারটি বিষয়কে একত্র বিচার করা আবশ্যক, যথা—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও জীব। ব্রহ্ম একমাত্র সত্য পদার্থ। উহা এক, অদ্বৈত, নির্বিশেষ ও নির্গুণ। ব্রহ্মের বিবর্ত—ব্রহ্মাশ্রিত মায়ার পরিণতিতে জগৎ। জগৎ দেখা গেলেও উহার পৃথক্ সত্তা নেই। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, প্রকৃতি ও অব্যক্ত—একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ মায়ার সত্তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই—আবার জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান থাকে না, তাই উহা সৎ কি অসৎ বলা যায় না বলে শঙ্কর উহাকে অনির্বচনীয়' বলেছেন। এই মতকে 'অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ' বলে।

শঙ্কর-মতে জগতের ব্যবহারিক সত্তা ও প্রবাহ-নিত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। মন অ-মন হলেই দ্বৈত জগৎ আর থাকে না। তখন মনোময় জগৎ মিথ্যায় পরিণত হয়। সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপতঃ একই, প্রথমটি ঔপাধিক অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া-উপাধিগ্রস্ত হ'য়ে সগুণ হন। সগুণ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি তাঁর মায়ার সহযোগে লীলা মাত্র। সগুণ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের সত্তা নেই।

শঙ্করের ভক্তি বা প্রেম হচ্ছে আত্মানুসন্ধান, ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতা-বোধ। এই ভক্তিতে বিরহ-ব্যথা নেই, শোক নেই, ইহা নিত্য মহা-মিলন। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানেই মহামুক্তি লাভ হয়। ভাষ্যকার জীবন্মুক্ত অবস্থা স্বীকার করেছেন। জীবিত অবস্থাতেও মুক্তির মহানন্দ লাভ করা যায়, তখন সংসারের অনিত্যতা-বোধ দৃঢ় হয়, তারপর প্রারব্ধক্ষয়ে দেহ-বিলয়ে বিদেহ মুক্তি। দেহ-বিলয়ে তো আর আত্মার বিলয় হয় না, তখন ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে যাওয়ার ন্যায় পূর্ণত্ব ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে। যথা:

> যথা ঘটেষু নষ্টেষু ঘটাকাশো ন নশ্যতি।
> তথা দেহেষু নষ্টেষু নৈব নশ্যামি সর্বগঃ॥

চরম মুক্তিতে—সূক্ষ্ম বা কারণ-দেহ প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

এই অদ্বৈত-মতই শঙ্কর-মতে সর্বশ্রেষ্ঠ মত। অপরাপর মত উহার নিম্নতর সোপানস্বরূপ। সগুণ উপাসনা বা নিষ্কাম কর্ম পরম্পরাক্রমে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানলাভে সহায়ক। কথা এই যে—জীব জীবরূপে ঈশ্বর হয় না, চৈতন্যস্বরূপে জীব-ব্রহ্ম অভেদ। জীবরূপে অন্তঃকরণ-ভেদে যেন বহু চৈতন্য, কিন্তু চৈতন্য মূলতঃ একই, ব্রহ্মদৃষ্টির প্রথম উন্মেষেই বুঝা যায় জাগ্রৎ বিশ্বও এক মহা স্বপ্ন, এই বোধ আরও ঘনীভূত হ'লে ঐ স্বপ্নও আর থাকবে না, তখন থাকবেন কেবল এক সচ্চিদা-নন্দ। যে ধ্যানে ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হ'য়ে যায়, তাকেই বলে জ্ঞান, এবং যে ধ্যানে ধ্যাতা ও ধ্যেয় মধ্যে পার্থক্য থাকে তা উপাসনা। ধ্যানের পরিপক্ব অবস্থায় অভেদ জ্ঞান নিশ্চয় এসে উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ জীব তো ব্রহ্মই, তবে উপাধিযোগেই ব্রহ্ম জীবাত্মা হয়েছেন। অভেদজ্ঞানে জীবের আমিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। ইহাই শাঙ্কর সিদ্ধান্ত। এই জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই অধিকতর লভ্য হ'তে পারে না। 'আত্মবোধ'-গ্রন্থে শঙ্কর তাই বলেছেন:

> যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখম্।
> যজ্‌জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥

'জগৎ নাই' এইরূপ অজাতবাদ-মূলক তত্ত্ব বা জগতের প্রাতিভাসিক সত্তাই আছে—ইহা দ্বারা বুঝায় এরূপ বাক্য শঙ্করের 'স্বাত্ম-প্রকাশিকা' পুস্তকে দেখা যায়। যথা:

নাজ্ঞানং ন চ বুদ্ধিশ্চ ন জগন্ন চ সাক্ষিতা
সর্পাদৌ রজ্জুসত্তেব ব্রহ্মসত্তৈব কেবলম্।
প্রপঞ্চাধাররূপেণ বর্ততে তদ্ জগন্নহি॥
ঘটাকাশমঠাকাশৌ মহাকাশে প্রকল্পিতৌ।
এবং ময়ি চিদাকাশে জীবেশৌ পরিকল্পিতৌ॥

'অপরোক্ষানুভূতি' গ্রন্থেও বলা হয়েছে :

যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে।
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্ বিশ্বং চিদাত্মনি॥

অর্থাৎ আকাশে নীলিমা, মরুতে জল, স্থাণুতে পুরুষ ব'লে যেরূপ ভ্রম হয়, সেইরূপ চিদাত্মায় বিশ্বের ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির উচ্ছেদ হ'লে এক চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, যাঁর দৃষ্টি হ'তে এই ভ্রান্তি ছুটে গেছে। যথা—

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ॥
যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥
ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণো ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥

—বিবেকচূড়ামণি

যেগুলি এখানে আলোচিত হ'ল, এই গুলিই শঙ্করের মূল শিক্ষা। শঙ্কর-রচিত বহু গ্রন্থে এই এক বিষয়ের আলোচনাই বিভিন্ন ভাষায় করা হয়েছে। শঙ্কর-রচিত 'বিবেকচূড়ামণি'-গ্রন্থে শঙ্কর-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত, ভাষ্যাদি সহ প্রস্থানত্রয়ে তাহাই বিস্তারিত। শঙ্কর-গ্রথিত 'মণিরত্নমালা'র কয়েকটি প্রশ্নোত্তর দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

প্রশ্ন	উত্তর
বদ্ধো হি কঃ ?	যো বিষয়ানুরাগী।
কা বা বিমুক্তিঃ ?	বিষয়ে বিরক্তিঃ।
শেতে সুখং কঃ ?	সমাধিনিষ্ঠঃ।
কোবাস্তি ঘোরঃ নরকঃ ?	স্বদেহঃ।
জাগর্তি কঃ ?	সদসদ্ বিবেকী।
কো বা দরিদ্রঃ ?	বিশালতৃষ্ণঃ।
তীর্থং পরং কিম্ ?	স্বমনো বিশুদ্ধম্।
শ্রাব্যং সদা কিং	গুরুবেদবাক্যম্।
কো বা জ্বরঃ ?	চিন্তা।
জিতং জগৎ কেন ?	মনো হি যেন।
কে কে হ্যুপাস্যাঃ ?	গুরুবেদবৃদ্ধাঃ।
প্রত্যক্ষ দেবতা কা ?	মাতা।
অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং ?	সংসারমিথ্যা শিবাত্মতত্ত্বম্॥

নব-প্রকাশিত পুস্তিকা

শ্রীধাম কামারপুকুর—স্বামী তেজসানন্দ প্রণীত

উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত :: পৃষ্ঠা ৩০, মূল্য—।৵০

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্ম-লীলাভূমি কামারপুকুর এ যুগের তাপদগ্ধ মানবের শান্তি ও আনন্দের উৎস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করিয়া লেখক কামারপুকুর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বসতবাটী ও তাঁহার স্মৃতিপূত স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তীর্থযাত্রীদের পক্ষে পুস্তিকাটি বিশেষ সহায়ক হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী বামদেবানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী বামদেবানন্দ ৫৪ বৎসর বয়সে গত ৩০শে মার্চ সন্ন্যাসরোগে (Apoplexy) দেহত্যাগ করিয়াছেন। ২৯শে মার্চ সকালে হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে সত্বর শেঠ সুখলাল কার্নানি হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং রোগ মারাত্মক বলিয়া নির্ণীত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও পরদিন হাসপাতালেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

স্বামী বামদেবানন্দ ১৯২৪খৃঃ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৯ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্মময় জীবনে তিনি মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে কাজ করেন, তন্মধ্যে কয়েক বৎসর কাটে দেওঘর বিদ্যাপীঠে, পরে অদ্বৈত আশ্রম—কলিকাতা-কেন্দ্রের ম্যানেজার এবং সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের সভাপতিরূপে তাঁহার কার্য উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর কাল তিনি যোগ্যতার সহিত উদ্বোধন কার্যালয়ের সহকারী কর্মাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। পাঠক-সমাজে সুপরিচিত' সাধক রাম-প্রসাদ' ও 'মীরাবাঈ' পুস্তকদ্বয় তাঁহার রচিত ও উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তিনি কলিকাতা 'কালচার ইনষ্টিট্যুটের' কর্মী ছিলেন এবং কিছুদিন হইতে প্রায়ই অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতে-ছিলেন। তাঁহার আত্মা ভগবৎপাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

পুরস্কার-বিতরণোৎসব

বেলুড় বিদ্যামন্দির : গত ২রা মার্চ রবি-বার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিভাবক, অধ্যাপক বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি এবং রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রগণকর্তৃক বৈদিক শান্তি-পাঠের পর কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বিশেষ ভাবে ইহাও উল্লেখ করেন যে উক্ত বৎসর বিদ্যা-মন্দির আই এ পরীক্ষায় ১ম হইতে ৫ম এবং ৮ম স্থান এবং আই এস-সি পরীক্ষায় ৩য় স্থান এবং স্কলারশিপ-তালিকায় আই এ পরীক্ষায় ১ম হইতে ৫ম এবং আই এস-সি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিবার গৌরব অর্জন করে। তিনি ইহাও বলেন যে এই কলেজের অনুকূল পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়ম শৃঙ্খলাবিধান ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান প্রভৃতিই এই সাফল্যের প্রধান কারণ।

তদনন্তর বিদ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র তাহা-দের সুললিত সঙ্গীত ও নিপুণ আবৃত্তি দ্বারা উপ-স্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সভাপতি মহোদয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত অভিভাষণে স্বামী

বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে গঠিত এই বিদ্যামন্দিরের সাফল্যকে অভিনন্দিত করিয়া ছাত্রগণকে ইহার শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশের মধ্যে জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন।

তিনি বলেন : প্রকৃত শিক্ষা সার্থক হইয়া উঠে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে—সমাজ, দেশ ও মানবের সেবায়। ভারতের শিক্ষার মূলে রহিয়াছে আধ্যাত্মিকতা। প্রচীনকালে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বালকগণ মুনি-ঋষিগণের পদপ্রান্তে বসিয়া যে শিক্ষালাভ করিত, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার সমূহ পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় সেই সনাতন আদর্শে সকলকে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হইতেছে না। বস্তুতঃ ত্যাগ ও সেবাই আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপ, যেখানে ইহার অভাব ঘটে, সেখানে শিক্ষা কল্যাণময় রূপে আত্মপ্রকাশ করে না। তাই পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার অনুশীলনে প্রতীচ্য মনীষিবৃন্দ আজ যে সকল শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, ত্যাগ ও সংযমের অভাবে তাহা মনুষ্যসমাজে ধ্বংসাত্মকরূপে প্রকটিত, তাহার কল্যাণমূর্তি আমরা দেখিতেছি না। বলা বাহুল্য যেখানে মানবকল্যাণে ও সমাজগঠনে শিক্ষার্জিত জ্ঞান ও শক্তিসমূহ নিয়োজিত হয় না, সেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিক্ষা-শিক্ষক-শিষ্য—এই ত্রয়ীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে উন্নত ও প্রসারিত করা—ভূমার সঙ্গে বিদ্যার্থীকে পরিচিত করিয়াই দেওয়া। তাঁহারাই শিক্ষক হইবার উপযোগী যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার আদর্শে জীবন গড়িয়া তুলিয়া ত্যাগ ও সেবাকে জীবনের ভূষণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন এবং শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিষ্যের অন্তরের সদ্বৃত্তি-নিচয় মুকুলিত করিয়া তুলিতে পারেন। এইরূপ আদর্শ শিক্ষকগণের নিকট হইতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ছাত্রগণকেও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে, কারণ শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। খুবই আনন্দের বিষয় রামকৃষ্ণসঙ্ঘের এই বিদ্যামন্দির—আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও সর্বজনপ্রিয় ও অতি আদরের ও শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার কারণ এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যমূলক শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সুব্যবস্থা হইয়াছে।

বস্তু-তান্ত্রিক বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে আজ যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, ভারতের ঋষি-মনীষিবৃন্দ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে সেই সকল সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন এবং মানবের সামগ্রিক জীবনকে এক বিরাট আধ্যাত্মিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপাদান আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন এবং যুগে যুগে তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই অমূল্য অবদান ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে নিহিত। যাহাতে আমরা আমাদের এই সাংস্কৃতিক আদর্শকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান যুগের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারি তজ্জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

এই মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রগণের কৃতিত্ব দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা

লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত এবং শিল্প-সৃষ্টিকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম পরিচালিত লোকশিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে নরেন্দ্রপুরে ('গড়িয়া' ২৪ পরগনা) সাতদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৫০ বিঘা জমির

উপরে এই বিরাট মেলাটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যহ বিকাল ৪টার পর শত শত নরনারীর আগমনে মেলা-প্রান্তরটি আনন্দমুখর হইয়া উঠিত।

গত ৩রা মার্চ রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ এই মেলার উদ্বোধন করেন। লোকশিক্ষা পরিষদ-পরিচালিত বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের কার্যাবলী ও শিল্প-কাজ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত তরজা, কীর্তন, যাত্রা, থিয়েটার, পটিদারী গান, জগঝম্প ও গুড়গুড়ি নৃত্য, পাঁচালি, কথকতা, কালীকীর্তন প্রভৃতির আসর সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিল। তাহা ছাড়া ছায়াচিত্র, আতসবাজি, গাজীখেলা, জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই মেলার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক: কথা ও চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন-ব্যাখ্যান, সমাজ-শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ, চার্ট, পোষ্টার প্রভৃতির প্রদর্শনী। বিভিন্ন দিন সন্ধ্যায় স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ যথাক্রমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন।

৯ই মার্চ ২৪ পরগণার জেলা-শাসক শ্রী কে, পি, সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী-সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-শিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় এবং শিক্ষা-বিভাগের উর্ধ্বতন-কর্মচারী শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ মেলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত ভাষণ দেন। মেলার কৃষি-প্রদর্শনীটিও স্থানীয় কৃষকদের প্রভূত উৎসাহ দান করে।

কার্যবিবরণী

কানপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৪, '৫৫ এবং '৫৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২০খৃঃ এই শাখা-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্র দ্বারা (১) হাসপাতাল, (২) উচ্চ বিদ্যালয়, (৩) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৪) বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুট ও বিবেকানন্দ ব্যায়ামশালা ব্যতীত ধর্মসভা ও ক্লাস পরিচালিত হয়।

হাসপাতালে রোগিসংখ্যা দৈনিক ৩০০ হইতে ৪০০এর মধ্যে। সার্জিক্যাল, ক্লিনিক্যাল ও ইলেক্ট্রোথেরাপি বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ৫ শত বালক অধ্যয়ন করে, পরীক্ষা-ফল প্রশংসনীয়। স্কাউট-প্রতিযোগিতায় ছাত্রেরা কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

লাইব্রেরির গ্রন্থসংখ্যা ৫৯০০, পাঠাগারে দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ২০।

সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যচর্চার সুবিধার জন্য আশ্রম-সংলগ্ন বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুট এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নগরের উপান্তে বিবেকানন্দ ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম-চর্চার ফলে সুগঠিত-দেহ বালকেরা মাঝে মাঝে ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করে।

আলোচ্য বর্ষগুলিতে মোট ৩৩০টি ক্লাস ও ১৬টি ধর্ম সভার অনুষ্ঠান হয়, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি-উৎসব ও অন্যান্য জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

পাকিস্তান-কেন্দ্রে উৎসব

নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব-পাকিস্তান): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই ফাল্গুন, বুধবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন, রবিবার পর্যন্ত পঞ্চদিবস-ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক স্তোত্র পাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। রাত্রে রামায়ণ-গানের ব্যবস্থা ছিল।

১৫ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী, স্বামী শর্মানন্দ ও স্বামী নিঃশঙ্কানন্দ দেড় সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

১৬ই ফাল্গুন, বৈকালে খানবাহাদুর আলহাজু আব্দুর রহমান খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি ধর্ম-সভায় রেভাঃ জি, আর, বিশ্বাস, শ্রীরাসমোহন, চক্রবর্তী, শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীনীরেন্দ্রনাথ দেব বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বলেন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ অভিভাষণ দান করেন। সভায় প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

১৭ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে একটী মহিলা-সভায় শ্রীশ্রীমায়ের স্তোত্র পাঠান্তে দ্বিসহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন ও গুণাবলীর আলোচিত হইলে পর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুজাতা ঘোষ মহাশয়া একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

১৬ই ও ১৭ই ফাল্গুন, সন্ধ্যার পর শ্রীহট্টস্থ 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার উপস্থিতিতে দুইটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

উৎসবের শেষ দিবস ১৮ই ফাল্গুন, রবিবার প্রায় ছয় হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। সারাদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও ভজন-কীর্তনে উৎসবটি সুসম্পন্ন হয়।

ফরিদপুর (পূর্ব পাকিস্তান): গত ৮ই ফাল্গুন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় আশ্রমের সভাপতি অধ্যাপক শিশিরকুমার আচার্য উপস্থিত ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনদর্শন মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচনা করেন। তৎপর সমবেত সর্ব শ্রেণীর নরনারীমধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৬ই ফাল্গুন জন্মোৎসব উপলক্ষে যথারীতি ভজন, কীর্তন, রামায়ণ গান, বিশেষ পূজা ও হোম আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ২ ঘটিকায় সমবেত বহু নরনারীর উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভজন-সঙ্গীত শ্রীহরবিলাস সাহা কর্তৃক অতি সুললিত কণ্ঠে গীত হয়। তৎপর বেলা ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত আশ্রমে সমাগত সর্বশ্রেণীর ৮ সহস্রাধিক নরনারীর ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ এই উৎসবে বিশেষ সেবা-পরায়ণতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে।

আমেরিকায়

নিউ ইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার

গত ২২শে মার্চ ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেন, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনগণ যথাক্রমে প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ও যুক্তিবাদী, বর্তমানে তাহারা নিজ নিজ অতীতকে পরীক্ষা করিতেছে। সময় আসিতেছে, যখন সকল ধর্ম একটি কেন্দ্রে মিলিত হইবে।

পাশ্চাত্যের হিংসাভাব কমাইতে ভারত সাহায্য করিতে পারে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয় দর্শন ধার করিবার প্রয়োজন নাই। খৃষ্ট-ধর্মের বাইবেলেই হিংসা ধিক্কৃত হইয়াছে, যাহারা তরবারি ধরে তাহারা তরবারিতেই মরে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে নরেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে 'গৌর' বলিয়া সুপরিচিত নরেশচন্দ্র ঘোষ গত ১৬ই মার্চ, ৭৩ বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান বাগবাজার 'বলরাম-মন্দিরে'র সংলগ্ন থাকায় বাল্যকাল হইতেই শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃঃ বাগবাজার বসুপাড়ার যে বাটীতে স্বামী যোগানন্দ দেহরক্ষা করেন সেই বাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যেদিন মিসেস ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি শ্রীশ্রীমায়ের ফটোগ্রাফ তোলেন (যে ফোটো এখন ঘরে ঘরে পূজিত হয়) সেদিনই অতি অল্প বয়সে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল।

তিনি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং অভিনয়েও দক্ষ ছিলেন। প্রায় এক বৎসর কাল তিনি স্বামীজীর সেবা করেন, বিশেষতঃ স্বামীজী যখন শেষবার (১৯০২ খৃঃ) বেনারস ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন।

গৌরবাবু অকৃতদার ছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতেই বলরাম-মন্দিরে (৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে) বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল মধুর, তিনি বেলুড় মঠের প্রাচীন ও নবীন সাধুগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন. রোগশয্যায় শায়িত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আসিতেন। বেলুড় মঠের প্রাচীন মহারাজগণের সহিত সুপরিচিত এই ভক্তের নিকট মঠের অনেক পুরাতন কাহিনী শুনিয়া আমরা খুবই আনন্দ লাভ করিতাম, তাঁহার জীবনাবসানে উহার অভাব হইল। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বামীজীর জন্মবার্ষিকী

বিবেকানন্দ সোসাইটি ঃ কলিকাতা

গত ২৩।৩।৫৮ অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী তেজসানন্দের পৌরো-হিত্যে এক সভায় স্বামী পূর্ণানন্দ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

স্বামী পূর্ণানন্দ তাহার ভাষণে বলেন যে, স্বামীজী ছিলেন ত্যাগ ও সেবার প্রতিমূর্তি। তাহার এই ত্যাগ ও কল্যাণব্রত শাশ্বত মানব-প্রেমের প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের অন্তর্নিহিত সুদূরপ্রসারী কল্পধারা সাধারণ মানব-চিত্তে প্রবাহিত করিয়া শান্তির পথে ও কর্মের আদর্শে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই তাহার মহান আদর্শ দেশ ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া সার্বজনীনতার রূপ লইয়াছে।

স্বামী তেজসানন্দ সভাপতির ভাষণে ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন যে, যাহা সমাজ-জীবনে মানুষকে সামগ্রিকভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে তাহাই ধর্ম। স্বামীজী ধর্মের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই মানব-ধর্মে তাহার ছিল অবিচল নিষ্ঠা. তিনি আরও বলেন যে, শিব ও শক্তির সমন্বয় স্বামীজীর জীবনে হইয়াছিল বলিয়াই তিনি নিরলস কর্মী, ত্যাগী ও বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে, এই বীর সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রধান প্রেরণা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জন্মোৎসব

কৃষ্ণনগর ঃ নদীয়া

গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী মঙ্গলারতি, প্রসাদ-বিতরণ, সভা, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৫ই মার্চ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সাধারণ সভায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পর দিবস বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক বিরাট ধর্মসভায় আলোচনার বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ', প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীমৎ ধ্যানাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজী সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। এইদিন জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী পদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ হইতে সমাজের সকল স্তরের অগণিত নরনারী সভায় যোগদান করেন।

কাসুন্দিয়া ঃ হাওড়া

গত ২২শে মার্চ, হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী সভার উদ্বোধনের সময় স্বামী ওঁকারানন্দ বলেন ঃ বর্তমান সংশয় ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে জ্যোতির্ময় প্রতিবাদস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি ভারতের চিরসত্যের মূর্ত প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের এমন এক যুগসঙ্কটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে সময় মেকলে-প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেক নূতন ভাবসম্পদের অধিকারী করিয়াও ভারতের জীবনসত্যের মূলে আঘাত করিতেছিল। নগণ্য পল্লীগ্রামে দরিদ্র ঘরে জন্ম এবং কেতাদুরস্ত শিক্ষাকে অস্বীকার করা—শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে এই দুইটি ঘটনা অত্যন্ত অর্থবহ। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার মধ্য হইতেই ভারতের প্রাণপুরুষের জাগরণ। আধুনিক বস্তুবাদীরা ঈশ্বর ও ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রমাণসিদ্ধ নয় বলিয়া অস্বীকার করিতে চায়। স্বামী ওঁকারানন্দ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রমাণের পার্থক্য রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দুরূহ তত্ত্বকে যেমন অশিক্ষিতরা বুঝিতে পারে না, তেমনি অধ্যাত্মপথে কিছুমাত্র অগ্রসর না হইয়া কাহারও পক্ষে ইহার সত্যতা বোঝা কিভাবে সম্ভব? ধর্মের বাস্তবতা প্রমাণ করাই শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের মূল উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন এবং সেই ঈশ্বরের সেবারূপ যে মহামানবতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রতি বক্তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি স্বামী বোধাত্মানন্দ কল্যাণধর্মী বিবেকানন্দের স্বরূপ আলোচনা করেন, এবং স্বামীজীর জীবন পরবর্তীকালের ভাবুক মনীষী ও দেশনেতাদের জীবন কিভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করেন।

দুই দিনই সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। প্রথম দিন 'মায়ের মন্দিরের' সভ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন করেন।

সিদ্ধি ঃ বিহার

গত ১৫ই এবং ১৬ই মার্চ সহরপুরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে অপরাপর বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে দুই দিবস সায়াহ্নে সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে মহতী সভায় স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী অচিন্ত্যানন্দের সুললিত বক্তৃতায় সমাগত

সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়। এবারকার উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' বাণীচিত্র-প্রদর্শনী। এতদ্ব্যতীত প্রভাতফেরি, চণ্ডীপাঠ, ভজন, কীর্তনে সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণ উৎসব-মুখর হইয়া উঠে। শেষ দিবস আট শতাধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভদ্রেশ্বর : হুগলি

গত ৯ই মার্চ রবিবার উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে ষোড়শোপচারে পূজা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া ভজনসঙ্গীত সহযোগে পল্লী পরিক্রমা করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যা এবং শ্রীযশোদানন্দন দাস 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' পাঠ করেন। সন্ধ্যায় ভজনের পর চন্দননগর দেবীসংঘ কর্তৃক চণ্ডীকীর্তন হয়।

কলাইঘাটা : রাণাঘাট (নদীয়া)

গত ২৫শে ফাল্গুন রবিবার রাণাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব—শহর হইতে অনুমান দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চূর্ণী নদীর অপর পাড়ে কলাইঘাটায় প্রাচীন বট-বৃক্ষমূলে অনুষ্ঠিত হয়। কলাইঘাট ঠাকুরের একটি লীলাস্থল। ইহার চারিধারের পল্লীসমূহ হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নরনারীগণ দলে দলে এই উৎসবে যোগদান করেন। পল্লীবাসী ও রাণাঘাট সহরবাসীর মিলনে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। অনুমান তিন সহস্র নরনারী বৃক্ষমূলে বসিয়া পরিতোষপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ তিনটায় একটি ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ পৌরোহিত্য করেন, সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীবসন্ত কুমার পাল ঠাকুরের কলাইঘাটায় আগমন বিষয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর চৌধুরীর প্রাণস্পর্শী ভাষণের পর সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন।

চাকদহ : (নদীয়া)

গত ১৬ই মার্চ চাকদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকসংঘের প্রচেষ্টায় স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উক্ত তারিখে সমস্ত দিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী পালিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ-পূজান্তে সেবকসংঘের কর্মিগণ সমাগত প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করেন। বৈকালে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী জীবানন্দ মহারাজ ও সাহিত্যিক শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

দক্ষিণেশ্বর : স্বামী যোগানন্দ-জন্মোৎসব

গত ৯৩৫৮ রবিবার দক্ষিণেশ্বরে স্বামী যোগানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। উষায় মঙ্গল আরতির পর প্রাতে চণ্ডীপাঠ ও পূজা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দের প্রতিকৃতিসহ নগর-কীর্তনের পর মধ্যাহ্নে প্রায় ৬০০ শত ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ৪টায় স্বামী পুণ্যানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দের জীবন আলোচিত হয়।

ভাষা-সম্মেলন

গত ৮ই ও ৯ই মার্চ দুই দিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে জাতীয় ভাষা উন্নয়ন সমিতি এবং বঙ্গীয় ভাষা সম্মেলনের যুক্ত উদ্যোগে নিখিল ভারত ভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন ডক্টর রাধাবিনোদ পালের সভাপতিত্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীরাজগোপালাচারী ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে চালু রাখিবার যৌক্তিকতা বিবৃত করেন এবং বলেন, হিন্দী ভাষাকে জোর করিয়া সরকারী ভাষারূপে চালু

করিতে যাইলে জাতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিতে পারে। হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষা করিলে যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাহারা সবভারতীয় ক্ষেত্রে চাকরির ব্যাপারে অহিন্দী ভাষাভাষী অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবে। ভারতের যে সব রাজ্যের অধিবাসিগণের মাতৃভাষা হিন্দী, সে সব রাজ্যেও এখনও পর্যন্ত হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, আগে সেই সব রাজ্যে হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে চালু করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঐ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে তবেই হিন্দী ভাষা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সরকারী ভাষারূপে চালু হইবার উপযুক্ত হইবে।

মাষ্টার তারা সিংও আপাততঃ ইংরেজী ভাষার অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি ডক্টর পাল বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির সঠিক তথ্য হিন্দী ভাষায় মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে প্রচারিত হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে ভারতের অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনায় হিন্দী পুষ্টতর নয়। সাধারণ ভাষা না থাকিলে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠে না বলিয়া যে যুক্তি দেখান হইয়া থাকে, তাহা ঠিক নয়। বহু ভাষা জাতিকে বহুধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে—এই যুক্তিও ভিত্তিহীন। সুইটজারলণ্ডে অনেকগুলি ভাষার চল আছে, তাই বলিয়া সেখানে জাতীয় ঐক্য নাই, একথা কেহই বলিবেন না।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ রত্নস্বামী। তিনি বলেন, ইংরেজী প্রায় গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া শাসনকার্যের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টি হইতে ঐ ভাষাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে আগত ভারতের অহিন্দী ভাষা-ভাষী অঞ্চল সমূহের প্রায় দেড় শত প্রতিনিধি এই সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতেও ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

শস্য-ফলনের তুলনা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৯৫৮ খৃঃ প্রকাশিত খাদ্য ও কৃষি পরিসংখ্যানে (Year Book of Food and Agricultural Organisation of United Nations) জানা যায়—ভারতে জমির উৎপাদিকা শক্তি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কম, এবং উহা আরও কমিতেছে। উপযুক্ত জলসেচ-ব্যবস্থা ও পরিমিত গোময়-সারই ঐ শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। গোময়-সার যাহাতে পোড়ানো না হয় তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত জালানি, কয়লা কৃষকদের পক্ষে দুর্মূল্য, তাছাড়া পাঁচ লক্ষ গ্রামে উহা সরবরাহ করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক গ্রামে জালানি-কাঠের গাছ লাগানো প্রয়োজন, এবং গোময়-সার মাঠে পাঠানো উচিত।

১৯৫৪ খৃ. হেক্টেয়ার প্রতি কিলোগ্রাম ফলন

	গম	যব	ভুট্টা	ধান
ভারত	৮০০	৮৭০	৭১০	১২৬০
ডেনমার্ক	৩,৭০০			
ইওরোপ (গড়)	১,৬৭০			
জাপান		২৪৩০	২০০০	৪৮১০
আমেরিকা			২২৮০	
এশিয়া (গড়)				১৮২০

[*F A O.—United Nations* হইতে সংকলিত]

আমাদের শুভবুদ্ধি দাও

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

দৈবী সম্পদের কারণস্বরূপ—দেবগণের স্রষ্টা, ঐশ্বর্যবিধাতা, বিশ্বপতি ও বিশ্বপাতা, সর্বজ্ঞ রুদ্র, যিনি জগৎসৃষ্টির পূর্বে হিতকর ও রমণীয় হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন।

যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ হইয়াও বিচিত্র মায়াশক্তিবলে অজ্ঞাত প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রারম্ভে অনেক প্রকার বর্ণ জাতি বা পদার্থ বিধান করেন, প্রলয়কালে যাঁহাতে বিশ্ব বিলীন হয় এবং স্থিতিকালেও জগৎ যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনি প্রকাশস্বভাব স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মা। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন।

ভোগপরায়ণ ভেদপরায়ণ অসুর-শক্তির প্রাবল্যে মানুষের বুদ্ধি আজ বিপথে পরিচালিত; চারিদিকে অশান্তি ও স্বার্থদ্বন্দ্ব, অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধি আজ মোহাচ্ছন্ন। কল্যাণের পথ কই?

শুভবুদ্ধিই সর্ববিধ কল্যাণের প্রসূতি। শুভ বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইতে পারিলেই মানুষ নিজের ও সকলের কল্যাণ করিতে সমর্থ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে

সমাজবাদ, না সমাজবোধ ?

এ পর্যন্ত সমাজবাদই (Socialism) বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা সক্রিয় আদর্শ—যাহা মানুষের মনকে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত করিয়াছে। উনবিংশতাব্দীর 'মানবতাবাদ'ই (Humanism) ধীরে ধীরে সমাজবাদে ব্যাপক হইতেছে—যদিও দেশে দেশে এই রূপান্তরের পার্থক্য লক্ষিত হয়—এবং ইহার ধারণাও জনে জনে পৃথক্।

'সমাজবাদ' কথাটি সুন্দর, এবং ইহার মধ্যে কল্যাণের বীজ নিহিত। সমাজবাদী সমাজে উচ্চ নীচ ভেদ নাই, স্ব স্ব স্থানে কর্মানুযায়ী প্রত্যেকেই অতি প্রয়োজনীয়। নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই সমাজের সেবা করিবে এবং সমাজও প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত অভাব মিটাইবে। 'আছে' ও 'নেই'-এর সংগ্রাম তিরোহিত হইবে, সর্বকল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনী-দরিদ্র, শিল্পপতি-শ্রমিক, শাসক-শাসিত প্রভৃতি ভেদবোধহীন রাষ্ট্র গঠনই সমাজবাদীর স্বপ্ন।

গণতন্ত্রও একদিন এই স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে দেখা গেল—গণতন্ত্রে জনগণ দলীয় রাজনীতির হাতে পুতুল মাত্র। 'আমেরিকা পাঁচ বৎসরে একবার স্বাধীনতা ভোগ করে'—অর্থাৎ ভোট-যুদ্ধে মত্ত হয়—ইহা আমেরিকানদেরই কথা। গণতন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সেও আজ পর্যন্ত মনোমত সরকার গঠিত হইল না। প্রাচীনকালে সর্বত্রই, বিশেষত ভারতে—সমাজে প্রতিযোগিতা দূর করিয়া সহযোগিতা ও কর্ম-বিভাগের আদর্শে জাতি-প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহা বহুদিন সমাজের শান্তি রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ ইহা বহুনিন্দিত।

প্রত্যেক আদর্শ ই প্রথম আবির্ভাবের সময় মানুষকে আশার আলোয় মুগ্ধ করে এবং স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিছু দিন পরে উহা একটি প্রথায় পরিণত হইয়া মানুষের অগ্রগতির বাধা সৃষ্টি করে, তখন আবার নূতন এক আদর্শ নূতন আশার বাণী লইয়া মানবচিত্ত অধিকার করে।

বর্তমানে চলিতেছে সমাজবাদের যুগ, পূর্বে পশ্চিমে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—এখন মানুষ এই ছাঁচে সমাজ গঠন করিতে আগ্রহশীল, ভারতেও তাহার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু অগ্রগতির পথ অনুসরণের পথ হইলেও অনুকরণের পথ নয়। চোখ বুজিয়া এ পথ চলা যায় না। চোখ চাহিয়াই আমাদের পথটুকু আমাদেরই চলিতে হইবে, কখনও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন, কখনও প্রয়োজন পরীক্ষা, কখনও নিরীক্ষা। চোখ চাহিয়া চলিলে কখনও পথের কণ্টক কঙ্কর হইতে, কখনও সংঘর্ষ পতন বা আরও ভয়াবহ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

বিঘোষিত হইয়াছে, ভারতের আদর্শ—সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র। সমাজবাদী নানা শ্লোগানে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত, তথাপি বিবিধ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের সংখ্যা বাড়িতেছে, তদপেক্ষা ক্ষতিকর—সমাজ-বিরোধী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কেন এরূপ হইতেছে, এখনই ইহার মীমাংসা প্রয়োজন, কারণ বিষক্রিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিলে পর তখন আর চিকিৎসায় কি হইবে ?

সম্প্রতি আমরা ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণেই সচকিত হইয়াছি, উহা সমাজের মাত্র একটি স্তরের ঘটনা, দেশের ও সমাজের প্রত্যেক স্তরে

আত্ম সংযম ও শৃঙ্খলার অভাব। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ধনলিপ্সা নানা দুর্নীতির আশ্রয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থে ও ক্ষমতা-লিপ্সায় মত্ত ব্যক্তি-গণ দেশের ও জনগণের কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া অসঙ্গত আচরণে, পরস্পর গালিগালাজে ও কর্তব্য-অবহেলায় নিমগ্ন। পথে ঘাটে সর্বত্র প্রত্যেকে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত,—অপরের জীবনের মূল্যও কেহ বুঝিতে চায় না,—'যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সব জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে—শুধু মানুষের জীবনের মূল্যই কমিতেছে' —ইহা অপেক্ষা মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তি আর কি হইতে পারে? আসন্ন অথবা সমাগত সমাজ-তান্ত্রিক যুগের পূর্বাভাসেই কেন এই বিশ্বব্যাপী অসামাজিক মনোভাব? ইহা কি অরুণোদয়ের পূর্বে রাত্রির শেষ অন্ধকার? না পতনের পূর্বে বিরাট খাদের ভয়াল মুখব্যাদান? নিশ্চিন্ত অগ্রগতি স্তব্ধ করিয়া আজ একান্ত চিন্তা প্রয়োজন—এই সমাজবাদী আদর্শ কি নির্ভুল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, না—কোথাও ইহার কোন ত্রুটি, কোন অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে?

যদি অসম্পূর্ণতা না থাকিবে তো—সমাজ-বাদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবোধ—সামাজিক সুরুচি ও সৌজন্য, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি কমিতেছে কেন?

'সমাজবোধ' ব্যক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে না, ব্যক্তির মর্যাদার ভিত্তির উপরই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তির বিকাশেই সমাজ পূর্ণ বিকশিত, যেন একটি নানাপুষ্প-সুশোভিত উদ্যান। ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া,ব্যক্তিকে বলি দিয়া দলগত ভাবের প্রেরণায় যে সমাজের উদ্ভব তাহা জঙ্গলের বৃক্ষসম্ভার, যোগফলে তাহা যতই ভারী হউক না কেন তাহা কৃষ্টি বা কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। প্রতিটি মানুষ যদি সুখী, শান্ত, সংযত, সন্তুষ্ট হয়—তবে সমাজে অবশ্যই ঐ সকল গুণ স্বতই সঞ্চারিত হইবে। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব?

রাজনীতি সংখ্যাধিক্য লইয়াই প্রমত্ত, সমাজ-নীতিও সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের যতটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের (Greatest good for the greatest number) ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত; তাহার জন্য কিছু লোককে অনিচ্ছায় বা রাষ্ট্রের ইচ্ছায় বঞ্চিত হইতে হইবে। সকলের জন্য একটি উচ্চতম আদর্শের সন্ধান—যাহা সকলকে সুখ দিবে, আনন্দ দিবে, মানুষের নিজস্ব মূল্য বোধে তাহাকে গৌরবান্বিত করিবে, এরূপ কোন আদর্শের সন্ধান—এ স্তরে নিষ্ফল। তাহার জন্য মানুষকে আরও একটু উঠিতে হইবে—সেইখানেই তাহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, সেখানেই তাহার প্রকৃত পরিচয়। শরীরের ক্ষুধা মিটিলেই মানুষ তৃপ্ত হয় না, সে চায় স্নেহ-ভালবাসা। মনের একটি আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইলে—শত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। মানুষের প্রকৃত স্ফূর্তি—'হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোন খানে।'

* * *

সে দূরের কথা, এখন যাহা চলিয়াছে—হয়তো এখন এইরূপই চলিবে—যতদিন না উন্নত-তর শক্তির অনুশীলন দ্বারা মানুষ উচ্চস্তরে উঠিতে পারে, ততদিন রাজনীতি ও অর্থনীতিই মানুষের সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-জীবন, সবই নিয়ন্ত্রণ করিবে, তাহার ফল ভালই হউক, আর মন্দই হউক।

বর্তমানে প্রায় সব দেশেই দেখা যায়—প্রভাবশীল রাজনীতিক দলের সমর্থন ব্যতীত কিছুই সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ঠিক করিয়া দেয়, বৈজ্ঞানিক কি গবেষণা করিবেন, সাহিত্যের মানদণ্ড এবং পুরস্কারও তাঁহাদেরই হাতে, কোন্ দেশ আমাদের শত্রু, কোন্ দেশ মিত্র—তাহাও নির্ভর করিবে—সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের

উপর। আমাদের ভারতেও ভাষা, শিক্ষা, সেবা, শিল্প, নৃত্যগীত, খেলাধূলাও নির্ভর করিতেছে রাষ্ট্রশক্তির উপর। একদা ছিল ধর্মশক্তি, পরে আসিল সৈন্যশক্তি, এখন প্রজাশক্তির দিন আসিয়াছে। ধর্মশক্তি এখন সাম্প্রদায়িকতার অপবাদে রাষ্ট্রনীতি হইতে নির্বাসিত, সৈন্যশক্তিও আজ অন্তরালে অন্তর্হিত, প্রজাশক্তি ভোট দিয়াই নিশ্চিন্ত—কারণ জনগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত।

মানুষই একদিন কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছিল—নিজের ও পরিবারবর্গের সুখ শান্তি সম্পদ ও নিরাপত্তার জন্য। 'কর্তব্য' 'প্রেম' প্রভৃতি কত উচ্চতর ভাব-সমন্বিত কথার সৃষ্টি হইল—বন্ধনহীন অসভ্য মানুষ সমাজবন্ধন স্বীকার করিয়া সভ্য সংযত হইল—তারপর দেখা দিল কত কৃষ্টি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি। এই মানুষই ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র (City states) সৃষ্টি করিয়া যে শাসনযন্ত্র চালু করিয়াছিল—আজ তাহারই গতি ও পরিণতি বিশ্বরাষ্ট্র-সংগঠনের অভিমুখে। প্রয়োজনের খাতিরেই—জিজীবিষার জন্যই পরস্পর বৈরভাব বিদূরিত হইবে, এবং হয়তো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U N O) একদিন বিশ্বরাষ্ট্র (World Government) স্থাপনে সফল হইবে।

কিন্তু তাহার পূর্বে প্রয়োজন ব্যক্তির মূল্য-স্বীকৃতি এবং নবতর সমাজবোধ বা অধ্যাত্ম চেতনার জাগরণ। হিরোশিমায় মাত্র দুই লক্ষ মানুষ মরে নাই—মরিয়াছে মানবজাতির বিবেক। 'যুদ্ধ থামাইবার জন্য যুদ্ধ চাই'—যুক্তির এই বিষচক্রই (vicious circle) আজ মানুষের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। সমাজবাদের এত প্রচার সত্ত্বেও সমাজবোধ বিলুপ্ত হইতেছে। এক দল মানুষ আজ পশুর মতো শুধু আশ্রয় ও খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরিতেছে, আর একদল বিবেকহীন মানুষ সকল ভোগ্য পদার্থ নিজে ভোগ করিবার জন্য স্বভাবের বশে অপরকে তাড়া দিতেছে। উচ্চতর আদর্শের অভাবই ইহার মূল কারণ।

অন্যান্য ব্যাপক দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের আলোচনা করিব না,তবে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা—ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ব্যথিত হইয়া 'শনিবরের চিঠি' চৈত্র সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

'আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাই কোন না কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীর দল কারণে অকারণে ক্ষিপ্ত হইয়া শুধু বিদ্যালয়ে বা পরীক্ষার হলে নয়, পথেঘাটে অর্থাৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কবিতেছে। .

'ষ্টেট সেকুলার হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু পাছে ছেলেমেয়েরা ধর্ম শিখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সাধারণ নীতিশিক্ষা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত বাখাব ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। . .

'একেবারে ধর্মের জড় মারিয়া মানুষকে উচ্চাদর্শে গঠিত করা যায় না, এই চিরন্তন সত্যটাও যেন তাঁহারা [রাষ্ট্র ও সমাজ নায়কগণ] স্মরণে রাখেন।'

'ধর্ম' কথাটি শুনিলেই যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার ভূত দেখেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন অজ্ঞতাজনিত ঐ ভূত তাঁহাদের মনেই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম এক মহাশক্তি যাহা মানুষের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যাহা পশু-মানবকে আজ সামাজিক মানবে পরিণত করিতেছে এবং এই ধর্মেরই উন্নততর সংস্করণ 'আধ্যাত্মিকতা' তাহাকে দেব-মানবে পরিণত করিবে। সমাজের নিজস্ব সার্থকতা নাই, সমাজেরও উদ্দেশ্য মানুষকে সমাজের ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছাইয়া দেওয়া—সেই অবস্থাতেই মানুষ দেশকালের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবে পরিণত হইয়া যথার্থ উদারতার আধার হইয়া যায়।

এইরূপ মানবসমাজেই উচ্চতম সত্য কার্যে পরিণত হইতে পারে।

এই আধ্যাত্মিক চেতনাই মানবকে দেহ মনের উর্ধ্বে আত্মার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়—যখন মানুষ অনুভব করে সকলেরই মধ্যে এক আত্মা বিরাজমান, তখনই সে জাতি দেশ অতিক্রম করিয়া সকলকে অতি আপনার বলিয়া ভাবিতে ও ভালবাসিতে পারে, এইখানেই যথার্থ সমাজ-বোধের সূত্রপাত। 'সকলেতে আমি আমাতে সকল'—এই বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত নূতনতর সমাজবাদ।

বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ মানবের কল্যাণকর না হইয়া আজ তাহাকে দ্বন্দ্ব-দ্বেষের সংঘাতে, অকল্যাণের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরাইতেছে। বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ ভোগসাম্যের সুদূর ও মধুর প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহা দিগ্‌বলয়ের মতো ক্রমশই দূরে সরিয়া যাইতেছে, তাই আজ প্রয়োজন এক নূতনতর সমাজবাদ, যাহার সাম্য মানবমাত্রের স্বরূপে—তাহার আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। দূরে নয়, ভবিষ্যতে নয়, 'এখনই এখানে তাহা অনুভব কর'—ইহাই আত্মবিজ্ঞানের বাণী। এই মহা সাম্যের অনুভূতি মানুষকে স্বার্থপর ভোগ-মুখী না করিয়া করিবে ত্যাগমুখী ও সেবাপরায়ণ। সে তখন সকলের মধ্যে নিজেরই আত্মাকে বোধ করিবে, প্রত্যেকের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবে। শুধু নিজ পরিবারে নয়, সমগ্র সমাজে সে নিজেকে বিস্তৃত দেখিবে, ইহাই সমাজ-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদ।

এই অবস্থায় ইহা আর মতবাদ মাত্র থাকিবে না, যুক্তি-তর্কের বিষয় থাকিবে না, নির্বাচনী ইস্তাহারের খোরাক জোগাইবে না, জাগাইবে হৃদয়ানুভূতির উৎস হইতে কল্যাণ-কর্মপ্রেরণা। মানবপ্রেমে আত্মহারা, নীরব নিরলস কর্মিবৃন্দ সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাদের নিজনিজ জীবন সফল করিবে এবং মানব-সাধারণকে উচ্চতর ভূমিতে উন্নয়নের চেষ্টায় প্রাণপাত করিবে।

* * *

পাশ্চাত্য শক্তি-সাধনার মূলে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, জড়জগৎ মন্থন করিয়া মানুষ শুধু জানিয়াছে, 'কি এবং কেমন করিয়া?' আরও একটু জানিয়াছে, 'কোথায় এবং কখন?' বিজ্ঞানের সাধনায় আজ দেশ-কাল, পদার্থের স্বরূপ ও রূপান্তর-পদ্ধতি পর্যন্ত বিজ্ঞাত। কিন্তু ততঃ কিম্?

তারপর প্রশ্ন—'কে এই সকল করিয়াছে?' বৈজ্ঞানিক আজ বলিতেছেন, 'Universe is more a great thought than a great machine, and its author is more a mathematician than a mechanic'—সার জেম্‌স্ জীন্‌স্ এ কথা বলিয়াছেন: 'একটা বৃহৎ যন্ত্র অপেক্ষা একটা বিরাট চিন্তার মতই এই বিশ্ব জগৎ, এবং ইহার কর্তা কারিগর অপেক্ষা একজন গণিতজ্ঞ!' এই চিন্তার ক্রমবিকাশেই একদিন পাশ্চাত্য মনীষা বুঝিবে—ইহার কর্তা কবি, শিল্পী, সাধক—চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ!

এখনও প্রশ্ন থাকিয়া যায়—'কেন?' এ প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গেই যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহারই নাম 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'। প্রাচ্য মনীষা এই খানেই স্বমহিমায় বিরাজিত। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের তোরণে দাঁড়াইয়া ভারতের ঋষি যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া শুনাইয়াছেন: 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—আমি দেখিয়াছি অন্ধকারের পারে সেই মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষকে, আমি উদ্‌ঘাটন করিয়াছি বিশ্বরহস্য, আমি জানিয়াছি জীবনের উদ্দেশ্য কি, জানিয়াছি প্রতিটি জীবনের সার্থকতা কিসে, পরম পুরুষার্থ কোথায়!

দিশাহারা পাশ্চাত্য জীবনে ও চিন্তাধারায় আজ বিপর্যয় আসিয়াছে,—রাজনীতিক সাম্যের বুলি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, বিজ্ঞানের এত ব্যবহার মানুষের দুঃখ বাড়াইয়াই তুলিতেছে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যর্থ আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরাও ব্যর্থতারই পুনরভিনয় করিব ? না—আমাদের ঐতিহ্য-লব্ধ অভিজ্ঞতা যথাসময়ে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আসন্ন সংকট হইতে মুক্ত করিব, এবং আমাদের জীবনদর্শন দ্বারা বর্তমান সমস্যার সমাধান করিব ?

কি আমাদের সেই অভিজ্ঞতা, সেই জীবন দর্শন ? সে ঐ শেষ প্রশ্নের, 'কেন ?'-প্রশ্নের উত্তর। কেন এই বিশ্বজগৎ, কেন এই মানবজীবন, কেন এই সমাজ-সংসার ? কাব্যে, দর্শনে, শাস্ত্র-রচনায় ভারত বারংবার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে—উত্তর দিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া তাহার সাধুসন্তের মুখে মুখে: মানুষ ক্রম-বিকশিত পশু নয়, মানুষের অন্তরে দেবতাই অন্তর্নিহিত। সেই দেবতাকে জাগ্রত করাই জীবন-সাধনা। অসীম সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, আবার অসীমে যাইতে চাহিতেছে—তাহাতেই তাহার সার্থকতা।

ভারতের এই অন্তর্মুখী জীবন-দর্শনের বাণীই আজ ধ্বংসোন্মুখ মানবের মুক্তি আনিতে পারে, তাহার বিচ্ছিন্ন বিবদমান সমাজে সংহতি ও সামঞ্জস্য আনিতে পারে—যাহার অপর নাম শান্তি ও সার্থকতা, যে শান্তি শ্মশানের বা কবরের শান্তি নয়।

সার্থকতা-লাভের এই সাধনার মূলে রহিয়াছে এই গভীর চেতনা—যে প্রতিটি মানুষ পৃথক্ হইলেও স্বরূপত সকলে এক, সকলের চরম উদ্দেশ্য এক : সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি বা মানবতার মধ্যে দেবত্বের অভিব্যক্তি। এই টুকু স্বীকার করিয়া সকল কাজে কর্মে কথায় বার্তায় অগ্রসর হইলে দ্বেষ ও হিংসার পরিবর্তে দেখা দিবে প্রেম ও সহানুভূতি, সংশয় অবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিবে পরস্পর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। এই বোধের উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই যথার্থ সাম্য ও শান্তির আধার, তাহারই আশ্রয়ে এ যুগের উত্তরাধিকারী পরবর্তী মানব-সমাজ সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনায় অগ্রসর হইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন সার্থক করিতে পারে।

সকল ধর্মের মিলন-ভূমি*

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

ইংরেজী 'রিলিজন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ নির্দিষ্ট নীতি বা নিয়মের বন্ধনে প্রত্যাবর্তন। এই অর্থ 'ধর্ম' কথাটির ভাব প্রকাশ করে না। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম শব্দ ধৃ-ধাতু নিষ্পন্ন, 'ধারণাদ্ ধর্ম উচ্যতে' বা ধরতি বিশ্বম্ ইতি ধর্মঃ' ইহার অর্থ ধর্ম বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। ইংরেজীতে 'ধর্ম' শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ না থাকায় 'রিলিজন' কথাটিই ব্যবহার করিতে হয়, ইহারও অর্থ বিস্তারিত করিলে দেখা যায় ইহা বিশ্বের ধারক শক্তি। 'ধর্ম' শব্দের একমাত্র অর্থ—Truth বা 'সত্য', কারণ সত্যই বিশ্বজগৎ ধরিয়া রহিয়াছে। সত্য হইতেই ইহার উদ্ভব, সত্যেই ইহা বর্তমান, সত্যেই ইহা বিলীন হয়।

দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে ধর্মের দুই প্রকার সংজ্ঞা সম্ভব। প্রথমতঃ পূর্ববর্ণিতরূপে ধর্মই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার একটি উপায়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম সত্য-রূপ লক্ষ্য লাভ করিবার উপায় বা পথ। মহর্ষি কণাদ ধর্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ সঃ ধর্মঃ'—যাহা হইতে সাংসারিক উন্নতি, জ্ঞান-মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক শান্তি বা চরম উদ্দেশ্যলাভ হয়, তাহাই ধর্ম। অপরে

* গত বৎসর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুক্তরাজ্যের (U K) হাইকমিশনার, স্থানীয় অর্থসচিব ও খাদ্য-সচিব প্রভৃতির উপস্থিতিতে ঢাকা বোর্ড হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারানুবাদ।

বলিয়াছেন : 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ স ধর্মঃ সম্প্রকীর্তিতঃ'—যে দেশে যে আচার প্রচলিত তাই ধর্ম। ভারতে ঋষি-রচিত সাধুসন্ত-নির্দেশিত রীতিনীতির লক্ষ্য জীবনে পরমশ্রেয়োলাভ। আচরণের নিয়মাবলী যেহেতু উদ্দেশ্যলাভের উপায়স্বরূপ, অতএব এগুলিও ধর্ম।

ধর্ম গোঁড়ামিতে নাই, কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানে, রীতিনীতি-বিশ্বাসে যুক্তি বা তর্কেও নাই, ধর্ম অনুভূতি এবং জীবনের রূপায়ণ, ধর্ম আছে সাধনায়—সিদ্ধিতে। জীবনের উদ্দেশ্য সত্যকে জানা—কর্ম বা উপাসনার দ্বারা, ভক্তি বা বিচারের দ্বারা, ধ্যান ও ধারণার দ্বারা, ইহাদের যে কোন একটির দ্বারা বা সবগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনের দ্বারা। আমরা পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ, আমাদের উদ্দেশ্য নিজ নিজ অসীম বিস্তার সাধন করিয়া অসীমকে উপলব্ধি করা।

এই দৃষ্টি হইতে ধর্ম উদ্দেশ্যলাভের উপায়। কেন্দ্র একটি বৃত্তের বা বহু সমকেন্দ্রিক বৃত্তের কারণ। পরিধি হইতে কেন্দ্রে পঁহুছিবার অসংখ্য ব্যাসার্ধ আছে। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সকলের কেন্দ্র বা কারণ। লক্ষ্য এক, তাহাতে পঁহুছিবার উপায় অসংখ্য।

এক দিক দিয়া বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যগুলি খুবই বড় দেখায়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃত রহস্য ভেদ করিয়া অসীম বৈচিত্র্যে একত্ব ধরিয়া ফেলে এবং নানাত্ব বিলুপ্ত হয়। দৃশ্যমান জগতে জীবনের সকল স্তরেই সীমাহীন বৈচিত্র্য চোখে পড়ে, কিন্তু বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করিলেই প্রকৃত পটভূমিকা ধরা দেয় এবং তখন বোঝা যায়—এক কি করিয়া বহু হইল।

জড় জগৎ সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় সকল পদার্থের একত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে এক সত্যই প্রতীয়মান নানা পদার্থের পিছনে থাকিয়া বিশ্বমানবকে চমকিত করিতেছে। জগতে অসংখ্য বৈচিত্র্যের কারণ দেখাইয়া বেদান্ত বলিতেছে, 'নাম-রূপই' সৃষ্টির জন্য দায়ী। জগৎ হইতে নাম-রূপ তুলিয়া লও, দেখিবে পার্থক্য মিলাইয়া গিয়াছে, সকল বৈচিত্র্যের একটি সাধারণ ভিত্তি—যাহা তাহাদের মিলনভূমি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ : লোহিত সাগর, পীত সাগর, প্রশান্ত, অতলান্ত, উত্তর মহাসাগরের এবং বিভিন্ন নদী হ্রদ, কূপ, তড়াগের—এমনকি নর্দমার জল লইয়া দেখ, তাহারা প্রত্যেকে কত পৃথক্। আবার একই জল—কঠিন বরফরূপে, স্বাভাবিক তরলরূপে, আবার বাষ্পরূপে পরস্পর কতই না বিভিন্ন, কিন্তু যখন ঐ সকল জলের এক বিন্দু রাসায়নিক ভাবে, বিশ্লেষণ করা যায়—তখন দুই অংশ উদজানের সহিত এক অংশ অম্লজান পাওয়া যাইবে। অতএব সকল প্রকার জলের একই ভিত্তি H_2O আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা গঙ্গা, জর্ডন বা জিম্‌-জিমের একবিন্দু পবিত্র জলের সহিত নর্দমার জলের কি ভয়ানক পার্থক্য করিয়া থাকি, কিন্তু বিশ্লেষণের পর আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হই, সকলই সেই—H_2O (দুই ভাগ উদজান ও এক ভাগ অম্লজান)। অতএব পার্থক্য 'নাম-রূপে'—বাক্যের প্রকাশ-ভঙ্গিতে, স্বরূপে নহে।

অতএব কালে আমরা বুঝিতে পারি বিশ্বের পরম সত্তা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও—যথা প্লেটোর 'গড্', স্পিনোজার 'সৎ' (Good) বা 'সাবষ্ট্যান্সিয়া'—হার্বার্ট স্পেন্সারের 'অজ্ঞেয়' এমার্সনের 'পরমাত্মা' (Oversoul), কাণ্টের সর্বাতীত স্বরূপ (Transcendental Thing in Itself)—সবই সেই এক—যিনি সর্বাতীত, সর্বানুস্যূত এবং সর্বত্র স্থিত, যিনি আমাদের আত্মার আত্মা, জীবনের জীবন তিনি এক ও অদ্বিতীয়। জলকে আরবীয়েরা 'অব', ভারতবাসীরা 'জল', গ্রীকরা 'অ্যাকোয়া'—মুসলমানরা 'পানি' এবং খৃষ্টানরা (ইংরেজ) 'ওয়াটার' বলিলেও—জল সেই একই পদার্থ, যে কেহ উহা যে কোন নামেই পান করুক না কেন—তাহার তৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

তাছাড়া—এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা একজনই, বহু হইতে পারে না। বেদান্তবাদীর 'ব্রহ্ম', জৈনদের 'জিন', ইহুদীদের 'জিহোবা', জোরোয়াষ্ট্রীয়ানদের 'আহুর মাজদা', মুসলমানদের 'বিসমিল্লা', খৃষ্টানদের 'গড্'—এক অদ্বিতীয় সত্তার বিভিন্ন নাম ও উপাধি। তাঁহার এই সব নামের মধ্যে যে কোন একটি লইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, সাধকের আধ্যাত্মিক পিপাসা চিরতরে নিবারিত হইবে। যদি এগুলি সব পৃথক্ হইত —তবে সৃষ্টিতেই একটি প্রতিযোগিতা চলিত, কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র সৃষ্টিতে এক বিস্ময়কর ঐক্য বর্তমান। একজন মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তাহার জাতি বা দেশ যাহাই হউক না কেন—তাহার দুই হাত, দুই পা, ইহার কমও নয়, বেশীও নয়। জলবায়ুর পার্থক্য সত্ত্বেও একটি আম গাছ যেখানেই বাড়িয়া উঠুক না কেন তাহাতে আমই ফলিবে, অন্য কিছু নয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম যথা—খৃষ্টান, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রত্যেকটি ধর্মের তিনটি অংশ: প্রথম দার্শনিক, দ্বিতীয় পৌরাণিক, তৃতীয় আনুষ্ঠানিক। দর্শন প্রত্যেক ধর্মের মূল নীতিগুলি উপস্থাপন করে, সেই দৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব সকলে বুঝে না, ইহা অতিশয় মেধাবী ব্যক্তিগণের জন্য এবং সাধারণের বোধশক্তির বাহিরে। অতএব বিখ্যাত সাধু মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনার ভিতর দিয়া দর্শনের কঠিন তত্ত্ব প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। পুরাণই দর্শনের ভাবমূলক তত্ত্বে পঁহুছিবার সহজতর পথ।

কোন সমাজ বা সম্প্রদায় শুধু মাত্র উচ্চ মেধাসম্পন্ন বা শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়াই গঠিত নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত এক বিরাট জনসংহতি আছে—যাহারা একেবারে নিরক্ষর। তাহাদের কি হইবে, তাহাদের ধর্ম কি? নিরক্ষর বলিয়া কি তাহারা ধর্ম ছাড়াই চলিবে? তাই প্রত্যেক ধর্মেই ঐ আনুষ্ঠানিক বিভাগটি দেখা যায়। এই বিভাগে সাধারণ মানুষের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের জন্য নানা আচার অনুষ্ঠান চালু করা হইয়াছে। যাহাতে তাহারাও ধার্মিক হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই চায়—উচ্চতম হইতে নিম্নতম প্রতিটি ব্যক্তিই ঐ ধর্ম-প্রবর্তিত নীতি ও আচারের মধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকুক।

যখন এই অনুষ্ঠানের দিক হইতে আমরা বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তাকাই—তখন দেখি পরস্পরের মধ্যে কি বিস্তীর্ণ ব্যবধান। যখন ক্রমশ উচ্চস্তরে উঠি—আনুষ্ঠানিক হইতে পৌরাণিক স্তরে, আবার পৌরাণিক হইতে দার্শনিক স্তরে—তখন দেখি, পার্থক্যগুলি মিলাইয়া গিয়াছে—শূন্যে বিলীন হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক বিভাগেও দেখা যায় এক আশ্চর্য মিলনভূমি—যদি আমরা অসংখ্য আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া—তাহাদের পটভূমিকায় অবস্থিত সত্যকে দেখিবার চেষ্টা করি। ধর্ম-জীবনে প্রবর্তক ও সাধকের জন্য কোন না কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন, ইহা নিঃসন্দেহ।

এই বিভাগের পার্থক্যও মিলাইয়া যায়—যদি আমরা নিজেদের মধ্যে এই ভাবে মনন করি: জিমজিমের জল যেমন মুসলমানদের নিকট পবিত্র, জর্ডনের জল যেমন খৃষ্টানদের নিকট পবিত্র—গঙ্গা ও যমুনার জল তেমনই হিন্দুদের নিকট পবিত্র। চন্দ্রকলা যেমন মুসলমানদের চক্ষে পবিত্র—ক্রুশ যেমন খৃষ্টানদের চক্ষে পবিত্র—তেমনি স্বস্তিকা, প্রতিমা প্রভৃতি সহায়ক বহুতর প্রতীক হিন্দুদের চক্ষে পবিত্র। যেমন মসজিদ মুসলমানদের, গীর্জা খৃষ্টানদের, প্যাগোডা বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র—তেমনি মন্দির ও দেবালয় হিন্দুদের নিকট পবিত্র।

যদি বিশ্ববাসী এই যুক্তি অনুযায়ী বিচার করে তাহারা শীঘ্রই বুঝিবে, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দিকে যাইতে, জীবনের শ্রেষ্ঠবস্তু প্রাপ্তির জন্য উদ্দেশ্যলাভের উপায় রূপে ধর্মে ধর্মে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, জ্ঞানীরা তাহাকে বহু নামে অভিহিত করেন। এই ভাবেই বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও মতবাদের বিভিন্নতা বিলীন করিয়া বিশ্ববাসী পরস্পরকে ভাই বলিয়া দেখিতে পারে, প্রত্যেকে মনে করিতে পারে—সকলের সহিত আমার রক্তের সম্পর্ক, সকলেই আমার আধ্যাত্মিক স্বজন—আমার আত্মীয়।

নব্যভারত ও বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আত্মার পরম তৃষা নিবারিত হবে কিসে? অনন্তের জন্যে অন্তরের গভীরে এই যে নিরন্তর কান্না—এ কান্নার অবসান কোথায়? কামিনী দিয়ে, কাঞ্চন দিয়ে, মুগ্ধ জনতার করতালি দিয়ে, খ্যাতির পশরা দিয়ে—কোন কিছু দিয়েই শূন্য হৃদয় পূর্ণ হবার নয়। 'হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়' —ভোগবাদের এই শূন্যগর্ভ ফিলজফি তো কোন দিনই মুক্তির মন্দির দ্বারে পৌঁছে দেবে না। ক'দিন ভোগ করবো? সামনে জলছে চিতার আগুন: জীর্ণ হয়ে যাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ। শ্মশানকে সামনে রেখে বাসরঘরের ফুলশয্যায় আনন্দ কোথায়?

যুগে যুগে নচিকেতার সগোত্রেরা তাই প্রলোভনের সামনে বলেছে: দরকার নেই সুদীর্ঘ পরমায়ুতে, দরকার নেই শতায়ু পুত্র-পৌত্রে, দরকার নেই সসাগরা ধরণীর সম্রাট্ হয়ে, দরকার নেই সুন্দরী নারীতে। দরকার অন্ধকারের পারে সেই আদিত্যবর্ণ পরমপুরুষকে, যাঁকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, যাঁকে পেলে ইহলোকে পরলোকে আর কিছুই চাইবার থাকে না।

রোমা রলাঁ স্বামীজীর জীবনচরিতে তাই লিখেছেন: With both science and religion the original impulse is the same, and so too is the end to be achieved—Freedom বিজ্ঞান আর ধর্ম দুইয়েরই পিছনে মুক্তির প্রেরণা। বিজ্ঞান বলে, জানব সত্যকে। সত্যকে জানতে গিয়ে যদি সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হয় তাতেও স্বীকার। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!' ধর্মেরও একই কথা—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' ধর্মের পথে যে পা বাড়িয়েছে সে তো কলম্বাসেরই সগোত্র, মৃত্যুকে অতিক্রম করবার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। রলাঁর অনুপম ভাষায়: He must get out of the grave-yard, out of the circle of tombs, away from the crematorium He must win freedom or die and better to die, if need arises, for freedom —মৃত্যুকে অতিক্রম করতেই হবে। হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু—দুয়ের একটি। আর দরকার হলে মুক্তির জন্যে মরণই শ্রেয়ঃ।

যে-উপাদানে নচিকেতা তৈরী হয়েছিলেন সেই উপাদানেই বিবেকানন্দেরও সৃষ্টি। হোমা পাখীর বাচ্চা মাটিতে পড়বার আগেই আকাশের অসীম মুক্তির মধ্যে মেলে দিল তার জোরালো ডানা দুটি। বিবেকানন্দের মতো পুরুষসিংহেরা কি মৃত্যুকে ভুলে থাকবার জন্যে কখনো ক্ষণিকের সুখ কামনা করতে পারেন? জয় করতে হবে মৃত্যুকে, ভেদ করতে হবে তার রহস্য, ছিন্ন করতে হবে মায়াজাল—অর্জন করতে হবে সেই পরম সম্পদ যার মধ্যে সমস্ত পাওয়ার অবসান।

গুরুদেবের পদপ্রান্তে নরেন্দ্র নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু এবং জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম নয়,—ঈশ্বরলাভ; তিনি আরও বুঝেছিলেন: তাহাই ধর্ম যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়। ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার ফলে স্বামীজী আর একটা সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এই সত্যটি তাঁর নিজের ভাষায়, 'এই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।' প্রত্যেক জাতিরই মর্ম থেকে উৎসারিত হচ্ছে একটি মূল

সুর, আর যত সুরের খেলা সবই এই সুরটিকে কেন্দ্র ক'রে। প্রাচীন গ্রীসের অন্তর-লোকে প্রতিষ্ঠিত ছিল সৌন্দর্যের আদর্শ। প্রাচীন ভারতবর্ষ ধর্মকে বসিয়েছিল হৃদয়ের সিংহাসনে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের সাধকেরা ঈশ্বর-লাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষণা ক'রে এসেছেন। অসংখ্য নরনারী এই সব সাধককে ঘিরে সমবেত হয়েছে, তাঁদের কথামৃত আকণ্ঠ পান করেছে, তাঁদের বাণী থেকে জীবন ভরে নিয়েছে ধর্মের পথে চলবার শুভ প্রেরণায়। স্বামীজী বললেন, যুগযুগান্তর ধরে একটা জাতির হৃদয়-তন্ত্রীতে যে মূল সুরটি বাজছে তাকে উপেক্ষা করলে সেই জাতির মৃত্যু অনিবার্য। পরানুকরণের সর্বনেশে পরিণতি সম্পর্কে স্বামীজী তাঁর স্বদেশবাসিগণের কর্ণকুহরে বারবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন।

জীবনকে একটা আদর্শের বেদীমূলে নিঃশেষে উৎসর্গ ক'রে সেই আদর্শকে ফলবান করবার জন্য নিজেকে অতন্দ্র সাধনায় ব্রতী রাখা সহজ নয়। স্বামীজী মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। এই স্বল্পকালের মধ্যে যা তিনি ক'রে গেছেন, সে কথা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন—অধিকাংশই পদব্রজে, দেশের নাড়ীনক্ষত্র জেনেছেন, এই ঘোরাঘুরির মধ্যে কখন পাণিনিও পড়ে ফেলেছেন, সমুদ্রপারে দেশ-বিদেশ পর্যটন করেছেন, অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন, অসংখ্য পত্র লিখেছেন, দেশে ফিরে এসে মঠ স্থাপন করেছেন, আরও কত কাজ ক'রে গেছেন। রলাঁ ঠিকই লিখেছেন: He was Energy personified, and action was his *message to men*—তিনি ছিলেন মহাবীর্যের প্রতিমূর্তি, মানুষের কাছে তাঁর বাণী ছিল কর্ম। এই যে আরাম ত্যাগ ক'রে, নাম-যশের প্রত্যাশী না হ'য়ে সৃজনধর্মী বিচিত্র কাজের মধ্যে অহরহ ডুবে থাকা—এর মূলে ছিল স্বদেশের ও মানুষের প্রতি তাঁর অনন্ত ভালোবাসা। তপোবনের ঋষিদের ভারতবর্ষ, নচিকেতার এবং বুদ্ধের ভারতবর্ষ, শ্রীচৈতন্যের এবং রামকৃষ্ণের ভারতবর্ষ, ইতিহাসের ঊষায় বেদান্তের অমর বাণী যাঁরা শোনালেন পৃথিবীকে—সেই আলোর পতাকা-বাহী মহাপুরুষদের ভারতবর্ষ—কি পৃথিবীর কাছ থেকে শুধু হাত পেতে নেবেই? জগৎকে কি তার কিছুই দান করবার নেই? স্বামীজী বললেন, ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে দিগ্বিজয় করবে। পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্ত সে প্লাবিত ক'রে দেবে ধর্মের প্লাবনে। পাহাড়পর্বত মরুজঙ্গল নদনদী পেরিয়ে, একদা ভারতবর্ষের মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি উঠবে সাত-সমুদ্রের তীরে তীরে—একথা স্বামীজী সমস্ত হৃদয় দিয়েই বিশ্বাস করতেন।

আজ তো পশ্চিমের প্রথিতযশা মনীষীদের কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে একটা হতাশার ভাব। টেক্‌নলজি সর্বজয়ী, ওর দ্বারা আমাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে, ইঞ্জীনীয়ারের হাতে রয়েছে যাদুকরের চাবি, আর সেই চাবি পৃথিবীতে খুলে দেবে স্বর্গলোকের দরজা—এমনি একটা রঙীন ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্নে পশ্চিমের আত্মা ছিল বিভোর হ'য়ে। সে স্বপ্ন তো আজ ধূলিসাৎ হওয়ার মুখে। টেক্‌নিশি-য়ানের (technician) কীর্তির উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক টয়েন্‌বী লিখছেন: After having been undeservedly idolized, for quarter of a millennium, as the good genius of Mankind, he has now suddenly found himself undeservedly execrated as an evil genius who has released from his bottle a jinn that may perhaps destroy human life on

Earth (Toynbee—An Historian's Approach to Religion—P. 233)

এর মর্মার্থ হ'ল—আড়াইশো বছর ধরে কত লোক মনে ক'রে এসেছে, টেক্‌নিশিয়ান্ (রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'-নাটকের যন্ত্ররাজ বিভূতি) মানবজাতির অশেষ কল্যাণ করবে। আজ সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। টেক্‌নিশিয়ানকে আজ সবাই বিষ-নজরে দেখছে। বোতলের ছিপি খুলে সে মুক্তি দিয়েছে একটা দৈত্যকে, যে দৈত্য পৃথিবী থেকে মানুষের জীবনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে। টেক্‌নলজির উপরে এই বিষদৃষ্টি পড়েছে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে। হিরোশিমায় পরমাণু-বোমার প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ তার চোখের সামনে থেকে মোহের আবরণ সরিয়ে দিয়েছে।

টয়েন্‌বী বলছেন, সেই ভলটেয়ারের যুগে ধর্মান্ধ পুরুতদের আচরণে যেমন মানুষের মনে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা এসেছিল, এ যুগে বিজ্ঞানের এবং টেক্‌নলজির বিরুদ্ধে মানুষের মন যে বিষিয়ে উঠবেনা—কে এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারে? সে যুগে ধর্মান্ধতার মধ্যে চিন্তাশীল লোকেরা দেখেছিলেন আত্মকেন্দ্রিকতার উৎকট প্রকাশ। এ যুগে বিজ্ঞান এবং টেক্‌নলজি যে-ভাবে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ক'রে মানুষের অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলবার আয়োজন করছে তাতে কি মনে হচ্ছে না, ওদের মধ্যেও সেই এক আত্মকেন্দ্রিকতারই কদর্য অভিব্যক্তি? ভল্‌টেয়ার যদি বিংশ শতাব্দীতে নূতন দেহ নিয়ে আসতেন তাঁর লেখনী টেক্‌নলজির উপরে নিশ্চয়ই আজ বিষোদ্গীরণ করতো।

বিজ্ঞানের চরম অবদান সম্পর্কে মানুষের সেদিনের মোহ যদি কেটে গিয়ে থাকে, হয়তো তার দিগন্তে খুলে যাবে একটা নবতর জগতের তোরণ-দ্বার এবং এই নূতনতর জগৎ যে ধর্মের জগৎ হবে না—তা কে বলতে পারে? লিখেছেন টয়েনবী: And then, when Man's mind has reached the limits of the scientific study of human affairs, perhaps this chastening intellectual experience may re-open an avenue leading to Religion along a new line of approach which, if humbler, will be spiritually more promising

কে জানে, এতকাল পরে মানুষের ইতিহাসে হয়তো সেই মহালগ্ন এসেছে যখন রিক্ত তপ্ত ক্লান্ত ইউরোপকে আসতে হবে ভারতবর্ষের কাছে—ধর্মের মধ্যে তার ক্ষত-বিক্ষত আত্মার তৃপ্তির জন্যে। বিবেকানন্দের জীবনীতে র'লা ইউরোপকে সম্বোধন ক'রে কী চমৎকার করেই বলেছেন:

Let us stop and recover our breath! Let us lick our wounds! Let us return to our eagle's nest in the Himalayas! It is waiting for us, for it is ours. —যাত্রা থামিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। আমাদের ক্ষতস্থানগুলি জিব দিয়ে একটু চাটি। হিমালয়ের ক্রোড়ে আমাদের সেই ঈগলের নীড়ে আমরা ফিরে যাবো। সেই নীড় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে যে আমাদেরই। ভারতবর্ষকে র'লা বলেছেন, মা। ইউরোপকে বলছেন, মায়ের দিকে মন ফেরাও, পান করো তাঁর স্তন্যরস। সেই রসধারা শক্তি রাখে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে নূতনতর জীবন দেবার।

'Let your thoughts return to the Mother! Drink her milk! Her breasts can still nourish all the races of the world'.

র'লার আহ্বান পাশ্চাত্যের কানের ভিতর

দিয়ে তার মর্মে প্রবেশ করবে কি না, তা ভগবানই জানেন। তবে টয়েনবী, রাসেল, হাক্স্‌লী, এদের সকলেরই কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি একটা নূতনতর সুর। ইউরোপ এবং আমেরিকা টেক্‌নলজির এবং বিজ্ঞানের রাস্তায় মানবজাতিকে 'সব পেয়েছি'র দেশে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে পারবে না—এ বিষয়ে এঁরা নিঃসংশয়।

স্বামীজী অনেক আগে দেখতে পেয়েছিলেন, ভারতের একটা 'মিশন' আছে, আর সেই 'মিশন' হ'চ্ছে তার আধ্যাত্মিকতার আলো দিয়ে মুমূর্ষু পৃথিবীকে নবজীবনের মধ্যে বাঁচানো। স্বদেশের ভবিষ্যতে এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল ব'লেই তিনি এমন ক'রে তিলে তিলে কর্মের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ ক'রে দিতে পেরেছিলেন। ঘৃণাও মানুষকে কাজে উৎসাহ দেয়—কিন্তু কর্মে প্রেরণা দিতে প্রেমের জুড়ি নেই।

কিন্তু জীবন্মৃত ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কী দান করবে? ঋষিদের বংশধরেরা পশুর সামিল হয়ে আছে। দিগন্তবিস্তারী অজ্ঞতার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে যারা বিচরণ করছে তারা মানুষ, না লক্ষ লক্ষ জীবন্ত নর-কঙ্কাল? গুরুদেবের অদর্শনের পর স্বামীজী পরিব্রাজকের দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়েছিলেন ঈশ্বরকে খুঁজতে। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যের দিকে যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন দেখতে পেলেন, ভারতবর্ষে মানুষের দুঃখের কোন সীমা নেই। অসহনীয় দারিদ্র্যের নিষ্করুণ চাপে অসংখ্য মানুষের জীবন নিষ্পেষিত হয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে স্বামীজীর কোমল হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে গেল। কুমারিকা অন্তরীপে এসে তিনি সংকল্প গ্রহণ করলেন, তাঁর জীবনকে এখন থেকে নিঃশেষে তিনি উৎসর্গ করবেন আর্ত মানবের সেবার কাজে। ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে সমুদ্রতীরের এক শিলাখণ্ডে শুরু হ'ল স্বামীজীর জন্মান্তরের পালা—'He dedicated his life to the unhappy masses'

সেই যে কোন্ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল 'দরিদ্র-নারায়ণ' কথাটি, এই কথার মধ্যে নব্য ভারতবর্ষ খুঁজে পেলো তার যাত্রাপথের পাথেয়, তার নবজীবনের জপমন্ত্র। গান্ধীজীর গণ-বিপ্লবে এবং কিষাণ মজদুর-প্রজারাজের স্বপ্নের মধ্যে বিবেকানন্দের বৈদ্যুতিক চিন্তার প্রেরণা, বিনোবাজীর ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনকেও কি আমরা বিবেকানন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পারি? নিদ্রিত ভারতবর্ষের কানে যেদিন থেকে তিনি 'দরিদ্র-নারায়ণ' কথাটি উচ্চারণ করলেন সেই দিন থেকে তার ঘুমের মধ্যে শুরু হোলো মহা-জাগরণের চাঞ্চল্য।

বেদান্তের বাণী যে এত ক'রে তিনি শোনালেন সেও দুর্বলতা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যে। মানুষ যে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার একটা খাঁচা মাত্র নয়, এই জড় শরীরটাকে সে যে ছাড়িয়ে আছে, সে যে আসলে আত্মা এবং আত্মা যে অনন্ত শক্তির আধার—বেদান্তের এই অগ্নিবচনকে তিনি কত বার কত ভঙ্গীতেই না প্রকাশ করেছেন দিকে দিকে। বিবেকানন্দ যে-আত্মার কথা মেঘমন্দ্র স্বরে দেশবাসীকে শোনালেন সেই আত্মার দুর্বার শক্তিকেই গান্ধীজী ব্যবহার করলেন সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে একটা প্রাচীন মহা-জাতিকে মুক্ত করবার কাজে। সত্যাগ্রহের মধ্যে আত্মিক শক্তিরই প্রকাশ।

স্বামীজী পরিষ্কার করেই বুঝতে পেরেছিলেন—দেহ দুর্বল থাকলে ভারতবর্ষ কখনই ধর্মবলেও বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। তাকে সর্বাগ্রে দেহে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে; আর শক্তি সঞ্চয়

করতে হ'লে সর্বাগ্রে দরকার পুষ্টিকর উত্তম আহার। 'পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে। তবে তো মনে বল হবে।' আধ্যাত্মিক আলো দিয়ে যে-ভারতবর্ষ জগৎকে নবজীবনকে দান করবে তাকে স্বামীজী কেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, কেন তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই কুরুক্ষেত্রের গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনালেন, কেন তাকে আত্মসম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলবার জন্যে এত বেদান্তের কথা বললেন,—সমস্তই আজ আমাদের কাছে সহজ-বোধ্য হ'য়ে প্রতিভাত হয়েছে।

সবশেষে স্বামীজীকে নিয়ে আজ শুধু গৌরব করলেই চলবে না—তাঁকে ব্যবহার করতে হবে তাঁর নব্যভারত সৃষ্টির স্বপ্নকে সফল করবার জন্যে। এ কাজ সাধন-সাপেক্ষ। ভগীরথ যেমন গঙ্গা নিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজীর ভাবগঙ্গাকে তেমনি গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার সময় এসেছে। স্বামীজী কতদিন হ'ল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বইগুলির মধ্যে কী সজীবতা! তাঁর বক্তৃতাগুলির মধ্যে আজও ধ্বনিত হচ্ছে নায়াগ্রার কলগর্জন! ভাষায় বারুদের গন্ধ, চিন্তাধারার মধ্যে স্বর্গের আগুন। এই অগ্নিগর্ভ চিন্তাধারার বৈপ্লবিক স্পর্শে পুড়িয়ে দিতে হবে কুসংস্কারের আবর্জনা-রাশি। যে ভাবধারা তিনি আমাদিগকে দিয়ে গেছেন, তার আলোয় আমরা নবসৃষ্টির পথ খুঁজে পাব। বিবেকানন্দের বীরবাণীর স্রোতের মধ্যে কোথাও শ্যাওলা জমতে পাবেনি, তিনি আজও সবুজ, আজও কাঁচা, আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে আমরা যদি ব্যবহার করতে না পারি—সে হবে আমাদেরই নির্বুদ্ধিতা।

হরি-মণ্ডপে

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

হরি-মণ্ডপে মোর,
তুমি এসে পাছে, ফিরে যাবে তাই
সদা খুলে রাখি দোর।
নাম-কীর্তনে বহু মানুষের,
সদা লেগে আছে, উৎসব জের,
এত সমারোহ, বসি আর ভাবি
ঝরে মোর আঁখি-লোর।

বিরাজিছ সবখানে,
কোথায় কিরূপে হতেছ প্রকট
তুমি ছাড়া কে তা' জানে?
আজ গেছি হেথা হিংসায় ভুলি,
মানুষের পদ-রজ শিরে তুলি,
বঞ্চনাময় ক্ষুব্ধ পরাণ
উঠে ভরে গানে গানে।

মনের ময়লা যত,
মানুষে নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে
করি আজ অপগত।
অসত্য আর অশুচি মনের—
ঘুচেছে স্পর্শে, শতেক জনের,
মানুষের মাঝে তোমাকে প্রণাম
করে যাই শত শত।

হে দয়াল, প্রেমময়,
তোমার প্রেমের মন্ত্র ধ্বনিত
সবার কণ্ঠে হয়।
তুমি যে সর্বজনের মাঝারে,
দেখালে বুঝালে জীবনে আমারে,
গোটা মণ্ডপ আলো-করা দীপ
তোমার গাহি গোঁ জয়!

বেদের অপৌরুষেয়তা

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

যে বাক্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে মানুষ তাহার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির বা অনভিলষিত পদার্থ পরিত্যাগের অলৌকিক উপায় জানিতে পারে না, যে বাক্যের দ্বারা তাহা জানিতে পারে—সেই বাক্য বা শব্দ রাশিকে বেদ বলে।[১] ভারতীয় সকল আস্তিক দার্শনিকই পূর্বোক্ত শব্দকে বেদ বলেন। তবে যে "বেদ-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান" ইত্যাদি বাক্যে 'ভাববার কথা'য় স্বামীজী জ্ঞানকে বেদ বলিয়াছেন তাহা শব্দ ও জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অভিপ্রায়ে। যাঁহারা জ্ঞানরাশির বেদস্বরূপতা খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা স্বামীজীর এই অভিপ্রায় না বুঝিয়াই তাহা করিতে চাহিয়াছেন।[২]

শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান—এই তিনটি পদার্থ অধ্যাস-বশতঃ পরস্পরের অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।[৩] শাব্দিকের মতে জ্ঞানমাত্রই, এমনকি নির্বিকল্প জ্ঞানও শব্দানুবিদ্ধ অর্থাৎ শব্দের সহিত সংসৃষ্ট। যেমন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে॥' যাহা হউক বেদ শব্দ বা বাক্যাত্মক। এই বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ব্যতীত কোন মনুষ্য বা দেবতা কর্তৃক রচিত বা আবিষ্কৃত নয়। এই অর্থেই 'অপৌরুষেয়' শব্দের প্রয়োগে সমস্ত আস্তিক দার্শনিকের ঐকমত্য আছে। তাঁহারা বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব বিনাযুক্তিতে যে স্বীকার করিয়াছেন বা অপরকে বুঝাইতে চাহেন—তাহা নয়, কিন্তু সেই বিষয়ে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সব যুক্তির দু-একটি মাত্র সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক

অধ্যয়ন পরাম্পরাক্রমে এখনও বেদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহার রচয়িতার নাম জানা যায় না। অনাদি কাল হইতে গুরুশিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে বেদ অধীত হইয়া আসিতেছে। সেই বেদের যতটা অংশ এখন অধীত হইতেছে, তাহার অক্ষরগুলি ঠিক ঠিক পূর্বাপররূপে সর্বত্র একরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে, সকলেই একভাবে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, অথচ অদ্যাবধি রচয়িতার নাম নিশ্চিতভাবে কেহই জানে না। আধুনিকেরা কেহ কেহ অমুক বেদ অমুক ঋষির আবিষ্কৃত ইত্যাদিরূপ একটা সম্ভাবনাকে প্রমাণ ভ্রমে জাহির করিয়া নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও আস্তিক ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন মাত্র। যেখানে বেদাধ্যায়ীরা এত বৃহৎ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ঠিক ঠিক স্মরণ রাখিয়াছেন, সেখানে কেবল রচয়িতার নামটাই তাঁহারা কালক্রমে ভুলিয়া গিয়াছেন, এই কথা বলা শোভা পায় না। মনু-সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কত প্রাচীন গ্রন্থের রচয়িতার নাম লোকের

---

১ "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ" [কৃষ্ণযজুর্বেদ-ভাষ্য-ভূমিকা]
'প্রত্যক্ষানুমানাদিষস্তিমো বেদঃ' [ঋগ্বেদ ভাঃ ভূঃ]।
'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' 'মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদঃ' [নিরুক্ত-টীকায় উদ্ধৃত]
২ অদ্বৈতসিদ্ধির বঙ্গানুবাদক।
৩ 'শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সংকরস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্' [যোগ সূঃ ৩।১৭]

মনে আছে, অথচ এই বেদের প্রণেতার নামটাই কেবল ভুল হইয়া গেল—এই কথা কি প্রমাণযোগ্য ? যদি বলা যায় যে, কত কত প্রবাদবাক্য, ছড়া প্রভৃতি লোকের মুখে মুখে আছে, কিন্তু তাহাদের রচয়িতার নাম জানা যায় না, সেইরূপ বেদের ক্ষেত্রেও হওয়া আশ্চর্য কি ?—ইহার উত্তর এই যে সেইসব ছড়া বা প্রবাদ-বাক্যের প্রণেতাদের নাম একজন না একজন জানে, খোঁজ করিলে তাহাদের নাম এখনও জানা যায়। এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছেও। কিন্তু বেদের বেলায় তাহা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং বেদ মনুষ্য, ঋষি বা দেবতা রচিত নহে।

যদি বল—বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা দৃষ্ট হয় : যেমন ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, প্রজাপতি দেবতা ইত্যাদি। এখানে 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষি ধ্যানভাবনাদির দ্বারা মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ সাক্ষাৎকার করিয়া মন্ত্রসকল রচনা করিয়াছেন, ইহাই তো সহজে অনুমেয়। ইহার উত্তরে বলা যায় : যদি বেদ পূর্বোক্তভাবে নানা ঋষির রচনা হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-মাত্রেরই কিঞ্চিৎ না কিঞ্চিৎ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির প্রক্রিয়া বা ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বেদে উক্ত হইত। কিন্তু এক একটি যাগ প্রভৃতির প্রক্রিয়া সমস্ত শাখাতে একই ভাবে উক্ত আছে। সমস্ত ঋষি এক সঙ্গে মিলিত হইয়া, এক-মত হইয়া বেদ করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। ভূত ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত ঋষির এক কালে মিলন অসম্ভব।

যদি বল, বেদে মতভেদ তো আছে—যেমন দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং কেবলাদ্বৈত মত দেখা যায়। সুতরাং বিভিন্ন ঋষি-প্রণীত না হইলে বিভিন্ন মত কেন দেখা যাইবে ? তাহার উত্তর এই যে এই সব মত-ভেদ ব্যাখ্যাতৃগণের ভেদেই উঠিয়াছে, রচয়িতার ভেদে নয়। সমস্ত বেদের একবাক্যতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা নিজ নিজ মতা-নুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য ঐরূপ ব্যাখ্যা করায় দোষ হয় নাই, বরং উহা বেদের প্রামাণ্যই সূচনা করিয়াছে, যেমন যদি কোন লোক আত্মাকে নিত্য বলিয়া আবার অনিত্য বলে, তাহা হইলে একই পদার্থে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া সকলে সেই লোকের বাক্যকে অপ্রমাণ মনে করে। সেইরূপ ব্যাখ্যাতাই যদি বেদবাক্যের দ্বৈতমতে—আবার অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যাতাকে লোকে বিশ্বাস করে না। পরন্তু ব্যাখ্যেয় বেদের প্রামাণ্যকেও সেই ব্যক্তি বিনাশ করিতে বসিবে। বস্তুতঃ বেদের চরম তাৎপর্য অদ্বৈতে। কিন্তু সেই অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী বিরল বলিয়া বেদ মন্দ অধিকারীকে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতে পৌছাইয়া দিবার জন্য আপাততঃ দ্বৈত প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন বলিলে কোন বিরোধ থাকে না, বা বেদের প্রামাণ্যও ব্যাহত হয় না।

এ মন্ত্রের অমুক ঋষি অমুক ছন্দ—ইত্যাদি বাক্যগুলি বেদের অন্তর্গত নয়। উহা মন্ত্রের প্রয়োগের সুবিধার জন্য পরবর্তী কালে ঋষিরা রচনা করিয়াছেন। আর 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে ধ্যানাদির দ্বারা যিনি পূর্ব হইতে বিদ্যমান মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ সাক্ষাৎকার করেন তিনি ঋষি পদবাচ্য। সুতরাং ঐ ঋষির দ্বারা বেদ রচিত বা আবিষ্কৃত নয়।

বেদের এক একটি শাখার একটি নাম দেখিয়াই মনে হয়, বেদ বিভিন্ন ঋষির দ্বারা রচিত। যেমন কঠ, বাজসনেয়ি, কালাপ

ইত্যাদি। এইরূপ মন্তব্যও শ্রুতির পৌরুষেয়তার নিশ্চায়ক নয়। কারণ দেখা যায়, একটি রাস্তা পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ লোকের বাড়ী সেই রাস্তার ধারে আছে অথবা তিনি সেই রাস্তায় অনেকবার গমনাগমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে রাস্তার নাম হয়, যেমন নেতাজী সুভাষ রোড্—কিন্তু তিনি সেই রাস্তা নির্মাণ করেন নাই। সেইরূপ প্রখ্যাত ঋষিগণের মধ্যে যিনি বেদের যে অংশটি বিশেষভাবে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতেন, পরবর্তীকালে তাঁহার নামে ঐ শাখার নাম দেওয়া হয়। প্রবাদ আছে, কঠ-নামক ঋষি সমস্ত বেদ জানিলেও ঐ অংশটি (কঠ শাখা) ছাড়া অন্য কোন বেদ অধ্যাপনা করিতেন না, তাই তাঁহার নামে কঠ শাখার নাম প্রচলিত হয়।

যদি বল—বেদে এমন অনেক বাক্য দেখা যায়, যার অর্থগুলি অত্যন্ত বিরুদ্ধ বা অযৌক্তিক। যেমন : 'স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদং' সেই প্রজাপতি নিজের হৃৎপিণ্ডের চর্বি ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। নিজের চর্বি অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করা অসম্ভব বা উন্মাদের লক্ষণ। অথচ এইরূপ বাক্য বেদে বহু আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে মনুষ্যরচিত গ্রন্থে যেমন অনেক আখ্যায়িকা থাকে, লোকের কৌতূহল বা আনন্দ বৃদ্ধির জন্য—বেদেও তদনুরূপ। সুতরাং উহাও মনুষ্যরচিত। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতির ঐ সকল বাক্যের অর্থ না বুঝিবার ফলেই ঐরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। কারণ ঐসব বাক্যের আক্ষরিক অর্থে তাৎপর্য নাই, কিন্তু বিধেয় যাগ প্রভৃতির প্রশংসাতেই ঐসব বাক্যের তাৎপর্য। প্রজাপতি যখন ঐ যাগে নিজের মেদ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই ঐ যাগ প্রশস্ত। অতএব হে মনুষ্যগণ! তোমরা এ যাগ কর। ইহাই বেদের অভিপ্রায়। যে বাক্যের যে অর্থে তাৎপর্য, সেই বাক্যের সেই অর্থই প্রকৃত অর্থ।[৪] যেমন যদি কেহ বলে, 'আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাইতে হয়'—তাহা হইলে সকলেই বুঝে যে, তাহাকে খুব পরিশ্রম করিয়া রোজগার করিতে হয়। কিন্তু তাহার কথায় এই অর্থ নয় যে, প্রত্যেক বার খাইবার পূর্বে তাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। বেদেও ঠিক ঐরূপ বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যে বিশেষ বিশেষ বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে।

এখন আবার আপত্তি উঠিতে পারে যে, লৌকিক বাক্য বা গ্রন্থে মানুষকে বুঝাইবার জন্য যে ভাবে চিন্তাপূর্বক গল্প, উপদেশ, বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকার বাক্যাবলি সজ্জিত দেখা যায়, বেদেও যখন ঐ প্রকার আখ্যায়িকা ভাগ, স্তাবক বাক্য প্রভৃতি দেখা যাইতেছে তখন উহা মনুষ্য-রচিতই হইবে। মনুষ্য-রচনার সাদৃশ্যবশতঃ, বেদও মানব-প্রণীত। আর আজকাল একদল শিক্ষিত ব্যক্তি, এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া অমুক গ্রন্থটি অমুকের রচিত বা অমুক গ্রন্থটি অমুকের রচিত নয়—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ যুক্তি নিতান্ত অসার। কারণ সাদৃশ্যের দ্বারা উহা নিশ্চয় করা যায় না। যেমন, গবয়ে গরুর সাদৃশ্য দেখিয়া 'গরু গবয়-সদৃশ' এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে, কিন্তু গরু গবয় বা গবয়-জাতীয়—এইরূপ নিশ্চয় কেহ করে না। সেইরূপ বেদে মনুষ্য-রচনার সাদৃশ্য দেখিয়া নিশ্চয় হইতে পারে যে মনুষ্যের রচিত

---

৪ যৎ পরঃ হি বাক্যং স তদর্থ ইতি ন্যায়াৎ।

গ্রন্থ, বেদসদৃশ বা মনুষ্যরচিত গ্রন্থে বেদের সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝা যাইতে পারে বেদ মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থসদৃশ, এই পর্যন্ত। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয় হইবে না যে, বেদ মনুষ্যরচিত গ্রন্থ বা তজ্জাতীয়।[৫] যদি বলা যায়, একটি গরুতে অপর একটি গরুর সাদৃশ্য দেখিয়া যেমন আমরা তাহাকে গো-জাতীয় বলিয়া বা গরু বলিয়া বুঝি, সেইরূপ বেদেও মনুষ্য-রচনার সাদৃশ্য দর্শনে, বেদ মনুষ্যরচিত বলিয়া নিশ্চয় করা যাইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, একটি গরু প্রথমে দেখিয়া, পরে অন্যান্য গরুকে যে আমরা গোজাতীয় বা গরু বলিয়া বুঝি, তাহা সাদৃশ্যবশতঃ নয়, কিন্তু গোত্ব (গরুর অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম) দেখিয়া সকল গরুকে গরু বলিয়া বুঝি। সাদৃশ্য ও অসাধারণ ধর্ম এক কথা নয়। এই সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে, এখানে তাহা বলা সম্ভব নয় বলিয়া বিরত হওয়া গেল। এই যুক্তিতে যাঁহারা মাণ্ডূক্য-ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ভাষ্য শঙ্করাচার্য-কৃত নয় বলেন, তাহাও খণ্ডিত হইল। বড জোর এই নিশ্চয় করা যায় যে মাণ্ডূক্য-ভাষ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতির ভাষ্যের সদৃশ নয়। সাদৃশ্য-লক্ষণ খণ্ডিত হইল, সুতরাং বেদ পৌরুষেয় নয়।

দুই

অনবস্থা। অনাদি কাল হইতে এ যাবৎ 'বেদ ভ্রান্ত বা সন্দিগ্ধ'—ইহা কেহই প্রমাণ করিতে পারে নাই। বেদ যে-ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে বৈদিক কর্ম বা জ্ঞানের উপায় অবলম্বন করিয়া পূর্বে বহু লোক যথাযথ ফল পাইয়াছেন এবং এখনও অনেকেই পাইতেছেন। বিশেষ করিয়া বহু মহাত্মা কোন প্রকার লৌকিক অর্থ, মান, যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, চিরকাল তপস্যার দুঃখ ভোগ করিয়াও বৈদিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন বা অপরকে সেই পথে চালিত করেন। সেইসব মহাপুরুষকে আমরা প্রামাণিক বলিয়া জানি। বহু পরীক্ষা দ্বারা মানুষ সেই সকল মহাত্মাকে যাচাই করিয়া লইয়াছে। অতএব এই দুই কারণে বেদ যে প্রমাণ তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

এখন বেদের এই প্রামাণ্যটি যদি অপর কোন প্রামাণিক মানুষ বা তাহার বাক্যকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই মানবের বাক্যের প্রামাণ্যও অন্য কোন প্রমাণকে অপেক্ষা করিবে। আবার তাহাও অপর প্রমাণকে অপেক্ষা করিবে। এইভাবে অনবস্থা দোষ হইয়া যাইবে।[৬] অতএব বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। এই কথা শুনিয়া অনেক সাধারণ শিক্ষা-ভিমানী ব্যক্তি হাসিয়া উঠিবেন বলিবেন: ইহা ধরিয়া লওয়া হইল যে বেদ অন্য কোন মানুষকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহারা বুঝিতে পারিবেন, ইহা একটি প্রমাণসিদ্ধ কথা। যেমন একজন নাদুস-নুদুস লোককে দেখা গেল, তারপর পরীক্ষার দ্বারা জানা গেল যে সে ব্যক্তি দিনে খায় না। তখন আমরা প্রথমে কি নিশ্চয় করিয়া থাকি? নিশ্চয় করি যে সে অবশ্যই রাত্রে খায়। রাত্রে খাওয়াটা আমরা প্রথমে ধরি না, কিন্তু ভোজন ব্যতিরেকে স্থূলতা সম্ভব নয়, ইহা আমরা নিশ্চিতই জানি। ঐ ব্যক্তি যখন

---

৫ এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে বেদান্ত-পরিভাষার উপমান-পরিচ্ছেদ, শ্লোক-বার্তিকের ৫ম সূত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রদীপিকার তর্কপাদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৬ এই অনবস্থা একটি তর্কবিশেষ। যেমন—বেদপ্রামাণ্যং প্রামাণ্যং বা যদি প্রমাণান্তরমপেক্ষং স্যাত্তর্হি নিশ্চেতুমশক্যং স্যাৎ। অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য যদি অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে তাহা হইলে আর বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করা যাইবে না।

দিনে খায় না, তখন প্রমাণের দ্বারা (অর্থাপত্তি) সিদ্ধ হইয়া যায়—সে রাত্রে খায়। সেইরূপ বেদের প্রামাণ্য পূর্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ আছে, আর সেই প্রামাণ্য অন্য পুরুষের চিন্তা বা বাক্য প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিলে 'অনবস্থা' দোষ-বশতঃ প্রামাণ্য অসিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব প্রমাণের (অর্থাপত্তি) দ্বারা সিদ্ধ হইবে যে, বেদ মানুষরচিত নয়—অপৌরুষেয়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ।

তিন

বেদ যদি মনুষ্যের রচিত হইত তাহা হইলে তাহা অপ্রমাণ হইয়া যাইত। কারণ মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। আর মানুষ যে সর্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত—তাহার প্রমাণ নাই, সর্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত বুঝিতে হইলে আর একজন সর্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত লোকের দরকার, আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির সর্বজ্ঞতা ও অভ্রান্ততা জানিবার জন্য আর একজন তৃতীয় সর্বজ্ঞ, অভ্রান্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। তাহার বেলায়ও তদ্রূপ, এই ভাবে অনবস্থা ও অনেক সর্বজ্ঞ স্বীকার করিতে হয়। আর স্বীকার করিলেও নিস্তার নাই।—কারণ অসর্বজ্ঞ আমাদের কাছে, অপর সর্বজ্ঞ নিশ্চয় করিবার উপায় থাকে না। যদি বল—বেদ হইতেই সর্বজ্ঞের নিশ্চয় করা যাইবে, তাহা হইলে বলিব, ভাল কথা—তাহা হইলেই বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইল। কারণ বেদের প্রামাণ্য যদি কোন মানুষকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে বেদ অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য-বশতঃ অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিতে হইবে। আর বেদে যে সর্বজ্ঞের কথা আছে তাহা একমাত্র ঈশ্বর-বিষয়ে, কোন মানুষ বা দেবতা বিষয়ে নয়।

অতএব সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর-কর্তৃক বেদ রচিত। ঈশ্বর-রচিত হইলেও তাহাকে পৌরুষেয় বলা যায় না। কারণ—যে সব গ্রন্থ মানুষ রচনা করে তাহা চিন্তা করিয়াই রচনা করে, আর ঐ গ্রন্থের পূর্বে এমন কোন গ্রন্থ থাকে না, যাহা একেবারে অক্ষরের পর অক্ষর হুবহু ঠিক ঐ গ্রন্থের মতন। কিন্তু ঈশ্বর কোনরূপ চিন্তা না করিয়া—কোনরূপ শ্রম না করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায়, পূর্বকল্পে ঠিক যে ভাবে অক্ষরের পর অক্ষর বেদ ছিল, সেই ভাবে উচ্চারণ করেন মাত্র।[৭]

অথবা বেদ কাহারও রচনা নয়, নিত্য—ইহাও একমতে (মীমাংসক) বলা যায়।

বেদ যে মনুষ্যরচিত নয়, সৃষ্টিকর্তা পূর্ব হইতে বিদ্যমান বেদ আলোচনা করিয়াই সৃষ্টির প্রথমে মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা বেদও বলিতেছেন।

যথা: 'বাচা বিরূপ নিত্যয়া' [ঋগ্বেদ] অর্থাৎ হে বিরূপ। তুমি নিত্য বেদ-বাক্যের দ্বারা দেবতার স্তুতি কর।

"এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃৃংস্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহা-নাশব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভি-সৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" [ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত ১।৩।২৮ সূঃ]

সৃষ্টিকর্তা বেদস্থিত 'এতে' এই পদ দেখিয়া দেবতা 'অসৃগ্রম্' (রক্তপ্রধান দেহে রত) এই পদ দেখিয়া মনুষ্য ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্ম-সূত্রেও আছে "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ

৭ 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদ' ইত্যাদি [বৃঃ উঃ ২।৪।১০] ঋগ্বেদ যজুর্বেদ প্রভৃতি এই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ।

প্রত্যক্ষাহুমানাভ্যাম্" [ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮] বেদের শব্দ হইতেই দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টি।

মহর্ষি মনুও বলিতেছেন : সর্বেষাং তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে॥ [মনু সং—১।২১] হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত পরমাত্মা প্রাণিসকলের—মনুষ্য, অশ্ব, গো প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম এবং লৌকিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বেদশব্দ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেদ যে সমস্ত জ্ঞানের আকর এবং তাহা স্বতঃপ্রমাণ ও অপৌরুষেয় তদ্‌বিষয়ে আরও স্মৃতি-প্রমাণ যথা :

"সর্বং বিদুর্বেদবিদো বেদে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
বেদে নিষ্ঠা হি সর্বস্য যদ্ যদস্তি চ নাস্তি চ"।
[মহাভাঃ শাঃ—২৭০।৪৩]। বেদজ্ঞ ব্যক্তি সব জানেন, বেদে সমস্তই আছে, কার্য কারণ যাহা আছে, ও যাহা এখনও নাই সে সবের কথাও আছে।

"ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" [মনু সং ২।১৩]—ধর্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বেদ। "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুমঃ"—বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ ও স্বয়ম্ভু। [ভাগবত ৬।১।৪০]

বৃথা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

[আচার্য শঙ্করকৃত 'অনাত্মশ্রীবিগর্হণম্'এর ভাবানুসরণে]

দেশ ও বিদেশ হোক রমণীয়
　　দেখে আনন্দ কৈ ?
প্রিয় বন্ধুর পোষণ পেয়েও
　　জীবনেতে আসে ছন্দ কৈ ?
ভেবে কিবা লাভ গেল কি না গেল
　　যত দারিদ্র্যদুঃখভার—
এ জীবনে যদি দেখা না পেলাম
　　সকল উৎস স্ব-আত্মার ?

পুণ্যতীর্থ জাহ্নবী-নীরে
　　স্নান তো হয়েছে অনেক দিন,
পুণ্যলাভের আশায় ষোড়শ
　　দান তো করেছি কুণ্ঠাহীন।
কোটিবার জপ করেছি মন্ত্র
　　তবুও কোথায় দীপ্তি সেই ?
আত্মার সাথে সাক্ষাৎ বিনা
　　সবই যে বিফল, তৃপ্তি নেই।

দক্ষিণভারতের তীর্থ-পরিক্রমা

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দক্ষিণ ভারতে তীর্থের অন্ত নাই, বিশেষ ক'রে 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর' ও কন্যাকুমারী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হিন্দুমাত্রেরই আছে। রেলওয়ে ট্রেন চালু হওয়ার পূর্বে অনেকে পদব্রজে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে আসতেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষ ক'রে বাংলা দেশ থেকে প্রতি বছর বহু হিন্দু নরনারী দক্ষিণ ভারতে আসেন, কিন্তু কোথায় কি প্রধান তীর্থ, কোন্ তীর্থে কি কি দ্রষ্টব্য, কোন্ পথে গেলে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বিখ্যাত তীর্থগুলি দর্শন করা যায়, থাকার ব্যবস্থা কোথায় কিরূপ আছে,—অনেকেরই জানা নেই। এই সব অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তরেই এই প্রবন্ধের সূচনা।

যাত্রার সময় ও আহারাদির ব্যবস্থা

অনেকে গরমের ছুটিতে এদিকে আসেন—কিন্তু এ অঞ্চলে গরম বেশী বলে তাঁরা খুব কষ্ট পান। পূজার ছুটিতেও অনেকে আসেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হ'তে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত এ দিকে বেশ বর্ষা। সব চেয়ে ভাল সময় নভেম্বরের মাঝামাঝি হ'তে জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত। বেশী শীত হবে মনে ক'রে যাত্রীরা প্রচুর বিছানাপত্র ও গরম কাপড় নিয়ে আসেন, কিন্তু উটাকামণ্ড (Hill station) ছাড়া এদিকে শীত নেই। যাঁরা উটাকামণ্ড, মহীশূর ও বাঙ্গালোর যেতে চান তাঁদের পক্ষে গরম কাপড় ও বিছানা অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু যাঁরা কেবল রামেশ্বর, কন্যাকুমারী প্রভৃতি দর্শন ক'রে যেতে চান, তাঁদের গরম কাপড় আনার কোনও প্রয়োজন নেই এবং বিছানাপত্রও যত কম আনেন ততই ভাল, কারণ পূর্বেই বলেছি, এ অঞ্চলে শীত মোটেই নেই। এ দেশের লোকেরা খুব সাদা-সিধা, এঁরা চলাফেরা করার সময় একটি হাত-ব্যাগ মাত্র সঙ্গে রাখেন, তার মধ্যে থাকে দু'একখানি কাপড়, একটি জামা এবং একখানি সুজনী বা তূলার কম্বল।

এদেশে হোটেলে খাবার প্রচলন খুব বেশী। অনেক গৃহস্থ পরিবার বাড়ীতে রান্না না ক'রে হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসেন, সেজন্য অলিতে গলিতে হোটেল আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের মূল্য দশ আনা। তিন চার আনাতে জলখাবার ও কফি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রসম্, সাম্বার, পাঁপড, একটি তরকারি ও ঘোল—এই খাওয়ার তালিকা। ইড্‌লি, দোশে এবং বোণ্ডা, তার সাথে নারকেলের চাট্‌নি—এই জলপান। বড় সহর ছাড়া আমিষ খাবার পাওয়া মুস্কিল। তিলের তেলেই—কোনও স্থানে বাদাম তেলে রান্না হয়। ঝাল ও টক তরকারিতে থাকবেই। যাঁদের এসব খাওয়া সহ্য হয় না, তাদের কিছু সরিষার তৈল ও বাসন-পত্র সঙ্গে আনা ভাল। সব বড় বড় তীর্থ-স্থানেই ধর্মশালা আছে এবং রান্নার ব্যবস্থা আছে। ধর্মশালাকে এদেশের লোকে চৌলট্রি (Choultry) বলে। অধিকাংশ চৌলট্রিতেই বিনা পয়সায় থাকা যায়। দুধও পাওয়া যায়—১৲ টাকা আন্দাজ সের, এদেশে পাড়ি হিসাবে বিক্রয় হয়—এক পাডি বাংলা দেশের পাঁচ পোয়ার সমান।

থাকার জায়গা নিয়ে অনেকে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সব বিখ্যাত তীর্থস্থানেই চৌলট্রি আছে—সেখানে সাধারণ যাত্রীরা বিনাব্যয়ে থাকতে পারেন। এছাড়া

রামেশ্বর, কন্যাকুমারী ও তিরুপতিতে মন্দির-পরিচালিত অতিথিভবন আছে। ঐ গুলি খুব সুবিধাজনক—আলাদা রান্নাঘর, শোবার ঘর, পায়খানা, জল প্রভৃতি সব কিছুর ব্যবস্থা আছে। দৈনিক ভাড়া ৸৹ আনা হ'তে ৫ টাকা পর্যন্ত—ঐ টাকায় একজন বা এক পরিবারও থাকতে পারেন। সাধারণতঃ তিন দিন থাকতে দেওয়া হয়। মন্দিরে গিয়ে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলে ঐসব ঘর খালি থাকলে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বড় বড় সহরে হোটেল আছে এবং বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে— আগে থেকে লিখলে মাথাপিছু চার্জ দিয়ে ঐ সব জায়গায় থাকা যায়।

প্রধান তীর্থসমূহ

পূর্বেই বলেছি দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য তীর্থস্থান। অনেকেরই পক্ষে সব তীর্থ দর্শন সম্ভব হয় না, কেহ কেহ খুব কম সময়ের জন্য আসেন। মাদ্রাজ প্রদেশের বিখ্যাত তীর্থগুলির নাম—কাঞ্চী, চিদাম্বরম্, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা,রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী, এবং প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান মহাবলীপুরম্। মহীশূর প্রদেশের তীর্থস্থান শ্রবণ-বেলেগোলা, বেলুড়, হালিবিদ্, শৃঙ্গেরী ও উডিপী, এবং দ্রষ্টব্য স্থান বৃন্দাবন গার্ডেন, রাজপ্রাসাদ ও যোগ-প্রপাত (Jog Falls) কেরলরাজ্যে প্রধান তীর্থস্থান গুরুবায়ুর ও কালাডী। অন্ধ্রদেশে প্রধান তীর্থস্থান তিরুপতি, শ্রীকালহস্তীশ্বর ও সীমাচলম্। মাদ্রাজরাজ্যের কুম্ভকোণম্ এবং তাঞ্জোরেও অনেকে যান, কারণ উহা রামেশ্বরের পথে পড়ে।

কাঞ্চী

কাঞ্চী (কাঞ্চীপুরম্) মাদ্রাজ হ'তে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত তিন সম্প্রদায়েরই মহাতীর্থস্থান। কাঞ্চী সহরের যে অংশে শিবমন্দির অবস্থিত উহাকে শিবকাঞ্চী এবং যে অঞ্চলে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত উহাকে বিষ্ণুকাঞ্চী বলে—উভয়ের দূরত্ব দু-মাইল। শিবের নাম একাম্বরনাথ বা একাম্বরেশ্বর। ঐ মন্দিরের নিকটই বিখ্যাত দেবীমন্দির—দেবীর নাম কামাক্ষী। কাঞ্চীর কামাক্ষী, মাদুরার মীনাক্ষী এবং কাশীর অন্নপূর্ণা সমভাবেই প্রসিদ্ধ। কামাক্ষী-মন্দিরে একপাশে শ্রীশঙ্করাচার্যের মন্দির আছে। আদিশঙ্কর ওখানে ছিলেন এবং কাঞ্চীতে তিনি কামকোটীপীঠম্ নামে মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠ বিষ্ণুকাঞ্চীতে অবস্থিত, এবং বর্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করাচার্য খুব প্রাচীন ও পণ্ডিত সাধু, বহুলোকে তাঁকে দর্শন করতে যান। বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদারাজ স্বামীর বিখ্যাত মন্দির। দোতালার উপর সুন্দর দণ্ডায়মান কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। বৈষ্ণবদের ইহা একটি প্রধান তীর্থস্থান। মাদ্রাজ হ'তে প্রতি একঘণ্টা অন্তর কাঞ্চীতে বাস যায়—ভাড়া প্রায় ১৷৹। একাম্বরনাথের মন্দিরে গোপুরম্ বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের সব মন্দিরের গোপুরম্ হ'তে উঁচু। ফিরবার সময় মাঝামাঝি পথে শ্রীরামানুজের জন্মস্থান পড়ে—স্থানটির নাম শ্রীপেরাম্বুদুর—এখানেও মন্দির আছে, মাদ্রাজ হ'তে দূরত্ব ২৪ মাইল। মাদ্রাজ হ'তে ট্রেনেও চিঙ্গলপুট হয়ে কাঞ্চী যাওয়া যায়। চিঙ্গলপুট হ'তে কাঞ্চী ১৮ মাইল।

পক্ষিতীর্থ

চিঙ্গলপুটের অন্য দিকে ৯ মাইল দূরে পক্ষিতীর্থ নামে পাহাড়ের উপর একটি তীর্থ আছে। এখানে রোজ দুপুর ১১৷৷ টা হ'তে ১২৷৷ টার মধ্যে দুইটি পাখী আসেন। এঁদের পূজা করা হয় ও খাবার দেওয়া হয়—পুরোহিতের হাত থেকে এঁরা ভোগ খেয়ে যান—বাটী করেও দেওয়া হয়, ৭০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হয়। আরও কিছু ওপরে বেদগিরি নামক শিবের

মন্দির আছে। প্রত্যহ ২।৩ শত যাত্রী এখানে যান। কখনও কখনও আবার একটি পাখী আসেন এবং কদাচিৎ একজনকেও দেখা যায় না। কেহ কেহ তিনটি পাখী দেখেছেন, বলেন। বৃদ্ধ ও অশক্ত যাত্রীরা ডাণ্ডী ক'রে ওপরে উঠতে পারেন। পাহাড়ের পাদদেশে গ্রামের নাম 'তিরুক্কুলিকুণ্ডরম্', মাদ্রাজ হ'তে দূরত্ব ৪৫ মাইল। সকাল ৭টা নাগাদ বাসে চড়লে ১০টা নাগাদ এখানে পৌছে গ্রামের মন্দির দর্শন ক'রে 'পক্ষী' দেখার জন্য পাহাড়ের উপর যাওয়া যায়।

মহাবলীপুরম্

পক্ষিতীর্থ হ'তে ৯ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে মহাবলীপুরম্ অবস্থিত। দেশবিদেশ হ'তে বহু লোক এর ভাস্কর্য দেখতে আসেন। কেহ কেহ এটিকে এই অঞ্চলের ইলোরা বলেন। পাহাড়ের গা কেটে কি সুন্দর সুন্দর মূর্তিই না এখানে খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছে! দেখলে সত্যই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। দেড় ফার্লং দূরে পাঁচটি ছোট পাহাড় কেটে পঞ্চরথ করা হয়েছে—ভারি সুন্দর দেখতে। সমুদ্রের কিনারায় একটি ছোট বিষ্ণু-মন্দির আছে এবং গ্রামের মাঝখানেও বড় বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যাত্রীদের জন্য একটি বাংলো নির্মাণ করেছেন—দৈনিক চার্জ ৫৲ টাকা। মাদ্রাজ হ'তে সকালে বাসে বেরুলে প্রথমে পক্ষিতীর্থ ও পরে মহাবলী-পুরম্ দেখে ঐদিনই সন্ধ্যায় মাদ্রাজে ফেরা যায়—ভাড়া যাতায়াত ৩৲ টাকার মত। রবিবারে গভর্ণমেণ্ট বাস যায় এবং আগে থেকেই আসন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে,—বাস ঐ দুটি জায়গা দেখিয়ে সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মাদ্রাজে জর্জ টাউনে ফলের বাজার (Fruit-Market) হ'তে মহাবলীপুরম্ পক্ষিতীর্থ, কাঞ্চী প্রভৃতির বাস সকালে ছাড়ে। মাদ্রাজ সহরকে কেন্দ্র ক'রে এই তিনটি স্থান দেখে নেওয়া ভাল।

চিদাম্বরম্

চিদাম্বরম্ শৈবদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। কেহ কেহ একে দাক্ষিণাত্যের কাশী বলেন। শিবের বিখ্যাত নটরাজ মূর্তি—ভারি সুন্দর। হাজার হাজার যাত্রী রোজ এই মন্দির দর্শনে যান। মাদ্রাজ হ'তে চিদাম্বরমের দূরত্ব ১৫১ মাইল, ৺রামেশ্বর লাইনে এটি একটি বড় ষ্টেশন। ষ্টেশন হ'তে মন্দির পৌনে এক মাইল। ষ্টেশনের কাছেই মারোয়াড়ী ধর্মশালা আছে—সকলেই থাকতে পারেন। তা ছাড়া ষ্টেশনের 'লেফ্‌ট্ লগেজ রুমে' জিনিস রেখেও মন্দির দর্শন ক'রে আসা যায়। দাক্ষিণাত্যে শিবের পাঁচটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ-মহাভূতের প্রতীক। নটরাজের মন্দিরের সংলগ্ন নটরাজের ডানদিকে শিবের ব্যোম বা আকাশ লিঙ্গ—আকাশের যেমন রূপ নেই, এখানেও সেরূপ কোন প্রতীক নেই। পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে—মাঝে মাঝে ঝাঁকি-দর্শনের মত পুরোহিতরা পর্দা খুললে শূন্যের মত দেখা যায়। কাঞ্চীতে একাম্বরনাথের লিঙ্গকে ক্ষিতি বা পৃথিবী লিঙ্গ বলা হয়। কথিত আছে পার্বতী দেবী নিজে এখানে বালির শিবলিঙ্গ গড়ে পূজা করেছিলেন। বাকী তিনটি লিঙ্গের মধ্যে তিরুবানামালাইএ তেজ লিঙ্গ, ত্রিচিনাপল্লীতে অপ্-লিঙ্গ—নাম জম্বুকেশ্বর এবং কালহস্তীতে মরুৎ বা বায়ু-লিঙ্গ নাম শ্রীকালহস্তীশ্বর। চিদাম্বরমের মন্দির খুবই পুরাতন এবং শ্রীজ্ঞানসম্বন্ধর্ প্রমুখ অনেক শৈব সাধু এই মন্দির দর্শন করেছেন। ডিসেম্বরের শেষে এই মন্দিরে 'অরুদ্র দর্শন' নামে বিরাট উৎসব হয়। ঐ সময় লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। চিদাম্বরম্ হ'তে তিন মাইল দূরে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তীর্ণ এলাকার উপর অবস্থিত।

ত্রিচিনাপল্লী

চিদাম্বরম্ হ'তে প্রায় ১০০ মাইল দূরে ত্রিচিনাপল্লী সহর অবস্থিত, মাদ্রাজ হ'তে দূরত্ব ২৪৯ মাইল, কর্ড লাইন দিয়ে গেলে ২০৯ মাইল। এটি মাদ্রাজ প্রদেশের চতুর্থ বৃহৎ সহর এবং একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। ইহার প্রধান দ্রষ্টব্য শ্রীরঙ্গম্—রঙ্গনাথজীর শয়ানমূর্তি। বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। ত্রিচিনাপল্লী জংশন ষ্টেশন হ'তে দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। জংশন ষ্টেশন হ'তে ১নং বাসে উঠলে একেবারে মন্দিরের দরজায় নামা যায়। মন্দিরের মধ্যেই ২।৩টি ধর্মশালা আছে, তন্মধ্যে মঙ্গনীরাম বাংগোডের ধর্মশালা বিখ্যাত। সকলেই সেখানে থাকতে পাবেন। রান্নার ব্যবস্থাও আছে—হোটেলও নিকটেই। মন্দিরের প্রবেশদ্বার হ'তে কাবেরী নদীর দূরত্ব এক মাইল, বাস পাওয়া যায়। সকাল ৭টায় হাতীর পিঠে ক'রে কাবেরী নদীর জল নিয়ে এসে সেই জল দিয়ে ঠিক ৭॥ টায় ভগবানের অভিষেক হয়। পূর্ব হ'তেই ভজন শুরু হয়—মাঝে মাঝে পর্দা খুলে ঝাঁকি-দর্শন করানো হয়—পরে সব যাত্রীরা গিয়ে দর্শন করতে পারেন। সোনার দাঁড়ানো উৎসব-বিগ্রহ এবং দুপাশে শ্রীদেবী ও ভূদেবী। মন্দিরের ওপরে সোনার চূড়া। বিশিষ্ট যাত্রীদের ওপরেও নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল ৯॥ টায় পূজা আরম্ভ হয়। কথিত আছে শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমতী আণ্ডাল এখানে শ্রীরঙ্গনাথজীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন, মন্দিরের দুপাশে রামানুজের ও আণ্ডালের ছোট মন্দিরও আছে। শ্রীরামানুজের ঐ স্থানেই সমাধি হয়। পাঁচ-চত্বর মন্দির এবং ১৬।১৭টি গোপুরম্। ভেতর-দিকে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। সকাল ৭টায় মন্দির-খোলা দর্শন ক'রে, জম্বুকেশ্বর দর্শন করা যায়—দূরত্ব এক মাইল এবং রঙ্গনাথজীর মন্দির হ'তে জংশন ষ্টেশনে যেতে উহা পথে পড়ে—১নং বাসেই যাওয়া যায়। পূর্বেই বলেছি জম্বুকেশ্বর পাঁচটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম, অপ্ লিঙ্গ। মন্দিরের মধ্যে সব সময় জল থাকে—কখনও কখনও শিবলিঙ্গ পর্যন্ত জলে ডুবে যান। যাঁরা কাবেরীতে স্নান করতে চান তাঁরা শ্রীরঙ্গম মন্দির হ'তে বাসে বা পদব্রজে গিয়ে স্নান ক'রে আসতে পারেন—এক মাইল মাত্র দূর। বাঁধানো ঘাট আছে। ত্রিচিনাপল্লী সহরে আর একটি প্রধান দ্রষ্টব্য রকফোর্ট টেম্পল (Rock Fort Temple)। ইহাও জংশন ষ্টেশন হ'তে ১নং বাসের রাস্তায় পড়ে। ছোট পাহাড়ের উপর গণেশের মন্দির। প্রায় ৪৫০ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হয়। ওপরে উঠলে সমস্ত ত্রিচিনাপল্লী সহরের ও কাবেরী নদীর অতি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। সকালে বা বিকালে ওপরে ওঠাই ভাল—দুপুরের দিকে গেলে রৌদ্রে কষ্ট হয়।

মাদুরা

মাদুরা মাদ্রাজ প্রদেশের প্রাচীনতম দ্বিতীয় বড় সহর, মাদ্রাজ সহর হ'তে দূরত্ব ৩০৫ মাইল। মাদুরা রেলষ্টেশনের খুব কাছেই মঙ্গনীরাম বাংগোডের ধর্মশালা আছে—এখানে যাত্রীরা থাকতে পাবেন। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, ষ্টেশন হ'তে দূরত্ব প্রায় এক মাইল। চারদিকে চারটি বিরাট গোপুরম্ আছে। দেবী খুব জাগ্রতা, বহু সহস্র লোক প্রত্যহ তাঁকে দর্শন করেন, মন্দিরের মধ্যে ঢুকলে গোলক-ধাঁধার মত মনে হয়। মন্দিরের মধ্যে বড় বাজার আছে। একদিকে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, অপর দিকে সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে পাথরের যে সব স্তম্ভ আছে তার কারুকার্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্তি পাথর কেটে খোদাই করা হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে

এইসব দেখলে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। সহস্র স্তম্ভের মণ্ডপও এখানে আছে।

এই মন্দিরের এক মাইল দূরে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির আছে। মাদুরার রাজা নায়েকদের প্রাসাদও দেখবার মত। সহরের একপাশে একটি সুন্দর হ্রদ আছে—অনেকে সেটি দেখতে যান। মাদুরার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষের উপর।

রামেশ্বর

মাদুরা হ'তে ৺রামেশ্বর পর্যন্ত সোজা ট্রেন আছে। মাদ্রাজ হ'তে রামেশ্বরম্ ৪১৬ মাইল। অনেকের ধারণা সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর একই জায়গা, কিন্তু তা ঠিক নয়। ট্রেনে গেলে রামেশ্বর হ'তে সেতুবন্ধ ২৬ মাইল। রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন ধনুষ্কোটী হতে সেতুবন্ধ প্রায় আধ মাইল। হেঁটেই যেতে হয়, কখনও কখনও গরুর গাড়ীও পাওয়া যায়। ষ্টেশনে জিনিসপত্র রেখে সেতুবন্ধে স্নান ক'রে আসা যায়। অনেকে এখানে শ্রাদ্ধাদিও করেন। কথিত আছে—এখানেই শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিছিলেন—অবশ্য এখন কোনও চিহ্ন নাই। এখানে ভারত-মহাসাগর ও বঙ্গোপ-সাগর মিলিত হয়েছে—দৃশ্য মনোহর। সমুদ্রে স্নান এখানে খুব আরামদায়ক। কোনও ভয় নেই। এখান হ'তে এক মাইল দূরে ধনুষ্কোটী পিয়ার ষ্টেশন। সেখান হতে সিলোনের (লঙ্কা) জাহাজ ছাড়ে, মাত্র ২৪ মাইল। ধনুষ্কোটী ষ্টেশনের সংলগ্ন হোটেল আছে।

মেন লাইনের পাম্বান ষ্টেশন হ'তে রামেশ্বর পর্যন্ত একটি শাখা লাইন আছে—১০ মাইল দূরত্ব। ষ্টেশন হ'তে মন্দির প্রায় এক মাইল। এখানে ৩৪টি ধর্মশালা আছে। মন্দিরের অতিথি-ভবনেই থাকা সুবিধাজনক। মন্দিরের কার্যাধ্যক্ষকে বলে তার ব্যবস্থা করতে হয়। সামান্য ভাড়া দিতে হয়। ঠিক ভোর পাঁচটায় মন্দির খোলা হয়—ঐ সময় মন্দিরে একটি গরু নিয়ে এসে দুধ দুয়ে সেই দুধে স্ফটিক-লিঙ্গের স্নান হয়। অন্য কোনও সময় ঐ স্ফটিক-লিঙ্গের দর্শন হয় না। রামেশ্বরের মন্দিরও বিরাট। ৺রামেশ্বর শিবের পাশেই বিশ্বনাথের মন্দির। কথিত আছে, সীতাদেবী রামেশ্বরের মূর্তি গড়ে লঙ্কা থেকে ফিরবার পথে এখানে শিবের পূজা করেছিলেন। অন্যদিকে (পার্বতী) দেবীর মন্দির। রাত ৯টায় সময় বাদ্যাদি সহকারে ৺রামেশ্বর এখানে শয়ন করতে আসেন, দেখবার মত। বহু স্তবাদি ঐ সময় পাঠ করা হয়। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি কূয়া আছে—বিভিন্ন তীর্থ নামে অভিহিত—ঐগুলির সংখ্যা চব্বিশ। কোনটি সহস্রতীর্থ, কোনটি কোটিতীর্থ ইত্যাদি। অনেক যাত্রী এইসব তীর্থেই স্নান করেন। কূয়ার জল খুব নিকটেই। সমুদ্র খুব কাছে, এক ফার্লং মাত্র। সমুদ্র-স্নানও অনেকে করেন। মন্দিরের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের এক পাশে শ্রীশঙ্করাচার্যের ছোট মন্দির আছে, প্রত্যহ পূজাদি হয়। এক মাইলের মধ্যে রামতীর্থ, সীতাতীর্থ ও লক্ষ্মণতীর্থ নামে তিনটি সরোবর আছে—ছোট মন্দিরও রয়েছে।

কন্যাকুমারী

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দির অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত। ভারত-মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব-সাগর—এই তিনটি সমুদ্র এখানে একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয়। একেবারে সমুদ্রের প্রায় ওপরেই দেবী কন্যাকুমারিকার মন্দির অবস্থিত। পাথরের দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তি অতি সুঠাম ও সুন্দর। দর্শনমাত্রেই মন অপূর্ব ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। মায়ের অভিষেক (স্নান) ও আরতি বিশেষ দ্রষ্টব্য। পূজাদি দিতে হ'লে প্রথমে

অফিসে নির্দিষ্ট পয়সা জমা দিয়ে রসিদ নিতে হয়। ঐ রসিদ না দেখলে পুজারী কোনও পূজার সামগ্রী গ্রহণ বা নিবেদন করেন না। পুরুষ মানুষের জামা-গায়ে অথবা প্যাণ্ট পরে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ—এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়াকড়ি। মন্দির থেকে এক ফার্লং দূরে সমুদ্রের মধ্যে দুইটি পাহাড় দেখা যায়। তন্মধ্যে দূরেরটি 'বিবেকানন্দ রক্' নামে পরিচিত। এই শিলাখণ্ডের ওপর স্বামী বিবেকানন্দ এক রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং এখানে বসেই শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি ভবিষ্যৎ কাজের।

সমুদ্রের ধারে জেলেদের বাস। তাদের ৪।৫ টাকা দিলে তারা কাটামারানে (তিনটি কাঠ জুড়ে এক প্রকার নৌকা বিশেষ) ক'রে 'বিবেকানন্দ রকে' নিয়ে যায়। কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর নামে একটি লাইব্রেরিও আছে। মন্দিরের অতিথি-ভবনে দৈনিক দু টাকা দিয়ে যাত্রীরা থাকতে পারেন। সাধারণের জন্য ধর্মশালা বা চৌলট্রিও আছে। দু ফার্লং দূরে ষ্টেট গেষ্ট হাউস ও হোটেল আছে—সেখানে দৈনিক চার্জ ৮।৯ টাকা। ত্রিবান্দ্রম্ সহর বা টিন্নিভেলী সহর হ'তে বাসে কন্যাকুমারী যেতে হয়। উভয় স্থান হ'তেই কন্যাকুমারীর দূরত্ব ৫০ মাইল, ভাড়া ১৸০ আন্দাজ।

কন্যাকুমারীর ৮ মাইল আগে সুচীন্দ্রম্ টেম্পল নামে একটি বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির আছে। একই বিরাট মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ছোট ছোট মন্দির আছে। কন্যাকুমারীতে অবস্থানকালেই সেখান থেকে বাসে গিয়ে ঐ মন্দির দেখে আসা যায়। আধ-ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে।

এই সব বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি ছাড়া মাদ্রাজ প্রদেশে তিরুচান্দুর তিরুবান্নামালাই, তিরুবারুর, পাল্‌নি প্রভৃতি স্থানেও বিখ্যাত মন্দির আছে।

কেরলের তীর্থ

কেরল প্রদেশে তিনটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ত্রিবান্দ্রম্ সহরে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির (বিষ্ণুর বিরাট শয়ান মূর্তি)। এটি ত্রিবান্দ্রম্ রাজার ব্যক্তিগত মন্দির, তবে প্রত্যেক দিন সকাল ৯টার পর ও সন্ধ্যার সময় সর্বসাধারণে দর্শন করতে পারে। ত্রিবান্দ্রম্ হ'তে প্রায় ১৫০ মাইল বাসে গেলে কোচিনের রাজধানী এর্ণাকুলমে যাওয়া যায়। পশ্চিম উপকূল দিয়ে এই ১৫০ মাইল যেতে অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে। ব্যাক-ওয়াটার দিয়ে কেহ কেহ নৌকা বা ছোট ষ্টীমারেও যান। গভর্মেণ্ট বাসে যাত্রা খুব আরামদায়ক। ভাড়া ৭৷৷০ টাকা। এর্ণাকুলম্ হ'তে কোচিন বন্দর খুব কাছেই—ইচ্ছা করলে দেখা যেতে পারে। কোচিন বা এর্ণাকুলম হ'তে ট্রেনে ১৬ও ১৭ মাইল দূরে আঙ্গামালী ষ্টেশন থেকে শ্রীশঙ্করের জন্মস্থান কালাডী যাওয়া যায়। নদীর তীরে শ্রীশঙ্করের ও তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীসারদা দেবীর দুইটি সুন্দর মন্দির আছে। কাছেই শ্রীকৃষ্ণের পুরাতন মন্দির বিদ্যমান। কালাডীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও শঙ্কর কলেজও দ্রষ্টব্য।

কালাডী থেকে বাসে ত্রিশ মাইল গেলে ত্রিচুর সহরে পৌছানো যায়। এখানে একটি বিখ্যাত শিবমন্দির আছে। ত্রিচুর হতে বাসে গুরুবায়ুর বিখ্যাত মন্দির পাওয়া যায়। দূরত্ব ২৪।২৫ মাইল। এখানকার শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বিখ্যাত। হাজার হাজার যাত্রী দর্শন করেন। সমগ্র কেরল প্রদেশে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির।

মহীশূর

মহীশূর সহরের কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর বিখ্যাত চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। পাহাড়টির নামই চামুণ্ডী পাহাড়—সহর থেকে বাসে বা পদব্রজে যাওয়া যায়, দর্শন ক'রে নামবার সময়

পাহাড়ে একটি বিরাট ষাঁড়ের মূর্তি শয়ান অবস্থায় দেখা যায়, তার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ফুট এবং উচ্চতা ১০ ফুট। কালো পাথরের বিরাট মূর্তি—ভারি সুন্দর। মহীশূরের মহারাজার প্রাসাদ দেখবার জিনিস। শনি ও রবিবারে প্রাসাদ দেখা যায়—প্রাসাদের অফিস থেকে পাস নিয়ে যেতে হয়। সহরের দশ মাইল দূরে 'বৃন্দাবন গার্ডেনস্' অতি সুন্দর পুষ্পোদ্যান। এখানে একটি হোটেলও আছে—অবশ্য চার্জ খুব বেশী। শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় এই পুষ্পোদ্যান নানা রকম রং-এর আলোকমালায় ভূষিত করা হয়। অসংখ্য জলের ফোয়ারার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রং-এর আলো ও অসংখ্য পুষ্পরাজি দেখলে মনে হয় মর্ত্যে স্বর্গের আবিভাব হয়েছে। কাজেই মহীশূর সহরে শনি বা রবিবারে যাওযাই উচিত। মহীশূরের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 'দশেরা' উৎসব। ঐ সময় রাজপ্রাসাদ লক্ষ লক্ষ আলোকমালায় সজ্জিত হয়। মহারাজার দরবার ও বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভুলতে পারবেন না। ঐ সময় কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। অবশ্য ঐ সময় বাসস্থান পাওয়া খুবই মুস্কিল। এখানকার পশুশালাও বেশ বড।

মহীশূর রাজ্যের প্রধান তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে শ্রবণ-বেলে-গোলা, বেলুড়, হালিবিদ্, শৃঙ্গেরী ও যোগ-প্রপাত (Jog falls) ও উড়িপী। মহীশূর সহর হ'তে ৭৪ মাইল ট্রেনে গেলে হাসান সহর পড়ে। এখান থেকে ৩২ মাইল দূরে শ্রবণ-বেলে-গোলা—বাসে যেতে হয়। এখানে পাহাড়ের ওপর ৫৬ ফুট দীর্ঘ জৈন তীর্থঙ্কর বাহুবলীর বিরাট দণ্ডায়মান সুন্দর নগ্ন মূর্তি। একটি পাথর কেটে এই মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। মুখের ভাব ভারি সৌম্য ও কমনীয়, বালক-মূর্তি। প্রায় ৬৫০ সিঁড়ি ভেঙ্গে এই পাহাড়ের উপর উঠতে হয়।

এখান হ'তে পুনরায় হাসান হয়ে বাসে বেলুড় যাওয়া যায়। এখানে চেন্নাকেশবম্ বিষ্ণুর অতি সুন্দর কালো পাথরের বিরাট দণ্ডায়মান মূর্তি, বহু প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের কারুকার্য অতুলনীয়। এখান হ'তে হালিবিদের দূরত্ব ১০।১১ মাইল—বাসে যেতে হয়, শিবের মন্দির। জৈনদেরও মন্দির আছে। বেলুড় ও হালিবিদের অপূর্ব কারুকার্য দেখতেই বহু যাত্রী আসেন।

বেলুড় হ'তে বাসে চিকমাগলোর ও কোপ্পা হয়ে শৃঙ্গেরী যেতে হয়—দূরত্ব ১২০ মাইল। পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাস-রুট, অতি সুন্দর দৃশ্য। দশনামী সাধুদের এটি একটি প্রধান তীর্থ, কারণ শ্রীশঙ্কর এই স্থানের সৌন্দর্য গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা দেখে মুগ্ধ হন, এবং এখানে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীসারদাদেবীর মন্দির নির্মাণ ক'রে শ্রীচক্র স্থাপন করেন। শ্রীশঙ্কর ভারতের চারদিকে যে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন তাদেব মধ্যে এটি অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই মঠের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশ্বরাচার্যের সমাধিও এখানে রয়েছে। এই মঠের অধ্যক্ষকে শঙ্করাচার্য বলা হয়। খুব পণ্ডিত এবং ত্যাগবৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকেই অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মন্দিরের অতিথি-ভবনে যে কোনও যাত্রী তিন দিন থাকতে পারেন। শৃঙ্গেরী একটি ছোটখাটো সহর, এখানে শ্রীশঙ্করের এবং শিবের মন্দির আছে। পাহাড়ের উপরও একটি শিবমন্দির আছে। ২৫৪ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। শৃঙ্গেরী থেকে শিমোগা সহরে বাসে এসে এখান থেকে বাসে সোজা যোগ-প্রপাতে যাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত জলপ্রপাত। জলপ্রপাতের পাশেই ডাকবাংলো আছে—সেখানে যাত্রীরা থাকতে পারেন। এখানে যে

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা সমগ্র মহীশূর প্রদেশে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু অংশ বোম্বাই প্রদেশেও যায়। ১০০০ ফিট্ নীচে ট্রলি দিয়ে নামলে পাওয়ার হাউস দেখা যায়।

যোগপ্রপাত দেখার পর বাসে শিমোগা হয়ে উডিপী যাওয়া যায়। শিমোগা হ'তে উডিপীর বাস ভাড়া প্রায় ৬৲ টাকা। মাঙ্গালোর সহর থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে উডিপীর দূরত্ব ৩৭ মাইল—বাসে যাওয়া যায়। এখানে দ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য শ্রীমধ্ব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ অসংখ্য যাত্রী এই মন্দির দর্শন করেন। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের পাশেই শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বর নামে দুটি শিবমন্দির আছে। শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের একদিকে শ্রীমধ্বাচার্য-প্রবর্তিত সাধু-সম্প্রদায়ের ৮টি মঠ আছে। উডিপী থেকে ৩ মাইল দূরে আরবসাগরের উপর মালপে নামক স্থানে বলরামের একটি পুরাতন মন্দির আছে। উডিপী হ'তে পুনরায় বাসে মাঙ্গালোর এসে সেখান থেকে ট্রেনে সোজা মাদ্রাজ পৌঁছানো যায়। মাঙ্গালোর হ'তে মাদ্রাজের দূরত্ব ৫৫১ মাইল—ভাড়া প্রায় ১৮৲ টাকা। বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাঙ্গালোর হ'তে বোম্বাই পর্যন্ত ষ্টীমারেও যাওয়া যায়।

অন্ধ্রদেশে

ভিজাগাপটম্ (বিশাখাপত্তনম্) সহর হ'তে বাসে ৯ মাইল গেলে সীমাচলম্ পৌঁছানো যায়। পাহাড়ের উপর বিখ্যাত শিবের মন্দির। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। সীমাচলম্ রেলষ্টেশনও আছে। কলিকাতা মাদ্রাজের প্রায় মধ্য পথে ওয়াল্টেয়ার জংসন পড়ে। এখান থেকে ভিজাগাপটনম্ সহর মাত্র ৩ মাইল, ট্রেনে যাওয়া যায়। ভিজাগাপটনমে জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা ও বন্দর দেখাবার মত।

তিরুপতিবালাজী

তিরুপতি অন্ধ্রদেশের সব থেকে বিখ্যাত তীর্থ। মাদ্রাজ সহর হ'তে এর দূরত্ব ১০২ মাইল। মাদ্রাজ থেকে বাসে বা ট্রেনে তিরুপতি যাওয়া যায়। মাদ্রাজ বোম্বাই মেন লাইনের রেনিগুণ্টা জংশনে গাড়ী বদল করে তিরুপতি যেতে হয়। রেনিগুণ্টা হ'তে তিরুপতি-ইষ্ট্ ষ্টেশন মাত্র ৫ মাইল। ষ্টেশনের কাছেই মন্দিরের বিরাট বিরাট ধর্মশালা আছে এবং এখান থেকেই বাসে পাহাড়ের উপর বালাজীর মন্দিরে যাওয়া যায়, দূরত্ব ১২ মাইল এবং ৩০০০ ফিট উঁচু। দেবতার নাম 'বালাজী' বা ভেঙ্কটেশ্বর। বিষ্ণু-মন্দির—কালো পাথরের দণ্ডায়মান ৭।৮ ফিট উঁচু অতি সুন্দর মূর্তি। হাজার হাজার যাত্রী এই মন্দির প্রত্যহ দর্শন করেন। যেখানে মন্দির আছে পাহাড়ের ওপর ঐ স্থানটির নাম তিরুমালা। এখানেও অনেক চৌলট্রি আছে। তিন দিনের জন্য বা এক দিনের জন্য মন্দিরের ধর্মশালা ভাড়া পাওয়া যায়। হোটেলও আছে। এটি ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে ধনী মন্দির, মাসে আড়াই লক্ষ টাকা প্রণামী পড়ে। দেবতার গায়ে প্রায় কোটী টাকার গহনা আছে। ঠিক ভোর ৫ টায় ভগবানকে জাগানো হয় ও মন্দির খোলা হয়। ঐ সময় 'সুপ্রভাতম্' নামে অতি সুমিষ্ট সংস্কৃত স্তব ব্রাহ্মণরা পাঠ করেন। ঐ সময়ে মন্দিরের ভাব অতি প্রশান্ত, গম্ভীর ও দিব্য। অনেক যাত্রী ঐ সময় মন্দিরে যান। দুপুর ১২ টায় ও সন্ধ্যায় সাধারণের জন্য 'ধর্মদর্শন' হয়—লম্বা লাইন দিয়ে বহু যাত্রী ঐ সময় দেবতার দর্শন করেন। বন্দোবস্ত খুব ভাল। মন্দিরের শীর্ষ সোনার পাত দিয়ে মোড়া। হনুমানের উৎপাত খুব বেশী।৵ প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়।

প্রতি শুক্রবার সকালে ভগবানের অভিষেক হয়—ঐ সময় দেবতার আসল মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার রাতে দেবতার গহনা ইত্যাদি খুলে ফেলা হয়, ঐ সময়ও আসল মূর্তি দেখা যায়। তিরুমালা পাহাড়ের উপর জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটা নিষিদ্ধ। নীচে তিরু-পতিতে মন্দিরের অফিসে জুতা রেখে টিকিট নিয়ে যাওয়া যায়। মন্দিরের যে পুষ্করিণী আছে তার এক কোণে ভগবানের বরাহ-মূর্তির ছোট মন্দির আছে—কথিত আছে ওখানেই ভগবান প্রথম আবির্ভূত হন। মন্দিরের চত্বরের ভেতরে একদিকে অনেক সুন্দর তৈলচিত্র আছে—তাতে দেবতার আবির্ভাবের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

তিরুমালা হ'তে ২॥ মাইল দূরে পাপ-নাশনম্ বলে একটি জলপ্রপাত আছে। হেঁটে যেতে হয়—রাস্তা খুব ভাল নয়। অনেকে ঐখানে যান ও স্নান করেন। মধ্যপথে আকাশ-গঙ্গা নামে একটি ছোট প্রপাত আছে। পূর্বেই বলেছি নীচে সহরের নাম তিরুপতি—বড় সহর। এখানে গোবিন্দরাজের বিখ্যাত মন্দির আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তিরুপতি হ'তে ২॥ মাইল দূরে তিরুচানুর নামক স্থানে দেবীর মন্দির—ঘোড়ার গাড়ীতে বা বাসে যাওয়া যায়।

শ্রীকালহস্তীশ্বর

তিরুপতি থেকে বাসে মাদ্রাজের দিকে ২৪ মাইল এলে কালহস্তীতে পৌছানো যায়। শ্রীকালহস্তীশ্বরের বিরাট মন্দির এখানে আছে। শিবের পাঁচটি জ্যোতির্লিঙ্গের কথা যা পূর্বে বলেছি তন্মধ্যে এটি বায়ুলিঙ্গ, খুব প্রাচীন মন্দির। শ্রী (মাকড়সা), কাল (সর্প) ও হস্তী এই তিনটি প্রাণী এখানে মুক্তিলাভ করেছিল বলে ভগবানের নাম শ্রীকালহস্তীশ্বর। গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বারে বহু প্রদীপ জ্বলে—সেখানে বাতাসের কোন অধিকার নাই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দুটি প্রধান প্রদীপের শিখা সর্বদাই নড়িতেছে। প্রবেশ-দ্বারের বাম দিকে 'শ্রীকানাপ্পা নয়নার' নামক বিখ্যাত শিবভক্তের মূর্তি আছে। মন্দিরের তলা দিয়ে স্বর্ণমুখী নদী প্রবাহিত। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরও দুপুর ১২টা হ'তে বিকাল ৪॥টা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এক আনা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। কালহস্তী থেকে বাসে মাদ্রাজ সহর ৬০ মাইল। কালহস্তী রেল ষ্টেশনও আছে—ট্রেনেও মাদ্রাজ আসা যায়, তবে ঘোরা পথ।

যাত্রার বিবরণ

এতক্ষণ প্রধান তীর্থস্থানসমূহের পরিচয় দেওয়া হ'ল। এবার যাত্রার বিবরণ দিচ্ছি।

যাঁরা কেবল দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শন করতে চান, তাঁরা মাদ্রাজ পর্যন্ত এসে এখানে ষ্টাণ্ডার্ড সার্কুলার টুর টিকেট কিনতে পারেন। তিন-চতুর্থাংশ ভাড়ায় এই টিকেট সব সময় পাওয়া যায়, এর মেয়াদ তিন মাস। সব ক্লাসের জন্যই এই টিকিট পাওয়া যায়। তিন নম্বর টুর (Tour No III) টিকিট কিনলে মাদ্রাজ, কালহস্তী, তিরুপতি, বান্নামালাই, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোণম্, ত্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটী, মাদুরা, পালনি, শ্রীরঙ্গম্, বাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি দেখে আবার মাদ্রাজে ফেরা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া মাত্র ৩৮৲ টাকা। কেবল পশ্চিম উপকূল বাকী থাকে, কিন্তু মাদুরা হ'তে টিনিভেলী পর্যন্ত আলাদা টিকিট ক'রে সেখান থেকে বাসে কন্যাকুমারী ও সুচীন্দ্রম্ দর্শন ক'রে আবার মাদুরা ফেরা যায়। মাদ্রাজ হ'তে টিনিভেলীর দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল এবং ভাড়া ৩৷৵৹, মাদুরা হ'তে টিনিভেলী হ'য়ে কন্যা-কুমারী গেলে ১০০ মাইল দূরত্ব কম হয়, কিন্তু ত্রিবান্দ্রম্ হ'য়ে গেলে ১০০ মাইল বেশী।

কলকাতা হ'তে মাদ্রাজের দূরত্ব ১০৩২ মাইল, ভাড়া ৩১।৶০, প্রতি শুক্রবারে হাওড়া হ'তে ঘুমানোর গাড়ী (sleeping coach)-যুক্ত জনতা এক্সপ্রেস রাত ৯-৪৫ মিঃ-এ ছাড়ে—উহা তৃতীয় দিনে বিকাল ৪-৩৫-এ মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌছায়। ১০ দিন আগে উহাতে ঘুমাবার জন্য বার্থ রিজার্ভ করা যায়। প্রতি রাতে ৩৲ টাকা বেশী লাগে। দুই রাত ট্রেনে থাকতে হয়। একটি পুরা বেঞ্চ রিজার্ভ করা যায় এবং ঐ গাড়ীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী মাত্র উঠতে পারেন—বেশ সুবিধাজনক। মাদ্রাজে ষ্টেশনের কাছেই ধর্মশালা আছে, এ ছাড়া অসংখ্য লজ ও হোটেল আছে। মাদ্রাজ সহরের প্রধান দ্রষ্টব্য ময়লাপুরে কপালীশ্বর শিবের মন্দির—সেণ্ট্রাল ষ্টেশন থেকে প্রায় চার মাইল, ২১সি, ৩, ২১ ও ৪ নং বাসে আসা যায়। সমুদ্রের তীরে ট্রিপ্লিকেনে পার্থসারথির মন্দির, ১নং বাসে আসা যায়। মাদ্রাজ সমুদ্র-সৈকত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সুন্দর সৈকত। সেণ্ট্রাল ষ্টেশন থেকে সমুদ্র প্রায় দেড় মাইল। এ ছাড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা (ময়লাপুর ও ত্যাগরাজ-নগরে), থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি, (আড়েয়ারে), চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, প্রভৃতিও অনেকে দেখেন। ময়লাপুরে কপালীশ্বর মন্দিরের কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। হাইকোর্টের ওপরে একটি বাতিঘর (Light house) আছে, অফিস-সময়ে ৵০ আনা দর্শনী দিয়ে উপরে উঠলে সমগ্র মাদ্রাজ সহরের ও পোতাশ্রয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। প্রায় ৩৫০ সিঁড়ি আছে—সকলেই উঠতে পারেন।

দক্ষিণে যেতে হ'লে এগ্‌মোর ষ্টেশনে ট্রেনে উঠতে হয়—এখান থেকে মিটার গেজের ট্রেন ছাড়ে। বাঙ্গালোর, মাঙ্গালোর, উটাকামণ্ড ও কোচিন যেতে হ'লে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হ'তে ব্রড গেজ লাইনে যেতে হয়। সেণ্ট্রাল ও এগ্‌মোর ষ্টেশনের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। এগমোর থেকে রামেশ্বরম্ বা ধনুষ্কোটী যেতে হ'লে পথে চিদাম্বরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশন পড়ে। যাঁরা পূর্বোল্লিখিত ষ্টাণ্ডার্ড টুর টিকেট কিনে যান তাঁদের ঐ রুটে যে সব ষ্টেশন পড়ে তার যেখানে ইচ্ছা তাঁরা নামতে পারেন।

যাঁরা টুর টিকেট না ক'রে এমনি টিকেট কিনে যান তাঁদের পক্ষে প্রথমে মাদ্রাজ থেকে টিন্নিভেলী (দূরত্ব ৪০২ মাইল, ভাড়া আন্দাজ ১৪৲ টাকা) গিয়ে ওখান হ'তে বাসে কন্যাকুমারী দর্শন ক'রে আবার টিন্নিভেলী ফিরে এসে ওখান থেকে ট্রেনে মাদুরা (৯৭ মাইল) এসে ওখানে ৺মীনাক্ষী দেবী দর্শন ক'রে, মাদুরা হ'তে ট্রেনে সোজা রামেশ্বরম্ যাওয়া ভাল। গাড়ী বদল করতে হয় না। রামেশ্বরম্ হ'তে রওনা হয়ে পাম্বান জংশনে গাড়ী বদল ক'রে ধনুষ্কোটী সকালে গিয়ে সেতুবন্ধে স্নানের পর দুপুর একটায় বোট মেল ধরে রাত আন্দাজ ৯টায় ত্রিচিনাপল্লী জংশনে পৌছানো যায়। রাত্রে শ্রীরঙ্গমে ধর্মশালায় থেকে পরের দিন দর্শনাদি ক'রে, ফিরবার পথে তাঞ্জোর ও কুম্ভকোণম্ দর্শন ক'রে চিদাম্বরম্ আসা যায়। ত্রিচিনাপল্লী হ'তে তাঞ্জোর মাত্র ৩১ মাইল এবং তাঞ্জোর হ'তে কুম্ভকোণম্ ২৪ মাইল, কুম্ভকোণম্ হ'তে চিদাম্বরম ৪২ মাইল, সব মাদ্রাজের দিকে। তাঞ্জোরে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় শ্রীবৃহদীশ্বরন্ মন্দির, সরস্বতী লাইব্রেরী, তার পাশেই যাদুঘর এবং মারাঠাদের রাজপ্রাসাদ। কুম্ভকোণমের প্রধান দ্রষ্টব্য শ্রীকুম্ভেশ্বরের মন্দির ও শারঙ্গপাণির মন্দির। কুম্ভেশ্বরের মন্দিরের সামনে বিরাট পুষ্করিণীতে ১২ বছর অন্তর লক্ষ লক্ষ লোক কুম্ভস্নান করেন, উহাকে 'মহামাঘম্' উৎসব বলে। কুম্ভকোণম্ খুব প্রাচীন সহর, ইহা তাঞ্জোর জিলার একটি তালুক।

ত্রিচিনাপল্লী হ'তে ইরোড ও জলারপেট হয়ে বাঙ্গালোরে যাওয়া যায় এবং বাঙ্গালোর হ'তে মহীশূর—দূরত্ব ৮৬ মাইল। মহীশূর থেকে ১০ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গপট্নম্ও দেখবার জিনিস। এখানে রঙ্গনাথ স্বামীর শয়ান মূর্তি এবং বিরাট মন্দির আছে। টিপু স্থলতানের রাজধানী এখানেই ছিল—প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে।

ত্রিচিনাপল্লী হ'তে ইরোড ও কোয়াম্বাটুর হয়ে উটাকামণ্ডে যাওয়া যায় এবং ত্রিচুর, কালাডী প্রভৃতি স্থানেও ট্রেনে যাওয়া যায়। মহীশূর হ'তেও উটাকামণ্ড পর্যন্ত বাস আছে। সমস্ত বড় বড় সহরের সঙ্গেই বাসের সংযোগ আছে।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপরিক্রমার একটি মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হ'ল। এর দ্বারা যাত্রীদের কোনও প্রকার স্থবিধা হ'লে শ্রম সার্থক মনে করব।

সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ

ডক্টর শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষা যে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এটা বিশেষ আনন্দের বিষয়। ভারত সরকার সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্যে যে কমিশন গঠন করেছিলেন, তাঁরা সম্প্রতি তাঁদের মতামত সরকারকে জানিয়েছেন। লোকসভায় আলোচনা হবার পর কমিশনের মতামত ও প্রস্তাব প্রকাশ করা হবে। কিছুদিন আগেও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিতেরা নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জিত হতেন, উগ্র আধুনিকদের সঙ্গে মিশতে সঙ্কুচিত হতেন। আমরা যখন সংস্কৃতের এম এ ক্লাশে এসে ভর্তি হলুম, তখন কমপক্ষে একশ জনের কাছে—কেন সংস্কৃত নিলুম, এ কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, আর নিন্দা করেছেন আরও একশ জন। আজও যে সে অবস্থার উন্নতি হয়েছে তা বলা চলে না, তবে সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্যে সরকার যে চেষ্টা করছেন, তা অভিনন্দনের দাবি রাখে।

আর্যেরা ইরাণ থেকে এসে যখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন, তখন তাঁদের ভাষা ছিল বৈদিক, এই ভাষাতেই ঋগ্‌বেদের স্থক্তগুলি রচিত হয়েছিল। এঁরা যখন সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে বিস্তৃতি লাভ করলেন তখন অনার্যদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল এবং এই যোগাযোগের ফলে অনেক অনার্য শব্দ বৈদিক ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে লাগল, তাছাড়া ভাষার মধ্যেও ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে অনেক নতুন রূপের সৃষ্টি হ'ল। যাঁরা রক্ষণশীল ছিলেন তাঁরা এ-অবস্থাকে ভাল বলে মেনে নিতে পারলেন না এবং পাণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি আর্য ভাষাকে একটা স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার ফলে উদ্ভূত হল পাণিনির সূত্র, কাত্যায়নের বার্তিক ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য। এঁদের আলোচনা ভাষাকে অলঙ্কৃত করল, তাকে একটা স্থায়ী রূপ দান করল। পাণিনি সূত্র রচনা ক'রে ভাষার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছেন ঠিকই, কিন্তু, তা না করলে আর্যভাষার অপরিবর্তিত রূপ আমরা পেতুম না, অনার্য ভাষার সঙ্গে মিশে এবং স্বাভাবিক ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে তা

সম্পূর্ণ নতুন একটা রূপ পরিগ্রহ করত। লেখার ভাষাকে পাণিনি বাঁধা কাঠামো দিয়ে গেলেন বলেই তা মহাভারতের যুগ থেকে আরম্ভ ক'বে আজ পর্যন্ত অনেকটা একরকমই আছে, কিন্তু কথ্য ভাষা অনেক স্তর অতিক্রম ক'রে আজকাল-কার বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতির রূপ লাভ করেছে। সুতরাং আর্য ভাষার কাঠামোকে ঠিক রাখার জন্যে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে চিবকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

সংস্কৃত ভাষা যে আর্যদের ভাষা, এ আলোচনা পূর্বের অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। এই ভাষায় যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তা ধর্মীয়ই হোক আব লৌকিকই হোক,সম্পূর্ণরূপে আর্যদেব নিজস্ব। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, কামনা-ভাবনা, অধ্যাত্মবোধ, ঐহিক চেতনা প্রভৃতি সব কিছুই এই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তা ছাড়া এই ভাষায় রচিত হয়েছে দর্শন, অর্থনীতি, শস্ত্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি অনেক কিছু। এক কথায়, যিনি সংস্কৃত জানেন না তাঁব প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের জীবনযাত্রা, অধ্যাত্মবোধ, সমাজচেতনা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভেব অধিকার বা সুযোগ নেই। এগুলো জানার কতটা দরকার আছে তা নিয়ে তর্কেব মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পিতৃপরিচয় না জানলে মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, ঐ পরিচয়টাই প্রয়োজন সকলের আগে। সুতরাং আমাদের পক্ষে সংস্কৃতকে উপেক্ষা করা কি ক'রে চলে বুঝিনা। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁরা তো এ কথা মনেই রাখেন না, এমনকি আজকাল একদল বাংলা নবীশ হয়েছেন যাঁরা সংস্কৃতকে ঘৃণাই করে থাকেন। আমরা তো বুঝি, ভাল ভাবে বাংলা জানতে হলে সংস্কৃত জানতে হয়; তা না হলে জাতির ভাবধারার পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তো আর হঠাৎ জাতির মাঝে আবির্ভূত হননি—যুগ-যুগান্তের কাব্যসাধনা তাঁকে সৃষ্টি করেছে। পদাবলী-সাহিত্যের রচনা আকস্মিক নয়, তার পশ্চাতে রয়েছে কালিদাস, ধোয়ী ও জয়দেবের প্রেরণা। কাজেই সংস্কৃত ও বাংলা—এরা পরস্পর বিরোধী নয়, ববং পরিপূরক।

সম্প্রতি, জাতীয় ভাষা কি হবে—এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলেছে। আলোচনার আবর্তে মূল প্রশ্নটি তলিয়ে গিয়েছে, কখনো শুনছি ইংরেজী বনাম হিন্দীব বিরোধ, আবার কখনো বা মনে হচ্ছে বাংলার সঙ্গে হিন্দীর বিরোধ। প্রদেশের কাজকর্ম সবই যে আঞ্চলিক ভাষায় হবে, এ নীতি স্বীকৃত হয়েছে: এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে সর্বভারতীয় ভাষা নিয়ে। আমার মনে হয় ভারতের একটি নিজস্ব জাতীয় ভাষা থাকা দরকাব এবং দেশের অধিকাংশ লোকই যখন হিন্দী ভাষা বোঝে তখন ঐ ভাষার পক্ষেই ক্রমশঃ জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি পাওয়া স্বাভাবিক। একটি সর্বভারতীয় ভাষা যদি না থাকে, তা হলে কেমন ক'রে আমরা উত্তর বা দক্ষিণ অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য অনুভব করব? আর কিছু না হোক জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেও এটা হওয়া দরকার। হিন্দী জাতীয় ভাষা হ'লে অহিন্দীভাষীদের নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে খুব অসুবিধে হবে, এ রকম আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। যাঁরা সংস্কৃত জানেন, তাঁদের পক্ষে নতুন ক'রে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করা অনেকটা সহজসাধ্য, কারণ বিশুদ্ধ হিন্দীর শব্দ-ভাণ্ডার সংস্কৃতের কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ ক'রে যে পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছে সে রকমটি আর কোনরূপে হয়নি। সংস্কৃতের শব্দ হিন্দীতে প্রয়োগ করা চলে, লিপিও

উভয়েরই দেবনাগরী। কেবল নতুন ক'রে শব্দ প্রয়োগ ও বাক্যগঠনের রীতি শিক্ষা করলেই হ'ল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যে উপেক্ষার পাত্র নয়, তা বোঝাবার জন্যেই এত কথা বলতে হ'ল। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলতে রাখি যে, সংস্কৃত থেকে প্রচুর শব্দ না গ্রহণ করলে হিন্দী পরিণত ও উচ্চ সাহিত্যের বাহন কখনও হ'তে পারে না। বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলেই এ উক্তির সত্যতা বোঝা যায়। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষাকে সাহিত্যের আসরে স্থান দেওয়া হয়নি, যখন বাংলা সংস্কৃত-ঘেঁষা হয়ে উঠলো তখনই তা সমৃদ্ধ হয়ে উন্নত সাহিত্যের বাহন হতে পারলো।

এখন দেখা যাক যে সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত আলোচনা চলছে, তার বর্তমান অবস্থা কি। আমাদের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত পড়া হ'ত, ইচ্ছে করলে কেউ আরো একটি পত্রে সংস্কৃত পড়তে পারত। এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যেটি শেষ পরীক্ষা তাতে সংস্কৃতকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানকার পাঠ্যতালিকায় ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে তাকে একটুখানি স্থান দিয়ে বাধিত করা হয়েছে মাত্র। এ রকম একটি ব্যবস্থা যে কেমন ক'রে শিক্ষাবিদ্‌দের সমর্থন লাভ করতে পারল, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। থাক সে কথা। স্কুলের পর কলেজে এসে আরো স্বাধীনতা, সেখানে ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া আর সবই ঐচ্ছিক, সংস্কৃতও তাই। যাঁরা বিজ্ঞান পড়েন তাঁদের সংস্কৃত নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আর যাঁরা মানবিক শাস্ত্র পড়েন, তাঁদের অধিকাংশও সংস্কৃত নিতে চান না। হয়ত সংস্কৃত ভাষার বাহ্য রূপ কঠিন বলে এরা ভয় পান। মোট কথা, সংস্কৃতের প্রতি ছাত্রসম্প্রদায়ের যে অরুচি, শিক্ষা-ব্যবস্থা তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। বাংলা দেশ থেকে সংস্কৃত পঠন-পাঠন তুলে দেওয়ার সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়েছে।

সংস্কৃতকে যদি সত্যি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তা হ'লে বি এ পরীক্ষা পর্যন্ত এটিকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় করা উচিত। ইংরেজী ও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি সংস্কৃত সাহিত্য পড়ে, তা হলে তারা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বুঝতে পারে। অবশ্য এ কথা আমি বলছি না যে, সংস্কৃত ভাষা সকলকে খুব ভাল ভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং নৈষধ ভাগবত প্রভৃতির কঠোর 'গ্রন্থগ্রন্থি' সকলকেই ভাঙতে হবে। সরল সংস্কৃত আয়ত্ত করলেই, ও কাব্য হিসেবে যে বইগুলি খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে, এমন কয়েকটি বই পড়লেই যথেষ্ট। এতে ছাত্রেরা আনন্দও পাবে। 'মেঘদূত' ও 'মৃচ্ছকটিক', 'শকুন্তলা' ও 'বাসবদত্তা' —এসবের রস যদি ছাত্র-ছাত্রীদের ধরিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে তাদের তা গ্রহণ করতে আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না। আমরা এখন যে ভাবে সংস্কৃত পড়াই তাতে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ জন্মাবার পরিবর্তে অনীহাকেই আমরা বাড়িয়ে তুলি। সাহিত্যের রস আমরা দিতে পারি না, দিই ব্যাকরণ ও অলংকারের খোসা। কাজেই 'লোক সংস্কৃত পড়ছে না' বলে লোকের ওপর দোষ চাপালে চলবে না, কেন পড়ছে না তা ভেবে দেখতে হবে এবং এর বিচার করতে গেলে আমরা—যারা সংস্কৃত পড়াচ্ছি—তাদের ওপর দোষ এসেই পড়ে। আর একটি বিষয় আমি খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি। স্কুল ও কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর ধরন একই : সেই সন্ধি ও সমাস ভাঙা—শব্দ ও ধাতু-রূপ দেখান। বি এ ক্লাসেও আমরা এর ওপরে উঠি না, যেন আমরা ধরে নিয়েছি যে সংস্কৃত

মানেই হচ্ছে ব্যাকরণ, আর সংস্কৃত পড়ানোর অর্থই হচ্ছে ব্যাকরণের আলোচনা করা। এ মনোভাব দূর না হলে বড় বেশী উন্নতি করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না।

আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাকেও আমরা সত্যি বলে নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। ইংরেজী ভাষায় লেখা অনেক বই আছে, তার মধ্যে কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই আছে। ইংরেজী সাহিত্য বলতে আমরা এদের সকলকে বুঝি না এবং ইংরেজীর পাঠ্য-তালিকায় কেবলমাত্র সাহিত্যই স্থান পায়। গিল্‌ক্রিষ্টের 'পলিটিকস্' ইংরেজী ভাষায় লেখা, কিন্তু কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর পাঠ্য-তালিকায় এ পুস্তক স্থান পেয়েছে বলে শুনিনি। এমনটিই হওয়া উচিত। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে, কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে এবং বিনা বিচারে আমরা তাকে মেনেও নিয়েছি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা যে কোন বইই হোক্ না কেন, তাকে আমরা সংস্কৃতের পাঠ্যতালিকায় স্থান দিতে রাজী আছি,—তা তাতে দর্শনের আলোচনাই থাক, আর রাজনীতির আলোচনাই থাক। আমার মনে হয় সংস্কৃত বলতে শুধু সাহিত্যকেই বোঝা ভাল। সংস্কৃতের পাঠ্যক্রমে কেবলমাত্র এরই স্থান হওয়া উচিত। আর অন্য যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাদের পড়াবার ব্যবস্থা সেই সেই বিষয়ের সঙ্গে হওয়া উচিত। যে ছাত্র লজিক্ পড়ে, সে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য তর্ক-পদ্ধতি জানবে কেন? ভারতীয় ন্যায়-দর্শনের গোড়ার কথা তাকে জানতেই হবে। যে সিভিকস্ পড়েছে, সে যদি কৌটিল্যের দু-একটা পরিচ্ছেদ পড়ে, তা হলে ক্ষতি হয় কি? যাঁরা নিজেদিগকে আধুনিক অর্থনীতিবিদ, অতএব ঐ শাস্ত্রের একমাত্র পরিবেশক বলে মনে করেন, তাঁরা এই প্রস্তাবে আঁতকে উঠলেও আমার মনে হয়, এতে সুফল হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বাড়বে বৈ কমবে না, আর সংস্কৃতের প্রচারও বাড়বে।

সংস্কৃত-শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির পথে একটি প্রধান অন্তরায় দেখছি, সেটি হচ্ছে গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা। অনেক সংস্কৃত বইই ছাপা হয় নি; যাও বা হয়েছে তাও পাওয়া যায় না, একটা সংস্করণ শেষ হলে আর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় না। রঘুনন্দন বাংলার লোক, তাঁর স্মৃতির মত আর কারও বই নেই, ঐটিই হচ্ছে প্রামাণিক। অথচ রঘুনন্দনের আঠাশটি স্মৃতির মধ্যে মাত্র কয়েকটিই আজ পাওয়া যায়। বাংলা দেশেই এ বই যদি না মেলে, তা হলে অন্য রাজ্যের অবস্থা বোঝাই যায়। শুনেছি সংস্কৃত কলেজ থেকে এ গুলি প্রকাশ করার চেষ্টা হচ্ছে, হলে ভালই। বাংলা দেশে অনেক কবি ছিলেন, যাঁরা সংস্কৃতে কাব্য রচনা ক'রে গেছেন। জয়দেব, ধোয়ী, রূপগোস্বামী ছাড়া এঁদের অন্য কারও নাম আমরা খুব বেশী জানি না, বইয়েরও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এগুলি উদ্ধার করার জন্যে চেষ্টা করলে ভাল হয়। সরকার এগিয়ে এসে যদি পুঁথি-সংগ্রহ ও গ্রন্থ-মুদ্রণের কাজে প্রেরণা দেন, তা হলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। শুনেছি সংস্কৃত কমিশন নাকি একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গবেষণা-সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। এ সুপারিশ গ্রাহ্য হলে সংস্কৃতামোদীরা খুশীই হবেন।

সংস্কৃত-শিক্ষা যে যে কারণে অসম্পূর্ণ থাকছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাকৃত ও পালির অনাদর। বর্তমানে যাঁরা সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করেন তাঁদেরও প্রাকৃত পড়তে হয় না, এ অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সংস্কৃত প্রাকৃতের স্তরের মধ্যে দিয়ে এসে আজকের বাংলা বা হিন্দী রূপ পেয়েছে। কাজেই সংস্কৃত থেকে

বাংলার রূপান্তর বুঝতে হলে প্রাকৃতকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগ যাঁরা পরিচালনা করছেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। কেবলমাত্র সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা কেন্দ্রীয় গবেষণা-সংস্থা স্থাপনের দ্বারা কিংবা বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার পরিবর্তনের দ্বারা সংস্কৃত-শিক্ষার কোন উন্নতি করা যাবে না। এর জন্যে সর্বপ্রথমে চাই সংস্কৃত-সেবীদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অপ্রিয় হলেও এটা সত্যি যে,পণ্ডিতদের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সঙ্কীর্ণ এবং প্রগতির বিরোধী। সংস্কৃতের পাঠ্য-ক্রমের কোনও পরিবর্তনের কথা শুনলে বা অন্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃতের আলোচনা করার কথা শুনলে এঁরা অসন্তুষ্ট হন, —মনে করেন, বুঝি বা, সংস্কৃতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। আমি সকলের কথা বলছি না। ভারতের পণ্ডিত-সম্প্রদায় অশেষ কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যেও সংস্কৃত-শিক্ষার ধারাকে রক্ষা ক'রে এসেছেন। তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। তবু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। যে যুগে কৃত্রিম চন্দ্র দেড় ঘণ্টায় বিশ্ব প্রদক্ষিণ করছে, সে যুগে দেশলাই-এর কাঠি জেলে একটি পঙ্‌ক্তি দেখে নিয়ে তার আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে 'দিলে আলোচনা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক্ না কেন, তা কখনও সাধারণের মন হরণ করতে পারে না। পণ্ডিতমশাইদের সঙ্কীর্ণতার কথা আগে বলেছি। সংস্কৃত পড়লেই যে প্রগতিশীল বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হারাতে হবে, বা যে সংস্কৃত পড়েছে সে যদি অন্য দশজনের সঙ্গে বসে চা খায় তা হলে নিন্দনীয় হবে—এ রকম ধারণা থাকা ঠিক নয়। সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতির প্রতি সবকারের দৃষ্টি পড়েছে। এই সময় যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংস্কৃতসেবীরা ঐ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছাত্র-সম্প্রদায়ের অনীহা দূর করতে সচেষ্ট হন, তা হলে সুফল ফলতে বাধ্য।

দুঃখ আমার তাইতো প্রিয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

দুখের সাথে আস তুমি,
দুঃখ আমার তাইতো প্রিয়,
তাইতো আমি বারেবারেই
দুঃখ যাচি—দুঃখ দিও।

দুখের সাথে তোমায় পাব,
তোমার প্রেমে মন রাঙাবো,
মলিন আমার চিত্তখানি
হবে পরম রমণীয়।

অনেক পাওয়ার মাঝে তোমায়
পাইনে খুঁজে—দাও না দেখা,
বহু জনের কোলাহলে
দিন যে আমার কাটে একা।

সব আভরণ ছিন্ন ক'রে
নামাও আমায় পথের পরে,
তোমার নামের একতারাটি—
কেবল আমার সঙ্গে দিও।

'জগৎ মিথ্যা'র শাস্ত্র-প্রমাণ

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

আজকাল অনেকে আচার্য শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা' কথাটি বুঝতে না পেরে নানাবিধ সমালোচনা ক'রে থাকেন। শঙ্করের বেদান্ত-ব্যাখ্যা পাঠ ক'রে বুঝতে পারি, তিনি যে জগৎকে মিথ্যা বলেছেন তার প্রমাণ শাস্ত্রে আছে, এবং একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অদ্বৈতবাদ একটা নতুন মত নয়, বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। ব্যাস, বশিষ্ঠ, শুকদেব, অষ্টাবক্র প্রভৃতি জ্ঞানীরা অদ্বৈতমতের সমর্থক। বৌদ্ধ যুগের পর তান্ত্রিক কাপালিকদের ও বিশেষ ক'রে নাস্তিক চার্বাকদেব অভ্যুদয়ে অদ্বৈত মতবাদ অপ্রকট হয়েছিল, বৌদ্ধ, জৈন বা তন্ত্র তত ক্ষতি করতে পারেনি, যতটা পেরেছিল চার্বাক। চার্বাক কিনা চারু বাক, অর্থাৎ যে উক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখকর ও জৈব প্রবৃত্তির উত্তেজক, তার মূল সূত্র হচ্ছে—পরলোক বা মুক্তি বলে কিছু নেই। প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক বলেন:

যতকাল বাঁচবে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, ঋণ করেও পুষ্টিকর খাদ্য খাবে, যখন দেহ ভস্মীভূত হলেই সব শেষ, তখন আবার আত্মার পুনরাগমন কোথা। এ জগতে যদি পরমপুরুষার্থ ব'লে কিছু থাকে, তা হচ্ছে শরীরের সুখের অনুসন্ধান। Epicurus-ও এইরূপ বলেছেন "Eat, drink and be merry"—কিন্তু এতে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ে, না কমে?

সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভূ মানুষের ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখী ক'রে সৃষ্টি করেছেন,সেইজন্য জীব কেবল বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। খুব অল্প লোকই আছেন যাঁরা ধীর ও স্থির, ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় থেকে টেনে মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় অন্তরে পরমাত্মাকেই দর্শন করেন। আবার বিষয়গুলিও মানুষের ইন্দ্রিয়-সকলকে আকর্ষণ করে, যথা (মনু—২।৮৮):

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥

অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) নিয়ে বাহ্য জগৎ তৈরী হয়েছে। ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করাই বিষয়ের স্বভাব। শব্দ শ্রবণে-ন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে,স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়কে, রূপ চক্ষু-রিন্দ্রিয়কে, রস জিহ্বাকে আর গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। যিনি বিদ্বান্ তিনি ইন্দ্রিয়গণের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু চারুবাক-সম্পন্ন কূতার্কিক নাস্তিক চার্বাক তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের ইন্দ্রিয়-ভোগের কুসুমাবৃত পথ দিয়ে নরকেই ঠেলে দিয়েছেন। অপর দিকে সাংখ্যবাদী, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক ও মীমাংসকরাও বিরোধিতা করেছেন। কাপালিকরা তর্কযুদ্ধে হেরে গেলে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গাঘাত করতে সদাই প্রস্তুত থাকত। শঙ্করাচার্য অল্প বয়সেই ঐ সব দুর্মদ অরিকুলের মধ্যে ব'সে স্থিরচিত্তে তর্ক-যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বৈদান্তিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা ক'রে প্রচার করেছিলেন, আর সেই ষোড়শবর্ষীয় আচার্যের কথা এখন শুধু ভারতবর্ষেই নয় পাশ্চাত্ত্য দেশেও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সে কথা অধ্যাপক ম্যাক্স-মুলার স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন।

* * *

এখন দেখতে হবে 'জগৎ মিথ্যা' সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে। কঠোপনিষৎ বলেন :

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
(২—১১)

অর্থাৎ সুসংস্কৃত মনের দ্বারাই একরস ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। এই ব্রহ্মৈকত্ব বিজ্ঞাত হ'লে নানাত্ব বা বা ভেদবুদ্ধিসমুৎপাদক অবিদ্যা নিবৃত্ত হ'য়ে যায়, কাজেই তখন ব্রহ্মই সৎ আর সমস্তই অসৎ, মনে হয়। কিন্তু যিনি নানাত্ব দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—"নানাত্ব" নেই, যিনি "নানাত্ব" দর্শন করেন তিনি জন্ম ও মৃত্যুর কবলে প'ড়ে বারবার যাতায়াত করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন—"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ" (১-১০)—অর্থাৎ অন্তে আবার বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। এতে জগৎকে মায়া বলা হ'ল। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি।" (২-৪)—অর্থাৎ যখন দ্বৈতের ন্যায় হয় তখন একজন আর এক জনকে দেখে। "দ্বৈতের ন্যায়" বলায় জগতের দ্বৈতত্ব বা নানাত্ব অস্বীকার করা হ'ল। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেছেন—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" (৬-২-১)—অর্থাৎ হে সৌম্য আদিতে (সৃষ্টির পূর্বে) শুধু সৎ-মাত্রই ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এখানে "এক ও অদ্বিতীয়" বলায় প্রমাণিত হ'ল যে দ্বিতীয় মিথ্যা, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কিছু নেই, ব্রহ্মই সব কিছুর সত্তা বা ব্রহ্মই সত্য, ঐতরেয় উপনিষৎ বলেন—"আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ"। (১-১)—অর্থাৎ আদিতে এক আত্মাই ছিলেন। এখন বুঝতে পারা গেল যে ঐ এক আত্মাই সৎ—অর্থাৎ ছিলেন, আছেন ও থাকবেন; আর বাকি সব অসৎ, অর্থাৎ পূর্বে ছিল না, বর্তমানে প্রতীয়মান, পরে থাকবে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেছেন, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ।" (৩-৯)—অর্থাৎ যাঁর পর আর কিছুই নেই। এখানে "যাঁর" পর কিনা ব্রহ্মের পর আর কিছু সৎ নেই, তা হ'লে ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎ মিথ্যা। মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ বলেন : "ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্।" (৪-২)—অর্থাৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়াময়, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যাদর্শন। এখানে খুব সোজাভাবেই এবং স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে জগৎ মিথ্যা,—মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বাজিকরই সত্য—বাজি মিথ্যা।

মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বলেন : "শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" (১-৭)—অর্থাৎ শান্ত, শিব, অদ্বৈত। "শান্তং"—কিনা রাগদ্বেষাদিরহিত। "শিবং" —অর্থে তিনি মঙ্গলস্বরূপ। "অদ্বৈতম্"—অর্থাৎ ভেদবিকল্পশূন্য। এখানেও জানানো হ'ল যে সেই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, দ্বিতীয় কোন কিছু নেই, যদি মনে হয় আছে—তা মিথ্যা', তা মায়া।

জড়বাদীরা (materialists) বলেন যে এই সসাগরা পর্বত-নদনদী-বনকানন-সমন্বিতা পৃথিবী—যাকে সর্বদা দেখেছি, যার উপর বাস করছি, তা একেবারেই মিথ্যা—একথা অবিশ্বাস্য। কাজেই আমাদের বলতে হবে যে, দেখতে পেলেই যে দৃষ্ট বস্তু সত্য হবে—তার কোন মানে নেই। স্বপ্নে নানারূপ বস্তু দেখা যায়, আবার জাগ্রৎ অবস্থায় শুক্তিতে রজত দেখা যায়, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়—সে সব মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চটাই মায়ার বিজৃম্ভণ। তাই না শাস্ত্রে দেখতে পাই, "ব্রহ্মাদি-তৃণপর্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।"—অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্তই মায়া-বিরচিত। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই

যদি মায়া থেকে উৎপন্ন হন, তখন জগৎ যে মিথ্যা তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন সমাগত হ'লে অব্যক্ত থেকেই এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তাঁর (ব্রহ্মার) রাত্রি-সমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু-মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন আর প্রত্যক্ষ ব্যবহারের উপযোগী জগৎ দৃষ্ট হয় না।

মহানির্বাণতন্ত্রে বিশ্বসৃষ্টি ও লয়ের এবং ব্রহ্ম-লক্ষণ সম্বন্ধে দেখতে পাই :

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্বাণি লীযন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মলক্ষণৈঃ ॥
(তৃতীয় উল্লাস—৯ম শ্লোক)

অর্থাৎ যাঁর সত্তাহেতু সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, এবং সমুদয় বিশ্ব যাতে অবস্থান করছে, আবার প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে সমুদয় বিশ্ব লয় পাবে, তিনিই ব্রহ্ম হ'লে বলতে বাধে না যে এক-মাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উদ্‌ভব-স্থিতি-লয় পরিদৃশ্যমান, ত্রিকালে সত্য নয়, সংসারে বারংবার উৎপত্তি ও বিনাশ সত্ত্বেও অবিদ্যার প্রভাবে জীবের সংসার-নিবৃত্তি হয় না। জীবের কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানই পুনঃপুনঃ সংসার-প্রবাহের একমাত্র হেতু। যতদিন না ভোগাবসান হয় ততদিন জীব মুক্ত হয় না।

আত্মজ্ঞান-বর্জিত অজ্ঞান ব্যক্তি যে শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তজ্জন্য তাকে অবশ্যই ফলভোগ করতে হয়। বস্তুতঃ কোন নতুন জীবের সৃষ্টি হয় না, সেই সব পূর্বকল্পের জীবকুল মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বারবার আনাগোনা করবেই করবে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে পূর্ব পূর্ব কল্পে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সৃষ্টি যেমন ছিল, উত্তর কল্পের সৃষ্টি কি ঠিক সেই রকমের হয়, না অন্য রকমের? এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং বেদই দিয়েছেন :

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবংচ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥"
(ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩)

অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গাদি সমস্ত জগৎ যেরূপ পূর্ব কল্পে ছিল বিধাতা উত্তর কল্পেও সেইরূপ রচনা করেন। মোট কথা এই যে, ব্রহ্মার দিবাগমে অভিব্যক্তি বা প্রাদুর্ভাব, ও রাত্রি-সমাগমে সমস্ত বস্তুরই তিরোভাব বা কারণস্বরূপে স্থিতি হয়। তা হ'লে বুঝতে পারা গেল যে, এই বিরাট জগতের লয় হয়, অতএব তা নিত্য নয়।

গীতায় শ্রীভগবান বলেন—'বীজং মাং সর্ব-ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।' (৭।১০) —অর্থাৎ হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের মূল—চিরপুরাতন বীজ ব'লে অবগত হও।

ভগবান জগতের বীজ—এরূপ বলাতে এই বুঝতে হবে যে, তাঁর থেকে পুনঃপুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাঁতেই বারবার জগতের তিরো-ভাব হচ্ছে। এরই নাম সৃষ্টি ও প্রলয়, পর্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে। সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত, এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হ'তে অব্যক্ত হচ্ছে। গীতায় (৯।১৮) ভগবান বলেছেন :

'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।'

অর্থাৎ তিনিই জগতের অক্ষয় বীজ, জগতের তাঁর থেকে উৎপত্তি, তাঁতে স্থিতি এবং তাঁতেই লয় হচ্ছে, তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয়।

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১-১-২)—অর্থাৎ 'জন্ম আদি অস্য যতঃ'—কিনা—'জন্ম' শব্দের অর্থ উৎপত্তি, 'আদি' শব্দের অর্থ স্থিতি ও লয়। তা হ'লে অর্থ হবে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—অর্থাৎ যাঁর থেকে এই জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়—সেই অখণ্ড নিত্য চিদ্বস্তুই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই; সুতরাং নিত্য, অতএব সত্য। কিন্তু জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, অতএব তা সর্বদা থাকে না, ত্রিকালে সত্য নয়, নিত্য নয় অর্থাৎ মিথ্যা। এই কথাই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেছেন :

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'।

অর্থাৎ যা হ'তে এই ভূতসকল উৎপন্ন হচ্ছে,—যাতে জীবিত থাকছে এবং অন্তকালে যাতে বিলীন হবে—তিনিই ব্রহ্ম। এখানেও ব্রহ্মেরই সত্যত্ব এবং জগতের মিথ্যাত্ব বলা হয়েছে।

গীতা বা বিভিন্ন উপনিষৎ এবং বিশেষ ক'রে বেদান্তসূত্র কিভাবে জগৎকে মিথ্যা বলেছেন, সে বিষয়ে আরও একটু আলোচনা দরকার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ যে কারও অনুভূত হচ্ছে না—একথা বলা বেদান্ত-দর্শনের উদ্দেশ্য নয়। বেদান্ত বলেন যে এই স্থূল দৃশ্য জগৎ যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হচ্ছে তার পৃথক অস্তিত্ব নেই। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সমন্বিত যে জগৎ-বোধ, তা সত্য নয়, মিথ্যা,—অর্থাৎ জগৎ স্বরূপতঃ যে রূপে আছে তা আমরা ঠিক সেরূপে না জেনে যা জানতে পাচ্ছি তা মিথ্যা। শ্রীভগবান বলেছেন :

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অর্থাৎ যে পদার্থ অসৎ, তার বিদ্যমানতা কোন কালেই নেই, আর যা সৎ তার অভাবও কোন কালে নেই, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপে সদসৎ নিরূপণ ক'রে থাকেন। এখন কথা হচ্ছে যে দেশ ও কালের দ্বারা যে সব বস্তু পরিচ্ছিন্ন সে সমস্তই অনিত্য ও মিথ্যা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ স্পর্শাদি ও অন্তঃকরণ-গ্রাহ্য স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতির বিদ্যমানতা না থাকলে দেশ-কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। সেইজন্যই দেশ ও কাল অসৎ, একেই নামরূপময় মায়া বলা হয়। নাম বা শব্দ দ্বারা প্রথমতঃ কালের জ্ঞান হয়, আর রূপ দ্বারা দেশের ধারণা হয় বলেই কাল ও দেশের অন্তর্ভুক্ত নাম-রূপময় বাহ্য জগৎ মায়ার বিকাশ—সে জন্য মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মা দেশ ও কালের অতীত, তা সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হ'তে পারে না বলেই আত্মা এক অদ্বিতীয়—আর তিনিই সৎ ও ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মের তুলনায় দেশ, কাল ও পদার্থসকল—যথা সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি অসৎ ও মিথ্যা।

আমরা উপরে বলেছি যে আত্মা এক,—সে জন্য এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে যদি সৎস্বরূপ আত্মা একই হন, তবে সেই সৎস্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সত্য এবং সেইজন্যই এই সংসারের সুখদুঃখও ভোগ করতে হবে, কিন্তু তা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হবে না। কেননা তা হ'লে জ্ঞানপ্রভাবে আত্মারও নিবৃত্তি হয়ে যেত। এর উত্তরে বলতে হবে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। রজ্জু সত্য—সর্প মিথ্যা, শুক্তি সত্য—রজত মিথ্যা, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প নেই, শুক্তিতে রজত নেই, সব মনের কল্পনামাত্র, সেইরূপ জগৎ-প্রপঞ্চ সদাত্মাতে কল্পনামাত্র। পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হলেই সংসারের সত্যতা-ভ্রম দূর হয়—তৎপূর্বে নয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার-ভ্রম যায় না, কিন্তু ঐ ব্রহ্মজ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ, যুক্তি-তর্ক দ্বারা সে জ্ঞান হয় না, পরন্তু চাই সুকঠোর সাধনা। এই সাধনার শেষে নির্বিকল্প সমাধিতে এই দৃশ্যমান জগতের লয় হয়, তখন সাধন ও সাধ্য এক হয়ে যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্যদের বলেছিলেন—ওরে

ওটা সব শেষের কথা। তাঁর গুরু তোতাপুরি পরমহংসকে চল্লিশ বছর অতি কঠোর সাধনা ক'রে ঐ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করতে হয়েছিল। শাস্ত্র বা পুস্তক পড়লে আক্ষরিক বিদ্যালাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। 'এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।' শ্রুতি বলেছেন: ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি। (কঠঃ উপঃ ১।৩।১৪)

অর্থাৎ, বিবেকসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সেই আত্ম-জ্ঞান রূপ পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম ব'লে বর্ণনা ক'রে থাকেন।

অসৎ বা মিথ্যা কি তার বিচার করা কর্তব্য। যা দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের জন্য অসৎ বা মিথ্যা। যা পূর্বে ছিল না, এখন রয়েছে, কিন্তু পরে থাকবে না, তা কালপরিচ্ছেদের অধীন, সুতরাং অসৎ বা মিথ্যা। এই সব লক্ষণানুসারে জগৎ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় জলেরই বিম্ব, বিম্বের জল নয়। জল আছে বলেই তরঙ্গ বা বিম্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। সাধক রামপ্রসাদ এইভাবেই গেয়েছেন: 'যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।'—এখন এক কথায় বলতে হবে যে কারণের কারণরূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ, আর তার অধিকরণে অবস্থাবিশেষে, সময়-বিশেষে, দেশবিশেষে, পাত্রবিশেষে অনুভূত, আবির্ভূত বা প্রকাশিত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ বা মিথ্যা, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম।

জাগ্রৎ অবস্থায় অন্ধকারে স্থাণুতে পুরুষ দেখা, ভূত দেখা, মন্দান্ধকারে রজ্জুতে সর্প দেখা, নদী-সৈকতে উদ্ভাসিত সূর্যালোকে শুক্তিতে রজত দেখা, দ্বিপ্রহরে মরুভূমিতে তপ্তবালুর উপর দীর্ঘ সরোবর দেখা, সমুদ্রতীরে নগরের বিপরীত ছবি দর্শন প্রভৃতি জাগ্রৎ অবস্থাতেই সংঘটিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দও রাজপুতানার মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে প্রথম প্রথম ভ্রমে পড়েছেন।

মরীচিকা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের এবং সমুদ্রতীরে উল্টো জাহাজের ছবি সম্বন্ধে নাবিক-দের লেখায় প্রতিপন্ন হয়, দর্শকগণ নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দর্শন করেননি, তাঁদের চক্ষুদোষে দৃষ্টিভ্রমও হয়নি, যখন দেখেছেন সত্যই দর্শন করছেন। দিনের বেলা বহু ব্যক্তি এক সঙ্গে ঐ সব দেখলেও, ঐ সব দৃশ্য সত্য মনে হলেও সর্বৈব মিথ্যা।

সামান্য বাজিকর যখন যাদুর প্রভাব দেখায় তখন আমরা মনে করি যেন কত কি অসম্ভব বিচিত্র দৃশ্য দেখছি, প্রকৃতপক্ষে সে সবও মিথ্যা। বিখ্যাত Rope trick (দড়ির খেলা)এর কথা সর্বজনবিদিত জাহাঙ্গীর বাদশাহ এইরূপ ভোজ-বাজি প্রত্যক্ষ করে আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সামান্য যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার যদি এত ক্ষমতা থাকে ত ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির যে কত প্রভাব তা কে বলতে পারে? যোগী পুরুষের না হয় যোগ-বিভূতি থাকতে পারে, কিন্তু যোগ-তপস্যাহীন যাদুকরের ঐরূপ ক্রিয়া অতীব বিস্ময়কর।

পরিশেষে মাণ্ডুক্য কারিকায় গৌড়পাদ বলেছেন: জাগ্রদবস্থায় অনুভূতির বিষয়ের চিত্ত থেকে পৃথক সত্তা নেই, সমস্ত দৃশ্য অনুভূত বিষয়—দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছু নয়। (মাণ্ডুক্য ৪-৬৬)

যোগবাশিষ্ঠেও উৎপত্তি-প্রকরণে (৯৪-২৯,৪০,৪১) আছে: এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা বা সঙ্কল্পমাত্র, যেমন মরীচিকা সূর্যরশ্মি ভিন্ন কিছু নয়। সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য দ্রষ্টা ভিন্ন কিছু নয়, অনুভূতকালে সত্য, যথার্থ সত্যের পরীক্ষায় মিথ্যা। এইজন্য ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'জগৎ মিথ্যা'—তবে তিনি বলেন নি, জগৎ আকাশকুসুমবৎ বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ অসম্ভব বা অসৎ। তিনি জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নি।

কিশা গৌতমী

শ্রীমতী বিভা সরকার

প্রশান্ত মনে শান্ত হৃদয়ে বুদ্ধ চরণে নমি
কে ওই রমণী দাঁড়ায়ে নীরবে ? ও যে কিশা গৌতমী !
ওর ভাণ্ডার কে ভরিল আজ মহা অমৃত ধনে,
অনন্ত বাণী কে দিল বাখানি ওব নিদ্রিত মনে ?

পরম আলোর স্নিগ্ধ শিখাটি আঁধার মনেব ঘরে
কে দিল জ্বালায়ে মহৎমায়ায় আজি আপনার করে ?
রুদ্ধ মনের বন্ধ দুয়ার খুলি দিয়া সযতনে
করুণাঘন কে মিলাল সেথায় বিশ্বের অঙ্গনে ?

চেনালো কে তারে মৃত্যুর পারে মহা অমৃত লোক ?
সুখ দুখ ভয় পেয়েছে অভয়, সেথায় শান্ত শোক।
সে মহালোকের খুলিয়া দুয়ার কে ঐ জ্যোতির্ময়
দুখিনী নারীর স্বর্গ রচিয়া বিলাইছে বরাভয় ?
তপস্বী-রাজ সে যে গৌতম—অম্লান অবিনাশী।
অভাগিনী নারী পেয়েছে অভয় তাঁহারই দুয়ারে আসি।

শ্রাবস্তীপুরে ফিরি দ্বাবে দ্বারে কেঁদেছে উন্মাদিনী
অঞ্জলি পাতি ভিক্ষা মেগেছে অমৃত সঞ্জীবনী।
অনেক ব্যথাব পুত্রবে তার, জনম দু:খিনী মেয়ে
আঁকড়িয়া ছিলো এক সন্তানে, প্রেমে অবহেলা পেয়ে
কাঙ্গালির ধন ছিনাইয়া নিল আসি কোন নিষ্ঠুর
একটি শ্যামল ছোট তৃণকণা সারা পথে বন্ধুর।
জীবনের মত কে দিল রচিয়া অনন্ত মরুভূমি ?
বক্ষে আঁকড়ি মৃত সন্তানে বুদ্ধ চরণে নমি—
শুধালো কাতরে মহাযোগিবরে নয়ন করিয়া নিচু
বাঁচাও ছেলেরে তোমার কৃপায়, দাওগো ওষধি কিছু।

করুণাঘন কহিল বচন— ওগো কিশা গৌতমী ?
দিতেছি অভয়, নাহি কিছু ভয়,বাঁচাবো ছেলেরে আমি—
যদি তুমি পার এনে দিতে মোরে একটি সরিষা-কণা
সেই ঘর হতে মৃত্যুর যেথা হয় নাই আনাগোনা।

আকুল রোদন ছড়াযে ভুবনে ছুটিল উন্মাদিনী
কাঁদিল ব্যথায় বনভূমি আর তটিনী কল্লোলিনী
এমনি বাতাস চমকি উঠিল শুনি সেই হাহাকার
বিহগ বিহগী হইল নীরব শুনি সুব সে ব্যথার।
হেরিয়া তাহায় বনস্পতির নীববে ঝবিল পাতা
কাঁদে তার সাথে সারা ত্রিভুবন, কাঁদিছে দুখিনী মাতা।

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল রমণী সরিষা-কণিকা চেয়ে
মিলিল না কণা, দেখিল ধরণী—মরণে গিয়েছে ছেয়ে।
জন্ম যেথায় মৃত্যু সেথায়, ভুল শুধু বুঝিবার—
অজ্ঞানতার আবরণ টুটি ঘুচিল অন্ধকার॥

শ্রীশ্রীযশোধরা-নাটকম্

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচৌধুরী-বিরচিতম্

(ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী অনূদিত)

[ভগবান বুদ্ধের লীলাসঙ্গিনী জননী যশোধরার পুণ্য জীবন জনসমাজে প্রায় অজ্ঞাত। সেজন্য দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি অবলম্বনে গবেষণা মুখে "শ্রীশ্রীযশোধরা" নাটকটি বিরচিত। এটী সম্প্রতি কয়েকটী কৃষ্টিকেন্দ্রে অভিনীতও হয়েছে।]

নান্দী

জ্যোতির্ময়ং বহুসুখাকরপুণ্যধাম
বুদ্ধং কষায়-হরণং পুলকং ধরায়াঃ।
বন্দে তথাগত-হিতৈক-সুখাং প্রগোপাং
দুঃখাপহাং কষিত-হেমবিভাং চ গোপাম্॥ [বসন্ততিলকম্]

বিশ্ব-দিবাকর সুখ-পুণ্যাকর বন্দনা করি বুদ্ধ।
কলুষ-হরণ ধরণী-মোহন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ॥
তথাগত-প্রাণা সুবর্ণ-বরণা বন্দনা করি গোপা।
শোক-নিবারিকা প্রধানা পালিকা মূর্ত-সুগত-কৃপা।

সূত্রধার—(নটীর প্রতি) দেবী সরস্বতীর অংশীভূতা তুমিই ত সমস্ত নাট্য কার্য আজ পরিচালিত করবে,—যেমন ঐ সম্মুখস্থিতা যশোধরা ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে একই দিনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত, তাঁর ধর্মকে সমুন্নত এবং তাঁর সংঘকে সংপুষ্ট করেছিলেন।

কল্যাণি! শান্তি-সুধা বর্ষণ কর সর্ব-মঙ্গলকরা।
বুদ্ধে যথা গোপামাতা অশেষ কল্যাণপরা॥[১] [প্রস্থান]

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—দণ্ডপাণি-গৃহবাটিকা। কাল—সন্ধ্যা]

গোপা—মহামহিমময় পরমসুন্দর ভগবান্ সূর্য এখন কোথায় যাচ্ছেন? চতুর্দিকে রক্তিম আলোক বিকীর্ণ হচ্ছে। এমন কি, সুবিশাল আকাশও প্রেমের রংএ রঙীন হয়ে উঠেছে। বিহগ-বিহগী শাবকদের আহ্বান ক'রে নিয়ে, কুলায়াভিমুখে যাচ্ছে। বিরহক্লিষ্ট সহস্ররশ্মি ভগবান্ ভাস্কর সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে কাকে অন্বেষণ করছেন? বস্তুতঃ, এই জীবনটা কি? জীবনটা হ'ল কেবলই অন্বেষণ, কেবলই বিচরণ, কেবলই পরহিতসাধন। এরই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন স্বয়ং ভগবান সূর্যদেব।

অথবা, কে আমার জীবনের সূর্য, যাঁর কিরণমালায় আমি নিত্য-স্নাতা, নিত্য-পূতা হব?

---

১ শক্তিং প্রদেহি কল্যাণি! সর্বমঙ্গলসাধিনীম্।
ইয়ং যশোধরা গোপা শাক্যসিংহ-হিতা যথা॥
[অনুষ্টুভ্]

দিক্‌চক্রবালে ঈশাদেশ-ফলে ধীরে ধীরে ডুবিছে রবি।
বিভুপদাশ্রিত আরাত্রিক-পাত্র নামায়ে রাখিছে পৃথিবী॥
কোথা প্রাণপতি শাশ্বতিক-স্থিতি যাঁর শ্রীপদে নিবেদিতা।
অমৃতা অজরা আনন্দ-মধুরা হবে দীনা গোপিকা সুতা॥[২]

যাহোক, এই সায়ং সন্ধ্যাকালে আমিও ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হব। সেজন্য এখন আমি দেবমন্দিরে যাই। কিন্তু কেন আজ আমার হৃদয় করুণ বিলাপ করছে? জন্ম-জন্মান্তরের কয়েকটি বৃত্তান্ত যেন মনে ভেসে উঠছে। কে যেন আমাকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

থাক্, এইভাবে আত্মচিন্তা ভাল নয়, কারণ আত্মকাম ব্যক্তি আপ্তকাম হন না। (সখীর উদ্দেশ্যে) বনলতিকে। তুমি কোথায়? এখানে এসো। আমি এখন পূজার জন্য যেতে চাই।

[অন্য দিকে শুদ্ধোদনের রাজপুরোহিতের প্রবেশ]

রাজপুরোহিত—হায়। রাজার অনুরোধ ত তাঁর আদেশেরই সমান। রাজকীয় ব্যাপারে 'অনুরোধ' ও 'আদেশে'র মধ্যে ভেদ কোথায়? স্নেহব্যাকুল রাজা শুদ্ধোদন আমাকে অনুরোধ করলেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনোমত গুণসম্পন্না বধূ অন্বেষণ করতে। সেজন্য এক বৎসর কাল ধরে আমি গৃহ থেকে গৃহান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেরূপ কন্যা কোনো স্থানেই ত পেলাম না। সিদ্ধার্থ অন্য কোনো কন্যাও গ্রহণ করবেন না। মহারাজও সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে আছেন। কি করি? সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত। এখন কোনো স্থানে রাত্রি যাপন করতে হবে।

গোপা—সখি বনলতিকে। শীঘ্র এসো। ভজনকাল যে অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

রাজপুরোহিত—অহো। দূরে যেন নারীকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বিনা অনুমতিতে এই উদ্যানে প্রবেশ করা কি উচিত? গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে বিচরণ ক'রে আমার পাদ-বিস্ফোটক হয়েছে, দেহ শিথিল হয়ে আসছে। যা হবার হোক, আমি এখানে প্রবেশ করি।

[বনলতিকার প্রবেশ]

বনলতিকা—হে বিপ্রবর। প্রণাম, আপনাকে যেন অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই সন্ধ্যাকালে আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি কি আপনার কিছু সেবা করতে পারি?

রাজপুরোহিত—(স্বগত)

আজন্ম-জননী নারী স্নেহখনি কোমলা মমতাময়ী।
মাতৃ-স্নেহ-স্পর্শে অরণ্য সহর্ষে হয় গৃহ-সুখদায়ী॥[৩]

---

২ দিক্‌চক্রে লযমেতি ভানুরধুনা ধাতুর্নিদেশক্রমাৎ।
পৃথ্বী সজ্জয়তীব বিশ্বপতয়ে সায়ন্তনারাত্রিকম্॥
ক্বাসৌ মে ভগবান্ মদীযচরণোপান্তে নিতান্তেপ্সিতে।
দত্ত্বা জীবনদীপমদ্য মুদিতা স্যাং কন্যকা গোপিকা॥
[শার্দূলবিক্রীড়িতছন্দ]

৩ জন্মনা জননী নারী দয়া-স্নেহ-প্রপূরিতা।
মাতৄণাং স্নেহসম্পর্কাদরণ্যানী গৃহায়তে॥
[অনুষ্টুভ্]

(বনলতিকার প্রতি) মাতঃ! কার্যব্যপদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে আমি কাতর হয়ে পড়েছি। এখন কোথায় রাত্রি যাপন করব—সেই চিন্তায় আমি ব্যাকুল।

বনলতিকা—আপনার আপত্তি না থাকলে, অদূরে স্থিত আমার প্রভুর উদ্যানে আপনি কৃপা ক'রে চলুন। সেখানে আমার প্রিয়সখী দণ্ডপাণিসুতা গোপা আছেন। তিনি অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণা। আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণ অতিথির শুভাগমনে তিনি পরম পরিতুষ্টা হবেন।

রাজপুরোহিত—আপনার যা ইচ্ছা।

গোপা—(সখীকে দেখে) অয়ি ঘূর্ণিপটুকে চটুলে বনলতিকে! তোমাকে আহ্বান করতে করতে আমার কণ্ঠ ভগ্ন হয়ে গেল। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

(রাজপুরোহিতকে দেখে) ভগবন্! প্রণাম, ক্ষমা করুন। আপনাকে দেখতে না পেয়ে আমি এরূপ বললাম। এই সায়ংসন্ধ্যায় আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে দেখে আমি কৃতার্থ হলাম। আমার কি করা উচিত, দয়া করে বলুন।

বনলতিকা—প্রিয়সখি! এই ব্রাহ্মণ অতিশয় ভ্রমণ-ক্লান্ত। আমাদের অতিথি সেবার এই ত মহা সুযোগ।

রাজপুরোহিত—কোন্ মহাত্মার এই গৃহ? গৃহস্বামী কি এখানে আছেন?

বনলতিকা—না, পিতা দণ্ডপাণি স্বকার্য-ব্যপদেশে অন্যত্র গেছেন। সেজন্য এখন তাঁর প্রাণপ্রিয়া কন্যা গোপাই কর্ত্রী।

গোপা—বনলতিকে! পাদ্যার্ঘ নিয়ে এসো। [বনলতিকার প্রস্থান]

রাজপুরোহিত—কল্যাণি! অতি সুন্দর এই স্থান।

গোপা—দেব! এখানে সুখে বিশ্রাম করুন। ক্ষণমধ্যেই আমার সখী ফিরে আসবে।

(স্বগত) অহো! সময় সমুপস্থিত! ইনিই ত হলেন সেই ভগবৎপ্রেরিত জন। যদিও নারী-সুলভ লজ্জা আমাকে বিশেষ বাধা দিচ্ছে, তবুও কর্তব্য যা তা অবশ্যই করতে হবে। সেজন্য আমি নিজেই এঁকে সব নিবেদন করব। সখীর সম্মুখে এই বিষয়ে কিছু বলা যাবে না, বলা উচিতও নয়। [রাজপুরোহিতের প্রতি]

দেব! নিয়তির বিধান অমোঘ। আপনি বহু কষ্ট ক'রে দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করছেন, কিন্তু রাজপুত্রের অভিমত কন্যা আজও পাননি। রাজপুত্র এরূপ বধূ চান—যা পাওয়া সত্যই দুষ্কর।

রাজপুরোহিত—কিন্তু আপনি তা জানলেন কি ক'রে?

গোপা—আপনারই আশীর্বাদে। রাজপুত্র তাঁর বধূর পনেরটি গুণের কথা বলেছেন। যথা—তিনি হবেন সত্যবাদিনী, শুদ্ধকুলজাতা, কবিতা-লেখিকা, মৈত্রীশীলা, ত্যাগব্রতা, দানশীলা, অগর্বিতা, অপ্রগল্ভা, অনুদ্ধতা, অনবগুণ্ঠিতা, ধর্মপ্রাণা, শুদ্ধস্বভাবা, শ্বশ্রূ-শ্বশুর-সেবকা, শাস্ত্রজ্ঞা, ও মাতৃরূপা। এরূপ একজন বধূর কথাই আমি জানি।

আপনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, তা হলে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি।

রাজপুরোহিত—মাতঃ! আপনার লক্ষ্মীমূর্তি দর্শন ক'রে আমার মনে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়েছে এবং আমার মন স্বতঃই আপনার অভিমুখী হয়ে পড়েছে। অপরাধের আর কি আছে? আপনার যা ইচ্ছা, তা অকপটে আমার নিকট ব্যক্ত করুন। নিশ্চয়ই তাদ্বারা পরম শুভ হবে।

গোপা—পিতঃ! লজ্জা নারীদের স্বভাব-ধর্ম। মনের ভাব তাঁরা সর্বদা মুখে প্রকাশ করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও, নিরুপায় হয়েই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে এই কথা নিবেদন করছি যে, আপনার অভীষ্ট বিষয়ে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন—যাতে কোনোরূপ বিলম্ব আর না হয়।

রাজপুরোহিত—(স্বগত)

আকস্মিক ঘটন	গূঢ-রহস্য-ঘন	চিন্তাতীত অদ্ভুত-স্বরূপ।
আভাসমাত্র-জ্ঞাত	বহুলাংশে অজ্ঞাত	আচ্ছাদিত তার সত্য-রূপ॥
কিন্তু সেই ত হবে	অতল-ভবার্ণবে	শুভ প্রাণতারণ-তরণী।
ধন্যা কন্যা অতুলা	রাজ্য-কম-কমলা	অকস্মাৎ উদিতা তারিণী॥[৪]

[গোপার প্রতি] কিন্তু স্নেহময়ি জননি! সেই রাজপুত্রবধূ কোথায়? আপনিই বা কে? কেন বিলম্ব না করতে বলছেন?

গোপা—আপনারই কৃপাসিক্তা সেই দীনা কন্যা আপনারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে। সে দণ্ডপাণি-সুতা গোপা, সেই ত রাজপুত্রের জন্য এতদিন অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। আর আপনি ত জানেনই বিলম্বে সব রস শুষ্ক হয়ে যায়।

রাজপুরোহিত—অহো! আমার সকল ক্লেশ আজ দূর হ'ল। ফলপ্রাপ্তি হলে প্রাণান্তিক ক্লেশরাশিও নিমেষে তিরোহিত হয়ে যায়। বহুদিন পরিভ্রমণ ক'রে আজ আমার অভীষ্ট লাভ করলাম। অতি শীঘ্রই রাজা শুদ্ধোদনকে এই সংবাদ দিতে হবে, কারণ তিনি সাতিশয় চিন্তাকুল হয়ে আছেন। সেজন্য, মাতঃ! অনুমতি দাও, আমি প্রত্যাবর্তন করি।

গোপা—ভগবন্! আপনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করুন। আমার প্রিয়সখী আপনার জন্য পাদ্যার্ঘ আনতে গৃহের অভ্যন্তরে গিয়েছে। সে শীঘ্রই এসে পড়বে।

রাজপুরোহিত—মাতর্গোপে! তুমি তো জানোই যে এরূপ ক্ষেত্রে আর ক্লান্তি থাকতে পারে না। বিশেষতঃ, যেখানে বিলম্ব হলেই বাধার সম্ভাবনা আছে।

অহো!	পশ্চিম গগনে	অন্তিম শয়নে	শায়িত দিবসমণি।
	হৃদয়-আকাশে	প্রোজ্জ্বল বিভাসে	উদিত আশা-দ্যুমণি॥
	আঁধার বাহিরে	আলোক অন্তরে	দুয়ের এ' সম্মেলনে।
	অকালে আগতা	উষা সুললিতা	মোর এ' হতাশ মনে॥
আশ্চর্য!	হৃদয় তিমির	হ'ল আজি দূর	সূর্য গেলে অস্তাচলে।
	দীপ্ত হ'ল চিত্ত	আনন্দ-রস-মত্ত	রাত্রি এলে ধরাতলে॥

---

৪ চিন্তাবাহ্যং চমক-ঘটনং গূহনং যৎস্বরূপে
কিঞ্চিল্লক্ষ্যং বহুল-সময়ে প্রাবৃতং গূঢবর্ষৈঃ।
সংসারাব্ধেরতলসলিলে তারকং প্রাণ-পোতং
ধন্যা কন্যা সহজ-সুভগা রাষ্ট্র-সৌভাগ্য-লক্ষ্মীঃ॥

[মন্দাক্রান্তাছন্দঃ]

মানবের মন অনুপম ধন হলেও অণুপরিমাণ।
স্বকীয় আনন্দে নিখিলের ছন্দে তুলিছে ভূমার তান ॥ ৫

কল্যাণি, রাজকুললক্ষ্মি! পবিত্রজ্যোতির্ময়ি! শাক্যরাজবংশের অক্ষয় আশীর্বাদ গ্রহণ কর। চিরায়ুষ্মতী হও।

গোপা—আপনার শ্রীচরণারবিন্দে এই স্নেহধন্যা কন্যার কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যপাদ মহারাজকেও আমার ভক্তি প্রণতি নিবেদন করবেন।

রাজপুরোহিত—আদরিণি মাতঃ! সর্বপ্রকারে তোমার মঙ্গল হোক। (নিষ্ক্রান্ত)

গোপা—(স্বগত) জানি না কি ঘটবে, আমার মন বিশেষ চিন্তাকুল হয়ে রয়েছে। যাহোক, কালের শক্তি অমোঘ। আমাদের আর কি সামর্থ্য আছে তা নিরোধ করবার? করুণাময় শ্রীভগবানের বিধানই জয়যুক্ত হোক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—মহারাজ শুদ্ধোদনের রাজসভা। কাল—প্রভাত]

শুদ্ধোধন—(সভাজনদের প্রতি)

হে বন্ধু বান্ধব ও প্রিয় পুত্রকন্যাগণ! সম্প্রতি আমি ঘটনা-পরম্পরায় জানতে পেরেছি যে, রাজপুত্রবধূ যশোধরা গোপা অবগুণ্ঠনরহিতা বলে কয়েকজন প্রজা বিরুদ্ধ সমালোচনা করছেন। এই কথা শুনে কুলবধূ যশোধরা আমার নিকট এই প্রার্থনা করেছেন যে, তিনিই স্বয়ং তাঁর এই আচরণ-বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার যথাযথ উত্তর দেবেন। তিনিই ত কুললক্ষ্মী, তিনিই ত আমার প্রজাবর্গের ভবিষ্যৎ মাতা, এবং সেজন্য তিনি স্বয়ং আপনাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কোনো ক্ষতি নেই—এই চিন্তা ক'রে আমি আমার পুত্রকন্যা-তুল্য সমস্ত প্রজাকে আজ এই প্রকাশ্য রাজসভায় আহ্বান করেছি। কৃপা ক'রে আপনারা সকলে শুনুন, এই অবগুণ্ঠন-রাহিত্য বিষয়ে সিদ্ধার্থের সহধর্মিণী—আমার আদরিণী কন্যা—যশোধরা-গোপার কি বক্তব্য আছে।

(যশোধরাকে আহ্বান ক'রে) কল্যাণময়ি মা আমার! তোমার ইচ্ছানুসারে আমি মিত্ররাজন্যবৃন্দ ও প্রজাপুঞ্জকে আজ এই সভায় আহ্বান করেছি। সকলের সম্মুখে তোমার অবগুণ্ঠন-রাহিত্য বিষয়ে তুমি যা বলতে অভিলাষ কর, তা নিঃসঙ্কোচে বল।

যশোধরা—পরমস্নেহময় পিতঃ, মহারাজ! পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য রাজন্যবৃন্দ! পরমস্নেহ-ভাজন দেশপ্রেমিক প্রজাপুঞ্জ! আপনারা সকলেই স্নেহভরে, কৃপা ক'রে আমার কথা শুনুন:

প্রথমতঃ, এটী অবিসংবাদী সত্য যে ভারতীয়া সহধর্মিণীর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হ'ল পতির অভিলাষ পূর্ণ

---

৫ অহো! একতঃ প্রয়াত্যস্তং মরীচিমালী অন্যত উদেতি মচ্চিত্তাশাভানুঃ।
এতয়োর্নির্গমাভ্যাগমান্তরালে সায়ন্তনে হৃদয়ে মে আয়াত্যুষা ॥
যতঃ—ঘনান্ধকারোঽহসৌ সূর্যেণ সহ গতঃ নবালোকো বিভাতি সাকং তমোভিঃ।
চমৎকারিত্বমংহো মানবমনসো হর্ষেণ হর্ষোচ্চয়াৎ স্ফূর্জতাজ্ জগৎ ॥
[প্রতিপাদ—বিংশমাত্রকং ছন্দঃ]

করা। আমার পূজ্যপাদ পতি, আপনাদের প্রিয় রাজপুত্রের ইচ্ছা যে তাঁর পত্নী যেন কোনদিন অবগুণ্ঠন ধারণ না করেন।

শুদ্ধোদন—সত্যই আমার পুত্র সিদ্ধার্থ তাঁর বধূর পক্ষে অত্যাবশ্যক যে পনেরটী গুণের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে অবগুণ্ঠন-রাহিত্য ও কবিত্বশক্তি—এই দুটী গুণ প্রধান ছিল।

কুলগুরু মহর্ষি কপিলের কৃপায় এই সমস্ত গুণই আমার এই প্রাণপ্রতিমা দুহিতার আছে।

যশোধরা—পুণ্যশ্লোক পিতঃ। আপনার স্নেহাশীর্বাদই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ফল দান করতে পারে। [সকলের প্রতি]

এই কারণে, পরমশ্রদ্ধেয় পতিদেবতার অভিলাষ পূর্ণ করাতে কি আমার কোন দোষ হয়েছে?

রাজন্যবৃন্দ—সে কথা ত ঠিকই। কিন্তু রাজপুত্রেরই বা এরূপ অভিলাষ হ'ল কেন? এ'ত দেশাচার সম্মত নয়।

যশোধরা—দেশাচার দেশের কল্যাণের জন্যই ত পালনীয়। সেজন্য দেশের হিতের জন্য দেশাচারও পরিবর্তন করা কর্তব্য।

শুদ্ধোদন—বুদ্ধিমতী মা আমার। এ'ত অতি সত্য কথাই বলেছ।

যশোধরা—পিতঃ। অনুগৃহীতা হলাম। দেখুন, নারী স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা, সাধারণ অবস্থায় তাঁরা লজ্জাপটাবৃতা হয়ে গৃহের মধ্যেই থাকতে পারেন। কিন্তু দেশের বিপদের সময়ে তাঁরা নিশ্চয়ই গৃহের বাহিরে আসবেন, প্রকৃত সত্য বা তত্ত্ব সকলের নিকট প্রকাশ করবেন।

রাজন্যবৃন্দ—নিশ্চয়ই, তাতে দোষের কিছু থাকতেই পারে না।

যশোধরা—আরো শুনুন, কৃপা ক'রে।

আপনারা কেহ কেহ বললেন যে, অবগুণ্ঠন রাহিত্য দেশাচার বা কুলচার-বিরুদ্ধ। এই বিষয়ে আমার প্রশ্ন হল এই যে—দেশাচার বা কুলাচার কি? আপনারা সকলেই জানেন যে, পরম-প্রজ্ঞাশীলা বাচক্নবী গার্গী জনকরাজার প্রকাশ্য রাজসভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্তা হয়েছিলেন। তিনি কি সেজন্য কুলাচার ভ্রষ্টা হয়েছিলেন?

পূর্বেই আমি যা বলেছি—দেশাচার দেশের, কুলাচার কুলের হিতের জন্যই ত কেবল পালনীয়। আমার কথাই ধরুন। আমার বংশ এখন রাজবংশ, সৌভাগ্যবশতঃ আমি রাজপুত্রবধূ। সেজন্য, আমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে যদি আমি পূর্বেই এই ভাবে পরিচিতা হই, তা গর্হিত হবে কেন?

প্রজাবৃন্দ—মাতার জয় হোক। আপনার দর্শনলাভে আমরা পরম ধন্য।

যশোধরা—আমি পুনরায় তারস্বরে ঘোষণা করব যে, নারীদের অবগুণ্ঠন-রাহিত্য সম্পূর্ণরূপেই যুগোপযোগী, দেশাচার বা কালাচার-বিরুদ্ধ নয়। আমাদের জন্ম এই মহাযুগসন্ধি-ক্ষণে, এখন দেশের সর্বত্রই হাহাকার, দিবারাত্র দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজ করছে এক গভীর হতাশা। এখন নারীরা কেবল গৃহের অভ্যন্তরেই থাকলে চলবে কেন? প্রয়োজনকালে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও দেশহিতার্থে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু, যদি নারীরা এই ভাবে দেশ-দেশান্তরে, দিগ্‌বিদিকে কর্মব্যস্তা থাকেন, তাহলে তাঁদের অবগুণ্ঠন-ধারণের প্রশ্ন কোথায়? সম্প্রতি যেন দেশে ঘোর কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে। সেজন্য, এই যুগে নারীদের দেশসেবাই প্রধান ব্রত, নিঃসন্দেহ। এই হ'ল আমার দ্বিতীয় কথা।

শুদ্ধোদন—অহো। দেশমাতৃকার প্রিয়তমা কন্যার দেশানুরাগ কি প্রবল! অথবা, আমার নয়নমণি কন্যাই স্বয়ং দেশজননী, সন্তানদের স্বীয় সেবায় আহ্বান করছেন।

সজ্জনবৃন্দ। আপনারা সকলে মনোযোগ সহকারে শুনছেন তো?

রাজন্যবৃন্দ—মহারাজ। সভাগৃহে ত নিঃশ্বাস-পতনের, সূচ-পতনের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মাতঃ। আপনি নিঃসঙ্কোচে সব বলুন। আমাদের কর্ণকুহর পিপাসু হয়ে আছে।

যশোধরা—আমি ধন্যা হলাম। পিতঃ' আপনার মধুর বাণী আমাকে প্রোৎসাহিত করছে।

আরো চিন্তা করুন। সমাজপক্ষীর ত দুটি পক্ষ, সেজন্য সে এক পক্ষে উড়তে পারে না। যদি নারী-পক্ষটি বাতব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহলে সমাজ চলবে কি ক'রে? আর এই চলনই ত জীবন। অতএব নারী কেন পশ্চাতে পড়ে থেকে, নীরবে দিন যাপন ক'রে কলঙ্ককালিমালিপ্তা হবেন? আপনারা জানেন যে, রুদ্রের থেকেও অধিক রুদ্রাণীই অসুর ধ্বংস করেছিলেন। বর্তমানকাল 'পঞ্চ-কষায়' পরিপূর্ণ। এই ঘোর বিপদ কালে শাক্যকুলবধূ, প্রজাদের মাতৃভূতা আমি দূরে উদাসীনা হয়ে থাকব কেন? সমাজ রক্ষার জন্য এখন নারীজাগরণ অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই আমার পরমারাধ্য পতিদেবতার এই অভিলাষ যে, আমি যেন অবগুণ্ঠিতা হয়ে গৃহকোণে বসে না থাকি। এই আমার তৃতীয় কথা।

প্রজাপুঞ্জ—মাতঃ। সত্য। কিন্তু তাতে শালীনতা বিপন্ন হবে না?

যশোধরা—রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ তোমরা। আমার কথা প্রণিধান ক'রে শোনো।

'শালীনতা'র প্রকৃত অর্থ কি? নারীরা অবগুণ্ঠন বর্জন করলেই শালীনতার প্রশ্ন উঠবে কেন? শালীনতা মনে, বাইরের আচার ব্যবহারে তা পর্যবসিত হবে কেন? বর্তমানে বিশেষ ক'রে ধর্মশালীনতার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। বস্তুতঃ, ধর্মশালীনতা রক্ষার জন্য আজ নারীদেরও বিশেষ ভাবে অগ্রণী হতে হবে। ধর্ম দ্বারা দুঃখক্লিষ্ট জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই আমার পুণ্যশ্লোক পতির ও আমার প্রথম সংকল্প। এই কারণে আমার পতি অবগুণ্ঠন ধারণের পক্ষপাতী নন। এই আমার চতুর্থ কথা।

রাজন্যবৃন্দ—জননি। আপনি স্বয়ং মূর্তিমতী শালীনতা, আপনার আচরণই সকলের আদর্শ হোক।

শুদ্ধোদন—(আনন্দবিহ্বল চিত্তে)

অহো। কি মধুরভাষিণী আমার এই মধুময়ী কন্যা। দেখ, এই বিশাল রাজসভার সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর অমৃতনিষ্যন্দিনী বাণী পানে পরম পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। আমার এই সর্বগুণসম্পন্না পুত্রী কবিতা রচনাতেও ত সিদ্ধহস্তা। কল্যাণি। তুমি উপস্থিত প্রাজ্ঞজনদের অধিকতর আনন্দবিধানের জন্য তোমার অবশিষ্ট ভাষণ সুললিত কবিতায় ব্যক্ত কর। পার্বত্য নির্ঝরিণীর ন্যায় কলনাদিনী, বিহগ-কাকলীর ন্যায় সুমিষ্টা, নবজলধারার ন্যায় সুশীতলা কবিতা যেমন মনকে স্পর্শ ও সঞ্জীবিত করে, তেমন ত আর অন্য কিছুই নয়।

যশোধরা—করুণাবরুণালয় পিতঃ। আপনার আদেশ সর্বদাই শিরোধার্য। আমি শ্লোকেই আমার পঞ্চম ও শেষ কথা আপনাদের শ্রীপদাম্বুজে নিবেদন করছি—

	সম্যগ্-বস্ত্রাবৃতা	সর্ব-দোষরহিতা	সংযতভাষিণী পুণ্যা।
	ভোগেচ্ছা-বিবর্জিতা	ফুল্ল-কুসুমপূতা	রমণী পরমা ধন্যা ॥
	অবগুণ্ঠনহীনা	সর্বভয়বিহীনা	বিরাজেন তেজস্বিনী।
	স্বমহিমপ্রদীপ্তা	পূর্ণ-গৌরবান্বিতা	অতুলনীয়া জননী ॥
কিন্তু	নারী-কলুষমনা,	সুশিক্ষা-দীক্ষাহীনা	হলেও লজ্জাপটাবৃতা।
	ঘোর-তমসাচ্ছন্না	নিখিল-দুঃখখিন্না	হবে সেই অবগুণ্ঠিতা ॥
পুনঃ	রমণী ধর্মাশ্রয়া	পরম-পূতকায়া	সেবা-দয়া-শোভান্বিতা।
	দিবাকর-ভাস্বরা	নিশাকর-মধুরা	পতিপদে নিবেদিতা ॥
	হলে অবগুণ্ঠিতা	দর্শন-বিবর্হিতা	হবে সে বিনা কারণে।
	প্রভাময়ী ভারতী	বিশ্বভুবন দীপ্তি	বঞ্চিতা কেন জ্ঞানধনে ?[৬]

রাজন্যবৃন্দ ও প্রজাপুঞ্জ—দেবি। কৃপা ক'রে বিরত হোন, বিরত হোন। আমাদের সমস্ত সন্দেহের আজ নিরসন হ'ল, সমস্ত ভ্রম দূর হ'ল। আপনিই ত স্বয়ং রাজ্যলক্ষ্মী, সম্প্রতি রাজপুত্র-বধূরূপে শাক্যকুল সমুজ্জ্বল ও পবিত্র করেছেন। আপনার দর্শন লাভে আমরা সকলে পরম ধন্য। আপনার এই পঞ্চবাণী পঞ্চপ্রদীপের মতই আমাদের বিশেষ ক'রে, নারীদের জীবন চিরালোকিত ক'রে রাখবে, নিঃসন্দেহ। জগজ্জননি। আমাদের ভক্তিনম্র, সাষ্টাঙ্গ প্রণতি গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করুন।

যশোধরা—প্রাণপ্রিয় সন্তানগণ। আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কর, তোমাদের সর্বথা কল্যাণ হোক।

শুদ্ধোদন—(সোল্লাসে)

গোপা বিশুদ্ধমনা	আত্মিক-গুণধনা	বিশ্বে তুলনাবিহীনা।
শম-দমসম্পন্না	সুসার্থকজীবনা	জ্ঞান-ভক্তিবিভূষণা ॥
কবিত্ব-সুরসিকা	মহানন্দদায়িকা	সর্বথা সিদ্ধার্থাধিকা।
বীরা মহাতেজস্কা	প্রাণপ্রিয়-বধূকা	প্রাণদা পুণ্য-সেতুকা ॥[৭]

যশোধরা—কৃতকৃতার্থা হলাম। সকলকে বারংবার প্রণাম।

[দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত]

৬ চন্দ্রার্ক-সন্নিভ-বিভা কমল-প্রকাশা প্রাণপ্রিয়ৈক-শরণা সতত়া-প্রতিষ্ঠা।
যা নাম ধর্মধনিনী পতিপাদলীনা কিং সাবগুণ্ঠনমুখী বিফলেক্ষণা স্যাৎ ॥

৭ গোপা বিশুদ্ধগুণভূষণজাতশোভা পুত্রোঽপি মে ন সমতামধুনাঽপি যাতি।
কালে পুনঃ শমদমাদিগুণবরিষ্ঠা ভূয়াদ্বধূর্জগতি শাশ্বতপুণ্যসেতুঃ ॥

[বসন্ততিলকছন্দঃ]

সমালোচনা

কল্যাণ—'ভক্তি-অঙ্ক' গোরখপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০৮, মূল্য ৭।০ টাকা।

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত ধর্মীয় পত্রিকা হিসাবে 'কল্যাণ' বহুজন-সমাদৃত। প্রতি বর্ষারম্ভে কল্যাণ-পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালক-মণ্ডলী এক একটি মূল্যবান বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইতঃপূর্বে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী সমন্বিত 'মহাভারতাঙ্ক', 'হিন্দুসংস্কৃতি-অঙ্ক', 'সন্ত-বাণী-অঙ্ক', 'তীর্থাঙ্ক' ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য এই বিরাট গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ ও মহিমা, শক্তি ও ফল, জ্ঞান কর্ম ও যোগের সহিত ভক্তির সুলভতা ও দুর্লভতা, ভক্তির লক্ষণ, অনাদিতা, আস্বাদ্যতা, বিবিধ শাস্ত্রে ভক্তির স্থান, ভক্তির মহান আচার্যগণ, ভক্তির সাধন পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি, শিবভক্তি, বিষ্ণুভক্তি, শক্তিভক্তি, সূর্যভক্তি, বিশ্বভক্তি, দেশভক্তি, সমাজসেবা, গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি প্রভৃতি বিষয় প্রখ্যাত সাধক ও লেখকবৃন্দ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তি-রসাপ্লুত কতকগুলি কবিতা ও সুন্দর ছবি গ্রন্থটির অলঙ্করণে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব পূর্ব বিশেষাঙ্কের ন্যায় এই সংখ্যাটিও পাঠ করিয়া ভক্ত পাঠকমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত হইবেন।

দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি (২য় খণ্ড)—স্বামী বাসুদেবানন্দ। প্রকাশিকা: শ্রীমতী কমলা দেবী, ৪০এ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬, পৃষ্ঠা—৪৭৫, মূল্য পাঁচ টাকা।

শাস্ত্রনিষ্ণাত সাধকের চিত্তহ্রদে বিচিত্র ভাব-তরঙ্গের লীলাবিলাস হয়, তাহাতে থাকে কখনও গভীর চিন্তা, কখনও দুরূহ তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ, কখনও বা ঐকান্তিকী প্রার্থনা ও প্রাণের আকৃতি। পূজনীয় স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজ তাঁহার ভাবোত্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে ভাব-পুষ্প চয়ন করিয়া দিনলিপিতে রাখিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য 'দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি' তাঁহার ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ডাইরীর গ্রন্থরূপ। সার্থকনামা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে মনে হয় সত্যই দিব্যবাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতি সহজ ও সরলভাবে বহু বিষয়ের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সমাধান একত্র পাওয়া দুর্লভ। আলোচিত বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: কল্পতরু, সমাধির পরের কথা, ধ্যানের চিত্র, অবতারের জাগরণ, মূর্তিপূজা, জড় ও চৈতন্য, কুণ্ডলিনী, ব্রহ্মবিদের সর্বজ্ঞত্ব, ধর্মের স্বাদেশিকতা, চিৎ ও চিত্ত, মরমিয়া তান্ত্রিকের সাধনার স্তর, উপনিষদে সমন্বয়, মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ।

—জীবানন্দ

শিবলিঙ্গ রহস্য: শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬, পৃষ্ঠা ৩০, মূল্য আট আনা।

ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন: রাজনৈতিক কারণে বৈরিতাবশতঃ বহু ইংরাজ আমেরিকান লেখক ও খৃষ্টীয়ান পাদরী ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কে কুৎসাগ্লানি প্রচার করেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের বহু ভ্রাতাও ঐ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এই জাতীয় তিনটি ভ্রান্তি নিরসন জন্যই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে স্থানভ্রষ্ট অশীতিপরবৃদ্ধ লেখক বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই পুস্তক প্রকাশের স্বল্পকাল পরেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। স্বধর্মের মহিমা রক্ষার্থ এই সাধনা তিনি নিজ জীবন দিয়াই করিয়াছেন। যদিও আলোচনাটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা গবেষক মনকে এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিবে। লেখক প্রমাণ করিয়াছেন 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ 'শিশ্ন' নয়, 'লিঙ্গতে লক্ষ্যতে' বা 'লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন—শিবলিঙ্গ লয়কর্তার প্রতীক। বিভিন্ন শিবলিঙ্গ, উহাদের প্রকার ও লক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তিনি বহুপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্য-বিবরণী

রেঙ্গুন ঃ রামকৃষ্ণ সোসাইটির কর্মধারা ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ে জনগণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কাজে সীমাবদ্ধ। এখানকার বৃহৎ লাইব্রেরি ও পাঠাগার সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য উন্মুক্ত, পাঠকবৃন্দকে চাঁদা দিতে হয় না। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : বর্তমানে গ্রন্থাগারে ইংরেজী, বর্মী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, সংস্কৃত, বাংলা ও গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার ২০ হাজারেরও অধিক পুস্তক আছে, '৫৭ খৃঃ তিন হাজারের অধিক গ্রন্থ সংযোজিত। গত তিন বৎসরের একটি তুলনা-তালিকা :

খৃঃ	পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা	পাঠাগারে দৈনিক উপস্থিতির গড়
১৯৫৫	৯,০৭৪	১২৫
১৯৫৬	১৮,১৭৪	১৭৫
১৯৫৭	২৫ ৮৮৪	২০০

পাঠাগারে ৬টি বিভিন্ন ভাষায় ২৮টি দৈনিক পত্রিকা এবং উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রিকাগুলি রাখা হয়। লাইব্রেরি ও পাঠাগারের কর্মবিস্তার জনসাধারণের পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গীতা ও বেদান্ত সম্বন্ধে ৯৩টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং পাঠচক্রের কাজ যথারীতি চলে। বিভিন্ন ধর্মের স্থাপয়িতাগণের স্মরণোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠা-বর্ষে ৭৭০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৩৩,৩৫১ ('৫৬ খৃঃ ১,২১,২৯১), এক্স-রে বিভাগে শতাধিক, চক্ষু-বিভাগে ১৩ হাজারের অধিক, E. N T বিভাগে ৯ হাজারের অধিক, দন্তবিভাগে প্রায় ৫ হাজার রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসাদি করা হয়। রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লেবরেটরির পরীক্ষাকার্যও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ৮ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক '৫৭ খৃঃ যোগদান করিয়াছেন। জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা সেবাপ্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতির মুখ্য কারণ। আলোচ্য বর্ষে বিশেষ অগ্রগতি—কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে এক্স-রে প্ল্যাণ্ট প্রতিষ্ঠা।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটির সূচনা হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের হৃদয় জনগণের দুঃখকষ্ট দেখিয়া করুণায় বিগলিত হয়, দরিদ্র গ্রামবাসিগণের সর্ববিধ সাহায্যকল্পে তিনি মিশনের এই শাখা কেন্দ্র স্থাপন করেন। গ্রাম্য পরিবেশে মিশনের ইহাই প্রথম কেন্দ্র।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি হাই স্কুল, একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল ও একটি বয়স্ক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়গুলিতে চার শতাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতেছে। আশ্রম লাইব্রেরি হইতে প্রায় ৫,৫০০ বই পড়িবার জন্য পাঠকগণকে দেওয়া হয়। পাঠাগারে প্রত্যহ বহু লোক আসিয়া দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তক পাঠ করেন।

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগ-সমন্বিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬,৭০৭ জন রোগী এবং পশুচিকিৎসা-কেন্দ্রে ৪০০ পশু চিকিৎসিত হয়।

দুঃস্থ পরিবারে চাল, টাকা এবং দরিদ্র বালকদিগকে বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সাময়িক সাহায্য উল্লেখযোগ্য। '৫৬ খৃঃ দুর্ধর্ষ বন্যা-পীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্য চালানো হয়।

সারগাছি কেন্দ্র কর্তৃক বহরমপুরে একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। দুই জন কর্মী সেখানে থাকিয়া একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার চালনা করিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের স্মরণোৎসব যথাযথ-ভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ধর্ম বিষয়ে আলোকচিত্র সহযোগে প্রদত্ত বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে দুই শত ছিল। সারগাছি ও বহরমপুর উভয় আশ্রমেই ধর্মপুস্তক অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক উৎসব

আসানসোল ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ঠা, ৫ই, ৬ই এপ্রিল তারিখে শান্ত পরিবেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব এক সুনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে। তৎসঙ্গে ৭ই এপ্রিল তারিখে আশ্রম-বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

চারিদিন-ব্যাপী উৎসবের প্রারম্ভে দুইটি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিসহ প্রভাতে ভক্তবৃন্দের এক শোভাযাত্রা প্রধান দুইটি পথ পরিক্রমা করে। সকাল ৭টা হইতে পূজা ও হোমাদির সঙ্গে সঙ্গে গীত-সুধাকর শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভজন গান পরি-বেশন করেন। বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা-সভায় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপাঁচকড়ি সরকার, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী ভাষণ দেন। ৫ই এপ্রিল বর্ধমান-জেলাশাসক ডাঃ অবনীভূষণ রুদ্রের পৌরোহিত্যে অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সুমধুর জীবন-চরিত্র আলোচনা করেন।

৬ই এপ্রিল রবিবারের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। ঐ দিন সকাল ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত কীর্তন গান পরিবেশিত হয়। বৈকাল ৫-৫০ ঘটিকায় অধ্যাপক বসু আশ্রমের নব-পরিকল্পিত 'জুনিয়র বেসিক' বিদ্যাভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। সন্ধ্যা ৬টায় বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে আচার্য বৈজনাথ রায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে হিন্দীতে ভাষণ দেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, স্বামী বীতশোকানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দজীর ভাষণের পর সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সরল সহজ ভাষণে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বসভ্যতার মিলনস্থলরূপে কল্পনা করেন। ভারতীয় সভ্যতা স্থিতিশীল নহে, উহা গতিধর্মী ও উহাকে প্রগতির পথে আগাইয়া চলিতে হইবে।

৭ই এপ্রিল সোমবার দুর্গাপুর ইস্পাত কার-খানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকরুণাকেতন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় আশ্রম ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করিলে আসানসোল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার ভাষণে স্বাধীন ভারতে মেধাবী ও স্বল্প মেধাবী সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সম্মুখে আশার উজ্জ্বল আলো

তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হইলে স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত বাস্তবে রূপায়িত হইবে। সভাপতি মহাশয় বলেন এই বিরাট সংসারে কীট-পতঙ্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব পর্যন্ত সকলে সম্মুখপানে নিরন্তর ছুটিয়া চলিতেছে। এখানে কাহারও বিরাম নাই। কিন্তু লক্ষ্যহীন চলা নিরর্থক বলিয়া তিনি ছাত্র-ছাত্রীগণকে স্বামীজীর জীবন ও আদর্শকে তাহাদের চলার পথে ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করিয়া কর্মময় সংসারে ছুটিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করেন। পুরস্কার বিতরণের পর জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

জন্মোৎসব

কাঁথি (মেদিনীপুর) : বিগত ৪ঠা এপ্রিল হইতে ৬ই এপ্রিল দিবসত্রয় কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডী পাঠাদি সহ উৎসবের সূচনা হয়, ঐদিন সন্ধ্যায় স্বামী সুশান্তানন্দ শিক্ষামূলক আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন, পরবর্তী দুই দিন বিরাট ধর্মসভায় বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী পূর্ণানন্দজী বর্তমান যুগসমস্যাসমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে সুললিত ভাষায় সুচিন্তিত ভাষণ দেন, অধ্যাপক অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ভুবনমোহন মজুমদার প্রমুখ বক্তাগণও বলেন। ৬ই এপ্রিল রবিবার পূর্বাহ্নে পূর্ণানন্দজী মহারাজের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যার পর বিভিন্ন হরিসমাজ মধুর মৃদঙ্গধ্বনি সহযোগে হরিনাম সংকীর্তন করেন।

উৎসবের অঙ্গ হিসাবে স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত জনসমাগমে উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচ হাজারেরও অধিক ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) :

২৯শে ও ৩০শে মার্চ রবিবার বহরমপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীনন্দকিশোর কীর্তন-বিশারদের গান হয়।

৩০শে মার্চ রবিবার মঙ্গলারতি ভজন ও বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতিতে সারাদিন আনন্দ-উৎসবের পর সন্ধ্যায় জেলাশাসক শ্রীযশোদাকান্ত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বামী অন্নদানন্দ, অধ্যাপক রেজাউল করিম ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণোদিত সেবাধর্মের প্রকাশ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনে এই মুর্শিদাবাদে কিভাবে ঘটিয়াছিল—মর্মস্পর্শী ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। প্রায় ১০০০ নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আরাত্রিকের পর শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী মহাশয়ের কীর্তনান্তে উৎসব শেষ হয়।

অখণ্ডানন্দ-স্মৃতিপূজা

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) : গত ২৮শে মার্চ (১৪ই চৈত্র ১৩৬৪) শুক্রবার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা-মহোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি, শান্তিপাঠ, চণ্ডী-পাঠ, বিশেষ পূজা হোম ও ভজনাদিতে সারাদিন আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী অন্নদানন্দজী পূজ্যপাদ মহারাজের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে পূর্বাহ্নে পাঠ ও আলোচনা করেন, অপরাহ্নে জেলাশাসক শ্রীযশোদাকান্ত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীভি রামমূর্তি শান্তিপাঠ

করিলে স্বামী নিরাময়ানন্দ অখণ্ডানন্দ মহারাজের জীবনের বহু নূতন নূতন ঘটনা বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। স্বামী অন্নদানন্দজী পূজ্যপাদ মহারাজের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সকলকে অভিভূত করেন, সভাপতি মহাশয় ভাবপূর্ণ হৃদয়ে মহারাজের সেবাধর্মের বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। প্রায় ৮০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান-কেন্দ্রে উৎসব

ঢাকাঃ গত ৮ই হইতে ১৪ই ফাল্গুন পর্যন্ত ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে কয়েকদিন রামায়ণ-গান, ছায়াচিত্র বক্তৃতা, সাধারণ সভা, পূজা পাঠ ও দরিদ্র-নারায়ণসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন যথারীতি পূজা, হোম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়, দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিবস বৈকালে স্বামী সূক্ষ্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী হইতে এবং সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ 'কথামৃত' হইতে পাঠ ও আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিবসে প্রায় ৪৫০০ নরনারী প্রসাদ পান এবং সারাদিন মঠের প্রাঙ্গণ লোক-সমাগমে মুখরিত থাকে।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে রামায়ণ গানের পর বিকালে ছাত্রসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীমুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য এম-পি-এ বক্তৃতা দেন, এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রও সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিল। চতুর্থ দিবস মধ্যাহ্নে রামায়ণ গান হয়। বিকালে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তকুমার দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে মিশন বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরিত হইলে পর মিশনের অস্থায়ী সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব বার্ষিক কার্যাবলির মৌখিক বিবরণী প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশ্বমৈত্রীর বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীরাম-বিবেকানন্দ' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।

বাগেরহাট (খুলনা):

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা হোমাদি এবং ভজন-কীর্তনাদি সহ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত উৎসবে অন্যূন আড়াই হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। বিগত ২১শে চৈত্র বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি জনসভায় স্বামী শর্মানন্দ এবং উকিল বিনোদবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন। উকিল অশ্বিনীবাবু 'যত মত তত পথ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গ লইয়া রাত্র ৯টা হইতে ১।।টা পর্যন্ত 'কবিগান' বা 'তরজা' সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন রাজ্যান্তবর্তী পোর্টল্যাণ্ড শহরে অবস্থিত বেদান্ত সমিতির ১৯৫৬-৫৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। সমিতির ধর্মনেতা স্বামী অশেষানন্দজী প্রতি রবিবার সকাল ১১টায় সমিতির 'বৈদিক মন্দিরে' (Vedic temple) এবং সন্ধ্যা ৭।।টায় সমিতির বক্তৃতা-গৃহে উপাসনা ও ধর্মালোচনা করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এবং বৃহস্পতি-বারে রাজযোগের ক্লাস পরিচালিত হইয়াছে। ভগ-বান যীশুখৃষ্টের জন্মদিবস (Chr stmas), তিরো-ভাব-দিবস (Good Friday) এবং পুনরুত্থান

দিবসে (Easter) বিশেষ উপাসনা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। দুর্গাপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা হোমাদির অনুষ্ঠান হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের জন্মজয়ন্তীতেও পূজা এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বৎসরের শেষ রাত্রিতে মধ্যরাত্রীয় উপাসনা এবং ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব দিবস-উদ্‌যাপনও সমিতির সভ্যসভ্যাগণের নিকট বিশেষ আধ্যাত্মিক উদ্দীপনাদায়ক ঘটনা। নভেম্বর মাসে সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবসও সোৎসাহে পরিপালিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে স্বামী অশেষানন্দ বাহিরের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান হইতে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতাদি দিয়া আসিয়াছেন। আগষ্ট মাসে তিনি হাওয়াই দ্বীপে হনলুলু শহরের বেদান্তানুরাগিগণের আমন্ত্রণে একমাস ঐ শহরে অবস্থান করেন এবং অনেকগুলি বক্তৃতা ও ক্লাস পরিচালনা করেন। আলোচ্য বর্ষে প্রভিডেন্স বেদান্তকেন্দ্রের স্বামী অখিলানন্দজী এবং সি-এট্‌ল্ বেদান্তকেন্দ্রের স্বামী বিবিদিষানন্দজী এই কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং মনোজ্ঞ ভাষণদ্বারা তাঁহারা এই কেন্দ্রের সভ্যগণকে আনন্দ দান করেন। স্বামী অশেষানন্দের নেতৃত্বে পোর্টল্যাণ্ডে বেদান্তের প্রচার ও সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

[উৎসব-সংবাদ প্রেরকগণের প্রতি অনুরোধ : সরল ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে কর্মসূচীর বিশেষানুষ্ঠানগুলিই তাঁহারা পাঠাইবেন।—উঃ সঃ]

সিঁথি (কলিকাতা-২) : রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৩রা এপ্রিল হইতে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে ফুল, মালা, চন্দনে সুশোভিত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি রাখা হয়। পূজা, পাঠ, সভা ও কীর্তনাদি প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের প্রবীণ সাধু শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী, স্বামী নিরাময়ানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন এবং ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও জীবনী আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা কান্তিলতা দেবীর চণ্ডীর কথকতা, হাওড়া অভয় সঙ্গীত পরিষদের শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকীর্তন, শ্রীরামজীবন মুখোপাধ্যায়ের নিমাই-সন্ন্যাস লীলাকীর্তন, শিকদারবাগান সঙ্গীত সমাজের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন, অরোরা ফিল্‌মসের 'জয়দেব' সবাক চিত্র সমবেত সকলকে আনন্দ দেয়। সঙ্গীত সহকারে স্বামী পুণ্যানন্দজীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল।

বিভিন্ন দিনে ছাত্রছাত্রী সভা, মহিলাসভা এবং শিশুসভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রসভায় স্বামী জীবানন্দ সভাপতিত্ব করেন। মহিলাসভায় সভানেত্রী ছিলেন দক্ষিণেশ্বর সারদামঠের ব্রহ্মচারিণী বাসনা দেবী এবং বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা সুশীলা মণ্ডল এবং শ্রীসত্যবতী রায়চৌধুরাণী। শিশুসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপন-বুড়ো)। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দাশ্রমের বালিকাগণ ও চারিগ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভ্যগণ ভজন ও কীর্তন করেন।

ইহা ছাড়া শ্রীযুক্তা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দময়ী দাশগুপ্তা, শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীমেঘনাথ বসাক প্রভৃতি সুমধুর কীর্তন ও ভজন গানে সকলকে আনন্দ দান করেন। ৬ই এপ্রিল রবিবার প্রাতে ভক্তজনমণ্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের প্রতিকৃতি লইয়া নগর পরিক্রমা করেন। ঐদিন দ্বিপ্রহরে প্রায় ৩০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবে প্রতিদিনই ৫।৬ হাজার দর্শক সমবেত হইতেন।

ঘোষপুর (হুগলী) : গত ৫ই এপ্রিল ঘোষপুরে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সমস্ত দিবসব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে বিশেষ-পূজা, গীতা ও চণ্ডী-পাঠান্তে সমাগত দুই সহস্রাধিক নর-নারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে কবিতা আবৃত্তি প্রবন্ধ পাঠ করে। পরিশেষে সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' সম্বন্ধে বলেন। সন্ধ্যায় কলিকাতার প্রখ্যাত কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি অবলম্বনে কথকতা সমাগত প্রায় সহস্র নরনারীকে মুগ্ধ করে।

পরদিন দেড় মাইল দূরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্মস্থান ময়াল-ইছাপুর গ্রামে পূজা পাঠ ও প্রসাদ ধারণ-কালে স্থানীয় বহু ব্যক্তি সমবেত হন।

নূতন পুকুর—(২৪ পরগণা) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী জীবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এবং সভাপতি বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

দ্বিপ্রহরে পূজা ও ভোগারতি সমাপ্ত হইলে প্রায় সহস্রাধিক লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চৌধুরীহাট (কোচবিহার) : গত ৪ঠা ৫ই, এবং ৬ই এপ্রিল কুচবিহারের অন্তর্গত চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়।

বেলুড়মঠ হইতে আগত স্বামী মিত্রানন্দ তিন হাজার শ্রোতার সমক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারা ব্যক্ত করেন। ৫ই এবং ৬ই এপ্রিল অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ ও দশ সহস্র দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলী) : গত ৭ই চৈত্র তারকেশ্বরের নিকটবর্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে (আরামবাগ মহকুমায়) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-শ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৩তম শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রাতে বিশেষ পূজা ও হোম, মধ্যাহ্নে কমপক্ষে দুই হাজার নর-নারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে জনসভায় স্বামী মিত্রানন্দ, ডাক্তার রাধাকান্ত গোস্বামী এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যুগাবতারের আধ্যাত্মিক বাণীর উপযোগিতা বিশ্লেষণ করেন।

ঘাটাল (মেদিনীপুর) : গত ৬।৪।৫৮ তারিখে ঘাটাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২৩তম জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল, পূর্বদিন সন্ধ্যায় রামনাম সংকীর্তন হয়, রবিবার ভোরে মঙ্গলারতির পর কীর্তনসহ নগরপরিক্রমা, বেলা ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত পূজা সুললিত কীর্তন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হয়, পরে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত নরনারায়ণের সেবা হয়, প্রায় ২ হাজার লোক প্রসাদ পায়। সন্ধ্যা ৭টায় ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন ঘাটাল মহকুমাশাসক। স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, শ্রীযুক্ত জলধর বিশ্বাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কুমিল্লা : রামকৃষ্ণ আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ উৎসব গত ১৯, ২০, ২১শে মার্চ তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে বুধবার স্বামী নিরূপানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সান্ধ্য আরাত্রিকের পর রামায়ণ গান হইয়াছে। ২০শে সাধারণ সভায় আশ্রমের কার্যবিবরণী পঠিত হইলে রামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতার পর রাত্রে রামায়ণ-গান হইয়াছে। ২১শে ঊষা-কীর্তন, ভজন-সঙ্গীত নামকীর্তন, বিশেষ পূজা হোম, ছায়াচিত্রে মহাভারত প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন উৎসব হয়।

জয়নগর-মজিলপুর : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ৮ই ফাল্গুন বিশেষ পূজা ও নরনারায়ণ সেবায় ২৫০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১১ই ফাল্গুন কবিগানে সমাগত বহু

নরনারী তৃপ্তি লাভ করেন। ১৮ই ফাল্গুন স্থানীয় ৺ধন্বন্তরী মাতার চাঁদনীতে স্বামী দেবানন্দজীর সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ও স্বপনবুড়ো' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

সরকারী ভাষারূপে সংস্কৃত

বিহার সংস্কৃত সমিতির বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে ইংরেজী ও হিন্দীর সহিত সংস্কৃতকেও সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। সংস্কৃতকে উচ্চ বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য করা উচিত এ বিষয়ে সংস্কৃত কমিশনের প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করেন। এরূপ করিলে এবং সংস্কৃতের আবহাওয়া অপসারিত করিলে ভারতের যুবকদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হইবে, কারণ আধুনিক প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই সংস্কৃতের প্রভাব ওতপ্রোত।

আচার্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, সংস্কৃত শুধু প্রাচীনতম নয়, পূর্ণতম ভাষাও বটে। মানুষের ভাষামধ্যে এমন আর একটিও ভাষা ভাবা যায় না যা সংস্কৃতের কাছাকাছি। সারা পৃথিবীর বিচারে দেখা গিয়াছে অন্যান্য ভাষার তুলনায় তিন সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় পরিবেশে সংস্কৃত যে সম্মান অর্জন করিয়াছে আর কেহ তাহা করে নাই এবং সংস্কৃত আরও বহুদিন এই সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে।

তিনি বলেন, সংস্কৃত এরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংযতভাবে সকল খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়াছে যে, সকল বিদেশী ছাত্রই সংস্কৃত ব্যাকরণ-পদ্ধতি পাণিনিকে মানব-মনীষার এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষার সহিত পাশ্চাত্য ভাষাগুলির সংযোগ অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। পাশ্চাত্য গবেষকগণের মধ্যে প্রচলিত মত—ভারতেও ভাষাতত্ত্বের চিন্তাশীল ছাত্রগণ কর্তৃক গৃহীত—বৈদিক ভাষাভাষিগণ ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। ভারতেরও কিম্বদন্তী—হিমালয়ের পারে উত্তরকুরুই পূর্ব পুরুষগণের আবাসভূমি। তৎসত্ত্বেও ভারতের মাটিতেই বৈদিক কৃষ্টি ও ভাষা পূর্ণ বিকশিত হয়।

ভারতের জীবন কৃষ্টি ও ধর্মে যে ঐক্য তাহার ভিত্তি এই মহতী সংস্কৃত-ভাষা। এই ভাষার ক্রমবিকাশে দ্রাবিড় কিরাত ও নিষাদ ভাষাও কিছু কিছু দিয়াছে, সেইজন্যই সংস্কৃত ভাষা ভারতের সকল মানুষের একটি সম্মিলিত কৃষ্টি তাই সংস্কৃত ভাষা বিনা বাধায় সর্বত্র প্রচলিত হইয়া যথার্থভাবে ভারতের জাতীয় ভাষা হইয়াছিল।

এখন দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের একদল উগ্রপন্থী সংস্কৃতের বিরোধী। তাঁহারা যদি ভারতের কৃষ্টিগত ধর্মীয় ও রাজনীতিক একত্ব স্থাপনে সংস্কৃত ভাষার-গুরুত্ব বুঝিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ ভাব পোষণ করিতেন না। ভারতের কৃষ্টিগত একত্ব আনয়নে সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, ভারত আজ ধর্ম এবং কৃষ্টিতে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—তাহা সংস্কৃত ভাষার জন্যই হইয়াছে। ভবিতব্য অনুসারে—প্রাচীনকালে যখনই বিভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠভাব সমন্বয়ে ভারত এক মহতী কৃষ্টি উৎপন্ন করিয়াছিল—তখনই ভারত সকল জাতিকে সত্য চিন্তা ও সত্য প্রচেষ্টার পথ দেখাইয়াছে। সংস্কৃতই ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মনীষা ও আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্র। ভারত ও বৃহত্তর ভারতের পরিকল্পনায় সংস্কৃতের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনে সংস্কৃতভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতে এখনই আমাদের সজাগ হওয়া দরকার।

সাধুর স্বভাব

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনান্ অহেতুনাহন্যানপি তারয়ন্তঃ ॥
অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥

[শংকরাচার্যকৃত বিবেকচূড়ামণি—৩৯, ৪০]

সতত দুঃখসন্তপ্ত মানুষের মনে শান্তি দিবার জন্য, জীবনপথে পথহারা যাত্রীকে সুপথ দেখাইবার জন্য লোকগুরু মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

বসন্তের বায়ু শীতের জড়তা দূর করিয়া বনে বনে গাছে গাছে ফুল ফুটাইয়া যায়, ইহাই তাহার স্বভাব, ইহার জন্য সে কিছু চায় না। শান্ত মহাপুরুষ এই সাধুগণও সেইরূপ তাঁহাদের সংস্পর্শে সমাগত মানব-মনের তামসিক জড়তা—সংসারমোহনিদ্রা—দূর করিয়া তাহাতে সচ্চিন্তা সদ্‌ভাব ও সৎসংকল্প জাগাইয়া নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়া যান।

তাঁহারা স্বয়ং ভয়ঙ্কর সংসারসাগর পার হইয়াছেন, সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গতাড়িত দেখিয়া অহেতুক করুণাবশতঃ অপরকেও পারে লইয়া যান।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অজ্ঞান-বন্ধন, অশান্তি-ক্লান্তি দেখিয়া তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐগুলি দূর করিতে যান, তাঁহাদের স্বভাব সুধাকরের মতো। সুধাংশু যেমন স্বভাববশতই রবিকর-সন্তপ্ত পৃথিবীতলকে শীতল করিয়া থাকে, মহাপুরুষগণও তেমনই মানুষের ত্রিতাপ-জ্বালা শান্ত করিয়া থাকেন, প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করেন না, লোক-কল্যাণই তাঁহাদের জীবন-ব্রত।

কথাপ্রসঙ্গে

নারীর শিক্ষা

নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, 'Give me good mothers, I will give you a great nation' —আমাকে ভাল মা দাও, আমি তোমাদের মহান্ জাতি দিব। কি গভীর অনুভূতিপূর্ণ ব্যথায়-ভরা কথাগুলি! তিনি তাঁহার জাতির তদানীন্তন জীবন-ধারায় ও রীতিনীতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ঐ প্রসিদ্ধ উক্তির সহিত আমরা স্মরণ করি ইংরেজী প্রবাদ-বাক্য: 'She who rocks the cradle, rules the world'—যে হাত দোলনা দোলায় সেই হাতই পৃথিবী শাসন করে। প্রবাদের ভিতর একটি জাতির হৃদয়মথিত অভিজ্ঞতা অতি অল্প কথায় ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভারত-কৃষ্টির বাহন সংস্কৃত ভাষা একটি শব্দেই যে এক মহাভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম তাহার একটি চমৎকার উদাহরণ—মহিমময় 'মাতা' শব্দটি, মাতা নির্মাতা।

সহস্র বৎসর পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ আজ নবজীবন গঠনেব জন্য বদ্ধপরিকর, নানা পরিকল্পনায় ভারতগগন মুখরিত। কিন্তু গঠন করিবে কে? নির্মাতা কই? কোথায় সেই মহতী মাতৃশক্তি যে দুই হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া শিশুকে লালন করে, পালন করে, শিশুকে কিশোরে—কিশোরকে যুবায় পরিণত করে? কোথায় মাতা—নির্মাতা?

নব-ভারত-পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উদ্গাতা সুদূরনিবদ্ধদৃষ্টি স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাসহায়ে সর্বাগ্রে নারীজাতির উন্নয়নেই যত্ন প্রকাশ করেন। তাঁহার ভারতীয় কর্মসূচীর প্রথমেই তাই দেখা যায় ভগিনী নিবেদিতা-সহায়ে বালিকা-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা। দেশে ও বিদেশে মুক্তকণ্ঠে তিনি ভারতীয় নারীর মহিমাকীর্তন করিয়াছেন, যাহাতে মাতৃভক্তি-সহায়ে এই মৃতকল্প জাতি বাঁচিয়া উঠে। জাতির উত্থানে পতনে, সংসারে সমাজে শান্তি-স্থাপনে বা অশান্তি আনয়নে নারীশক্তির অমোঘতা উপলব্ধি করিয়া সকল দেশের সামাজিক নিয়ম-প্রবর্তক চিন্তাশীল শাস্ত্রকারগণ প্রথমে নারীকেই সংযত হইবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-সহায়ে সংযত নারীই শান্তিপূর্ণ সুন্দর সংসার ও সমাজ রচনা করিবে এবং জাতি উন্নতির পথে চলিতে থাকিবে, —ইহাই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সিদ্ধান্ত।

আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় নারীশিক্ষা আজ যে শুধু অবহেলিত—তাহা নয়, কোন্ পথে কি উদ্দেশ্যে যে চলিয়াছে তাহাই কেহ বলিতে পারে না। একটি উদ্দেশ্য বোঝা যায়—'স্বাধীনতা', এবং একথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় পাশ্চাত্ত্য সংস্করণের স্বাধীনতা, যাহা নারীকে না দিয়াছে শান্তি—না দিতেছে স্বস্তি।

নারী শক্তি, পুরুষের সহযোগী—পরিপূরক পুরুষেব সমকক্ষ বা প্রতিযোগী হইবার জন্য নারী জন্মগ্রহণ করে নাই এবং স্বাভাবিকভাবে তাহা কখনও হইতে পারেও না—এবং হওয়ার প্রয়োজনও নাই। যেখানে জোর করিয়া উহা করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, অথবা আর্থনীতিক কারণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে, সেখানে সামাজিক ও ব্যক্তিগত মানসিক নানা অশান্তিরই সৃষ্টি হইতেছে। অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা বিনষ্ট করিতেছে। কতকগুলি গুণ ও কর্ম পুরুষে শোভা পায়, সেগুলি নারীতে অশোভন, সেইরূপ কতকগুলি গুণ ও কর্ম নারীর অলঙ্কার, পুরুষে সেগুলি হাস্যোদ্দীপক। প্রকৃতির এই নিয়ম কি এত

সহজেই লঙ্ঘনীয় ? ব্যতিক্রম দুএকটিই সম্ভব, ব্যাপক ব্যতিক্রম বা নিয়মলঙ্ঘন ভয়েরই কারণ।

নারী ও পুরুষের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়াই উভয়ের জীবনধারা পৃথক্ হইয়াও পাশাপাশি চলে, এবং ইহাই অপূর্ণ সংসারে, অশান্ত সমাজে ও বিরোধপূর্ণ জীবনে একটা সামঞ্জস্য, সম্পূর্ণতা ও শান্তি আনিয়া থাকে।

* * *

সম্প্রতি দিল্লীতে নারীশিক্ষার জাতীয় কমিটির উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যাহা বলিয়াছেন তাহা সাবধান-বাণীর মতো দেশবাসীর প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইবে। তাঁহার মূল বক্তব্য: শিক্ষায় মেয়েরা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। নারীদের, বিশেষতঃ বালিকাদের শিক্ষা আরও উন্নত ও শক্তিশালী করিতে না পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তিনি আরও বলিয়াছেন: দেশে স্বাধীনতা আসার পর হইতে জাতির স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তির জন্য আমরা ড্যাম, জলবিদ্যুৎ, সারের কারখানা প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আরও প্রয়োজনীয় একটি দিক আছে—উহা জাতির চরিত্র গঠন।

বর্তমান পৃথিবীতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়—বিজ্ঞানে সজ্জিত, শিক্ষায় সমুন্নত বহু জাতি আজ শৃঙ্খলার অভাবে ধ্বংসোন্মুখ। অতএব আজ শিক্ষায় যন্ত্রপাতির উপর অত্যধিক জোর না দিয়া মনুষ্যত্বের উপর জোর দিবার প্রয়োজন বেশী। যন্ত্রপাতি প্রধানতঃ পুরুষ-কেন্দ্রিক, মনুষ্যত্ব-গঠনের দায়িত্ব প্রধানতঃ নারীর, তাই প্রথমেই প্রয়োজন নারীর শিক্ষা।

নূতন ভবিষ্যৎ রচনা করিতে গেলে নূতন ভাবরাশি জীবনে বপন করিতে হইবে,—তবেই আচরণে তাহা ফুটিয়া উঠিবে! আজ দেখা যায় আমরা বড় বড় ভাবের ও আদর্শের কথা বলি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করি। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—এগুলি বাস্তবে রূপায়িত করিতে গেলে যে উন্নত মানের শিক্ষা প্রয়োজন—তাহা কই? মন্ত্রের মতো ঐ কথাগুলি আওড়াইয়া গেলেই কি ঐ সকল ভাব অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে? শিক্ষা-সহায়ে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি নরনারীর মন ঐ নূতন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে তবেই সুদৃঢ় জাতীয় চরিত্র গঠিত হইবে, যাহার ভিত্তির উপর এক নূতন মহান্ জাতির জীবন দাঁড়াইতে পারিবে। সভা-সমিতি-সম্মেলনের, তাহাতে পাস-করা প্রস্তাবের বা সেখানে প্রদত্ত শত শত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার সাধ্য নাই যে জাতীয় জীবন গড়িয়া দিবে।

বিদেশের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলেন: জাপান, জার্মানি, রাশিয়া বা চীনে দেখিয়াছি—সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা হইলে তাহারা জাতীয় চরিত্র পরিবর্তন করিতে পারে। আমাদের পক্ষেও এক পুরুষের (generation) মধ্যে দেশের চেহারা পরিবর্তন করা সম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন শুধু শক্তিশালী প্রাণবান্ ও সাহসী নেতৃত্ব। সেই নেতা দেশবাসীর মনে এই ভাব জাগাইয়া দিবেন যে আমরা এ অবস্থায় সন্তুষ্ট নই, এই সংকল্প জাগাইয়া দিবেন যে আমরা দেশকে উন্নত করিব, শুধু মাত্র যন্ত্রের শিল্পশক্তির উপর নির্ভর করিব না, এবং মানুষের চরিত্রের ও গুণের উপর নির্ভর করিব।

এই কমিটির নেত্রীরূপে শ্রীমতী দেশমুখ নারী-শিক্ষা ও সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন—তাহাও আশাপ্রদ নহে। তিনি বলিতেছেন: সংবিধানে আছে—সংবিধান আরম্ভ হইবার দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর-বয়স্ক বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা

দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে—কিন্তু ইহা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা আরও ভয়াবহ ভাবে পিছাইয়া আছে। ১৪-১৭ বৎসর বয়সের ১২ কোটি বালিকার মধ্যে শত-করা মাত্র ৩ জন (৩%) অর্থাৎ মাত্র ৩,৬০,০০০ ছাত্রী স্কুলে যায়। এরূপ অবস্থায় কঠোর উপায় অবলম্বন করাই কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি বেসরকারী কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের নারীশিক্ষা-প্রচারপ্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। বরোদার আর্য কন্যা মহাবিদ্যালয় এখন কলিকাতা বাঙ্গালোর ও দিল্লীতে তাঁহাদের শাখা প্রসারিত করিতে-ছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীআনন্দপ্রিয় পণ্ডিত বলিয়াছেন: আমাদের উদ্দেশ্য মেয়েরা ভাল মা হইবে, সাহসের সহিত সংসার-ভার বহন করিবে, আমরা চাই না কতকগুলি মাত্র-ইংরেজী-শিক্ষিতা নারী সৃষ্টি করিতে, যাহারা শুধু আর্থনীতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবে। এখানকার মেয়েরা শরীর-চর্চার সহিত শিল্পকলা ও গৃহবিজ্ঞান শিখিবে, সংস্কৃত এখানে অবশ্য পাঠ্য।

বাংলা দেশেও অনুরূপ বেসরকারী নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। যথার্থ শিক্ষা ও শক্তির চর্চায় নারীদের শরীর ও মন সুগঠিত হইলে তবেই আমরা জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি, কারণ পণ্ডিতের পুত্র অনেক সময় মূর্খ হইয়া থাকে, পালোয়ানের পুত্র দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিতা শক্তিময়ী জননীর পুত্র কখনও মূর্খ হইতে পারে না, দুর্বল হইতে পারে না।

সর্বোদয়ের আদর্শ

আমরা সুখী হইতে না পারি, আমাদের পরে যাহারা আসিতেছে তাহাদের সুখী করিবার ব্যবস্থা যদি করিয়া যাইতে পারি—সেও এক রকম সুখ। প্রচলিত পরিচিত আদর্শ—'বহুর সুখ', 'অধিকাংশের সুখ', নূতনতর আদর্শ 'সকলের সুখ'। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ। বহুজনহিতায় তোমরা জগতে পরিভ্রমণ কর।' শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছিলেন, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'। খৃষ্টের কথা: প্রতিবেশীকে ভালবাস নিজের মতো। প্রতিবেশীর পরিধি বর্ধিত করিলেই বিশ্ববাসী। স্বামী বিবেকানন্দ 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এ যুগের ধর্মসংঘ স্থাপন করিয়া তাহার মর্মবাণী বলিয়াছেন: আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। সর্বহিতের আদর্শ তাই নূতন হইয়াও পুরাতন।

সকলের সুখের জন্য কাজ করিতে হইবে। সুখ কি? ইন্দ্রিয়ের আরাম? না তো!—'সর্বমাত্মবশং সুখং, সর্বং পরবশং দুঃখম্'—সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরতাই সুখ, পরনির্ভরতাই দুঃখ। ইন্দ্রিয়গণ তো অশ্বের মতো—সংযত করিয়া তাহা-দের চালাইতে না পারিলে রথ যে পথ ছাড়িয়া বিপথে পড়িবে। ইন্দ্রিয়ের চালক মন। মনকে বশ করিতে পারিলে তবেই সুখ, তবেই শান্তি। নতুবা অসংযত মনের দুঃখ-অশান্তি, স্বার্থচিন্তা, বাসনার অনল কে রোধ করিতে পারে? মনকে জয় করার কৌশলই সকল শিক্ষার সার কথা। মহতের আহ্বানে সাড়া দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা, প্রতিটি জীবনের সার্থকতায় সমাজের সার্থকতা। এমন সমাজ-ব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে কাহারও জীবন ব্যর্থ হইবে না। প্রত্যেকটি জীবন অজানার সন্ধানে এক আনন্দের অভিযান,—যেন পুষ্পকোরকের বিকাশের মহোৎসব।

সেবায় ও সহযোগিতায় সমাজ-জীবনের সার্থকতা, মানুষকে সুখী করাই মানুষের যথার্থ সুখ। জগতে দুঃখ আছে, অভাব আছে—

সংগ্রাম করিয়া তাহাদের দূর করিতে হইবে। এই সংগ্রাম কর্ম, ঐ সেবা কর্ম, কর্ম কোন স্বার্থ-পূর্ণ উদ্দেশ্যে করিলে তাহার নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া অশান্তি, নিঃস্বার্থভাবে করিলে তাহার ফল চিত্তপ্রসাদ, শান্তি। অনাসক্ত কর্মই গীতার সাধন-নির্দেশ, ভারতের চিরন্তন শিক্ষা।

বর্তমান পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য চিন্তিত নয়। সর্বত্র মানুষ চাহিতেছে—একটু সুখ, একটু শান্তি। রাষ্ট্র-নেতারা আনিতে চাহিতেছেন আন্তর্জাতিক শান্তি—অশান্তির পথে, কিন্তু একথা কি তাঁহাদের কানে পৌছাইবে—'শান্তি আসিতে পারে শান্তির পথেই'? উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমতা প্রয়োজন। মহৎ উদ্দেশ্য কখনও নীচ উপায়ে লভ্য নয়। সমাজ নানাভাবে—দেশ, ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতিতে খণ্ডিত বলিয়াই এত স্বার্থদ্বন্দ্ব, সকল ভেদ দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি একটি কার্যকরী আদর্শের সমতা ও অখণ্ডতাবোধে দ্বন্দ্ব-ভাব দূরীভূত হইতে পারে, তবেই সুখ ও শান্তি আসিবে। বিশাল মানবতার ভিত্তির উপর নৈতিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা—ইহাই হইল সর্বোদয়ের আদর্শ, সর্বহিতের নীতি।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে—কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক জীবন লইয়া যত পরীক্ষা হইয়াছে—তাহাতে এই প্রেম ও শান্তির আদর্শই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কেহ ভারতে আসিয়াছে ভারত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, পরন্তু ভারত কখনও অপরের দেশে অধিকার বিস্তার করিতে যায় নাই। প্রেমের দ্বারাই জগৎ জয় করা সম্ভব, পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ দুর্দশার মহৌষধ প্রেম। আলো যথা সূর্যের, প্রেম তথা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শান্তির জন্য প্রেমই একান্ত প্রয়োজন—বিনোবা আজ এই বাণীই লইয়া চলিয়াছেন ভারতের কুটিরে কুটিরে, ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে।

* * *

এ বৎসর পণ্ঢরপুরে সর্বোদয়ের দশম বার্ষিক সম্মেলনে আচার্য বিনোবা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন: আমি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী, মূল 'কথামৃত' পড়িবার জন্য আমি বাংলা শিখিতেছি।

জাতীয় জীবন গঠনে এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য নারীরা যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত একথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: 'মহিলা' শব্দটির মূল 'মহা' শব্দ, নারী বা মহিলা মহত্ত্বের আধার। এই বৈজ্ঞানিক হিংসার যুগে যখন পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ তখন নারীই পারে শান্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া মানুষের মধ্যে মহৎ গুণাবলী ফুটাইয়া তুলিতে।

অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়

আমার ধারণা, জনসাধারণের কল্যাণচিন্তা উপেক্ষা করিয়া আমাদের জাতি মহাপাতক করিয়াছে, এবং তাহারই ফলে বর্তমান অধঃপতন।

* * * *

জগজ্জননী আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি নারীগণের অবস্থার উন্নতিসাধন না করিলে ভাবিও না যে তোমাদের অগ্রগতির অন্য কোন উপায় আছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

গীতার মূল বক্তব্য কি?

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

বিভিন্ন সময়ে ভারতের বহু বিশিষ্ট মনীষী গীতার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অথবা মতবাদের সমর্থনের জন্য গীতার বিভিন্ন প্রকার, এমনকি পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদের মতবাদ সুদৃঢ় করিবার জন্য গীতাকে অদ্বৈতভাবের সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং দ্বৈতবাদীরা ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে গীতায় অদ্বৈতভাব অথবা জ্ঞান সমর্থিত হইয়াছে, এবং কখনও দ্বৈতভাবের অথবা ভক্তির প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে, কখনও বা কর্মযোগের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় গীতায় এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত আছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে গীতার মূল বক্তব্য অনুসন্ধান করিয়া লওয়া কঠিন। টীকাকারদের মত অনুসরণ না করিয়া গীতার মধ্যেই ইহার মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে আছে—'শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ইত্যাদি'। ইহা হইতে পাওয়া যায় যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যাও বটে এবং যোগ-শাস্ত্রও বটে। 'যোগ' শব্দটি গীতায় বারংবার ব্যবহৃত হওয়ায় ইহা যে প্রধানতঃ 'যোগশাস্ত্র'—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। গীতার শেষ ভাগে সঞ্জয়ের উক্তিতে ইহা সমর্থিত হয়। তিনি বলিতেছেন:

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্ এতদ্‌গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥
—আমি এই যোগ বা যোগশাস্ত্র স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শুনিয়াছি।

উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি ভারতের গৌরব। পূর্ব-কালের ঋষিগণ নির্ভীকভাবে সত্যের অনুসন্ধানের ফলে যে অমূল্য জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহারা গম্ভীর ভাষায় ও উৎকৃষ্ট ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন. বিদেশী পণ্ডিতগণ উপনিষদের গভীর চিন্তাধারা, অনুপম ভাষা ও ছন্দ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ইহার দার্শনিক তত্ত্বকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উপনিষদের সার কথা এই যে, 'সর্বভূতের স্বরূপ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পরমাত্মা', ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে:

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'
বিশ্বের সর্ববস্তুই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। 'জগৎ ব্রহ্মময়'—এই জ্ঞান প্রয়োজন।

আবার উপনিষদে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি অতি দুরূহ। অত্যন্ত-ধীসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহা লাভ করেন।

'এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥'

আরও আছে: ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।—ব্রহ্মানু-ভূতির পথ ক্ষুরের ধারের মত তীক্ষ্ণ ও দুর্গম। অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এ পথে চলিতে পারেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ অতি দুর্গম। এই জন্যই ইহাকে 'রহস্য' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। বেদান্তের উপলব্ধি হিমালয়-আরো-হণের সহিত তুলনা করা অসঙ্গত নয়। কয়েকজন

---

*গত ৬ই জানুআরি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারানুবাদ

মাত্র ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই এই দুর্গম পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, সাধারণ লোকেরা দূর হইতেই উহা দেখিতে থাকে। তাহাদের পর্বত-চূড়ায় আরোহণ করিবার শক্তি থাকে না।

কি উপায় অবলম্বন করিলে সাধারণ ব্যক্তি এই দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার বিবরণ স্পষ্টভাবে গীতাতেই আমরা প্রথম পাই। সেই উপায়কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'যোগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বোধ হয় উপনিষদের পরবর্তী কালে যোগী মহাপুরুষগণ এই যোগের প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই যোগ-বিদ্যা লুপ্ত হইয়াছিল। ইহা আমরা জানিতে পারি গীতারই উক্তি হইতে :

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥

এই যোগশাস্ত্র পুনরায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গীতা রচিত হইয়াছে। ভগবানই যোগের গুরু 'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥' —হে অর্জুন! সেই সনাতন যোগশাস্ত্র আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম।

ইহা বলা অত্যুক্তি নয় যে গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। গীতার মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে উপনিষদের সহিত পরিচয় প্রয়োজন। উপনিষদে জীবনের উদ্দেশ্যের এ গীতায় আধ্যাত্মিক উপায়ের বিশেষভাবে নির্দেশ আছে। উপনিষদ্ উচ্চকণ্ঠে মনুষ্যের দেবত্ব ঘোষণা করিতেছে, আর প্রচার করিতেছে মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই জীবনেই এই পরম সত্য উপলব্ধি করা।

কিন্তু মানবের দুঃখদ্বন্দ্ব সমস্যার কোন উল্লেখই উপনিষদে পাওয়া যায় না। মানুষ দেব-স্বরূপ হইলেও সাধারণ জীবনে সে যে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত, একথা উপনিষদে ব্যক্ত হয় নাই। উপনিষদ্ সেই 'ধীর' ব্যক্তিদের জন্যই, যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও বুদ্ধি পরিমার্জিত। কিন্তু এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা যে কোন সমাজে—যে কোন সময়ে অতি অল্পই হইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে উচ্চতম তত্ত্ব আলোচিত হইলেও মানবসমাজের খুঁটিনাটি আধ্যাত্মিক সমস্যা সকলের সমাধান উপনিষদে নাই। সাধারণ নরনারী কি প্রকারে ধীরে ধীরে তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনপূর্বক স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে চরম অনুভূতি লাভ করিতে পারে সে পথনির্দেশ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বাকী ছিল। যোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান—সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের সুপরিকল্পিত প্রণালীর অপূর্ব উত্তম নির্দেশ তাঁহার গীতা।

উদ্দেশ্য এক হইলেও সকলের পক্ষে পথ এক নয় :

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

গম্যস্থল এক হইলেও রুচি অনুসারে পথের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর পথ এক, ভক্তের অন্য পথ এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ও সংসারমোহে মুগ্ধ জনসাধারণের পথ ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সকল পথের কথাই বলিলেন :

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

—হে অর্জুন! আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানীদের জন্য সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ এবং কর্মীদের জন্য কর্মযোগ। আবার সর্বশেষে বলিলেন, 'যথেচ্ছসি তথা কুরু'।

অর্জুনকে সকল প্রকার যোগের উপদেশ দিলেন, কিন্তু কোন্‌টি অর্জুনের অবলম্বনীয় তাহা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কি? সেই স্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশ না পাইলে কি অর্জুন অবশেষে গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়া দৃঢ় অসন্দিগ্ধ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, 'করিষ্যে বচনং তব'? অর্জুন একথা বলিলেন না যে 'আমি জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিব বা তোমার ভক্ত হইয়া একান্তে বসিয়া তোমার গুণগান ও ভজনা করিয়া দিন কাটাইব; বরং তাঁহার দ্বিধাহীন ভাষায়

এই ভাব প্রকাশ পাইল, 'প্রভো, তোমার ইঙ্গিত আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমার পক্ষে কর্মই প্রশস্ত। তুমি যে পথের নির্দেশ দিয়াছ আমি তাহাই করিব। আত্মীয়-বধের জন্য দুঃখ করিব না। যুদ্ধই করিব।'

ইহা হইতে বুঝা গেল যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে অনুপ্রেরিত করিলেন। কিন্তু এই কর্ম যাহাতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাধন হয়, সেইজন্য তিনি ইহাও শিক্ষা দিলেন যে, কর্মের সহিত জ্ঞান ধ্যান ও উপাসনার অভ্যাস করা অত্যাবশ্যক। পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা আনে চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং সার্থক জীবন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতাই শিক্ষা দিয়াছেন। কেবলমাত্র ভাব, বুদ্ধি বা কর্মতৎপরতা—একটির উপর জোর দেন নাই। স্বয়ং গীতাকার নিজ শিক্ষার সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। তিনি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা বুঝাইবার জন্য 'যোগ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি অধ্যায়ে 'যোগ' শব্দটিকে নানাভাবে নানাদিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই সর্বতোমুখী ব্যাখ্যার দ্বারা পরিশেষে জীবন ও কর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুষ্ঠু সম্পূর্ণ দিঙ্ নির্ণয় করিয়াছেন।

তিনি বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে প্রথমেই বলিলেন : —এ বিষাদ কেন ? এই হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ কর। এই বাক্য হইতেও স্পষ্ট অনুমিত হয় যে পরবর্তী অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এই যে অর্জুনকে তাহার যাহা উপযুক্ত সেই কর্মে অর্থাৎ যুদ্ধে নিয়োজিত করা। আত্মা সম্বন্ধেও অর্জুনকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন। এই আত্মতত্ত্ব বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন তাহা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যা করিলেন যাহাতে উদ্দেশ্যের প্রতি অর্জুন লক্ষ্য রাখেন। তৎপরে বলিলেন : এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। —হে অর্জুন। এতক্ষণ আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলাম এখন তোমাকে যোগবুদ্ধি সম্বন্ধে বলিব, শ্রবণ কর। এই বুদ্ধি অভ্যাস করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। অল্পমাত্র অভ্যাস করিলেও বহু ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

গীতোক্ত উপদেশের অধিকারী কে ? উপনিষদ্-রূপ গাভী গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন করিতেছেন, এই গাভীর বৎস পার্থ। গীতামৃতরূপ দুগ্ধ সুধীজন পান করিতেছেন। সুধী কে ?—যিনি জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত, এবং জীবনের সার বস্তু অনুভব করিতে ইচ্ছুক। এই সুধীগণকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান বলিয়াছেন : এই সাধক সুধীজনকেই আমি বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন। বুদ্ধিকে মার্জিত করা, আর চরিত্র গঠন করা—একই কথা। তাহার জন্য দৃঢ়তা ও একাগ্রতার প্রয়োজন। সেজন্য ভগবান্ বলিতেছেন :

মন বহু দিকে ধাবিত হইলে চঞ্চল হয়। চঞ্চল মন কোন সৎকার্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। এই প্রকার মনকে একনিষ্ঠ করিলে সিদ্ধিতে উল্লাস বা অসিদ্ধিতে বিষাদ আসিবে না। আরও একটি সদ্‌গুণের অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন, তাহা অনাসক্তি। তাই বলা হইয়াছে : 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'।

এই অনাসক্তির ফলে মনের সমতা আসিবে। এবং সমতাই বুদ্ধিযোগ—'সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াও এই যোগীরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না, বরং যোগ অনুশীলনের ফলে তাঁহারা অধিকতর উদ্যমে কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হন। কর্তব্য কর্ম সুসম্পন্ন করিবার উপায়ই যোগ—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। যোগবুদ্ধি অভ্যাস করিলে কি ফল লাভ হয় তাহাও বলা হইয়াছে। ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি দুঃখ হইতে মুক্ত হন।

অনাসক্তি ও সংযমের পথে এই যোগ অভ্যাস করিলে শান্তি, অন্যথা—ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করিলে বাত্যাতাড়িত নৌকার মত তাহার বুদ্ধির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ নৈতিক অবনতি নিশ্চিত, কিন্তু যিনি ধৈর্য সহকারে এই যোগ অভ্যাস করেন তিনি নির্মম নিরহঙ্কার ও নিঃস্পৃহ হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হন এবং পরম শান্তি পান—'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।' চিত্তশান্তির জন্য এই যোগ-শিক্ষাই গীতার প্রধান বিষয় বস্তু।

'মাষ্টার মশাই'য়ের প্রশ্ন*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

সংসারের কাজকর্ম ফেলে তোমরা যে আশ্রমে আস—এতে খুব আনন্দ হয়। সংসারে থাকলেও তোমরা একটু সময় ক'রে নিয়ে পালিয়ে আস, এটা খুবই দরকার। বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে ঠাকুরের স্মরণ ও তাঁর লীলা চিন্তা করলে কল্যাণ হবে। তাতে এত শিক্ষা, জ্ঞান, ভক্তি, আনন্দ ও শান্তি আছে যে আর কোথাও যেতে হয় না। সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা ও মূলতত্ত্ব তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছে।

কথামৃত-কার মাস্টার মশাই (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর উপদেশাবলী শুনে লিপিবদ্ধ করেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি প্রথম আসেন ১৮৮২ সালে। কয়েক দিন তাঁর সঙ্গ করেই মাস্টার মশাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, এই মহাপুরুষের কাছেই আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য জানতে পারা যাবে। দু চার বার যাতায়াতেই মাস্টার মশাই দেখলেন, এই মহামানবের নির্দিষ্ট পথই শান্তিলাভের উপায়।

দ্বিতীয় দর্শনে মাস্টার মশাই ঠাকুরকে এই চারটি প্রশ্ন করেছিলেন: (ক) ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়? (খ) সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে? (গ) ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? (ঘ) মনের কি অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়? সৃষ্টির প্রথম থেকে এই প্রশ্ন কয়টি জিজ্ঞাসিত হয়ে আসছে, আর মহামানবেরা যুগে যুগে এগুলির উত্তর দিয়েছেন। ঠাকুরের প্রদত্ত উত্তরগুলি সকল সম্প্রদায়ের জন্য, দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী এবং সাকার, নিরাকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর উপাসকদের জন্য। গীতা কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যাপার নয়, অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে ভগবান জগদ্বাসীর জন্য সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখিয়েছেন। ঠাকুরও তেমনি মাস্টার মশাইকে উপলক্ষ্য ক'রে বিশ্ববাসীর সংশয় নিরসন ক'রে ভিন্ন ভিন্ন নরনারীর উপযোগী সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। ঠাকুর এসেছিলেন জগদ্গুরুরূপে। নিজের ছবি দেখে একদিন তিনি বলেছিলেন, "ঘরে ঘরে এর পূজো হবে।" এখন আমরা দেখছি ঘরে ঘরে তাঁর পূজো হচ্ছে, আরও কত হবে। সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছেন—সব ধর্ম, সব মত ও সব পথ সত্য। আমরা দেখছি—যত দিন যাচ্ছে ততই সকলে তাঁর ভাব গ্রহণ করছে।

ঠাকুর মাস্টার মশাইকে যে সমস্ত উত্তর দিয়েছিলেন ক্রমে ক্রমে সেগুলি আলোচনা করবো। এই চারটি প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলে তো সবই জানা হয়ে গেল। তবে যারা পিপাসু, শোনার পরে তাদের একটু সাধন করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে। শ্রবণের পর মনন করতে হয়। ছোট্ট কথায় ঠাকুর বলতেন, 'গরু এক পেট খেয়ে নিয়ে জাবর কাটে।' ধর্মপ্রসঙ্গ শোনার পর আমাদের আর জাবরকাটা হয় না। উপদেশ ধারণা করতে হ'লে জাবরকাটা চাই। দুর্গামণ্ডপে এসে সব কি গল্প! ঠাকুর বলতেন,—'মূলোর ঢেঁকুর'। দেবস্থানে এলে সংযত হয়ে থাকতে হয়।

---

*মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজ্যপাদ মহারাজের ৬-৪-৫৪ এবং ৭-৪-৫৪ তারিখের ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রুতলিখিত। মাষ্টার মশাইয়ের জীবনীর জন্য "কথামৃত" প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রশ্ন

মাস্টার মশাইয়ের প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয় ?' তদুত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন: ঈশ্বরের নাম-গুণ-গান ও সাধুসঙ্গ। বিষয়ের ভিতর সর্বদা থাকলে তাঁতে মন হয় না। তাই সাধু বা ভক্তদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। সর্বদা সদসৎ বিচার করা দরকার, ঈশ্বরই সৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তু, আর যা কিছু সবই অসৎ, কিনা অনিত্য। ঠাকুর বলেছেন, এইরূপ বিচারের দ্বারা অনিত্য বস্তু থেকে মন তুলে নিতে হয়।

ঈশ্বরের নাম-গুণ গান, কীর্তন এবং শ্রবণ, —'হরের্নামৈব কেবলম্'। তবে মালা পেলাম, গুরুর কাছে রামনাম ক'রে গেলাম,—সে ভাবে নয়। নাম অনেকেই করছে, ফল হয় না কেন ? ঠিক ঠিক করতে পারলে নামের ফল অবশ্যম্ভাবী। নাম-গুণ গানের প্রকৃত অধিকারী কে ? ঠাকুর কিভাবে মায়ের নাম করতেন ? 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দিনে পুজো করতেন, আর রাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে উত্তরের ডোবার কাছে আমলকী গাছের তলায় বস্ত্রোপবীত ত্যাগ ক'রে মায়ের নাম করতেন। ঠাকুর বলতেন, 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।' পাশ মানে বন্ধন। লজ্জা-ঘৃণা-ভয়াদি অষ্টপাশ জীবকে বজ্রবন্ধনে বেঁধে রেখেছে। উপবীত ব্রাহ্মণসন্তান-অভিমানের চিহ্ন, বস্ত্র লজ্জার প্রতীক। অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হ'লে জীবই শিব হয়ে যায়, যখন পাশমুক্ত অবস্থা তখন বালকের স্বভাব। পাঁচ বছরের বালকের কোনও অভিমান নেই, আসক্তি নেই। হয়তো খেলা করছে, মা ডাকতেই অমনি সব ফেলে চলে গেল। ঈশ্বরকে ডাকতে হয় নিজেতে বালকের ভাব আরোপ ক'রে, বালকের মতো বিশ্বাস সরলতা পবিত্রতা নিয়ে। ঠাকুর বালকভাব নিয়ে শুরু করলেন, সন্তানভাবেই সিদ্ধ হলেন। চিরদিনই মায়ের ছেলে থেকে গেলেন তিনি।

দু হাজার বছর আগে যীশুখ্রীষ্টও এই ভাব সাধন ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন, Except ye be converted and become as little children ye cannot enter into the Kingdom of Heaven. শিশুর অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মে না। এখানে যীশু ও ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। যীশু আর একটি কেমন সুন্দর কথা বলেছেন, The Kingdom of Heaven is revealed unto the babes, but is hidden from the wise and the prudent.—স্বর্গরাজ্য শিশুদের কাছে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে।

ঠাকুর বালকভাবে ছিলেন বলেই এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জগন্মাতার সঙ্গে মিশতে পেরেছিলেন। তাঁর মতো এত অধিক মাত্রায় দর্শন, স্পর্শন ও আলাপের কথা আব কোথাও শোনা যায়নি। জগদম্বার কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যতই উপাধি আমরা লাভ করি না কেন, তাঁর কাছে আমরা অজ্ঞ বালক।

* * *

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে এবং একটি উপদেশে দেখিয়েছেন, হরিনামের অধিকারী কে। তিনি বলেছেন:

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্লোকটির অর্থ, যিনি হরিনামের অধিকারী হবেন তাঁর মধ্যে থাকা চাই তৃণাধিক দীনতা ও বৃক্ষসদৃশ সহিষ্ণুতা, তিনি স্বয়ং নিরভিমান হয়ে অপরকে সম্মান প্রদান করবেন। দীনতা—কিনা

অহঙ্কারের অভাব। যিনি হরিনামের অধিকারী হবেন, সংসারের ঝড়ঝাপ্টাকে বৃক্ষের ন্যায় সহ্য করতে হবে তাঁকে; বৃক্ষ কুঠারাঘাতে ক্লিষ্ট হয়েও ছেদনকারীর উপর থেকে ছায়া অপসারণ ক'রে না। যে ঢিল ছুঁড়ছে তার জন্যেই বৃক্ষ অকাতরে ফল ফেলে দিচ্ছে। সহিষ্ণুতার কথায় তাই বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিলেন মহাপ্রভু।

আসল জিনিসটা, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অহঙ্কার একটা প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক। মস্ত একটা কাঠের গুঁড়ি যেন মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পড়ে রয়েছে। সেটিকে অপসারণ ক'রে দূরে ফেলে দিতে হবে। যতই ভক্তিলাভ হবে ততই অহং চলে যাবে।

* * *

সংসারে তিনটি জিনিস দুর্লভ,—মনুষ্যজন্ম, মুমুক্ষুতা ও মহাপুরুষের আশ্রয়। একটি বা দুটি হতে পারে, কিন্তু দেবতার কৃপা ভিন্ন এই তিনটি একত্র উপস্থিত হয় না। মুমুক্ষুতা কি? সংসার একটা বড় বন্ধন, সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট্ট কথায় বলতেন, 'পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে। মাছগুলি জালে পড়েছে। কতকগুলি মাছ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশই পালাবার চেষ্টা করে না, বরং জালসহ পাঁকের ভিতর মুখ গুঁজে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। জানে না, জেলে এখুনি টেনে হুড়-হুড ক'রে ডাঙায় তুলবে।' সংসারে শতকরা নিরানব্বই জনেরই অবস্থা এই। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন হয়তো আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্নশীল হয়, আবার এইরূপ হাজার হাজার যত্নশীল লোকের মধ্যে একজন হয়তো আমার আসল স্বরূপ জানতে পারে।' গানে আছে—'ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি'।

মনুষ্যদেহ লাভ ক'রে আমরা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গেছি। ঠাকুর বুড়ী-ছোঁয়ার উপমা দিয়েছেন; 'বুড়ী ছোঁয়া' মানে ভগবান লাভ করা। বুড়ী চায় না যে সকলে তাকে ছোঁয়। ভগবানের এমনি মায়া যে বুড়ী ছুঁতে দেয় না। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।' সাধুসঙ্গটা বিশেষ ভাবে হওয়া চাই। হলে হবে কি, তাঁর কৃপা ছাড়া উপায় নেই। মায়ার এমনি প্রভাব! চণ্ডীতে আছে, ইন্দ্রাদি দেবীর স্তব করছেন :

> ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
> বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
> সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ
> ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

সেই মায়ায় সকলকে মোহিত ক'রে রেখেছে। মায়াতে বিপরীত বোঝায়, অনিত্যকে নিত্য, অসারকে সার বলে মনে হয়, ঈশ্বর আমাদের লক্ষ্যের বাহিরে চলে যান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

> দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা অতীব কঠিন। যারা আমার শরণাগত হয়ে অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, তারাই আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।

'এই মায়া সরিয়ে দাও' বলে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

মাস্টার মশাইয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নটি স্মরণ কর : "সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে?" এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে আমাদের কি করা কর্তব্য? এখানে ঠাকুরের কথাই আবার আনতে হচ্ছে। তাঁর উপদেশগুলি এ যুগের আলো, যুগধর্ম। ঠাকুর বলেছেন, "সাধুসঙ্গ করতে হবে। বিবেকের আশ্রয় নিতে হবে।"

বিবেকের কাজ কি? সদসৎ বিচার। সৎ মানে নিত্য, অসৎ কিনা অনিত্য। ঠাকুর বলেছেন, ঘড়ি মেলানোর জন্য সাধুসঙ্গ দরকার, এত সুন্দর উপমা তাঁর আগে কেউ দিয়েছেন কিনা জানি না। গ্রীণিচ্ থেকে টাইম নেওয়া হয়, সেই টাইম আমরা রেডিওতে পাই, তা থেকে ঘড়ি মিলোই। 'ঘড়ি মিলোলে' জানা যায়, সংসারে থেকে আমরা তাঁর দিকে এগুচ্ছি, না তাঁর দিক থেকে পিছুচ্ছি, স্লো যাচ্ছি কিংবা ফাস্ট যাচ্ছি। সাধুসঙ্গই ঘড়ি। কলকাতার লোকেরা ও ব্রাহ্ম ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে এসে ভবতারিণীর পাগল পূজারীর কাছে ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে যেতেন, জেনে নিতেন, সংসার থেকে তাঁরা আদর্শ ঠিক রেখে চলতে পারছেন কিনা। ঘড়ি মিলোলে (সাধুসঙ্গ করলে) বিবেক হয়, সদসৎ বিচার আসে। ঠাকুরের এই ঘড়ি মেলানোর দৃষ্টান্তটি অমূল্য।

ঠাকুর বলতেন, 'এখুনি ভগবদ্দর্শন হয়, আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু মনটা যে বিষয়ে বন্ধক পড়েছে।' গহনাদি বন্ধক পড়ার মানে—থেকেও কাজে না লাগা। মনও বিষয়ে বন্ধক পড়লে তাকে আসল কাজে লাগানো যায় না। আবার এমন অবস্থা হয় যখন সেই মনই ছুটে এসে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করে। যাঁরা তৃষ্ণার্ত পিপাসু, তাঁরা ছুটে এসে কত আগ্রহ সহকারে ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করতেন। তিনি বলতেন, —'গঙ্গার দিকে যত এগুনো যায় ততই শীতল বাতাস পাওয়া যায়।' গঙ্গাস্নানে শরীর আরও শীতল হয়।

বাগবাজারে খালের ওপর লোহার চেন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তখনকার দিনের একটি ছোট পোল আছে। নৌকায় যেতে যেতে সেই পোল দেখে ঠাকুর বলেছিলেন,—'সংসারী লোকেরাও এই রকম আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এক-আধটা শিকল ছিঁড়ে গেলেও বন্ধন খোলে না।' তবে উপায়? উপায় সাধুসঙ্গ। তাই আবার বলছি,—'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।' সংসার থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে এসে সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ হ'লে তখন মনে পড়ে যায়, আমরা ঐ সংসারকেই সার বলে মনে ক'রে রেখেছি, আর যিনি আসল সারবস্তু সেই ভগবানকেই ভুলে বসে আছি।

ঠাকুর বললেন,—'সংসারে দু রকম প্রকৃতির লোক আছে,—কতকগুলি লোকের কুলো-প্রকৃতি, আর কতকগুলির চালুনি-প্রকৃতি।' কি দৃষ্টান্ত। এ জিনিসটি আর কে লক্ষ্য করেছেন—ঠাকুর ছাড়া?

চালুনি-প্রকৃতির লোকেরা সার বস্তুকে বাদ দিয়ে বিষয়-সুখাদি অসার ভুষি ধরে রাখে। তারা বিষয়াসক্তিতেই ডুবে রয়েছে। তারা বলে,—'সংসারে এসেছ, যে কদিন পরমায়ু আছে বিষয় ভোগ ক'রে নাও।' কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে,—'তা কি ক'রে জুটবে শুনি, তুমি তো বেশ বলে দিলে।' চালুনি-প্রকৃতি অমনি জবাব দেয়, যেমন ক'রে পার ভোগসুখ ক'রে নাও। ধার করেও ঘি খাওয়া চাই। দেহটা চলে গেলে আর কিছুই তো থাকবে না।' বদ্ধজীব যেন জালবদ্ধ মাছ, তার স্বভাবই এই।

কুলো-প্রকৃতির লোকেরা অসার ভুষি ত্যাগ ক'রে সার বস্তুকে, ধর্ম সত্য ভগবানকে ধরে থাকে। তাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধি, এর আর এক নাম বিবেক, বিবেকের কাজ সদসৎ বিচার। সংসারপথে বিবেকই একমাত্র সারথি। এই জিনিসটির ওপর ঠাকুর খুব জোর দিতেন।

সন্ন্যাস কি?—ত্যাগ। রামপ্রসাদ গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী ছিলেন। বিষয়ের মধ্যে ছিলেন, বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না। কথামৃতে আছে,—'পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক

লাগে না। গা পরিষ্কার উজ্জ্বল। এইটিই গীতোক্ত সংসারে অনাসক্ত ভাবে থাকার দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদের গানে আছে :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি ॥

এই মন নিয়ে সংসারে থাকতেন রামপ্রসাদ। মা কল্পতরু, তাঁর কাছে চাইলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যায়। মনের দুটি জায়া (পথ), প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। অধিকাংশ লোকেই প্রবৃত্তির সঙ্গে সংসার করে, অর্থাৎ বিষয়কে ভালবেসে তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ে। মনকে তাই নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন ক'রে কালী-কল্পতরুমূলে যেতে বলছেন রামপ্রসাদ, আর বলছেন বিবেকের আশ্রয় নিতে।

বিবেকের আশ্রয় নিতেই হবে। সাধুসঙ্গ করলে বিবেকের উদয় হয়। সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চললে হবে না। 'যাহা রাম তাঁহা নেহি কাম।' পূর্বদিকে এগুতে হ'লে পশ্চিমকে পিছনে ফেলে যেতে হবে।

* * *

কথামৃতে আছে : মধ্যে মধ্যে দু এক সপ্তাহ, কি এক আধ মাস নির্জন বাস খুব দরকার। তখন শুধু ঈশ্বরচিন্তা, শুধু বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগ প্রার্থনা। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যে ঘরে বিকারের রুগী সেই ঘরেই কিনা জলের জালা আর তেঁতুলের আচার। রুগীকে আরাম করতে হ'লে ঠাঁই-নাড়া করা দরকার।' জলের জালা হচ্ছে বিষয়সুখ, তেঁতুলের আচার যোষিৎসঙ্গ, এই কথাটি বার বার বলতেন ঠাকুর। কেশব সেন মধ্যে মধ্যে বেলঘরের বাগানে গিয়ে সাধন করতেন।

ঠাকুর বলতেন, 'চারাগাছকে বেড়ার মধ্যে রাখতে হয়।' অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় ভক্তের যার তার সঙ্গে, কি বিষয়ীর সঙ্গে মেলামেশা চলে না। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—ঠাকুর মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন। মথুরবাবু জমিদার, আর কাশীতে তিনি যাঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন তিনিও বৈষয়িক। সে বাড়ীতে বিষয়ের কথা শুনে ঠাকুর জগদম্বাকে বলেছিলেন,—'মা। এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলি?' গাছ বেড়ে উঠলে তখন আর বেড়ার দরকার নেই, তখন হাতি বেঁধে দেওয়া চলে। গাছ বড় হওয়ার অর্থ মন তৈরী হওয়া। মনের পাঁচটি অবস্থা—ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হচ্ছে মনের রাজসিক অবস্থা, যেমন রাবণের। মূঢ় হচ্ছে মনের তামসিক অবস্থা, তার দৃষ্টান্ত কুম্ভকর্ণ। একাগ্র ও নিরুদ্ধ হ'ল মনের সাত্ত্বিক অবস্থা, যেমন বিভীষণের। মনকে তৈরী করতে হয়।

* * *

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী এই সমস্ত গ্রন্থের উৎপত্তি বিষাদ থেকে। অর্জুন বিষাদগ্রস্ত না হ'লে আমরা গীতা শুনতে পেতুম না। অর্জুনের বিষয়ে বিতৃষ্ণা হয়েছে। মনের যা কিছু দুঃখকষ্ট সবই তিনি নিবেদন করেছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে, এই ভাবে ভগবানেরই সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে গীতার প্রথম অধ্যায়টির নাম 'বিষাদযোগ'। ভোগে এইরূপ বিষাদগ্রস্ত না হ'লে ধর্মলাভ হয় না। ধর্মের উৎপত্তি বিষাদে। অর্জুন ভগবানকে বলেছেন: 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—আমি তোমার শিষ্য, শরণাগত, আমার শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ প্রদান কর। মনের এইরূপ অবস্থা না হ'লে ভগবানকে আশ্রয় করা যায় না, গুরুলাভ হয় না।

নৃপতি সুরথ হৃতরাজ্য হয়ে বনে গেলেন। সেখানে ধনলোভী স্ত্রীপুত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত বৈশ্য

সমাধির সঙ্গে দেখা। তখন দুজনেই বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় মেধস মুনির কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে গেলেন।

ঋষিপুত্র শৃঙ্গী মহারাজ পরীক্ষিৎকে শাপ দিলেন, 'সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে তোমার মৃত্যু ঘটবে।' অভিশপ্ত নৃপতির বিষয়-তৃষ্ণা অন্তর্হিত হ'ল। তখন শুকদেব এসে তাঁকে ভাগবত শোনালেন।

ভগবান রামচন্দ্রের মনেও বিষাদ এসেছিল, তখন দশরথ গুরু বশিষ্ঠকে পাঠালেন পুত্রকে উপদেশ দিতে। বশিষ্ঠদেব রামকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ শোনালেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারবার আমাদের বলতেন, —'মনে অশান্তি create (সৃষ্টি) কর্। কি আছে এ সংসারে?' প্রভুর পাদপদ্মে বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগ না হওয়ার জন্য যে অশান্তি, তার কথাই তিনি বলতেন। এ অশান্তি, টাকা-কড়ি হ'ল না, বাসনা মিটলো না বলে যে অশান্তি, সে জিনিস নয়।

* * *

সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে? এই প্রশ্নটি আবার স্মরণ কর।

গীতামুখে শ্রীভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—সর্বদা আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সংসারে কাজ করবার সময় তাঁর স্মরণমনন সর্বদা চাই, তাঁকে ভুললে চলবে না। শ্রীভগবান বলছেন, আমাকে আশ্রয় ক'রে তোমার কর্তব্য কর। এই আশ্রয় করার মানে একজনকে শুধু অবলম্বন ক'রে চলা নয়, সেই সঙ্গে তাঁতে আসক্তচিত্ত হওয়া, তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসা। 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ'—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমাকে আশ্রয় কর ও আমাতে আসক্তচিত্ত হও।' ঠাকুরও বলেছেন, 'খোঁটা আশ্রয় ক'রে সংসার কর।' খোঁটার (ভগবানের) প্রতি অনুরাগ থাকা চাই। ঠাকুর বলেছেন, 'এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য কর।' আর দু হাতে সংসার করেই কুলিয়ে উঠতে পারছি না আমরা!

* * *

গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—'আমাকে আশ্রয় ক'রে, আমাতে ফল সমর্পণ ক'রে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর।" এই ভাবে অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করার প্রসঙ্গে ঠাকুর কয়েকটি উপমা দিয়েছেন:

(১) ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে কোটে। একজন নেড়ে চেড়ে দেয়। সে হুঁশ রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। আবার ছেলেকে মাই দেয়, আর এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে নেয়। খদ্দেরের সঙ্গে বাকী পাওনার কথাও বলছে।

কতগুলো কাজ একই সঙ্গে করতে হচ্ছে তাকে, অথচ তার হাত ঠিক চলছে। তার পনের আনা মনই মুষলে, এক আনায় এতগুলো কাজ করছে। এটা তাকে অভ্যাস করতে হয়েছে। সাধন করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে, এবং তা প্রীতি ও অনুরাগের সহিত; গুরু বলে গেছেন বলেই যন্ত্রের মতো নয়।

(২) 'হাতে তেল মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়,'—ঠাকুর বলতেন। আশ্চর্য! কাঁঠাল ভাঙা মানে সংসার করা। কাঁঠালের আঠা কিনা আসক্তি। তেল হ'ল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি। অনুরাগরূপ তেল হাতে মেখে কাঁঠাল ভাঙলে (সংসার করলে) হাতে আঠা জড়িয়ে যাবে না, সংসারে আসক্ত হয়ে পড়বে না।

(৩) ঠাকুর বলতেন,—সংসারে থাকবে বড় মানুষের বাড়ীর ঝির মতো। সে বাবুর ছেলেকে মানুষ করে, বলে—আমার হরি। সে সব কাজ

করে, কিন্তু মনে মনে বেশ জানে এ বাড়ী বা ছেলে কোনটাই তার নিজের নয়। তার মন দেশে পড়ে থাকে।

মাস্টার মশাইকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে খুব মিশবে, যেন পরস্পর কত আপনার। কিন্তু মনে মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়, তুমিও তাদের কেউ নও।' তোমার বলতে শুধু ভগবান, স্ত্রী পুত্র ঘর-বাড়ী সব তাঁর।

(৪) ঠাকুর বলেছেন, সংসারে পানকৌটির মতন থাকো। পানকৌটি সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু একবার পাখা ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

(৫) আর পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাকতে হয়, তবু পাঁক লাগে না। গা পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে।

(৬) কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আড়ায় —যেখানে ডিম রয়েছে।

(৭) দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম করছে, কিন্তু মনটা আছে দরদের দিকে।

(৮) নর্তকীর মতন থাকবে, যেমন মাথায় বাসন রেখে নাচে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখনি? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে পথ চলছে। তেমনি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবে।

তৃতীয় প্রশ্ন

'ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?' এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। মধ্যে মধ্যে নির্জনবাস, ঈশ্বরের নাম-গুণ-গান, সাধুসঙ্গ, সদসৎ বিচার, এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।'

চতুর্থ প্রশ্ন

'মনের কি অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়?'—এই প্রসঙ্গে ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন: ছেলের জন্য,টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কে বল দেখি ঈশ্বরের জন্য চোখের জল এক ফোঁটা ফেলছে? খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে ঈশ্বরকে দেখা যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান এবং বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান—এই তিন টান একত্র হ'লে তবে ভগবান দেখা দেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখতে পাই, সাধনের অবস্থায়—'মা দেখা দে। তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, কমলাকান্তকে কৃপা করেছিলি' বলে তিনি কত কাঁদতেন। তখন এক টান। যখন তাঁর দু টান হ'ল তখন তিনি গঙ্গার পোস্তায় মুখ ঘষে কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'জীবনের আর একটা দিন বৃথা চলে গেল। এখনও দেখা পেলুম না। কি হবে মা আমার।' যখন তিন টান হ'ল তখন মা কালীর খাঁড়া নিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন ঠাকুর। তিন টান দিয়েই মাকে পেয়েছিলেন তিনি। এই তিন টান দিয়ে ডাকলে এখনি ঈশ্বর দর্শন হয়।

মাস্টার মশাইয়ের চারটি প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা প্রধানতঃ 'কথামৃত' থেকেই বলেছি। তোমরা 'কথামৃত' ভাল ক'রে পড়বে। তার ভিতরেই তোমরা নিজ নিজ সাধনার পথে আলোক পাবে।

হে বীর সন্ন্যাসী !

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বিচিত্র বিগ্রহ লয়ে বহু পথে চলে পরিক্রমা,
অসীম জ্ঞানের স্তরে বুদ্ধিপ্রজ্ঞা চির-আবর্তিত।
পরাবিদ্যা—বিজ্ঞানের যত তত্ত্ব ছিল অকথিত,
তুমি তো কহিয়া গেলে ব্যক্ত করি স্রষ্টার মহিমা।
বিজ্ঞানের খণ্ডজ্ঞান, খণ্ড সত্য-সমষ্টিরে লয়ে,
বস্তু বিশ্বে করে প্রহসন। তর্ক যুক্তি সমন্বয়ে
প্রেয়প্রিয় দৃষ্টবাদী, পার হোতে প্রমাদের সীমা,
পারিল কি প্রমোদের লালসার নিত্য প্রলোভনে ?

এই বিশ্ব বিঘূর্ণিত গ্রহে গ্রহে কিসের স্পন্দনে,
মূঢ় নর বুঝিবে কেমনে ? চির রহস্যের কূলে
যাত্রা কভু করে নাই, ভ্রান্ত চিত্তে করে আনাগোনা
মৃত্তিকার খেলাঘরে। তুমি তার অজ্ঞানের মূলে
দাঁড়ায়েছ গুরুদত্ত আলো লয়ে,—তোমার সাধনা
তারে দিয়েছে যে খণ্ড হোতে অখণ্ডের পূর্ণবোধ,
দ্বৈত হোতে অদ্বৈতের মাঝে লুপ্ত মনন-বিরোধ।

তোমার উদাত্ত কণ্ঠ শিকাগোয় গিয়াছে যে শোনা
নিখিলের ধর্ম-সম্মেলনে। শঙ্করের রূপ ধরি
তুমি তো কহিয়া গেলে সত্য এক, দিবস-শর্বরী—
বহু রূপে বহু ভাবে জড় চেতনায় সদা বহি
করিতেছে লীলা বোধাতীত ভাবের আবেশে ;
দ্বৈতাদ্বৈত জীব-শিব সেবা, প্রেম-বার্তা লয়ে এসে,
আত্মা আর অধ্যাত্মের প্রজ্ঞানের মর্মকথা কহি'
হে বীর সন্ন্যাসী ! ফিরে গেছ সপ্তর্ষি-মণ্ডলে আজ,
ভেদের ভিতরে ঐক্য দেখালে কি তুমি মহারাজ ?
বেদনার ইতিহাসে আনন্দের বাণী তব বহি।

সংসারের সর্ব ক্ষেত্রে আজো জ্বলে তব যজ্ঞ-শিখা,
ভারতের ভালে তুমি দিয়া গেলে গৌরবের টীকা।

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি

স্বামী জীবানন্দ

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—কথাটি শ্রুতিসুখকর সন্দেহ নেই, কিন্তু বৈরাগ্য-সাধন ব্যতীত অসংখ্য বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত, তাই একই কণ্ঠের সুরধ্বনি :

বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে।

জীবনে যেদিন এই কঠোর কৃপার অনুভূতি হয়, সেদিনটি সত্যই দুর্লভ।

বিদ্যা ও অর্থ উপার্জনের সময়ে তৎপ্রতিকূল কত সুখ ছেড়ে দুঃখের জীবন বরণ করার প্রয়োজন হয়, তবে মুক্তি-সাধনের ক্ষেত্রে অনমুকূল বিষয়ে সীমার সংকীর্ণ বন্ধন ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হবে কেন?

বহু আয়াস সত্ত্বেও পার্থিব কোন বস্তুকেই চিরকাল ধরে রাখা যায় না। এই জগতের বিচিত্র বিষয়ভোগ হয়তো দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন তা ভোগ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে যাবে। তাই উপভোগের সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুমুক্ষু যাবতীয় বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করেন। প্রকৃত মুমুক্ষু সাধনার জীবনকে আরামের জীবনে পরিণত করতে চান না।

জগৎ দুঃখময়, জন্মগ্রহণে দুঃখ, জীবন-ধারণে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ। ব্যাধি, জরা, অশান্তি, হাহাকার—এইতো জীবন। এত দুঃখ-কষ্ট দেখেও মানুষের বিবেক জাগে না, এমনি তার চিত্তের বিভ্রম।

জীবন-সন্ধ্যায় হিসাব-নিকাশ করতে বসে লোকে ভাবে : কত সাধেই না সংসারে সুখভোগ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সংসারকে তো আমরা ভোগ করতে পারিনি, সংসারই আমাদের গ্রাস ক'রে ফেলেছে। সংসারে এসে আমাদেরই তপস্যা করবার কথা ছিল, কিন্তু হ'ল ঠিক বিপরীত, সারাটি জীবন আমরাই সন্তপ্ত হয়ে কাটালাম। কালকেও অতিক্রম করতে পারিনি, কালই আমাদের মৃত্যুর দরজায় ঠেলে নিয়ে এসেছে। দারুণ বিষয়-বাসনা অণুপরিমাণও ক্ষীণ হয়নি, আমরাই জীর্ণ হয়েছি। জীবন-রঙ্গমঞ্চের শেষ দৃশ্য বড়ই করুণ।

'ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা-
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥
(বৈরাগ্যশতকম্)

পথের সামনে ভোগ্য বস্তু এসে উপস্থিত হয়ই, কিন্তু যদি সাহস ক'রে বলতে পারা যায়—এই সব চাই না, চাই এ সকলের উৎসকে, তবে সত্যের মঙ্গলালয়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

ধন, জন, মান, বিদ্যা, রূপ, গুণ, অভ্যুদয়—সব কিছু থেকেই ভয়, একমাত্র বৈরাগ্যই ভয়হীন।

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং
বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ং।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং
রূপে তরুণ্যা ভয়ম্॥
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং।
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥

বিষয়-সুখ অধিক-পরিমাণে ভোগ করলে রোগের ভয়, কুলীন হ'লে কুলনাশের ভয়, ধনী হ'লে নৃপভয়, সম্মান থাকলে মানহানির ভয়, বলিষ্ঠ হ'লে শত্রুভয়, রূপবান্ হ'লে তরুণী-ভীতি, শাস্ত্রজ্ঞান থাকলে প্রতিপক্ষ হতে ভয়, গুণ বিদ্য-

মানে দুর্জন-ভয়, দেহে সর্বদা মৃত্যু-ভয়, এ সংসারে সকল বস্তুই ভয়-কণ্টকিত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। যিনি বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেছেন, তাঁরই কোনরূপ ভয়ের কারণ নেই।

বৈরাগ্যে সঞ্চয়ের স্পর্ধা নেই, আছে ত্যাগের মহত্ত্ব। বৈরাগ্যের সার্থকতা প্রাচুর্যে নয়, ভূমায়। ভোগে দাসত্ব-ভীতি, বৈরাগ্যে স্বাধীনতা—নির্ভীকতা। সঞ্চয় বন্ধন, সঞ্চয়ের স্তূপে শ্বাস রুদ্ধ হয়। বৈরাগ্যের পথে অল্প থেকে ভূমার দিকে যাত্রা। বৈরাগ্য শূন্যতার শুষ্কতায় হৃদয় মরুভূমি করে না, পূর্ণতার অভিষেকে তাকে সরস ও শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলে।

বৈরাগ্য অনুরাগের রঙে রাঙিয়ে দেয় চিত্ত-কুসুমকে। যিনি বৈদান্তিক তিনি জগতের উপরকার নাম ও রূপের খোসা ছাড়িয়ে ভেতরে চলে যান, সচ্চিদানন্দ আস্বাদ করেন।

বৈরাগ্য আত্ম-প্রবঞ্চনা বা পলায়নী বৃত্তি নয়, বৈরাগ্য আত্মবিকাশের সহজ সোপান। অভাব অনটন-জনিত সংসার-বিরক্তি বৈরাগ্য নয়, আত্মা বা ঈশ্বরে অনুরাগ-জনিত আনন্দে বিষয়-রস-পানে ঔদাসীন্যই বৈরাগ্য। বৈরাগ্যে অনুরাগের প্রগাঢ়তা। ঈশ্বর-কৃপায় আকৃষ্ট জীবের হৃদয়েই স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতরঙ্গের লীলাবিলাস হয় বৈরাগ্যের আশ্রয়ে।

বৈরাগ্যের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা—'ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগঃ'। আচার্য শঙ্কর 'সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহে' একটু বিস্তার ক'রে এই কথাই বলেছেন :

ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ তদ্বৈরাগ্যমিতীর্যতে॥

ইহলোকে এই জীবনের ভোগ যেমন পরলোকের স্বর্গাদির ভোগও তেমনই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয়হেতু অল্প বা অধিক সকল ভোগে যে স্পৃহাশূন্যতা ও তুচ্ছবুদ্ধি তারই নাম বৈরাগ্য। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে বৈরাগ্যের সংজ্ঞা :

দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য
বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। (যোগসূত্র)

অর্থাৎ দৃষ্ট এবং শাস্ত্রে শ্রুত বিষয়সকলের ভোগের প্রতি যে বিতৃষ্ণা তা বৈরাগ্য নামে অভিহিত। বিষয়সমূহ দুই প্রকার—দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক। দৃষ্ট—যে বিষয় সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা আছে, যা দেখা যায়, যেমন : ক্ষেত্র, বিত্ত, পশু, স্ত্রী, পুত্র, অন্নপানাদি। আনুশ্রবিক—যে বিষয় চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণে জানা যায়। পুণ্যের ফলে স্বর্গে গমন ক'রে অমৃত-পান, অপ্সরাদির সহিত ক্রীড়া প্রভৃতি ভোগের কথার উল্লেখ শাস্ত্রে আছে। সকল ভোগই আরম্ভে সুখদায়ক এবং পরিণামে দুঃখপ্রদ, ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্তি সহজে হয় না, পৃথিবীর সমস্ত ভোগও একজনের ভোগের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, ভোগেচ্ছা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হানাহানি কাটাকাটি ইত্যাদির কারণ—এইরূপ বিচার দ্বারা বারংবার বিষয়ের দোষ দর্শন করলে সমুদয় ভোগেরই উপর বিতৃষ্ণা আসে। দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক ভোগে যখন নিস্পৃহ ভাব হয় তখন বৈরাগ্য বশ হয়েছে বলা হয়, তাই এর নাম 'বশীকার' বৈরাগ্য।

আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন নির্বাপিত হয় না—ক্রমশই বর্ধিত হয়। কাম্য বস্তুর উপ-ভোগে কামনার শান্তি না হয়ে বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। যযাতি-উপাখ্যানের সেই অমর শ্লোক ভারতের মর্মবাণী।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ পলিত, দন্ত গলিত, চক্ষু দৃষ্টিহীন, কর্ণ শ্রবণশক্তিহীন হয়, তৃষ্ণাই একা নিত্য নূতন রূপ ধারণ করে।

জীর্যন্তে জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
জীর্যতশ্চক্ষুষী শ্রোত্রে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥

বাসনা-মদিরা পান ক'রে জগৎ মত্ত। যেমন দিন ও রাত্রির একত্র অবস্থান অসম্ভব, তেমনি

বিষয়-ভোগ ও ভগবান লাভ একসঙ্গে হ'তে পারে না। বাসনা বিষের বড়ি, সোনার পাতে মোড়া। আপাত-রমণীয়—কিন্তু পরিণামে বিষময়। তাই উপদেশ :

মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।

ভোগমুখী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের দিকে ধাবিত না হয়ে অন্তর্মুখী হওয়াই বৈরাগ্যের মূল মন্ত্র। বৈরাগ্যের আরম্ভে সাধনার সূত্রপাত। তাই উদাত্তকণ্ঠে বেদ ঘোষণা করছেন : ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

রূপরসাদি বিষয় ভোগ করতে করতে মন তাদেরই রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। যার মন বিষয়-রঙে রঙে গেছে তার মুখে শুধু বিষয়েরই কথা। ঈশ্বরীয় কথা কেমন ক'রে আসবে সে মুখে? কিন্তু যে বিষয়ে বিরক্ত, তার মুখে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা আসে না। 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—তিনিই পালন করতে পারেন। আবার অপরের জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ বা নিজের সব কিছু ত্যাগ তিনিই করতে পারেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণের জন্য—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।

বৈরাগ্যের দুটি দিক : (১) সংসারে বিরাগ (২) ঈশ্বরে অনুরাগ। সংসারে অনিত্যত্ববোধ যত দৃঢ় হবে অমৃতত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরানুরাগ ততই বৃদ্ধি পাবে। নিজেকে অকর্তা ভেবে ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কর্ম করা ও নিঃস্বার্থভাবে পরার্থে আত্মনিয়োগ করা বৈরাগ্যসাধনের উপায়।

শাস্ত্রকারগণ বলেছেন বৈরাগ্য দুই প্রকার : অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য। ভোগের দুঃখকর পরিণাম-চিন্তায় মনে বিষয়ের প্রতি যে বিরক্তি আসে তার নাম 'অপর বৈরাগ্য'। সত্য-স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার হ'লে অসত্য বস্তুসমূহের উপর স্বতই যে বিরক্তি উপস্থিত হয় তাই 'পর বৈরাগ্য'। পর বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য।

অপর বৈরাগ্য তিন প্রকার : মন্দ, মধ্যম ও তীব্র। মন্দ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যুতে প্রিয়জনের বিয়োগে বা শ্মশানে মৃতদেহ-দর্শনে সাময়িকভাবে হয়তো বৈরাগ্য উদিত হতে পারে, কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্মশান-বৈরাগ্য অন্তর্হিত হয়। শ্মশান-বৈরাগ্যকে 'মর্কট'-বৈরাগ্যও বলা যেতে পারে। মর্কট বা বানর যেমন অস্থির তেমনি এই বৈরাগ্যও অস্থির। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে শ্মশান-বৈরাগ্য থেকেও প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়ে থাকে। মধ্যম বৈরাগ্যে বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এবং ত্যাগের ইচ্ছা হয়, কিন্তু পূর্বসংস্কার-বশতঃ ঐ ইচ্ছা প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলপ্রসূ হয় না। তীব্র বৈরাগ্য যেন প্রচণ্ড বন্যার স্রোত, কোন কিছু বাধাই তার সামনে টেকে না, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তীব্র বৈরাগ্যে সংসার মরুময় বোধ হয়, সমস্ত বস্তুতেই হেয়ত্ব-বুদ্ধির উদয় হয়। তীব্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগের পথকেই বরণ ক'রে নেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার, মায়াপাশ কচ্‌কচ্‌ ক'রে কেটে দেয়। ভগবান লাভ আজই করব, এখনই ক'রে তবে কাজ।

বৈরাগ্যের ফল কি? আচার্য শংকর 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থে বলেছেন :

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্
স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্॥
যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্বপূর্বন্তু নিষ্ফলম্॥

বৈরাগ্যের ফল বোধ বা জ্ঞান, জ্ঞানের ফল উপরতি, বাহ্য বিষয় থেকে চিত্তবৃত্তির অন্তর্মুখীনতা, অন্তর্লীনতা এবং জগতের বিস্মৃতি। উপরতির ফল ব্রহ্মানন্দানুভব-জনিত শান্তি। উত্তরোত্তরটির অভাব হ'লে পূর্ব পূর্বটি নিষ্ফল। যে বৈরাগ্যে জ্ঞানের উদয় হয় না, সে বৈরাগ্য নিষ্ফল, যে

জ্ঞান উপরতির কারণ হয় না, সে জ্ঞানও নিষ্ফল, এবং যে উপরতি ব্রহ্মানন্দানুভব-জনিত শান্তি আনে না, সে উপরতিও নিষ্ফল।

বৈরাগ্য সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে। বৈরাগ্য দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, নিজের ও সমুদয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, এবং মায়ারূপ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় এবং 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত' সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বোধ হয়।

'অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ সমাহিতস্যৈব দৃঢ়-প্রবোধঃ'—অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সমাধি হয় এবং সমাহিত পুরুষের পক্ষেই দৃঢ়জ্ঞান-লাভ সম্ভব।

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণমাত্রতা॥

যেখানে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্বের মন্দতা দৃষ্ট হয়, সেখানে মরুভূমিতে কল্পিত জলের মত শমাদি সাধন মিথ্যা ভাণমাত্রে পর্যবসিত হয়, অতএব মোক্ষলাভে বৈরাগ্য একান্ত প্রয়োজন।

অনাসক্তিই বৈরাগ্যের স্বরূপ। অনাসক্তি একটি মনোভাব বা মনের অবস্থা। আসক্তির আশ্রয় মন, মন থেকে ত্যাগই ত্যাগ। কার কতখানি অনাসক্তি—নিজে-নিজেই তা জানা যায়। বাইরের চালচলনে আচার-ব্যবহারে অন্যের কাছেও আসক্তি বা অনাসক্তির ভাব অপ্রকট থাকে না।

বাহ্য দৃষ্টিতে ত্যাগের ছোট বড় পার্থক্য প্রতিভাত হয়। পরমার্থ-দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। ত্যাগের বিষয়ে ধনী নির্ধনের তফাৎ নেই। যার যে ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা মন অধিকৃত হয়ে আছে, সেই ভোগ্য বিষয় ত্যাগই ত্যাগ, তাতে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজ্য-ত্যাগ করেছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান শংকরাচার্য সামান্য পৈতৃক কুটীর ত্যাগ করে-ছিলেন, বাহ্য দৃষ্টিতে উভয় ত্যাগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুভূত হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। দরিদ্রতম লোকের অতি অকিঞ্চিৎকর কয়েকটি জিনিসের প্রতি ঘোর আসক্তি থাকতে পারে, ঐগুলিই যে তার সম্পত্তি—তার নিজের। অতি সযত্নে তাই সে ঐ-গুলিকে ঘিরে আসক্তির প্রাচীর খাড়া ক'রে রাখে। আবার অগাধ সম্পত্তির মালিক ধনীর দুলালের মনে অনাসক্তি থাকতে পারে। দরিদ্র হলেই যে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য হবে তার কোন মানে নেই, ধনী হলেই যে হবে না তাও বলা যায় না। কার কবে কখন কোন্ শুভক্ষণে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হবে তা জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না।

ত্যাগ ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। অনেকে মনে করে ভোগ করতে করতেই ভোগের ইচ্ছা ক্ষয় হয়ে ত্যাগের ভাব আসবে। যা ভোগ করা যায়, তার ক্ষয় হয় হলেও ভোগের ইচ্ছা বলবতী হতেই দেখা যায়। ভোগে অনেক সময় ইন্দ্রিয়সকল অবসাদ-গ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু তা নিবৃত্তি নয়। ভোগের সংস্কার পূর্ববৎ ঠিক থেকে যায়। ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হলেও সংস্কার নিস্তেজ হয় না—বলবান্ই থাকে। বিপরীত সংস্কার উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব সংস্কার যায় না। ভোগাভ্যাসের ফলে ভোগা-সক্তি ও ইন্দ্রিয়ের কার্যকুশলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—'ভোগাভ্যাসমনুবিবর্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি'। [যোগভাষ্য] অতএব বিপরীত সংস্কারের উৎপত্তি ভোগাসক্তির দ্বারা সম্ভব নয়, ভোগে অনাসক্তির দ্বারাই সম্ভব।

বৈরাগ্য বিনা আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভই হয় না, এ বিষয়ে স্মরণীয় স্বামীজীর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত :

জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার শুধু নোঙর ফেলে নৌকার দাঁড় টানা হচ্ছে।

নবজন্ম

সৈয়দ হোসেন হালিম, সাহিত্য-রত্ন

আজিকে আমার প্রাণের জোয়ারে জেগেছে ঘূর্ণাবর্ত,
এক হয়ে গেছে নিখিলের রূপ—স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য।
জীবনে আজিকে ওঠে কলতান, মৌন মধুর স্তব্ধ পাষাণ
হ'ল উচ্ছল প্রাণচঞ্চল নির্ঝরিণীর নর্ত।

দূর হ'তে কার অম্বু-নিনাদ মুখরিত করে বিশ্ব,
ভীম গর্জন ঘোর তর্জন তার কাছে সব নিঃস্ব।
মেঘের মতন কেশপাশ তার, জটাজালে বাঁধা গঙ্গার ধার,
আমি দুর্বার, আমি খরধার, আমি তার খ্যাপা শিষ্য।

আজিকে প্রাণের পাষাণ-ফলকে কার চারু রূপ রঙ্গে,
সব বন্ধন করি খণ্ডন নেচে উঠি তারি সঙ্গে।
কর-পল্লবে ঝলিছে ত্রিশূল, অশ্রুর মণি নয়নের ফুল,
আমি পূজি তারে নব ঝঙ্কারে—ছন্দের ভুরু-ভঙ্গে।

সেই সে বিরাট স্তব্ধ অচল চিরদিন রহে মৌন,
ধরণীর যতো কঙ্কর-ধূলি তার কাছে সবি গৌণ।
ভাঙা-গড়া তার পুতুলের খেল, তুড়ি দেয় কভু হয় উদ্বেল,
ভাষা-নন্দিনী ভাবে বন্দিনী—ভাবে ভাষা চির মৌন।

সুখ-দুখ সে তো মানব-মনের কল্পনা-সম্পৃক্ত,
অশ্রু-উরসে হাসির কুমার অশ্রুর সুধাসিক্ত।
লাভ-ক্ষতি আর জ্বালা হাহাকার, সে ত মানবের মনের বিকার,
তুমি প্রেমময় চির অব্যয়, তুমি ছাড়া সব তিক্ত।

ধ্যানের মূরতি মোর ধ্যাননাথ আজ দিয়া গেছে স্পর্শ,
সুখ-দুখ-হরা তার করপুটে ঝরিছে বিমল হর্ষ।
নয়নে তাহার নীল অঞ্জন করিছে মনের দুখ ভঞ্জন,
আমি আজি তার কণ্ঠের হার—পুষ্পিত নব বর্ষ।

'শ্রীম'-সকাশে

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন

সন ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২ খৃঃ) স্বামী শুদ্ধানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-প্রচারকল্পে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সোসাইটি সেই সময়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর (বর্তমানে যেখানে 'ষ্টেট ব্যাঙ্ক—শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ' সেখানে) অবস্থিত ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দ বিভিন্ন পল্লীতে চক্রাকারে উপনিষদ্ (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য) এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ' প্রভৃতি ক্লাস করিতেন। আমি বিভিন্ন পল্লীতে গিয়া তাঁহার ক্লাসে যোগদান করিতাম।

একবার সুকীয়া ষ্ট্রীটে এক আলোচনা-সভায় তিনি বলিলেন : দেখুন, আর দুই দিন মাত্র আমি এইরূপ ক্লাস নেব, ৺পূজা এসে পড়ল, আমার আর সময় নেই, আমাকে মঠে চলে যেতে হবে। আমি তো এখানে মাস্টারি করতে আসিনি। আপনাদের মনে ধর্ম-বিষয়ে একটা আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়ার জন্য এই ক্লাস নেওয়া। যদি কাহারও আসল সত্য বস্তু লাভ কররবার ইচ্ছা থাকে তিনি যেন নিজে নিজে চেষ্টা করেন। এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে দু চার জন স্থূল শরীরে বর্তমান আছেন। তাঁদের নিকট গেলে সত্য উপলব্ধি হতে পারে। এই সূত্রে তিনি মঠে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ, উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ, সারগাছিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহস্থ পার্ষদ শ্রীশ্রীমাস্টার মহাশয়ের নাম করেন। তিনি জানাইয়া দিলেন, 'মাস্টার মহাশয়' সুকীয়া ষ্ট্রীটের অতি নিকটেই থাকেন —সেখানেও যেতে পারেন।

খোঁজ লইয়া জানিলাম 'মাস্টার মহাশয়' ৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মর্টন ইনষ্টিট্যুশনে চার-তলার উপরে থাকেন, সেখানে অবারিত দ্বার —সন্ধ্যার সময় যাইলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে। আবার একথাও মনে হইল তিনি একজন মস্ত লোক আমাদের মত লোকের সহিত কি তিনি দেখা করিতে রাজী হইবেন? এই সব ভাবিয়া দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, গিয়া দেখা করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

একদিন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোনও দিন মাস্টার মশায়ের নিকট গিয়েছিলেন না কি? আমি ইতিপূর্বে তাঁহাকে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর নির্দেশের কথা বলিয়াছিলাম, সেই জন্যই তিনি ঐ প্রশ্ন করিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'না' এবং তিনি শ্রীশ্রীমাস্টার মহাশয় সম্বন্ধে আমার যে ধারণা অর্থাৎ তিনি একজন মস্ত বড় লোক, আমি যাইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি না—এই আশঙ্কার কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'তিনি একজন অতিশয় নিরভি-মান মহাপুরুষ—একদিন গিয়েই দেখুন না কেন।' তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আগামী কল্য নিশ্চয়ই যাইব। তদনুযায়ী ৪ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার সন ১৩২৯ সালে আমি প্রথম শ্রীশ্রীমাস্টার মহাশয়ের দর্শন পাই এবং এই দিনটিকে আমার জীবনের এক মহা সৌভাগ্যের দিন বলিয়া গণ্য করি।

ঠিক সন্ধ্যার সময় মর্টন ইনষ্টিট্যুশনের চার-তলার উপর উঠিয়া দেখি, আবক্ষলম্বিত শ্বেত-শ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রশান্তমূর্তি গৌরকায় এক

ভদ্রলোক উত্তরাস্য হইয়া একটি ছোট টিনের ছাদবিশিষ্ট বারাণ্ডায় চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে বেঞ্চে কয়েকটি ভক্তও উপবিষ্ট আছেন। মাস্টার মহাশয় যে কে তাহা চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। সেই বালকস্বভাব সরলতাপূর্ণ সৌম্য মূর্তি দেখিয়া প্রাণে স্বতই ভক্তির উদয় হইল। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি 'আহা-হা-হা না-না-না' এমন ভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন, যে আমার আর প্রণাম করা হইল না, আমি দাঁড়াইয়া মাথায় হাত স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম, তিনি আমার হস্ত ধরিয়া সামনের বেঞ্চে ঠিক তাঁর সম্মুখে বসিতে বলিলেন। বসার পর চুপ করিয়া কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম।

সকালে সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল—একজন ভক্ত 'মঠে' গিয়াছিলেন। গঙ্গার দুধারে কত লোক স্নান করিতেছিলেন, ও মঠেই বা গ্রহণের সময় কিরূপ দৃশ্যাদি হইয়াছিল তিনি তাহা বর্ণনা করিতেছিলেন ও মাস্টারমশাই শুনিতেছিলেন, শেষে বলিতে লাগিলেন :

'আহা। ঐ দৃশ্য দেখা কি কম সৌভাগ্যের কথা। এত লোক ভগবানের নাম ক'রে স্নান করছে—এই সময় তাদের মনে ভগবৎ-চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই—'It is a sight for the gods to see.' (এ দৃশ্য দেবতাদেরও দর্শনীয়)।

দেখুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়—চার থাক ভক্তের কথা বলেছেন,

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এই চার থাক ভক্তের মধ্যে যদিও ভগবান জ্ঞানীকেই একটু বিশেষ স্থান দিয়েছেন, তথাপি তার পরের শ্লোকেই তিনি ঐ চার থাক ভক্তকেই 'মহৎ' এই কথা বলেছেন। 'উদারাঃ সর্ব এবৈতে'—'উদার' এই কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন। উদার মানে মহৎ। তিনি জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও বাকী তিন থাক ফেল্‌না নয়। আর্ত যে সে দুঃখে প'ড়ে ভগবানকে ডাকে, জিজ্ঞাসু ভক্ত জ্ঞানীর ঠিক নীচে। সে তাঁকে জানতে চায়, পাঁচ জায়গায় ঘোরা ফেরা করে, কি ক'রে ভগবানকে জানা যায় তার জন্য চেষ্টা করে, এইরূপ করতে করতেই জ্ঞান আপনা আপনি আসে।

সূর্যগ্রহণের সময় নানারূপ ভক্ত স্নান করিতে আসিয়াছে শুনিয়া ঐ চার থাক ভক্তের কথা বলিলেন। আরও বলিলেন, দেখুন ভগবানের কি মহিমা। তিনি কত দয়াময়। মানুষ তাঁকে ডাকবে বলে তিনি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দেবালয়, গলিতে গলিতে কত ভক্ত ও এত কাছে 'মঠ' ক'রে রেখেছেন। এত কাছে মঠ করবার মানে কি? লোকে তাঁকে ডাকবে বলে। এই মঠ ক'রে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করছেন তাঁর নিকট যাবার জন্য। যদি তাঁর আহ্বানে না যাই তা হ'লে তিনি দরজা বন্ধ করে দেবেন। এই বলিয়া Bible-এর একটি গল্প বলিলেন :

খৃষ্ট একবার জনকয়েক গৃহস্থ ভক্তকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় যখন খবর দেওয়া হইল তখন নিমন্ত্রিতের মধ্যে কেহই আসিলেন না। কেহ বলিলেন, আমায় শস্য কাটিতে যাইতে হইবে। আবার কেহ বলিলেন, 'মশাই, আমি নূতন বিবাহ করিয়াছি, স্ত্রীকে ছাড়িয়া কি করিয়া যাই বলুন!' কেহ বা বলিলেন, আমার অন্য দরকার আছে, আমি যাইতে পারিব না।' এইরূপ নানা ওজর আপত্তি করিয়া কেহই আসিলেন না। তখন প্রভু বলিলেন, রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া

আনিয়া খাওয়াইয়া দাও। তাঁহার কথামত রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া আনা হইল। প্রভু তখন সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরের লোকদের খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। যখন এইরূপ ভোজনাদি চলিতেছিল তখন পূর্ববর্তী লোকদের হুঁশ হইল। তাহারা মনে করিতে লাগিল, প্রভুর নিমন্ত্রণে না যাওয়া ভাল হয় নাই। এই মনে করিয়া একে একে আসিয়া দরজা ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল, 'Lord, Lord, প্রভু দরজা খুলুন, আমরা আসিয়াছি।' প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কারা?'—উত্তর হইল, 'আপনি যাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহারাই, আমাদিগকে কি চিনিতে পারিতেছেন না'। প্রভু তখন বলিলেন, তোমাদের যখন ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছিল, তখন তোমরা আস নাই কেন? এখন আর দরজা খোলা হইবে না। এই বলিয়া তিনি আর দরজা খুলিলেন না।

এই যে এত নিকটে তিনি তাঁর মঠ করেছেন—এ যেন আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে সাবধান হ'তে বলেছেন। যদি আমরা তাঁর নিমন্ত্রণে সাড়া না দিই—তা হ'লে তিনি দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন। অর্থাৎ আমরা যেন মঠে গিয়ে সাধু-সঙ্গের সুযোগ গ্রহণ করি, যদি এ সুযোগ গ্রহণ না করি—তা হ'লে তিনিও তাঁর দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন।

পূর্বোক্ত 'জিজ্ঞাসু ভক্ত' প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন: এক ভক্ত ছুটি হ'লে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—কি ক'রে ভগবান লাভ করবে এই উদ্দেশ্যে। যার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল সে কি চুপ ক'রে থাকতে পারে? তার শ্বশুর তাকে বলেন, 'ছুটি হ'লে খালি কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াও,—একটু আ-রা-ম করতে পার না?' শ্বশুর একটু বড়লোক। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীমাস্টার মশাই বলতে লাগলেন, দেখ,—তথাকথিত বড়লোকেরা কি অপদার্থ। খালি আরাম চায়। আত্ম নির্ভরতার উপর মোটেই নজর নাই। তেল মাখাচ্ছে চাকর, স্নান করাচ্ছে চাকর। আর তারা খালি আরাম কচ্ছে।

এই সব কথা শুনে আমরা মনে হ'তে লাগল, আমি যেন আত্ম-নির্ভরতা শিখি—ভুলেও যেন পরমুখাপেক্ষী না হই।

তারপর আমার দিকে তাকাইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলাম, স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনার আশ্রয়ে এসে পড়েছি—আমায় দয়া করতে হবে। তদুত্তরে বলিলেন, 'আমার আশ্রয়ে কেন বলছেন? বলুন, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছেন'।

এই সব কথা শুনিয়া সেদিন বাড়ী ফিরিলাম। তাঁর সৌম্য মূর্তি, দেবভাব, বালক-সুলভ সরলতা আমার মনে একটা গভীর রেখাপাত করিল। তাঁহাকে দেখিয়া এই কথাই মনে হইল, তিনি নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন, এবং এই আক্ষেপ হইতে লাগিল—কেন এতদিন ইহার কাছে আসি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

('শ্রীম'-প্রতি)

না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে—তাঁর কাছে যাব, তা হলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

ওয়াশিংটন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

ওয়াশিংটন আমেরিকার মর্মস্থল। এই নগর যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের অন্তর্গত নয়, কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত। এর জন্য স্বতন্ত্র একটি জেলা আছে, যার নাম কলাম্বিয়া, 'ওয়াশিংটন, ডিষ্ট্রিক্ট কলাম্বিয়া'কে সংক্ষেপে বলা হয় 'ওয়াশিংটন ডি সি.' (Washington, D. C.)

বাসে করেই ওয়াশিংটন এসেছিলাম—ট্রেল কোম্পানির বাস। নিউ-ইয়র্কে উঠেছিলাম বেলা সাড়ে দশটায় আর ওয়াশিংটনে এলাম বেলা চারটায়। পথের শোভা চমৎকার—বিস্তৃত প্রান্তর, মাঝে মাঝে বন আর নগর—মন-ভোলানো ছবি। আমি উঠেছিলাম আন্তর্জাতিক একটি গৃহে—১৯ নম্বর রাস্তায়, বাড়ীটির নাম 'The House'

বিশ্ব-মৈত্রীকে সরল ও সহজ করবার আয়োজন এখানে, তাই দেশ দেশান্তরের মানুষ এখানে স্বল্প ব্যয়ে পায় বাসস্থান। জিজ্ঞাসা করতে করতে উপস্থিত হলাম—হেঁটে হেঁটে।

বাড়ীটি ছোটখাটো, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসা মাত্র পরিচালিকা মিসেস ব্লকের সাথে দেখা হ'ল। উনি ফিলিপিন, কিন্তু বিয়ে হয়েছে একজন আমেরিকানের সাথে, স্বামীটি গোবেচারা, মিসেস চালাক—তবে দুজনেই ভাল মানুষ। পেলাম আন্তরিক দরদ।

তারপর প্রাট বলে একজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ছেলেটি চমৎকার,—U N. O প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে, বললে—বাল্টি-মোরে একটা বিশ্ব-কল্যাণের সংস্থা গড়বার আয়োজন চলছে, সেই সভায় আমি যেন যোগ দিই, তার কথায় সম্মত হলাম।

সে তখনই ফোন ক'রে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিল—প্রাণবন্ত উচ্ছল যৌবনের প্রতীক, ভাল লাগল তার আলাপ। সে ফিলাডেলফিয়ার অটো ম্যালোরির সঙ্গেও যোগস্থাপন করতে ব'লে বলল, পৃথিবীতে আজ পৃথক্ হয়ে থাকবার দিন নেই, তাই সকলকে মেলাবার নানা আয়োজন চলছে—আপনি সাংস্কৃতিক দূত—এই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে এলে আমাদের মানবতা উপ-লব্ধি করবেন।

কথাগুলি মিষ্টি, যথাযথ প্রতিভাষণ জানিয়ে আমিও তার কথা সমর্থন করলাম। তারপর ঘরে গিয়ে মনের আনন্দে স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওয়াশিংটনের ঐতিহ্যের কথা ভাবতে লাগলাম: স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও রাজধানী ছিল না, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য ফিলাডেলফিয়ায় রাজধানী ঠিক করা হ'ল, আর সেই সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নির্বাচন ও নির্মাণ করতে হবে—এই প্রস্তাব স্থিরীকৃত হ'ল। মেরিল্যাণ্ড এবং ভার্জিনিয়ায় পটোম্যাক নদীর দুই তীরে দশ মাইল দীর্ঘ আর দশ মাইল প্রস্থ স্থান ঠিক হ'ল—ওয়াশিংটন নিজেই স্থান ঠিক করলেন—পরে ভার্জিনিয়ার অংশটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ওয়াশিংটনে ৭০ বর্গ মাইল জায়গা আছে। লামফান নামে একজন ফরাসী স্থপতি নগর-পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত হন, ১৮০০ খৃঃ প্রেসিডেন্ট আডাম ওয়াশিংটনে আসেন—তখন চারিদিকে জলা; একটি বাড়ী থেকে আর একটি বাড়ীর দূরত্ব দুঃসহ—রাস্তার পর রাস্তা—কিন্তু ঘরবাড়ী নেই তাতে; সেই

ওয়াশিংটন দেড়শত বৎসর পরে আজ পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর নগর।

২৪শে নভেম্বর বুধবার। সকালে প্রাতরাশ সমাপ্ত ক'রে গেলাম ১৬ নং রাস্তায় রাশিয়ান দূতাবাসে; রাশিয়ায় যাওয়ার ভিসা চাই। ওদের ভিসা-অফিসার বললেন, ভিসা পেতে কত দিন লাগবে তার কিছু ঠিক নেই—পনর দিনে পেতে পারেন—ছ মাসে পেতে পারেন, কারণ সেটা আসবে মস্কো থেকে, অতএব দেশে গিয়ে ভিসার চেষ্টা করবেন।

ওদের সাংস্কৃতিক দূত বললেন, ভক্‌স্ (Voks) থেকে আপনি যাতে নিমন্ত্রণ পান তার চেষ্টা করুন।

কথাগুলি মিষ্টি, কিন্তু চলার পথে হলে সহজেই রাশিয়া দেখে যেতে পারতাম। পৃথিবীতে আজ দুই শক্তি কাজ করেছে, এক আমেরিকা—অন্য রাশিয়া। আমেরিকার গণতন্ত্রের পরিচয় পেলাম, —পেলাম তার সহৃদয় মানুষের আতিথ্য ও আদর, এর সাথে তুলনা করব রাশিয়ার অবস্থা—এই ছিল মনের বাসনা, তা পূর্ণ হল না। লৌহ-যবনিকা উঠল না।

ওখান থেকে ভিজতে ভিজতে এলাম পেন্‌সিলভ্যানিয়া এভিনিউ, এটা কোনাকুনি গিয়ে মিশেছে ভুবনবিদিত ক্যাপিটলে—ডাক-ঘরে রাশিয়ান দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত বইগুলি—যেগুলি মনোমত হ'ল, সেগুলি দেশে পাঠিয়ে দিলাম। সেখান থেকে প্রেসিডেন্টের বাড়ী হোয়াইট হাউসের পাস দিয়ে শিল্পশালায়—করকোরান গ্যালারিতে গেলাম। হোয়াইট হাউসের ভিতর দেখবার সুযোগ করতে পারিনি—এটা আমেরি-কানদের তীর্থ—জর্জ ওয়াশিংটনের পরে সব প্রেসিডেণ্টই এখানে বাস করেছেন, আমেরিকার ইতিহাস এইখানেই তৈরি হয়েছে। এটা প্রাসাদের গরিমা পায়নি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির বাড়ী! ধনকুবের আমেরিকার রাষ্ট্রপতির বাড়ীর সঙ্গে তুলনা করলে দরিদ্র দেশ ভারতের রাষ্ট্রপতির বাড়ী কুঁড়েঘর হওয়া উচিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈন্যেরা বাড়ীটি পুড়িয়ে ফেলে, তারপরে নূতন বাড়ীটি তৈরি হয়েছে।

শিল্পশালার ছবির সংগ্রহ মূল্যবান। বর্তমান নানা পদ্ধতির নূতনত্ব এবং বর্ণবিন্যাস অনভিজ্ঞের পক্ষে রসাস্বাদনের ব্যাঘাত জন্মায়। ওখান থেকে গেলাম প্যান আমেরিকান (Pan American Union) প্রতিষ্ঠানে—এটা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সকল রাষ্ট্রের মিলন-ভূমি। ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম—সভা-ভবন, কিছু কিছু শিল্পসংগ্রহ ও সৌন্দর্যের সম্ভার। তারপর গেলাম কনষ্টিট্যুশন এভিনিউ (Constitution Avenue) বেয়ে নূতন প্রশাসনিক সৌধের পাশ দিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে (National Academy of Science)

ওখানে থেকে গেলাম আব্রাহাম লিন্‌কনের স্মৃতি-মন্দিরে। গ্রীক স্থাপত্য-রীতির অপূর্ব নিদর্শন এটা, একটি জাতির পুঞ্জীভূত শ্রদ্ধায় এটি সমৃদ্ধ—সম্মুখের কাকচক্ষু স্বচ্ছ সরোবরের দিকে রয়েছে লিন্‌কনের প্রস্তর-মূর্তি। লিন্‌কন আমেরিকা থেকে দাসত্ব তুলে দিয়ে পৃথিবীতে এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।

তখনও টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে—তার মাঝে রওনা হলাম—রাস্তায় জল এল জোরে—একস্থানে আশ্রয় নিলাম—তবু খুব ভিজে গেলাম—পটো-ম্যাক নদীর পাশে টাইডাল বেসিন (Tidal Basin) নামক জলাশয়ের তীরে জেফারসনের স্মৃতি-মন্দির দূর থেকে চোখে পড়ল। এখানে জাপান থেকে চেরীগাছ এনে বসানো হয়েছে—বসন্তে যখন চেরী ফুলের সমারোহে দৃশ্য মধুর হয়ে ওঠে—তখন মহামানব জেফারসনের স্মৃতি-পূত এই স্থানটিতে দর্শকের ভিড় লেগে যায়।

তারপর একটি ছাপাখানার প্রতিষ্ঠান (Borough of Engraving and Printing) দেখতে গেলাম—ওখান থেকে গেলাম কৃষি-কার্যালয়ের পাশ দিয়ে চিত্র-প্রদর্শনী (Feer Gallery of Art), সেখান থেকে বিমান-প্রদর্শনী দেখে গেলাম শিল্প ও বিজ্ঞানের যাদুঘর (Smithsonian Institution).

ক্যাপিটল (Capitol) এদের লোকসভা-ভবন। এর শ্বেত গম্বুজটি দেখতে সুন্দর—বাড়ীটিও চমৎকার। এখানেই আমেরিকার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, আইন তৈরি হয়, তাই প্রতি আমেরিকান এই সৌধকে সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় দেখে। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর এটি তৈরি—সম্মুখে সবুজ তৃণাচ্ছন্ন পার্ক—দূরে ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট, স্থানটির শোভা অতুলনীয়। বাইরেটা ঘুরে গেলাম বিরাট শিল্প-ভবন (National Art Gallery) দেখতে। তারপর বাসে ক'রে ভারতীয় দূতাবাসে পৌঁছলাম।

কাপুরের কাছে চিঠি দেওয়া ছিল—এখনও লাঞ্চ খেয়ে ফেরেননি, ভারতীয় দূতাবাসের শৃঙ্খলা, কর্মনৈপুণ্য এখনও আশানুরূপ নয়। কাপুর আমার জন্য কিছু ক'রে উঠতে পারেননি। তাঁর সাথে আমেরিকার আদি অধিবাসীদের কথা হ'ল। কাপুর অনেক আদি অধিবাসী দেখেছেন, তিনি বললেন—বহু পূর্বেই ভারতীয়েরা বেরিংপ্রণালী পেরিয়ে আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় এসেছিল।

তারপর কাপুর ভারতীয় দূতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে গেলেন। সাক্ষাৎশেষে নাগের সঙ্গে আলাপ ক'রে বাসায় ফিরলাম। নাগ আগামী কাল মাউণ্ট ভার্নন দেখিয়ে নিয়ে আসবেন বললেন। আজ এদের এখানেই রাতের ডিনার খেলাম। চিংড়ি মাছ খাওয়ালে, কিন্তু তার আদৌ স্বাদ নেই।

বৃহস্পতিবার—ভোর বেলাই উঠে পড়লাম। নিজে নিজে মেরিডিয়ান হিল পার্ক (Meridian Hill Park) নামক উদ্যানে বেড়াতে গেলাম। নগরের সুন্দরতম পুরোদ্যান বলে বিখ্যাত,—কিন্তু আসলে কিছু নয়। অত্যুক্তি—ভাবে-ভোলা আমেরিকান জাতির স্বভাব; নাগ সত্যই বলেছিলেন, 'আমেরিকায় সব সময় দেখবেন Superlative degree (অতিরঞ্জন)। একটি গির্জা ঘুরে গেলাম নাগের সন্ধানে—৬১৬ নম্বর ঘরে। মিসেস নাগ বন্ধু-কন্যা; উভয়ে আমায় সাদর অভ্যর্থনা করলেন। চায়ের পর ওদের ছোট ছেলে বিণ্টু, নাগ আর আমি নাগের গাড়ীতে মাউণ্ট ভার্ননে গেলাম—প্রায় ১৪।১৫ মাইল পথ পটোম্যাকের তীরে তীরে বেশ আনন্দে চলা গেল। ওয়াশিং-টনের বৈমাত্রেয় ভাই লরেন্স এই বাড়ী তৈরি করেন। এইখানে জর্জ ওয়াশিংটন ও তাঁর স্ত্রী মার্থা ১৭৫৯ খৃঃ থেকে ১৭৯৯ খৃঃ পর্যন্ত বাস করেন—তারপর তাঁর পরিবারের লোকেরা এখানে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করার পর যখন বাড়ীটি বিক্রি করতে যান তখন সাউথ কেরোলিনায় মিস অ্যান পামেলা কানিংহাম অগ্রসর হয়ে একে জাতীয় সম্পদে পরিণত করেন। বাড়ীটি কাঠের, কিন্তু এমন চমৎকার রং করা যে পাথরের বাড়ীর মত মনে হয়। ওয়াশিংটন সত্যি এই জাতির জনক—দলে দলে মানুষ এসে জানায় প্রণতি। পুরাতন দিনের সব কিছুই এরা ঠিকঠাক রেখেছে।

বিকালে নাগ এলেন—সস্ত্রীক। আমরা সবাই মিলে উঠলাম ওয়াশিংটন মনুমেণ্টে। দশ সেণ্ট দিলে লিফ্‌টে—একেবারে চূড়ায় উঠতে।

ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের সু-উচ্চ চূড়া বহুদূর থেকে দেখা যায় রাত্রে আলোর প্লাবনে একে অতি চমৎকার দেখায়। উচ্চতা ৫৫৫ ফুট—১৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এটি তৈরি—এই চতুষ্কোণ

পাথরের চূড়া থেকে চারিপাশের নগরের ছবি বেশ মনোহারী। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামিনি, সিঁড়ি দিয়ে নামলে নানা দেশের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য —পাথরের চৌকা দেখা যেত।

তারপর কংগ্রেসের দুটি পাঠাগার দেখতে গেলাম। নূতন পাঠাগারটি সাজ-সজ্জাহীন, কিন্তু পুরাতনটি অতুলনীয় সজ্জায় বিচিত্র। কাপুর ঠিকই বলেছিলেন—কংগ্রেস-পাঠাগার না দেখলে ওয়াশিংটন যাওয়াই বৃথা।

তারপর ডাউনটাউন (Downtown) ওয়াশিংটনের বড় বড় দোকানে খৃষ্টমাসের পণ্য-সমারোহ দেখে পিপল্স্ ড্রাগ ষ্টোরে (Peoples' Drug Store) ৩০ সেণ্ট দিয়ে ডিনার সমাধা করলাম।

বাসায় ফিরে গরম জলে স্নান ক'রে পড়তে বসলাম। ফিরবার পথে বাল্টিমোর বিশ্বকল্যাণ-সভায় যাওয়া স্থির হয়েছিল, তাই আগামী কাল ওয়াশিংটনের দ্রষ্টব্য দেখবার আর সুযোগ হবে না। এখানে এক বাঙালী অধ্যাপক আছেন—নাম জোয়ারদার, ফোনে তাঁর সাথে আলাপ হ'ল, তিনি আমেরিকান মহিলা বিয়ে ক'রে আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন।

শুক্রবার ২৬শে নভেম্বর। খুব সকালেই নীচে নেমে এলাম। মিসেস ব্লক্ পাওনা নিতে দেড় ডলার বেশী দাবি করলেন—আমি এক ডলার কমালাম, কিন্তু আর আধ ডলার যে কেন বেশী লাগল তা ধরতেই পারলাম না। আজও মনে করি এটি মধুরভাষিণী মহিলার গণিতের অজ্ঞতা। মিসেস ব্লকের পাওনা মেটাতে হিসেবের গণ্ডগোলই ছিল, তাঁদের আধ ডলার বেশিই দিয়ে দিলাম। জোয়ারদার এবং মিঃ ব্লকও আমার সাথে বাল্টিমোরের উপনগরী গ্রেমার্সিতে চললেন।

বেশ চমৎকার রাস্তা—মোটরের যাত্রাটি বেশ আরামপ্রদ লাগল। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন সভা আরম্ভ হয়ে গেছে। বয়স্কলোক-শিক্ষার বড় পাণ্ডা মিঃ লাবাক সভাপতি হিসাবে বিশ্বমৈত্রীর পরিকল্পনা পেশ করলেন।

তারপর লাঞ্চ হ'ল। নিজেরাই পরিবেশন করলেন সভ্য ও সভ্যারা। খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম, তারপর চলল সভা। আমি খুব সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা দিলাম। আমার স্বল্প ভাষণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তখন সবাই আমার পরিচয় নিতে অগ্রসর হলেন, আমার সঙ্গে আলাপের হিড়িক পড়ে গেল।

অনেকে আমার অটোগ্রাফ বইতে বিশ্বপ্রেমের বাণী লিখলেন। তারপর এদের একটি গ্রুপ কমিটি (Group Committee)-তে আমাকে সভ্য হতে হ'ল। আমি বললাম: বিশ্বমৈত্রীর এই আয়োজনকে রাষ্ট্রসম্পর্কহীন সাধারণ সংস্থা হতে হবে।

অনেকে আমাকে সমর্থন করলেন। তারপর সংস্থার নাম কি হবে তা নিয়ে নানা জনে নানা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আমি বললাম,—'এর নাম হোক The Fellowship of Human Culture'—নামটি সবাই পছন্দ করলেন। সবাই আমাকে ব্যাখ্যা করতে বললেন—নামটির আশা ও উদ্দেশ্য।

আমি বললাম: মানুষের জীবধর্ম যা, সেখানে মানুষ পশু, কিন্তু মানুষ যেখানে বিশ্ব-মানবের সাথে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই সে স্বস্থ এবং সুস্থ, একেই বলে মানুষের ধর্ম ও সভ্যতা, এইটাই মানব-সংস্কৃতি। মানব-সংস্কৃতির বেদীমূলে সব দেশের মানুষ মিলবে পরম মৈত্রীতে, তাই এ হবে আমাদের 'মানব-সংস্কৃতি মৈত্রী সংঘ'।

জোয়ারদার প্রথমে আমাকে আমল দেননি,

—কিন্তু পরে যখন অবলীলাক্রমে এই সভায় অপরিচিতের মাঝে নিজের একটি বিশিষ্ট আসন প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিলাম, তখন তিনি অধিকতর আত্মীয়তা দেখালেন।

রাত এগারোটায় শুতে গেলাম—কিন্তু দু' কাপ কড়া কফি খেয়েছিলাম, তাই আর ঘুম এল না—রাত প্রায় সাড়ে তিনটায় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সারলাম।

তারপর এদের একজন তরুণ সভ্য এলেন—আমাকে বাল্টিমোর ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসবেন। আমেরিকায় রেলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার জন্য বাসের টিকিট থাকলেও গাড়ীতে এলাম।

যুবকটি নম্র এবং ভদ্র। পথে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। যুবকটি প্রশ্ন করলেন, আমেরিকাকে কেমন লাগল ?

বললাম, সব দেশের চেয়ে ভাল লেগেছে, আমেরিকায় দেখেছি মানুষের সত্যকার সাম্য। এই মানবতা-বোধ এখানে আনে সহজ স্বাভাবিকতা, কোথাও কোন সঙ্কোচ থাকেনা।

হাঁ, আমরা খুব দিলখোলা—

এদেশে নানা মানুষের আতিথ্য পেয়েছি—আমাদের কবি এক কবিতায় বলেছিলেন: দূর নিকট বন্ধু হয়, আর পর হয় ভাই—এটা আমেরিকায় না এলে এমন ভাবে উপলব্ধি হ'ত না—

আমাদের বিশ্বমৈত্রীর কাজে কি ভারতবর্ষের সহায়তা পাব ?

নিশ্চয় পাবেন—সব দেশের আগে আমাদের দেশের ঋষিরা বিশ্বনরের জন্য কল্পনা করেছিলেন 'বৈশ্বানরের', আর বলেছিলেন, 'সকল মানুষের হোক এক মন্ত্র—এক সমিতি—'

ষ্টেশন এসে পড়ল। টিকিট কিনে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে যুবক বিদায় নিলেন।

গাড়ীতে খুব ভিড় নয়—আমি ঝিমোতে ঝিমোতে চললাম, নিউ জার্সিতে এসে ঘুম ভাঙল, ভোরের আলো তখন চারিদিকে তার কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে—দেখলাম বিরাট কলকারখানার আয়োজন—উদাস প্রান্তর—আর রাস্তায় মোটরের অবিরাম গতি।

গাড়ী এসে থামল। বাস-কোম্পানিতে গিয়ে টিকিটের দাম ফেরত চাইলাম—কোনও কথা না বলে টিকিটটা নিয়ে নিল—বলল, পাঁচদিন পরে আসবেন—কারণ ওয়াশিংটনে চিঠি দিতে হবে।

তারপর দেশের চিঠির আশায় ছুটলাম আমেরিকান এক্সপ্রেসে। পেলাম চিঠি—একান্ত প্রয়োজনের ঘরোয়া কথা। বাসায় এলাম—তখন সন্ধ্যা। যে বাড়ীতে ছিলাম তার গৃহিণী খেতে বললেন না—কাজেই খাওয়া হ'ল না। বড়ছেলের অসুখের সংবাদে মন দুশ্চিন্তায় ভরে উঠল। কিন্তু দুশ্চিন্তা করলে তো বিপদ যায় না, এখানে শরণাগতিই পথ—তাই তাঁরই চরণে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম।

রাত্রে গৃহকর্তা এলেন। জিগ্যেস করলেন—কেমন কাটল ?

ভালই, তবে একটা মজা দেখলাম, কম্যুনিজম-ভীতি ভূতের মত আপনাদের চেপে বসেছে।

কেমন ?

মিসেস ব্লকের ওখানে ওদের পাঠাগারে রাশিয়ান দূতাবাস থেকে আনা কতকগুলি বই দিয়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ওরা পড়বে—সে কথা মিসেস ব্লককে বলিনি, তাই নিয়ে এক প্রলয়-কাণ্ড।

কি হয়েছিল ?

মিসেস ব্লক ভাবলেন কোনও পঞ্চমপন্থী বই-গুলি তার সর্বনাশের জন্য ওখানে রেখেছে—তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বান্ধবীকে ফোন

করলেন—তাঁর সাথে পুলিশের জানাশোনা, তিনি বললেন অত ভেবোনা, হয়তো কোনও বোর্ডার রেখেছে—খোঁজ করো—

তারপর ?

সন্ধ্যায় যখন ফিরলাম, তখন মিসেস ব্রকের প্রশ্নে অপরাধ স্বীকার করলাম, কিন্তু মিসেস ইতি-মধ্যে বইগুলি পুড়িয়ে আপনার মুক্তি সাধন করেছেন।

তারপর দুজনে খানিক হাসাহাসি করলাম। অবশেষে বললাম, 'সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্'—এটা আমাদের দেশের একটি পুরাতন নীতি।

মিষ্টার রস বললেন, আমাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু কম্যুনিজম—তাই ওটাকে আমরা আদৌ সইতে পারিনা।

বাদানুবাদ বৃথা—শুভরাত্রি জানিয়ে শুতে গেলাম।

ভক্তি

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

নামখানি ছোট তার, ছোট বুকে বাস তার নিতি,
বিরাট মহিমা তবু,—সুরে তার বিরাটের গীতি।
মাটির মূরতি সেও চিন্ময়ের রূপ ধ'রে জাগে,
অরূপের ধ্যানে তার রূপের ঝলক সদা লাগে!
চন্দনের শুভ্রতায়, ফুলের সুগন্ধি-সুষমায়,
প্রসাদী দ্রব্যের মাঝে হৃদয়ের মালা সে সাজায়।
অশ্রু হ'য়ে কভু দেয় দেখা,—
সুন্দরের মধুবাণী প্রাণের পরতে তার লেখা।

সন্ধ্যা-প্রদীপের শিখা তারে নিয়ে হয় যে উজ্জ্বল,
তুলসীর তলে;
আরতির দীপখানি তারি তো প্রাণের রঙ নিয়ে
নূতন দীপ্তিতে উঠে জ্বলে'।
পদ্মপলাশ আঁখি হৃদয়ের টানে তার
কাছে আসে,—বুক ভরে রসে,
অমৃতের স্বাদ পায় একমুঠো খুদকুঁড়া তারি তো পরশে।
সে তো এক দেবী-রূপ, দেখা দেয় শুচি-স্নিগ্ধতায়!
এত দিন এই ভক্তি লুকাইয়া ছিল বা কোথায়?

যেখানে যেমন সেখানে তেমন

শ্রীমতী শোভা দুই

'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—শ্রীশ্রীমায়ের এই শিক্ষাটি আমাদের চিরদিনের অবলম্বন। এই উপদেশকে মূল-মন্ত্র ক'রে যদি আমরা জীবন-পথে চলি, তাহলে নানা রকম ঝঞ্ঝাট আর অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজেরা শান্তিতে থাকতে পারি, আর অন্যকেও সুখী করতে পারি।

হয়তো আমরা শহরে থাকি, সেখানে বৈদ্যুতিক আলো পাখা স্নানাগার আরও অনেক কিছু জীবনধারণের সুখ-সুবিধা ভোগ করি, কিন্তু কোন কারণে যদি যেতে হয় এবং কিছুদিন থাকতে হয়—পল্লীগ্রামে তখন আমরা কি শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলব? না কাঁদতে বসব? দুটির একটিও না ক'রে মায়ের উপদেশ-মত গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলব। পল্লীর মানুষগুলিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করব, তাদের দোষ ত্রুটি অজ্ঞানতা নিয়ে ব্যঙ্গ করব না, আচার-ব্যবহারগুলি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখব, মানুষগুলিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করব, তাহলেই গ্রামে বাস করা দুর্বিষহ মনে হবে না, আমরা বেশ শান্তিতেই থাকতে পারব।

গ্রামের মানুষও যখন আসবে শহরে তাদেরও তখন 'শহুরে' হতে হবে, শহরের আদব-কায়দা চাল-চলনে তাদেরও চলতে ফিরতে হবে; শহর এবং গ্রামের জীবন-যাত্রা আকাশ-পাতাল প্রভেদ, শহরে মেয়েদের পড়া-শুনো ছাড়াও নানা রকম কাজে—বাইরে বেরুতে হয়, পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়। ঘরের কোণে বসে থাকলে চলে না, গ্রামের মানুষের অনভ্যস্ত চোখে হয়তো এসব ভালো লাগবেনা। কিন্তু ভালো না লাগলেও এ নিয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য করা কিংবা বাঁকা হাসি, বাঁকা কথা বলা চলবে না, যে দেশের যা নিয়ম, যে সমাজের যা প্রথা তা সহানুভূতি দিয়ে দেখতে হবে, হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোন গোঁড়ামি থাকলে চলবে না, যেখানে যেমন সেখানে তেমন হতে না পারলে সংসারে প্রতিপদক্ষেপে হোঁচট খেতে হবে।

সিস্টার নিবেদিতা এলেন আমাদের দেশে—আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাষা আগ্রহভরে শিখতে লাগলেন। এ দেশের সব কিছু দরদ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন। সুখে দুঃখে, ধর্মে কর্মে, নিজেকে মিশিয়ে দিলেন আমাদের মধ্যে।

ভাগ্যচক্র কখন কাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায়, কোন্ অবস্থায় ফেলে তা কেউ বলতে পারে না, ভাগ্যের ফলে ধনীর দুলালী হয় দরিদ্রের ঘরনী, পণ্ডিত স্বামীর হয় মূর্খ পত্নী, নাস্তিকের পত্নী হয় ভক্ত রমণী, শহরের তরুণী হয় পল্লীর বধূরাণী। এই ঘটনাগুলি কেউ রোধ করতে পারে না। এই নিয়ে হা-হুতাশ কিংবা কান্না-কাটি ক'রে নিজেকে এবং অন্যকে অস্থির করার কোন অর্থ হয় না। 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—শ্রীশ্রীমায়ের এই উপদেশ স্মরণ ক'রে অবস্থানুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। তা না নিতে পারলে এই সংসারে আমরা মহা অশান্তি ভোগ করব, আর অন্যকেও কষ্ট দেব।

'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—মায়ের এ কথাটি তাঁর নিজের জীবনে অতিশয় পরিস্ফুট। ওলিবুলের আকুল আগ্রহে মা ফটো তুলতে রাজি হলেন। সাহেব ফটোগ্রাফারের সামনে মা তাঁর স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা সরিয়ে রেখে ফটো তুলতে

বসেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ঘোমটা খুলে চুল আঁচল ঠিক ক'রে দেন। শুধু এ পর্যন্তই নয়, স্বামী বিবেকানন্দ শশী মহারাজকে লিখেছিলেন (মার্চ ১৮৯৮) 'শ্রীমা এখানে (কলিকাতায়) আছেন, ইওরোপিয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাইয়াছিলেন! ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'

আবার দেখা যায়—মা যখন যেখানে বাস করেছেন সেখানে সমাজ মেনে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অবর্তমানে মা তখন কামারপুকুরে অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। ঠাকুরের সন্তানদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে। সন্তানরা মাকে কলকাতায় আনবার জন্যে মহা ব্যস্ত। মা কিন্তু পল্লী-সমাজের মতামতের অপেক্ষায় রইলেন। তিনি স্বয়ং এই সময়ের কথা এইরূপ বলেছেন, "ঠাকুর চলে যাবার পর আমার যখন এখানে (কলকাতায়) আসার কথা হ'ল, তখন আমি কামারপুকুরে। ওখানকার অনেকেই বলতে লাগলো, 'ওমা সেই সব অল্প-বয়েসের ছেলে, তাদের মধ্যে গিয়ে কি থাকবে?' আমি তো মনে জানি, এখানেই থাকব। তবু সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয় ব'লে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কেউ কেউ আবার বলতে লাগল, 'তা যাবে বৈকি, তারা সব শিষ্য।' পরে ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী—যিনি ভারী ধার্মিক আর বুদ্ধিমতী ব'লে সকলে তাঁর কথা মানে,তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'সে কি গো, তুমি অবিশ্যি যাবে। তারা শিষ্য, তোমার ছেলের মতো। একি একটা কথা, যাবে বৈকি।' তাই শুনে তখন অনেকে যাবার মত দিল, তখন এলুম।" মা স্বচ্ছন্দে সমাজের মত না নিয়েই চলে আসতে পারতেন কিন্তু 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' বলেই তিনি সমাজের মত উপেক্ষা ক'রে চলে এলেন না।

রাধু তখন সন্তানসম্ভবা, শরীর খুব খারাপ, কোন শব্দ সহ্য হয় না। আমাদের মা সকলের সঙ্গে জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করলেন। অবশ্য সে বারে শ্রীমতী রাধুর ইচ্ছায় তিনি কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমেই বাস করেছিলেন, বিষ্ণুপুর ছেড়ে আট মাইল দূরে জয়পুরে এসে এক চটিতে রান্নার বন্দোবস্ত হ'ল। রান্না প্রায় শেষ হয়েছে, ফেন গালবার জন্যে পাঁচসের চালের হাঁড়িটি উনান থেকে নামাবার সময় হঠাৎ হাঁড়িটি ভেঙে ভাত ও ফেন চারদিকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো, আবার রান্না করতে গেলে খুব দেরি হয়ে যাবে। এই ভেবে সকলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমাদের মা কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি খড়ের একটি নুড়ো দিয়ে ধীরে ধীরে ফেন সরিয়ে ভাতগুলিকে উপর উপর টেনে এক সঙ্গে করলেন। তারপর হাত ধুয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিখানি বাক্স থেকে বার ক'রে একধারে বসালেন, এবং একটি শালের কাঠি দিয়ে কতকগুলি ভাত একটা শালপাতায় তুললেন। ভাতের ধারে ডাল-তবকারি সাজিয়ে রেখে যুক্ত-করে ঠাকুরকে বললেন, 'আজ এই রকমই মেপেছ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও।' মায়ের কাণ্ড দেখে সকলে হেসে উঠলে তিনি বললেন, 'যখন যেমন তখন তেমন তো করতেই হবে, নাও তোমরা সব এখন বসে খাও দেখি।'

'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—মায়ের এই অমূল্য উপদেশটি মনে রেখে যদি এই ভাবে চলতে চেষ্টা করি, তাহলে এ সংসারে আমাদের যখন যে অবস্থাই আসুক না কেন আমরা ঠিক মানিয়ে নিতে পারব। কোন অবস্থাতেই আমরা মুষড়ে পড়ব না। কোন ভাগ্য-বিপর্যয়েই আমরা দিশেহারা হব না। ভালো-মন্দ সকল অবস্থাতেই আমাদের মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, জীবন-যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারব।

বিশিষ্টাদ্বৈতমত

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এখন একটি প্রবন্ধ লিখছি, লিখছি চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপরে, লিখছি লেখনীর সাহায্যে আমার মনের মধ্যে যে বিচারপুঞ্জ প্রকাশের পথ খুঁজছে, তাদেরই প্রকাশিত করছি, আমার হস্তের—আমার অঙ্গুলির—আমার লেখনীর সাহায্যে। আমার প্রবন্ধ-লেখা নামক ক্রিয়া, যে ক্রিয়া বর্তমানে ঘটছে এই তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই ক্রিয়াটি এখন ঘটছে, তাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ আমি সন্দেহ করছি না। অবশ্য স্বপ্ন অবস্থাতেও এরকম বোধ হয়। আমি স্বপ্ন দেখি যে আমি লিখছি, মনে করি যে লেখন-ক্রিয়ার আশ্রয় আমি। এই বোধ যে ভ্রান্ত, এই দেখা যে ভুল দেখা, এই মনে করা যে অযথার্থ এ আমি তখন বুঝি না, কোন সন্দেহ পর্যন্ত করি না। বুঝি, নিঃসন্দেহে বুঝি, স্বপ্ন ভাঙার পর জেগে উঠে।

বর্তমান ক্ষণে ঘটছে যে লেখন-ক্রিয়া তার সম্পর্কেও কি এই মন্তব্য করব? অন্ততঃ স্বাপ্ন বোধের নজীরে একে সন্দেহ করব? না। কারণ, আমি যে বর্তমানে স্বপ্ন দেখছি না, তা আমি জানি। আমি কেবল স্বপ্নই দেখি না, আমি যে স্বপ্ন দেখি, তাও বুঝি, এবং স্বপ্ন-কালে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে টের পাই না, এমনকি এ যে জাগরণ-অবস্থা নয়, এমন সন্দেহও করি না, স্বাপ্ন বোধ ও জাগ্রত বোধ বলে দুটি ভিন্ন জাতীয় বোধ আছে, এ খেয়ালও আমার তখন থাকে না। এখন কিন্তু এই খেয়াল আছে, এ অবস্থা স্বপ্ন-অবস্থা কি না, এমন বিলাসী সংশয়ও আমি করতে পারছি, বেশ বুঝছি, দুনিয়া আমায় না বুঝিয়ে ছাড়ছে না, যে আমি এখন জেগে আছি। এই জাগ্রত বোধকে স্বপ্নতুল্য বলব? না, স্বপ্নের পর জাগরণ, জাগরণের পর কি তা তো জানি না। উপরে যে লেখন-ক্রিয়াটির কথা বলেছি—তা আছে, দার্শনিকের ভাষায় এটি একটি সৎ-পদার্থ।

এই ক্রিয়াটি যদি একটি সৎ পদার্থ হয়, তাহলে এই ক্রিয়ার কর্তা, আমিও কি একটি সৎ পদার্থ নই? আমি যদি মিথ্যা হতাম, অলীক হতাম, অবিদ্যমান হতাম, অ-সৎ হতাম, তাহলে কি এই ক্রিয়াটি ঘটতে পারত? এ্যালিস যে আজব দেশে গিয়েছিল—সে দেশে বিড়াল না থাকলেও মিঁয়াও-ধ্বনি শোনা যায়, আর আজব দেশেই তা সম্ভব। এই ক্রিয়াটি তো আর কোন আজব ক্রিয়া নয়, আর কোন আজব দেশেও ঘটছে না। সুতরাং ক্রিয়া যেহেতু আছে, তার কর্তা আমিও আছি, এ যেহেতু সৎ আমিও সৎ, এ যেহেতু বিদ্যমান আমিও বিদ্যমান। আবার আমি বিদ্যমান, অতএব আমার দেহও বিদ্যমান। আমি আমার দেহই কি না, আমার দেহ-অতিরিক্ত কোন কিছুই প্রকৃত আমি কিনা, এ প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন।

যে আমি লেখে, পড়ে, খায়, ঘুমায়, হাসে, কাঁদে, ভালবাসে, ঘৃণা করে, ঝগড়া করে, এবং আরও কত কিছু করে—সেই আমি যে দেহী তাতে সন্দেহ নাই। এ যখনই লেখে তখনই তার হাতকে চলতে হয়, আঙুলকে কলম ধরতে হয়। সুতরাং আমি যখন সৎ, তখন আমার দেহ, আমার হাত, আমার আঙুল—এরাও সৎ। আর কালি, কলম, কাগজ, টেবিল, চেয়ার, এই ঘরটি, এবং একে ঘিরে রয়েছে যে বিশাল

জগৎ—সেই বিশাল জগৎও অবশ্যই সৎ। এই আমার সহজ অনুভব। এই অনুভবের উপর নির্ভর করেই আমি কাজকর্ম ক'রে থাকি, কথা-বার্তা বলে থাকি,—আমার সামাজিক ব্যবহার, শব্দ ব্যবহার সবই এই অনুভবকে অবলম্বন ক'রে হয়। দর্শনের ভাষায় যখন আমি আমার এই অনুভবকে প্রকাশ করি তখন বলি, জীব ও জগৎ সৎ। আমি আছি, আমার মতন চেতন তুমি আছ এবং আরও পাঁচজন আছে। আমরাই জীব, আমরা সৎ। আবার টেবিল সৎ, চেয়ার সৎ, ঘট পট প্রভৃতি অচেতন দ্রব্য, অচিৎ পদার্থ —এরাও সৎ। এরাই জগৎ, জগৎ সৎ। জীব ও জগৎ সৎ—এই আমাদের সহজ অনুভব। মহাবীর কর্ণ যেমন অক্ষয় কবচ সহ জন্মেছিলেন, আমরাও তেমনি যেন এই বোধ সহই জন্মাই, অথবা আমাদের 'ভব' আর এই বোধের 'ভব' একে অপরের 'অনু'—পশ্চাৎ, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহ। জীব ও জগৎ সৎ—এই আমাদের সহজ, লৌকিক ও স্বাভাবিক অনুভব।

এখন দার্শনিকরা সহজও নন, লৌকিকও নন, স্বাভাবিকও নন। তাই তাঁরা একথা মানতে চান না, অন্ততঃ বিচার না ক'রে মানতে চান না যে জীব ও জগৎ সৎ। বস্তুতঃ বিচারই দর্শনের প্রাণ, এবং দার্শনিকরা বিচার না ক'রে কিছুই বলেন না। আবার এই বিচার জিনিষটিই এমনি যে একবার শুরু হ'লে আর শেষ হতে চায় না, এবং অনেক সময়ই দেখা যায় যে রাক্ষসীদের দেশে যেমন ফল বিশেষের দৈর্ঘ্য বার হাত হলেও তার বীজের দৈর্ঘ্য তের হাত হতে পারে, তেমনি বার জন দার্শনিক বিচার করতে বসলে মতও হয়ে যায় তের রকম। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে আমাদের সহজ অনুভবকে বিনা বিচারে দার্শনিকরা চালু হতে দেবেন না, এবং এ নিয়ে বিচার করতে বসে এক সিদ্ধান্তেও পৌঁছাবেন না। আসল কথা জীব ও জগতের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকরা বহু বিচার করেছেন, এবং বহু সিদ্ধান্তে—পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য, এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্য হতে জগৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি আমরা বেছে নিতে পারি এবং তাদের চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন:

(১) জগৎ সৎ, (স্বপক্ষ বা নিজ মত)
(২) জগৎ অসৎ, (শূন্যবাদ)
(৩) জগৎ সৎও নয়, অসৎও নয়; (মায়াবাদ)
(৪) জগৎ সৎও বটে, অসৎও বটে। (জৈনমত)

যে বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের কথা বলব বলে মনে করছি, সেই মতে জগৎ সৎ, জীবও সৎ। উপনিষদ্ বা বেদান্ত-বাক্যরূপ কুসুম-গুচ্ছকে গ্রন্থনের জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেছিলেন সেই সূত্রই এই মতের মূলে। এ মত বেদান্ত-মতই। তবে আরও অনেক বেদান্ত-প্রস্থান আছে। এর বহু কারণের মধ্যে একটি কারণ ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি, ভারতীয় দর্শনের সকল সূত্র-গ্রন্থের সূত্রের মত অল্পাক্ষর ও বিশ্বতোমুখ। তাই ভিন্ন ভিন্ন আচার্য এদের ভিন্ন অর্থে নিতে পারেন এবং নিয়েছেনও। ব্রহ্মসূত্রের তথা উপনিষদের তাৎপর্য-নির্ণয় কেবল অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন অনুভব। এই অনুভবের বিভিন্ন স্তর আছে, এবং যে আচার্য যে স্তরে অবস্থিত, যে অনুভূতি-কেন্দ্র তাঁর নিজস্ব, সেই অনুভবকেই তিনি বাক্যবদ্ধ-রূপে দেখতে পান বেদান্ত-বাক্যে। এরই অনিবার্য ফল বিভিন্ন বেদান্ত-প্রস্থান। যাই হ'ক, বিশিষ্টাদ্বৈত-মত বেদান্ত-মতই। এ মতের প্রধান আচার্য রামানুজ, তবে তিনি প্রথম আচার্য নন। বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রবিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দী, যমুনাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ

এই মত প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য তাঁর পূর্বেই যত্ন করেছিলেন। আচার্য রামানুজ তাঁর গ্রন্থে এই সব পূর্বসূরীদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর অলৌকিক প্রতিভার আলোকে এই প্রস্থানের তত্ত্বগুলিকে এমনই উদ্ভাসিত করেছেন যে পরবর্তী যুগে এক ঐতিহাসিক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই তাঁর পূর্বাচার্যগণের রচনা পাঠের প্রয়োজন হতে পারে।

* * *

বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে জীব ও জগৎ সৎ-পদার্থ। এই মত সহজ অনুভব-সিদ্ধ। বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যরাও একথা স্বীকার করেন। তাই তাঁরা অশেষ যত্ন করেন বিরোধী মতগুলিকে খণ্ডন ক'রে এই মতকে বিচার-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিভাবে তাঁরা এই খণ্ডন-কার্যটি করেন তা আমরা এখন দেখতে পারি।

দ্বিতীয় পক্ষ বা 'শূন্যবাদ'-খণ্ডন

উপরে আমরা বলেছি যে 'জগৎ অসৎ অর্থাৎ অলীক'—এই একটি পক্ষ আছে। এই দ্বিতীয় পক্ষটিকে 'শূন্যবাদ' বলা হয়। ভারতীয় দর্শনে শূন্যবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এর সমর্থক ছিলেন মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার্যগণ। এই মতে শূন্যতাই তত্ত্ব; তাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না, সৎ এবং অসৎ উভয়ই—তাও বলা যায় না, সৎও নয়, অসৎও নয়—তাও বলা যায় না। তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে বাক্ ও মনের গোচর নয়, প্রপঞ্চের দ্বারা প্রপঞ্চিত নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ এই শূন্যবাদ মতকে সহজেই খণ্ডন করেন। তাঁরা দেখান—যা অলীক অসৎ, তা কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। আকাশ-কুসুমের কোন প্রতীতি কারও হয় না। আকাশ-কুসুম প্রত্যক্ষের বিষয় নয়; অনুমিতির বিষয়ও নয়, কারণ অনুমান হতে হ'লে উপযুক্ত হেতু থাকা দরকার। সংক্ষেপে—জগৎ জ্ঞানের বিষয় হয়, আমাদের অনুভবে ভাসমান হয়, প্রতীত হয়। জগৎকে আমরা অলীক বলতে পারি না, জীবকেও পারি না। জগৎ অসৎ, অথবা জীবজগৎ অসৎ—এই পক্ষ অসিদ্ধ।

তৃতীয় পক্ষ বা 'মায়াবাদ'-খণ্ডন

দ্বিতীয় পক্ষটি যে অসিদ্ধ তা আমরা দেখলাম। এখন তৃতীয় পক্ষটির মূল্য নির্ণয় করা যাক। এই পক্ষটিকে 'মায়াবাদ' বলা হয়, মায়াবাদীদের অভিপ্রায় নিম্নরূপ: এই জগৎ যখন প্রতীত হয়, তখন একে অলীক বলা যায় না। কিন্তু এ যখন বাধের অযোগ্য নয় (অর্থাৎ বাধিত হয়) তখন একে সৎও বলা যায় না। অর্থাৎ যা নিত্য—তিন কালেই অবাধিত, তাকেই আমরা সৎ বলতে পারি, যা তা নয় তাকে সৎ বলতে পারি না। যেমন রজ্জুতে যে সর্প প্রতীত হয়, তাকে আমরা সৎ পদার্থ বলতে পারি না। যখনই রজ্জুবুদ্ধি হয়, তখনই সর্পবুদ্ধি বাধিত হয়। প্রতীত সর্প ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ সর্পবুদ্ধি থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ রজ্জুবুদ্ধি হয় না। এই সর্পসত্তা অবাধিত সত্তা নয়। এই সর্পকে আমরা সৎ বলতে পারি না। রজ্জুসর্প সৎ নয়, শুক্তিরজতও সৎ নয়। আমাদের ব্যবহারিক জগতের সত্তাও এদেরই মত। যদিও রজ্জুসর্প প্রভৃতির সত্তা প্রাতিভাসিক, 'মিথ্যা' শব্দের লৌকিক অর্থে মিথ্যা, এবং ব্যবহারিক জগতের সত্তা ব্যবহারিক, 'মিথ্যা' শব্দের পারিভাষিক অর্থে মিথ্যা * তবুও এদের মধ্যে এই সাদৃশ্য আছে যে এদের কারও সত্তা অবাধিত নয়। রজ্জুসর্প বাধিত হয়, ব্যবহারিক সর্পও বাধিত হয়। মরীচিবারি বাধিত হয়, গাঙ্গ্য বারিও বাধিত হয়। তবে রজ্জুসর্প যে বাধিত হয়, তা আমরা সকলেই বুঝি; কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ যে বাধিত হতে পারে, তা আমরা অনেকেই

* লেখকের 'ন্যায়তত্ত্ব-পরিক্রমা'র ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়ে অনতিবিস্তারে ইহা আলোচিত।

বুঝি না। এর প্রধান কারণ এই যে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হওয়ার পর যখন রজ্জুর বুদ্ধি—অধিষ্ঠানের বুদ্ধি হয়, তখন সর্পবুদ্ধি বাতিল হয়ে যায়, বাধিত হয়। অধিষ্ঠান-বুদ্ধি বাধে অপেক্ষিত। রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত প্রভৃতি স্থলে আমাদের সকলেরই এই বুদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ যে অধিষ্ঠানো অশ্রিত—অধ্যস্ত, সেই অধিষ্ঠান-বুদ্ধি—ব্রহ্মবুদ্ধি—আত্মবুদ্ধি আমাদের অনেকেরই হয় না, তাই আমরা ব্যবহারিক জগতের সত্তাকে বাধিত সত্তা মনে করি না। কিন্তু এর সত্তা মোটেই অবাধিত সত্তা নয়। ব্রহ্মবুদ্ধি হ'লে আর জগৎ-বুদ্ধি থাকে না। শ্রুতিতেও তাই নানাত্বপূর্ণ, ভেদপ্লাবিত, মৃত্যুময় এই সংসার বা ব্যবহারিক জগৎ যে অবাধিত সত্তায় সত্তাবান্ নয়, একথা বারবার বলে। কিছু মনন করলেও টের পাওয়া যায় যে নানাত্ব, ভেদ, অস্থিরতা প্রভৃতি সৎ (নিত্য সত্য) হতে পারে না, ঐগুলি সৎ-এর ধর্ম হতে পারে না। অস্থিরতার কথাটিই ধরা যাক। ব্যবহারিক জগতে সব পদার্থই অস্থির, একেবারে ক্ষণিক না হলেও পরিবর্তনশীল, উৎপত্তি-বিনাশশীল, এইরূপ পদার্থ সৎ-পদার্থ হতে পারে না। এরা বিরোধ-বিদীর্ণ।

ক যখন খ-এ রূপান্তরিত হয়, তখন বুঝাতে হবে যে ক এর ক-সত্তা নিত্য সত্তা নয় ; এবং অ-ক সত্তাকে বাধা দিতেও অসমর্থ। ক-এর জীবনে এমন ক্ষণ নিশ্চয়ই আসে যে ক্ষণে কত্ব ও অ-কত্ব মিশ্রিত হয়ে যায় যে ক্ষণে 'ক'কে না বলা যায় 'ক', না বলা যায় 'অ-ক'। এই ক্ষণটি, এই গোধূলি ক্ষণটি, এই আলো এবং আঁধারের সংগ্রামের ক্ষণটি যে বিরোধপূর্ণ, তা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে বিরোধ এই ক্ষণে পরিস্ফুট হচ্ছে, প্রচ্ছন্ন থাকছে না, সেই বিরোধের উৎপত্তি এই ক্ষণেই নয়। একক্ষণেই বিরোধ উৎপন্ন হতে ও স্ফুটাবস্থা লাভ করতে পারে না। অনেকক্ষণ ধরে, অনেকদিন ধরে এই বিরোধ উপস্থিত আছে, গোপনে গোপনে প্রচ্ছন্নভাবে নিজেকে প্রবল, অপ্রতিহত ক'রে তুলেছে। ক-এর উৎপত্তিক্ষণই যে এরও উৎপত্তিক্ষণ তাও বলা যায়। যে ক্ষণে 'ক' উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষণেই 'অ-ক'ও উপস্থিত হয়েছে এবং ক ও অ-ক এর মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছে। ক কত্ব-ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে করতেই পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তন মানেই বিরোধ। যাই পরিবর্তনশীল তাই বিরোধ বিদীর্ণ। তার সত্তা অবাধিত সত্তা নয়।

ব্যবহারিক জগৎ অস্থির, সুতরাং অবাধিত সত্তায় সত্তাবান্ নয়। একে আমরা সৎ পদার্থ বলতে পারি না। জগৎকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জগৎ অনির্বচনীয়—সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ, জ্ঞান-বিরোধী, অনির্বচনীয়, অজ্ঞানের পরিণাম। এই অজ্ঞানকে মায়াও বলা হয়। এ জগৎ যে মায়ার পরিণাম, তাও বলা যেতে পারে।

এই মায়াবাদও বিশিষ্টাদ্বৈতচার্যগণের সম্মত নয়। তাঁরা মায়াবাদ খণ্ডনের জন্য অশেষ যত্ন ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ মায়াবাদ বা অদ্বৈতমতই বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রধান পূর্বপক্ষ। তাই এখন আমাদের সংক্ষেপে দেখা প্রয়োজন কি ভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণ মায়াবাদ খণ্ডন ক'রে থাকেন।

মায়াবাদের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণের প্রধান আপত্তি এই যে, যে মায়া বা অজ্ঞানের কথা মায়াবাদীরা বলেন তার কোন প্রমাণ নাই। অজ্ঞানকে মায়াবাদীরা ব্যবহারিক জগতের উপাদান কারণ বলেন। সেইজন্য অজ্ঞানকে তাঁরা অভাব পদার্থ, বা জ্ঞানাভাব বলতে পারেন না। অন্য ভাবে বলা যায় যে, কাপড়, টেবিল, ঘর, বাড়ী, এদের উপাদান কারণ সুতা, কাঠ, ইট, প্রভৃতি—এরা সবাই ভাব পদার্থ, কেউই অভাব পদার্থ নয়—(নাস্তি বা নাই-বুদ্ধির বিষয় নয়)। শুধু তাই নয়, অভাব যে কিভাবে উপাদান কারণ হবে, তাও বোঝা যায় না। মায়াবাদে অজ্ঞানই জগতের উপাদান কারণ। সুতরাং অজ্ঞান অবশ্যই অভাব পদার্থ নয়,

ভাব-পদার্থ। কিন্তু অজ্ঞানকে কি আমরা ভাব-পদার্থ বলতে পারি? অজ্ঞানকে ভাব-পদার্থ বলার প্রমাণ কি? মায়াবাদীরাও এই প্রশ্নের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই এস্থলে প্রধান প্রমাণ। যেমন 'আমি অজ্ঞ' *এইরূপ অনুভব আমাদের হয়। এই অনুভবের, প্রত্যক্ষ বোধের বিষয় আমার অজ্ঞতা ও অজ্ঞান। এই অজ্ঞতা বা অজ্ঞান কি জ্ঞানাভাব, অথবা কোন ভাব পদার্থ? মায়াবাদিগণের মতে এ একটি ভাব পদার্থই।

অভাব প্রত্যক্ষ কয়েকটি সর্ত পালন করেই হতে পারে। আমি যখন দেখি, ভূতলে ঘট নেই, অর্থাৎ ভূতলে ঘটাভাব প্রত্যক্ষ করি, তখন ভূতল দেখি, ঘট কাকে বলে তা জানি, এবং ভূতলে ঘট দেখি না। তেমনি আত্মায় জ্ঞানাভাব প্রত্যক্ষ করতে হলে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, এবং আত্মায় জ্ঞানের প্রত্যক্ষ করলে চলবে না। এখন আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং আত্ম-বুদ্ধি যেই হবে, জ্ঞান-বুদ্ধিও হবে। জ্ঞানময় আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। আমি অজ্ঞ, এই বোধ জ্ঞানাভাবের বোধ নয়, ভাবরূপ অজ্ঞানের বোধ। এই হ'ল মায়াবাদিগণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণের মতে এ প্রমাণ নয়, 'গগন রোমন্থন'। কারণ জ্ঞানময় আত্মাতে যদি জ্ঞানাভাবের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে না পারে, তাহলে জ্ঞান-বিরোধী ভাবরূপ অজ্ঞানের জ্ঞানই বা হবে কেমন ক'রে? আমি অজ্ঞ এই অনুভূতির অজ্ঞানতাকে জ্ঞানাভাব না বলে, ভাবরূপ অজ্ঞান বলায় কোন সুবিধা হয় না। বস্তুতঃ এই বোধের উপপত্তির জন্ত বিশ্লেষণ করতে হবে 'অজ্ঞতা'র নয়, 'আমি'র; বুঝতে হবে যে 'আমি'র এক প্রকার বোধ অস্ফুট বোধ-কালে অজ্ঞানের, অর্থাৎ জ্ঞানাভাবেরই হ'ক, অথবা ভাবরূপ অজ্ঞানেরই হ'ক, বোধ হতে পারে, তবে স্ফুটবোধকালে হতে পারে না। তাই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপন্যাস মায়াবাদীরা ক'রে থাকেন, তা বিফল।

অনুমান প্রমাণটিরও মর্যাদা ভিন্ন নয়। মায়াবাদীরা যে অনুমানটি উপন্যস্ত করেন—জটিলতা বর্জন ক'রে তাকে এই ভাবে প্রকাশ করা যায়। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ-প্রভা ভাবরূপ অন্ধকার ধ্বংস করে এবং অপ্রকাশিত অর্থ প্রকাশ করে। এ হতে এই নিয়ম প্রণয়ন করা যায় যে অপ্রকাশিত অর্থ-প্রকাশক পদার্থমাত্রই ভাবরূপ বিষয়-আবরক পদার্থকে বিনষ্ট করেই স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে। যথার্থ জ্ঞান অপ্রকাশিত অর্থ-প্রকাশক, সুতরাং স্বীয় বিষয়াবরক কোন ভাব-পদার্থ অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনষ্ট করেই উৎপন্ন হয়, ভাবরূপ অজ্ঞান অনুমানসিদ্ধ। এই হ'ল মায়াবাদীদের অনুমানটি। বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণ এই অনুমানটিকে নির্দোষ অনুমান বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন, যে নিয়মটিকে অবলম্বন ক'রে এই অনুমান উপন্যস্ত হয়েছে—সেই নিয়ম অনুযায়ী এই অনুমানের ফলরূপ অনুমিতিও অপ্রকাশক অর্থপ্রকাশক যথার্থ জ্ঞান বলে নিজ বিষয়ের অর্থাৎ ভাবরূপ অজ্ঞানের আবরক কোন দ্বিতীয় ভাবরূপ অজ্ঞানকে বিনষ্ট করেই উৎপন্ন হয়েছে, এই কথা বলতে হয়। আবার এই কথাটি আর একটি অনুমান বলে তৃতীয় ভাবরূপ অজ্ঞান মানতে হয়, চতুর্থ, পঞ্চমও মানতে হয়। এইভাবে

* ন্যায়তত্ত্ব-পরিক্রমা—১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়—বিশদ আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য। [লেখকের বক্তব্য এ নয় যে মায়াবাদীরা ছয়টা প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রধান বলে গণ্য করেন, তবে সাধারণত জাগতিক বস্তু বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মূল্যমান বেশী, অতীন্দ্রিয় (ব্রহ্ম বস্তু) বিষয়ে শ্রুতিই চরম প্রমাণ। উঃ সঃ]

অনবস্থা হয়। উপরন্তু এই অনুমানের দৃষ্টান্তটি সুদৃষ্টান্ত নয়। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ-প্রভাকে আমরা অর্থ-প্রকাশক বলতে পারি না, অন্ততঃ জ্ঞানকে যে অর্থে বলি, সে অর্থে পারি না। সুতরাং অনুমানের সাহায্যেও অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রমাণ করা যায় না।

শ্রুতির সাহায্যে যায় কি? মায়াবাদিগণ মনে করেন, যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণ কিন্তু অন্য মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, শ্রুতিতে মায়ার উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু এ মায়া অদ্বৈতাচার্যগণের মায়া নয়। শ্রুতিতে 'মায়া' শব্দের দ্বারা প্রকৃতিকে অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিচিত্র অর্থ নির্মাণকারী শক্তিকে বুঝায়, অনির্বচনীয়, না-সৎ না-অসৎ ভাবরূপ অজ্ঞান বুঝায় না। প্রকৃত কথা এই যে মায়া বা ভাবরূপ অজ্ঞান অঙ্গীকার করা,আর নির্গুণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করা—একই কথা। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন প্রমাণই নাই। সকল প্রমাণ সবিশেষ পদার্থ প্রমাণেই সক্ষম। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে যে প্রত্যক্ষ অনেক দর্শনে স্বীকৃত হয়, তার সাহায্যেও নির্বিশেষ বস্তুর সাধন সম্ভব নয়। কারণ নির্বিকল্পক জ্ঞানও নিষ্প্রকারক জ্ঞান নয়। অর্থাৎ আমি যখন কোন ঘট দেখি, তখন ইহা ঘট—এই আকারের একটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার হয়। ন্যায়মত-অবলম্বনে বিশ্লেষণ করলে এই জ্ঞানে বিষয় হয় 'ইদং', 'ঘটত্ব' এবং সমবায় সম্বন্ধ অথবা এই জ্ঞানটি সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্ববান্ ইদং—এই জ্ঞান। এই জ্ঞানে ঘটত্বটি বিধেয়। এই জ্ঞানটিকে আমরা ঘটত্ব-প্রকারক জ্ঞান বলি। এইরূপ ইহা পট, এই বাক্যে যে জ্ঞান আকার লাভ করে, সেই জ্ঞানটি পটত্ব-প্রকারক জ্ঞান। ভাষায় যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, যে জ্ঞান বাক্যে আকার লাভ করে, সেই জ্ঞানই সপ্রকারক, বা প্রকার-যুক্ত জ্ঞান। ন্যায় প্রভৃতি দর্শনে—সপ্রকারক, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের (যেমন ইহা ঘট—এই আকারের প্রত্যক্ষের) পূর্বগামীরূপে, এই জ্ঞানের বিশেষণ অর্থাৎ প্রকাররূপে ভাসমান অর্থের (ঘটত্বের) জ্ঞান-রূপে এক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়। এই প্রত্যক্ষ নাম প্রভৃতি যোজনা-রহিত, এবং প্রকারতা-বর্জিত। অদ্বৈত বেদান্তেও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকৃত। এই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার করলে নির্বিশেষ বস্তু যে কোন জ্ঞানেরই বিষয় হয় না, জ্ঞানমাত্রই সপ্রকারক বলে অর্থ, প্রমাণসিদ্ধ অর্থ-মাত্রই সবিশেষ এই কথা আর খাটে না। তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এইরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অর্থ নিষ্প্রকারক প্রত্যক্ষ নয়, একজাতীয় পদার্থের প্রথম 'পিণ্ডগ্রহণ'। মনে করা যাক আমি পূর্বে কোন ঘট দেখি নাই। এই আমি যখন প্রথম ঘট দেখি, এবং বুঝি এটি একটি ঘট, তখন আমার যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞানে প্রকাররূপে ঘটত্ব উপস্থিত থাকে, তবে স্বরূপতঃ থাকে, জাতিরূপে থাকে না। এই জ্ঞানে ঘটত্ব বিষয় হয়, কিন্তু এই-ঘটত্ব যে অন্য অন্য ঘটব্যক্তি[ঘটরূপে প্রকাশিত বস্তু]তেও উপস্থিত থাকে, তা তখন জানা হয় না। জাতিরূপে ঘটত্ব এই জ্ঞানে প্রকার হয় না। নিষ্প্রকারক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই। নির্বিশেষ বস্তুর সাধক কোন প্রমাণ নাই। শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয় তখন বোঝায় যে প্রাকৃত হেয় গুণের তিনি আশ্রয় নন। তিনি যে কল্যাণগুণগণাকর, একথা কোথাও অস্বীকার করা হয় না, বরং বারবার তাই বলা হয়। শ্রুতি মায়ার কথাও বলেন না, নির্গুণ ব্রহ্মের কথাও বলেন না। শ্রুতির সাহায্যে যে আমরা মায়া অথবা ভাবরূপ অজ্ঞান সাধন করব, তা হবে না।

মায়াবাদী-কল্পিত অজ্ঞান যে অমূলক কল্পনা

মাত্র তা একটু বিবেচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। মায়াবাদীরা অজ্ঞানকে জ্ঞানে আশ্রিত বলে থাকেন। কিন্তু জ্ঞান কি ক'রে অজ্ঞানের আশ্রয় হবে? শুক্তিতে রজতজ্ঞানের স্থলে অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান নয়, জ্ঞাতা। একথা সত্য যে মায়াবাদীরা জ্ঞাতাকে জ্ঞানেই পর্যবসিত করেন। কিন্তু এই পর্যবসান অনুভব-সিদ্ধ নয়। জ্ঞান যে জ্ঞাতার ধর্ম, এই কথাই প্রামাণিক। বস্তুতঃ মণি, দ্যুমণি প্রভৃতি তেজোদ্রব্য যেমন প্রভাময় ও প্রভাবান্, জীবও তেমনি জ্ঞানময় এবং জ্ঞানবান্। শ্রুতিতেও জীবকে শ্রোতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং যে অজ্ঞান জ্ঞানাশ্রিত, জ্ঞাতায় আশ্রিত নয়, সেই অজ্ঞান অমূলক কল্পনামাত্র।

উপরন্তু মায়াবাদে সপ্তবিধ অনুপপত্তি স্বরূপ অসংলগ্নতা রয়েছে। যেমনঃ (১) **আশ্রয়-অনুপপত্তি**। অজ্ঞানের আশ্রয় জীবও হতে পারে না, আবার ব্রহ্মও হতে পারে না। জীব অবিদ্যার কার্য। আগে অবিদ্যা, পরে জীব। জীবের পক্ষে অবিদ্যার আশ্রয় হওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ; অজ্ঞান সেখানে আশ্রিত হতে পারে না। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মে আশ্রিত হতে হলে, অজ্ঞানকৃত সম্বন্ধেই হতে হবে। সুতরাং পূর্ব হতেই অজ্ঞানকে থাকতে হবে। অজ্ঞানের আশ্রয় যে কি, তা বুঝা যায় না। আর নিরাশ্রয় হলে হয় অলীক, অথবা ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী, অলীক হ'লে মায়াবাদ-ভঙ্গ, আর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লে অদ্বৈত-ভঙ্গ। (২) **তিরোধান-অনুপপত্তি**। মায়াবাদে অজ্ঞান আবরক ও বিক্ষেপক। আবরক-রূপে অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ। তার আবরণ, সুতরাং তিরোধান, সুতরাং সংসারের উৎপত্তি যে কিভাবে হয়—তা বুঝা যায় না। (৩) **অনির্বচনীয় অনুপপত্তি**। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়। কিন্তু এর অর্থ কি এই নয় যে মায়া একটি কথার কথামাত্র? অন্য অর্থ যে কি—তা বুঝা যায় না। বস্তুতঃ বস্তুমাত্রই নির্বচনীয়। এমন হতে পারে যে আমরা কোন বস্তুর নির্বচন ক'রে উঠতে পারি না। কিন্তু স্বরূপতঃ অনির্বচনীয় (objectively indefinite) কোন কিছুই হতে পারে না। (৪) **প্রমাণ-অনুপপত্তি**। মায়ার কোন প্রমাণ নাই। (৫) **স্বরূপ-অনুপপত্তি**। মায়া সৎও নয় অসৎও নয়, প্রমাণযোগ্যও নয়, সুতরাং আকাশ-কুসুমের মতই নিঃস্বরূপ। (৬) **নিবর্তক-অনুপপত্তি**। অজ্ঞানের নিবর্তক অবশ্যই কোন জ্ঞান হবে। কিন্তু কার জ্ঞান? নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান নয়—কারণ সবিশেষ, সপ্রকারক জ্ঞানই বাধক হতে পারে। জীবের জ্ঞান নয়—কারণ জীবের জ্ঞান অজ্ঞান প্রসূত। (৭) **নিবৃত্তি-অনুপপত্তি**। নিবর্তক না থাকায় অজ্ঞানের নিবৃত্তিও নাই। সুতরাং (অজ্ঞানের নিবর্তক না থাকায়) মায়াবাদে মোক্ষ অসম্ভব।*

চতুর্থ পক্ষ 'জৈনমত'-খণ্ডন

এই হ'ল বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণের মায়াবাদ বা তৃতীয়পক্ষ-খণ্ডন। এইবার দেখা যাক, কিভাবে তাঁরা চতুর্থ পক্ষটি খণ্ডন করেন। এই পক্ষটি জৈনাচার্যগণের। তাঁরা মনে করেন যে জগৎ সৎও বটে, অসৎও বটে। তাঁদের অভিপ্রায় এই যে ঘটাদি পদার্থ আছে—একথাও মিথ্যা নয়, আবার নাই—একথাও মিথ্যা নয়। 'আছে'—একথা যদি

---

* অদ্বৈতবাদিগণ এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। উঃ সঃ।

[তাছাড়া 'মায়াবাদে'র চরমসীমা 'অজাতবাদ'—সেইমতে বন্ধনই অস্বীকৃত, অতএব মোক্ষ অপ্রাসঙ্গিক। মাণ্ডুক্য-কারিকায় বৈতথ্যপ্রকরণে : ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা। লয় নাই, সৃষ্টি নাই, বদ্ধজীব বা সাধক নাই, মুমুক্ষু বা মুক্ত বলিয়া কেহ নাই—ইহাই চরমসিদ্ধান্ত।]

মিথ্যা হ'ত, অসত্তাই যদি ঘটের স্বভাব হ'ত, তাহলে ঘট উৎপন্ন করার জন্য আমরা কেউ যত্ন করতাম না। আবার 'নেই' একথাও যদি মিথ্যা হ'ত, সত্তাই যদি ঘটের স্বভাব হ'ত তাহলেও তার উৎপাদনের চেষ্টা করতাম না। ঘটাদি স্বভাবতঃ সৎও বটে, অসৎও বটে। তারা যুগপৎ সৎ ও অসৎ। এই মতের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে কোন কিছু হয় 'সৎ' অথবা 'অসৎ', যুগপৎ সৎ এবং অসৎ নয়। 'সৎ' এবং 'অসৎ' শব্দ দুটি বিরোধ-বাচক।

এই বিরোধকে আমরা দুভাবে বুঝাতে পারি এবং এই জন্য বিরোধও যে দুপ্রকার, তা বলা যায়। ইংরেজীতে এই দুরকমের বিরোধকে Contrary বিরোধ ও Contradictory বিরোধ বলে। সৎ ও অসৎ যদি Contrary শব্দ হয়, তাহলে তারা একই উদ্দেশ্যের বিধেয় হতে পারে না, তবে একটি যদি কোন উদ্দেশ্যের বিধেয় না হয়, অপরটি যে হবেই—এমন কোন কথা নাই। উদ্দেশ্যটির বিধেয় সৎ ও অসৎ উভয় হতেই ভিন্ন, অনির্বচনীয় কিছু হতে পারে। মায়াবাদীদের মত তাই। সুতরাং মনে হয় তাঁদের মতে শব্দ দুটি Contrary। কিন্তু এরা যদি Contradictory শব্দ হয়, তাহলে একই উদ্দেশ্যের তারা বিধেয় হতে পারবে না এবং একটি যদি কোন উদ্দেশ্যের বিধেয় না হয় অন্যটি হবেই। লৌকিক মতে এরা Contradictory। দুরকম বিরোধের মধ্যে যে রূপ বিরোধই এদের মধ্যে থাক না কেন তারা একই উদ্দেশ্যের বিধেয় হতে পারে না।

সুতরাং একই পদার্থকে যুগপৎ সৎ ও অসৎ বলার অর্থ, শব্দ দুটি বিরোধী নয়। একথা অশ্রদ্ধেয়। সৎ ও অসৎ বিরোধী। এদের বিরোধ Contradictory বিরোধ। মায়াবাদও স্বীকার করা যায় না, জৈনাচার্যগণের মতও স্বীকার করা যায় না। বিশেষ ক'রে জৈনাচার্যগণের কথা স্বীকার করলে সকল বিচার, সকল নিশ্চয় পরিত্যাগ করতে হয়। সকল নিশ্চয় পরিত্যাগ—একান্ত বর্জন জৈনাচার্যগণের অভিপ্রেত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে নিশ্চয় ত্যাগ করলে কি বিচারও ত্যাগ করতে হয় না? সুতরাং জগৎ সৎও বটে অসৎও বটে, এই পক্ষ সিদ্ধ হয় না।

প্রথম পক্ষ বা স্বমত স্থাপন

জগৎ সৎ, জীবও সৎ। তবে চার্বাকগণ যে অর্থে জগৎকে সৎ পদার্থ বলে মনে করেন সে অর্থে জগৎকে সৎ পদার্থ বলা যায় না। জগৎ অর্থাৎ অচিৎ অলীক নয়, মায়া নয়—সৎ বটে, সত্তাবান্ বটে। কিন্তু এই সত্তা স্বাধীন সত্তা নয়, অপরতন্ত্র সত্তা নয়। অচিতের সত্তাকে স্বাধীন সত্তা বলা, আর অচেতন যে চেতন-প্রেরিত না হয়েও কার্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারে, এই কথা বলা সমান। চার্বাকগণ তা বলেন বটে, কিন্তু তাঁদের কথা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। তাঁদের স্বপক্ষে কোন দৃষ্টান্তই নাই। আর এই বিষয়ে মূল প্রমাণ শ্রুতি। শ্রুতিতে বার বার বলা হয়েছে এই জগৎ ব্রহ্ম-সৃষ্ট। বস্তুতঃ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (যা হতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তাই ব্রহ্ম) ব্রহ্মের লক্ষণ—তটস্থ লক্ষণ নয়, স্বরূপ লক্ষণ। মায়াবাদেই স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করা হয়। কারণ মায়াবাদে জগতের উপাদান কারণ মায়া, এবং আধ্যাসিক তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম এই মায়ার আশ্রয়। ব্রহ্ম জগতের কারণ এই কথা মায়াবাদীদের মতে ভুল না হলেও ঠিক নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্যগণ এ ভাবে চিন্তা করেন না। তাঁদের মতে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' যেমন ব্রহ্মের লক্ষণ, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' তেমনি ব্রহ্মের লক্ষণ। যাই হ'ক চার্বাকদের মতো মনে করা ঠিক হবে না যে অচেতন স্বভাবই এই জগতের কারণ। আবার মায়াবাদীদের মতো একথাও মনে করা ঠিক হবে না যে জগৎ অনির্বচনীয়। জগৎ সৎ, কিন্তু ব্রহ্মে আশ্রিত বলেই সৎ, ব্রহ্মের কার্য বলেই সৎ। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলে মনে করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কারণতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা হয় না। ন্যায়াচার্যগণ ঈশ্বরকে

জগতের নিমিত্তকারণমাত্র—কর্তামাত্র বলে মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস কুম্ভকার যেমন ঘটের কারণ, ঈশ্বর তেমনই জগতের কারণ—একথা গ্রাহ্য নয়। অচিৎ সত্তা ব্রহ্মেরই সত্তা। ব্রহ্ম-অতিরিক্ত ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ অচিৎ নাই। অচিৎ অলীক নয়, অসৎ নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-শরীরে প্রবিষ্ট-রূপেই সৎ। জীব সম্পর্কেও এই কথা। সংক্ষেপে—ব্রহ্ম সৎ, জীব সৎ এবং অচিৎ সৎ—'ঈশ্বরশ্চিদ-চিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ'। কিন্তু জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গতরূপে আশ্রিত-রূপেই সৎ। নচেৎ ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে। মায়াবাদে এর অর্থ করা হয় ব্রহ্ম স্বগত, সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ-রহিত। পট হতে ঘটের যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদ—তা ব্রহ্মে নাই। এক ঘট হতে অপর ঘটের যে ভেদ তা সজাতীয় ভেদ—তাও ব্রহ্মে নাই। কোনও ঘটের এক অবয়ব হতে অন্য অবয়বের যে ভেদ, স্বগত ভেদ—তাও ব্রহ্মে নাই। রামানুজাদি আচার্যগণ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে ব্রহ্মে বিজাতীয় ও সজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। জগৎকে মিথ্যা এবং জীবকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বলা যায় না। বস্তুতঃ জীব জগৎ ব্রহ্ম হতে ধর্মতঃ ভিন্ন। জীব অণুপরিমাণ, কিন্তু ব্রহ্ম বিভু, সর্বব্যাপী। জগৎ অচেতন, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন। জগৎ ভোগ্য, জীব ভোক্তা এবং ব্রহ্ম নিয়ামক। তবে ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। কারণ জীব ও জগৎ পৃথক্ সত্তাহীন। ব্রহ্মের অংশরূপেই তারা সৎ। ব্রহ্মের সত্তাতেই তারা সত্তাবান্। ব্রহ্ম অংশী, জীব জগৎ অংশ; ব্রহ্ম আধার, জীব জগৎ আধেয়; ব্রহ্ম আশ্রয়, জীব জগৎ আশ্রিত; ব্রহ্ম বিশেষ্য, জীব জগৎ বিশেষণ; ব্রহ্ম দ্রব্য, জীব জগৎ গুণ; ব্রহ্ম আত্মা, জীব জগৎ দেহ। ব্রহ্ম হতে পৃথক্ সিদ্ধি তাদের নাই, তাদের সিদ্ধি অপৃথক্ সিদ্ধি। তবে অংশী ও অংশ, আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত; বিশেষ্য ও বিশেষণ, দ্রব্য ও গুণ, আত্মা ও দেহ, সমান সত্য—জীব-জগৎও ব্রহ্মের মত সম্পূর্ণ সত্য। এই সমান সত্যভাব গূঢ় অর্থ হ'ল এই যে এরা পরস্পরাশ্রয়ী; এবং পরস্পরাশ্রয়িত্ব এক প্রকার অভিন্নত্ব বলে এরা অভিন্ন। উপরন্তু জীব জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি এই 'স্বরূপতঃ অভিন্নতা'ই বুঝায়। 'তিনিই তুমি' এই বাক্যের তিনি (তৎ) ব্রহ্ম, এবং তুমি (ত্বম্) জীব হ'লে বাক্যটি অপ্রামাণিক হবে। ব্রহ্ম ও জীব ধর্মতঃ ভিন্ন। ব্রহ্ম নিরস্তসমস্তদোষ, অনবধিক, অতিশয়, অসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাস্পদ। 'তুমি' জীব হতে পারে না। বস্তুতঃ এ ভাবে বুঝাতে চাইলে বাক্যটি পরিণত হয়—ব্রহ্মই জীব (জীবই ব্রহ্ম) অথবা ব্রহ্মই ব্রহ্ম, (জীবই জীব) বাক্যে। জীবকে জীবরূপে বুঝলে এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে বুঝলে প্রথম প্রকার বাক্য হয়; আর এর অপ্রামাণিকত্ব প্রমাণ করতে হয় না; এবং জীবকে ব্রহ্ম রূপে বুঝলে (অথবা ব্রহ্মকে জীবরূপে বুঝলে) দ্বিতীয় প্রকার বাক্য হয়। এই বাক্য বাক্য নয়, প্রমত্ত প্রলাপ। ঘটই ঘট—যেমন অপ্রমত্ত উক্তি নয়, তেমনি ব্রহ্মই ব্রহ্ম, জীবই জীব, এসব উক্তিও উক্তি নয়, অভেদবোধক উক্তিমাত্রই প্রমত্ত উক্তি হয়, যদি বিভিন্ন বিশেষণযুক্ত বিশেষ্য অভিন্ন—এই অর্থবোধক না হয়। ব্রহ্মই ব্রহ্ম, ঘটই ঘট—এই সব উক্তি প্রমত্ত উক্তি। রঘুপতিই সীতাপতি বা লম্বোদরই গজানন নয়। 'রঘুপতিই সীতাপতি' বাক্যটির অর্থ হ'ল রঘুপতিত্ব ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী, এবং সীতাপতিত্ব ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মী শ্রীরামচন্দ্র ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। 'তিনিই তুমি' বাক্যের অর্থও তাই। সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং জীবত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্ম হতে

ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। জগৎ সম্পর্কেও এই কথা। এই জন্যই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—'বিশিষ্টাদ্বৈতম্' অর্থাৎ বিশিষ্টয়োরদ্বৈতম্, ধর্মতঃ ভিন্ন, বিশিষ্ট বস্তু দুটি (যেমন ব্রহ্ম ও জীব, অথবা ব্রহ্ম ও জগৎ) স্বরূপতঃ অভিন্ন। অথবা, বিশিষ্টাদ্বৈতম্ দ্বৈতবিশিষ্টম্ অদ্বৈতম্, অর্থাৎ যদিও ভেদের দিক হতে তত্ত্ব তিনটি—জীব জগৎ ও ব্রহ্ম, কিন্তু অভেদের দিক হতে তত্ত্ব একটি, দ্বৈত-বিশিষ্ট অদ্বৈত, জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম।

চিৎ অচিৎ এবং ব্রহ্ম, সবই তত্ত্ব। ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ। শ্রুতিতে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ-রূপে সমস্ত-দোষ-শূন্যরূপে এবং কল্যাণগুণের আকর-রূপে লক্ষিত হন। তাঁর অসংখ্য গুণের মধ্যে সৎ চিৎ ও আনন্দ মুখ্য। এই জন্য তাঁকে সচ্চিদানন্দও বলা হয়। আবার এই গুণগুলি তাঁর স্বরূপও বটে—ব্রহ্ম সৎ ও সত্তাবান্, চিৎ ও চেতন, আনন্দ ও আনন্দময়। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও চালক, বিচারক এবং মুক্তিদাতা। তিনি নির্বিকার, কিন্তু নিষ্ক্রিয় নন। তিনি সব কিছুকে ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, কিন্তু সব কিছু হতেই দশ অঙ্গুলি পরিমাণের ঊর্ধ্বে, সকল পরিমাণযোগ্য পরিমাণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তিনিই ঈশ্বর,—মায়া-উপহিত ব্রহ্ম ঈশ্বর নন।

অচিৎ তিন প্রকার : প্রকৃতি, কাল এবং শুদ্ধ তত্ত্ব। প্রকৃতি—সত্ত্ব রজঃ এবং তম এই তিনটি গুণযুক্ত, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। কাল নিরবয়ব ও নিত্য। আমরা কাল বিভাগ করি বটে, কিন্তু এ বিভাগ লৌকিক। শুদ্ধ তত্ত্ব সত্ত্বগুণাত্মক, ব্রহ্ম ও মুক্ত পুরুষের দিব্য দেহের এবং বৈকুণ্ঠলোকের উপাদান কারণ।

জীবের স্বরূপও জ্ঞান, ধর্মও জ্ঞান। জীবকে জ্ঞানী বলা, আর ঘটকে লাল বলা, এক প্রকার বলা নয়। লাল রংটি ঘটের গুণ, কিন্তু ঐ গুণের আবির্ভাবের পূর্বেও ঘটটি ছিল। জীবের সম্পর্কে এমন কথা বলা যায় না। জীব ঘট-পট প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞাতা, এবং সেইজন্য জ্ঞান নামক গুণের আশ্রয়। তবু স্বরূপতঃ অজ্ঞান, অচেতন নয়। জীব জ্ঞাতা, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা। তবে সে কেবল জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাই নয়, নিজ দেহ-মনের সে পরিচালক। তাকে কর্তা স্বীকার করেই শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কর্তা হওয়ায় জীব ভোক্তাও বটে। আমার কর্মের ফল আমি ভোগ করি, তোমার কর্মের তুমি। তুমি আর আমি ভিন্ন। জীব সংখ্যায় বহু, এবং পরিমাণে অণু। কোন জীব বদ্ধ, কোন জীব মুক্ত। মুক্তদের অনেকে বদ্ধমুক্ত, আবার অনেকে নিত্যমুক্ত। বদ্ধজীব সংসারী, কর্মপাশে আবদ্ধ। এই পাশ ছেদন ক'রে মুক্তি লাভ করা যায়। যাঁরা তা করেছেন, তাঁরা বদ্ধমুক্ত। নিত্যমুক্তেরা কখনও বদ্ধ হন না।

বদ্ধ জীবের পাঁচটি অবস্থা আছে : জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা ও মরণ। জাগ্রৎ অবস্থায় জীব জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। স্বপ্নে, এমন কি সুষুপ্তিতেও জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মের হানি হয় না। মূর্ছাকালে জ্ঞানাদি থাকে না, প্রাণ থাকে। প্রাণের হানি হয় মরণে।

বদ্ধজীবের কেউ বুভুক্ষু, কেউ মুমুক্ষু। বুভুক্ষুরা সকাম কর্ম করেন, এবং বার বার জন্ম গ্রহণ করেন। মুমুক্ষুরা নিষ্কাম কর্ম করেন। নিষ্কাম কর্ম মুক্তির প্রথম সোপান, কিন্তু নিষ্কাম কর্মই মুক্তি দিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক। মুমুক্ষুকে সদ্গুরুর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। কেবল জ্ঞানেও কিন্তু মুক্তি নাই, ভক্তি প্রয়োজন। ভক্তি অর্থে ধ্যান, উপাসনা, 'তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ'। মুমুক্ষু নিয়ত ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হন। এই ধ্যানও মুক্তি দিতে পারে না, ভগবৎ-প্রসাদ প্রয়োজন। এই প্রসাদেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, এবং তখনই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং 'ক্ষয় পায় মর্ত্যের সকল বন্ধন'।

শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শীপূজা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবনের খুঁটি-নাটি প্রতিটি ঘটনাই গভীর তত্ত্বপূর্ণ। তাঁর অতি সাধারণ আচরণগুলিও নিরর্থক বা উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। স্বীয় জীবনে আচরণ না ক'রে অপরকে কখনও তিনি কোন উপদেশ বা শিক্ষা দিতেন না। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর শিক্ষার আদর্শ।

ক্রমশঃ যতই দিন যাচ্ছে ততই জগৎ এই দিব্য জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর নিগূঢ় মর্ম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। 'ষোড়শীপূজা'—তাঁর পুণ্য জীবন-সাধানার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

পার্থিবভোগসর্বস্বতার যুগে তাঁর জীবনের এই ঘটনাটি যে কত গভীর রহস্যপূর্ণ তা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও সকলেই চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ। নিজ পত্নীকে সাক্ষাৎ ভগবতী জগন্মাতা জ্ঞানে আরাধনার কথা জগতের আর অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনে কখনও শ্রুত হয়নি। বস্তুতঃ এই ঘটনাটি সমগ্র বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে একান্তই অভিনব।

শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী বিভিন্ন ধর্মমত ও বিবিধ ভাবের দুশ্চর সাধন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়ে-ছিলেন এই ষোড়শীপূজায়। এর পর তিনি আর কোনরূপ সাধন বা অনুষ্ঠান করেননি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার এই পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'এ পূজা পূজার ইতি, আর দেব-দেবী মূর্তি,
কভু না পূজিলা পরমেশ।
যেন পূজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার,
পরিণাম সকলের শেষ।।'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে : 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—জগতের সকল নারীই জগদম্বার মূর্ত প্রকাশ। আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্বভূতে বিরাজিতা থাকলেও নারী মূর্তিতেই তিনি সমধিক প্রকাশিতা। এই জন্য প্রত্যেক নারীকেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ জ্ঞান করতেন, এমনকি—সমাজের চক্ষে যারা পতিতা, তারাও ছিল তাঁর বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সেই আনন্দময়ীর এক একটি মূর্তি। তাঁর নিজ মুখের উক্তি—'আমার সন্তান ভাব।· ·সমস্ত স্ত্রী-যোনি আমি মাতৃ-যোনি মনে করি। স্ত্রী-লোকের স্তন মাতৃস্তন মনে হয়।· সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ।' শ্রীমা এ প্রসঙ্গে বলতেন, 'ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল।' যা হোক চণ্ডীর উল্লিখিত শ্লোকার্ধটি মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমময় জীবনের উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, এই নরবরের দিব্য জীবন-সাধনা চণ্ডীর ঐ শ্লোকার্ধটির জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিনব জীবন-সাধনার আদি, মধ্য ও অন্ত—সর্বাবস্থায় আদ্যাশক্তি মাতৃ-ভাবে পরিব্যাপ্তা। শৈশবে বিশালাক্ষীদর্শনে আহুড়ে গমনকালে ঐ দেবীর আবেশে পথে গভীর তন্ময়তা, যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে 'মা মা' রবে ব্যাকুল ক্রন্দন ও মায়ের দর্শনলাভ এবং অন্তিমে কাশীপুরে 'কালী' নাম উচ্চারণপূর্বক মহাসমাধিলাভ—তাঁর পুণ্য জীবনলীলায় দেখা যায়। বস্তুতঃ, তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল মহা-মাতৃশক্তির পরম লীলাপীঠ। সাধন-কালে এক এক ক'রে তিনি বিবিধ মতের ও ভাবের সাধনা করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর পুনরায় মাতৃক্রোড়ে ফিরে এসেছেন। তাঁর মহাজীবনের সকল সাধনাই ছিল মাতৃকেন্দ্রিক।

বিবিধ ধর্মমতের সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি-লাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বরে জগদম্বার ভাবে নিমগ্ন রয়েছেন, সেই সময়ে শ্রীমা সারদামণি তথায় সহসা উপস্থিত হলেন। সারদামণি দেবী তখন অষ্টাদশবর্ষীয়া— উদ্ভিন্ন-যৌবনা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরম সমাদরে তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন, কিন্তু তিনি যেন কিঞ্চিৎ শঙ্কাগ্রস্তও হলেন। তাই শ্রীমার মনোগত অভিপ্রায় জানার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন তাঁকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ ?' শ্রীমা বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না ক'রে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।' শ্রীমার কণ্ঠে এই উক্তি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখশ্রী দিব্য বিভায় ও স্বর্গীয় প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত এবং বিমলানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

শ্রীমা ঐ সময়ে দিনের বেলায় নহবতে এবং রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে থাকতেন। শ্রীমার অনুপম সংযম ও অদ্ভুত শান্ত স্বভাব লক্ষ্য ক'রে তিনি পরম আহ্লাদিত ও বিমুগ্ধ হন। উভয়ে একই শয্যায় শয়ন করলেও উভয়েই সম্পূর্ণ দেহ-বোধরহিত হয়ে সারারাত্র এক দিব্য আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিরাজ করতেন। বাসনাসক্ত জীবের পক্ষে এই বিশুদ্ধ প্রেমসম্বন্ধ সম্যক্ উপলব্ধি করা একান্তই দুঃসাধ্য।

ঐ সময়ের কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলেছেন: ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হ'ত, তাহলে দেহবুদ্ধি আসত কি না, কে বলতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হ'য়ে ধরেছিলাম যে, 'মা! ওর ভিতর থেকে কামভাব এককালে দূর ক'রে দে।' একত্র বাস ক'রে ঐকালে বুঝেছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শুনেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমাও সেই সময়ের কথা নিজ-মুখে বলেছেন: (ঠাকুর) সে যে কি অপূর্ব দিব্য-ভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়। কখনও ভাবের ঘোরে কত কি বলতেন। কখনও হাসি, কখনও কান্না। কখনও একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত। সে যে কি এক আবির্ভাব, আবেশ! দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম 'কখন রাতটা পোহাবে?' (তাঁর) ভাব-সমাধির কথা তখন তো আর বুঝি না। একদিন তাঁর সমাধি ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে (ঝি) কালীর মাকে দিয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে (তাঁর) কানে নাম শোনাতে শোনাতে তবে পরে তাঁর চৈতন্য হয়। পর দিন ভয়ে কষ্ট পাই দেখে, তিনি নিজে (আমাকে) শিখিয়ে দিলেন, এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শোনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শোনাবে। তখন আর তত ভয় হ'ত না, ঐ সব শোনালেই তাঁর হুঁশ হ'ত।

শ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে শায়িত দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বিশুদ্ধ অন্তরে কেবলই বিশ্বপ্রসবিনী জগজ্জননীর উদ্দীপনা হ'ত। তাঁর মনে হ'ত, তিনি যেন সাক্ষাৎ বিশ্বজননীর কাছেই শয়ন ক'রে আছেন। তিনি শ্রীমাকে জগন্মাতা ভিন্ন অন্য কোন রূপে দেখতে পারতেন না। তাঁর শ্রীমুখের কথা—'যে মেয়েমানুষের কাছ থেকে এত সাবধান হ'তে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী! তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে।'

শ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী জ্ঞান করতেন। শ্রীমা একদিন তাঁর পদসেবা করতে করতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাকে তোমার

কি বলে বোধ হয়?' শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন, তিনিই এখন আর এক রূপে আমার পদসেবা করছেন। তোমাকে সর্বদা সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে সত্যসত্য দেখতে পাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণির সম্বন্ধ অতি বিচিত্র ও একান্তই অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সারদামণিকে তাঁর আরাধ্যা দেবী জ্ঞান করতেন, শ্রীমাও তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনার পরম আরাধ্য ইষ্টদেবতা-রূপে দর্শন করতেন।

'শ্রীপ্রভু লীলার স্বামী, সঙ্গে মাতা ঠাকুরাণী,
সনাতনী সৃষ্টির আধার।
বিভিন্ন মাত্র ভৌতিকে, এক আত্মা আধ্যাত্মিকে,
অভ্যন্তরে দোঁহে একাকার॥
দৈহিক সুখ সম্বন্ধ, প্রভু অবতারে বন্ধ,
পরিণয় মাত্র সংস্কার।
কি বুঝিবে বদ্ধ নর, ইষ্ট জ্ঞান পরস্পর,
কে পূজ্য পূজক বুঝা ভার॥'—পুঁথি

শ্রীমায়ের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃজ্ঞান গভীর থেকে ক্রমশঃ গভীরতম হতে লাগল। সুতরাং এখন তিনি শ্রীমাকে জগদম্বারূপে কেবল দর্শন করেই ক্ষান্ত বা পরিতৃপ্ত হলেন না। তিনি তাঁকে সর্বসিদ্ধিদাত্রী পরমাকল্যাণী 'শ্রীবিদ্যা ষোড়শী'রূপে পূজা ক'রে স্বীয় তপস্যার পরিপূর্ণতা সাধনের সংকল্প করলেন।

'এবে তাহা তিম্বাগিরে, মূর্তিমতী গুরুমায়ে,
পূজিতে প্রভুর হইল মন।
যথাবিধি উপচার, আজ্ঞা হইল তাঁহার,
করিবারে ত্বরা আয়োজন॥' —পুঁথি

শ্রীশ্রীষোড়শী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা দেবী, ইনি ত্রিপুরসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী এবং শ্রীবিদ্যা-রূপেও প্রসিদ্ধা। ষোড়শাক্ষর মন্ত্রে এই দেবীর পূজা করতে হয়। ষোড়শীদেবী সদা প্রসন্না, ত্রিনেত্রা ও চতুর্ভুজা। তাঁর চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও পঞ্চবাণ পরিশোভিত। সকল প্রকার সুমোহন বেশ ও নানাবিধ দিব্য আভরণে তিনি বিভূষিতা। তিনি সর্ব সৌন্দর্যশালিনী, সর্বাভীষ্টপ্রদা, সর্বমঙ্গলা ও সর্বশক্তিময়ী। তন্ত্রোক্ত সকল সাধনার অন্তে এই শ্রীবিদ্যা ষোড়শীদেবীর পূজার বিধি রয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমার শুভাগমনের পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবিধ তন্ত্রের সাধনকালে এই রাজরাজেশ্বরী ষোড়শী দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়েছিলেন। তদবধি তাঁর হৃদয়মধ্যে ঐ দেবীর অনবদ্য রূপশ্রী চির সমুজ্জ্বল হয়েছিল। তিনি সেই দর্শনপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'মার যত রূপ দেখেছি, তাঁর রাজরাজেশ্বরী মূর্তি সৌন্দর্যে অনুপম—তার তুলনা নাই।'

যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় সংকল্প-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সন্নিকটে এক পরম শুভ তিথিও পেলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী-সংযুক্ত অমাবস্যা তিথি দেবীপূজার পক্ষে অতীব প্রশস্ত। সেদিন শ্রীশ্রী৺ফলহারিণী কালিকা-পূজা—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ সাল (৫ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞায় তাঁর সহচর ও ভাগিনেয় হৃদয় ৺ষোড়শী-পূজার যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করলেন।

'যখন যা ইচ্ছা আসে, যুটে তাহা অনায়াসে,
ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছায়।
আয়োজন পরিপাটি, অণুমাত্র নাই ত্রুটি
যাহা লাগে ষোড়শী-পূজায়॥'—পুঁথি

৺ফলহারিণী কালিকা-পূজা উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর ভবতারিণীর মন্দিরে দেবীর পূজার্চনার বিশেষ সমারোহ হয়ে থাকে। ঐদিন নাটমন্দিরে দেবীর ভজন-কীর্তনাদিও হয়। কালীবাড়িতে দর্শনার্থিগণের সমাগমও হয় প্রচুর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ঘরে একান্ত নিভৃতে ষোড়শী

পূজা করবেন মনস্থ করেছেন। অবশেষে প্রতীক্ষিত শুভ দিনটি উপস্থিত হ'ল। তিনি পূর্বেই শ্রীমাকে তাঁর ঘরে উপস্থিত থাকার কথা নিবেদন ক'রে রেখেছেন।

যথাসময়ে ঘরে পূজাস্থান ও দেবীর আসনপীঠ (পিঁড়ী) আলপনায় ভূষিত হ'ল। ষোডশোপচার পূজার বিবিধ সামগ্রীর সঙ্গে ঠাকুরের সাধনকালের বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত দ্রব্যগুলিও সেখানে রাখা হ'ল।

'লইলেন তার সনে, পূর্ব সাধন-ভজনে
ব্যবহৃত যাহা ছিল তোলা।
বস্ত্র বিবিধ বরণ, সাজ সজ্জা আভরণ,
সগোমুখী রুদ্রাক্ষের মালা ॥' —পুঁথি

শ্রীযুক্ত হৃদয় ৺ষোডশী পূজার সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করলেও দেবীর কোন মূর্তি বা চিত্রপট আনয়ন করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আজ সমস্ত দিবস জগন্মাতার চিন্তায় বিভোর। দিব্য ভাবের আবেশে তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত। সন্ধ্যাবেলা নহবতে গিয়ে তিনি যথারীতি জননী চন্দ্রামণি দেবীর পাদপদ্ম বন্দনা করলেন এবং শ্রীমতী সারদামণিকে পূজাকালে তাঁর ঘরে উপস্থিত থাকার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। অতঃপর তিনি ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে ৺ষোড়শী-পূজা অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর আজ্ঞা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা ক'রে নিজ কক্ষে এলেন।

শ্রীযুক্ত হৃদয় ঠাকুরের ঘরে ষোড়শীপূজার আয়োজন শেষ ক'রে ভবতারিণীর পূজার জন্য কালীমন্দিরে গেলেন। আজ রাত্রে তিনি ঐ মন্দিরে দেবীর বিশেষ পূজা করবেন। যাহোক, রাধাকান্তজীর মন্দিরের পূজারী শ্রীযুক্ত দীনু (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) সন্ধ্যারতি প্রভৃতি সম্পন্ন ক'রে ঠাকুরের ঘরে এলেন। তিনি ফুল, বেলপাতা ও নৈবেদ্যাদি গোছগাছ ক'রে দিলেন। পূজার সমুদয় আয়োজন সম্পন্ন করতে রাত্রি প্রায় নয়টা বেজে গেল। দীপ, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি প্রজ্বলিত হওয়ায় সমস্ত গৃহ সুমধুর সৌরভে আমোদিত হ'ল। গৃহমধ্যে অদ্ভুত প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য বিরাজ করছে।

ঠাকুর ইতিপূর্বেই পূজকের আসন গ্রহণ করেছেন। তিনি যথাবিধি আচমনাদির পর ষোড়শী-পূজার সংকল্প ক'রে পূজার দ্রব্যসকল শোধন করছেন সেই সময়ে শ্রীমা শুভ্র বস্ত্রে অবগুণ্ঠিতা হয়ে ধীর নম্র মূর্তিতে প্রবেশ করলেন। ঠাকুর সুমধুর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। শ্রীমা ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে ঠাকুরের অপূর্ব ভাব-ভক্তিময় অনুষ্ঠান দর্শন করতে করতে ভাবাবিষ্টা হয়ে পড়লেন। ঠাকুর সুস্বাগত জানিয়ে তাঁর সম্মুখে স্থাপিত আলিম্পন-ভূষিত আসনপীঠে উপবেশনের জন্য তাঁকে ইঙ্গিত করলেন। শ্রীমা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রমুগ্ধার মত গিয়ে দেবীর জন্য নির্দিষ্ট আসনপীঠে পশ্চিমমুখে উপবিষ্টা হলেন। ঠাকুর সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত গঙ্গাবারি শ্রীমার অঙ্গে কুশ দ্বারা সিঞ্চন ক'রে প্রথমে তাঁকে অভিষিক্তা করলেন। তারপর করযোড়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন: হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি, মাতঃ ত্রিপুর-সুন্দরি, সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত কর। এঁর শরীর মনকে পবিত্র ক'রে এঁতে আবির্ভূতা হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর!

অনন্তর ৺ষোড়শীদেবীর বীজমন্ত্রে তিনি শ্রীমার অঙ্গে করাঙ্গন্যাসাদিপূর্বক ষোড়শোপচারে সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শীদেবীজ্ঞানে তাঁর যথাবিধি পূজার্চনা করলেন। পূজার সময়ে তিনি তাঁকে নববস্ত্র পরালেন, অলক্ত দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম রঞ্জিত করলেন। তাঁর ললাটে ও সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। তাঁর গলায় সুগন্ধি পুষ্পের ও জবা-বিল্বপত্রের মাল্য পরালেন। তাঁর চরণযুগল

গন্ধচন্দনাদিতে চর্চিত ক'রে রক্তজবা, রক্তকমল, অপরাজিতা, বিল্বদল প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করলেন। পরে নিবেদিত ফল, মিষ্টান্ন, পানীয়, তাম্বূল প্রভৃতির কিছু কিছু স্বহস্তে তাঁর শ্রীমুখে প্রদান করলেন। শ্রীমার নেত্রদ্বয় অর্ধ-নিমীলিত, রয়েছে, কিন্তু তিনি এক অপূর্ব দিব্য ভাবের আবেশে ধীর স্থির সমাহিত।

'পূজার সময়ে হেথা, সুস্থির নীরবে মাতা,
মহা পূজা করিলা গ্রহণ।
দেহখানি জড় প্রায়, বাহ্য চেষ্টা নাহি গায়,
মৃত্তিকার প্রতিমা যেমন॥' —পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্ধবাহ্যদশায় গদ্‌গদকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। সমাধিস্থ পূজক এবং সমাধিস্থা দেবী ভাবাতীত রাজ্যে একীভূত হয়ে গেলেন। তত্ত্বতঃ তাঁদের আর পৃথক্ কোন সত্তা রইল না।

'পূজ্য পূজকেতে দুয়ে, ভাবরাজ্য তিয়াগিয়ে,
ভাবাতীতে একত্র মিলন।
দেহ দুটি পড়ে হেথা, মিলিয়া গিয়াছে সেথা,
বিয়েব বারতা বুঝ মন॥' —পুঁথি

বহুক্ষণ ঐভাবে অতিবাহিত হ'ল। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অনেকক্ষণ অতীত হয়েছে। ঠাকুর এখন ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'লেন। তাঁর বিবিধ সাধনায় বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত দ্রব্যসকল তিনি ষোড়শীরূপিণী শ্রীমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন। ঐ সঙ্গে তিনি জপের গোমুখী রুদ্রাক্ষ-মালাটিও তাঁর চরণে উৎসর্গ করলেন। সকল সাধনার সমুদয় ফলও ঐভাবে তাঁতে সঁপে দিলেন। অবশেষে অলক্ত দ্বারা বিল্বপত্রে স্বীয় নাম লিখে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়ে তাঁতে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করলেন।

'বলিলেন বার বার, যাগ যজ্ঞ তপাচার,
সাধন ভজন সমুদায়।
করম কাণ্ডের মালা, আজ হৈল শেষ খেলা,
সকল সঁপিনু দুটি পায়॥' —পুঁথি

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিভরে শ্রীমায়ের রাঙা চরণযুগলে প্রণিপাতপূর্বক গদ্‌গদকণ্ঠে প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন :

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ধীরে ধীরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হলেন। ঠাকুরের পূজাও শেষ হয়েছে। দেবী পীঠাসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে নহবতে চলে গেলেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অভিনবলীলা ষোড়শী-পূজা সাঙ্গ হ'ল।

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'পূজা শেষ হইলে মূর্তিমতী বিদ্যা-রূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনা-পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।'

সদা শিবানাং পবিভূষণায়ৈ
সদাঽশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

আচার্য যদুনাথ সরকার

গত ১৯শে মে সোমবার রাত্রি দশটায় ৮৭ বৎসর বয়সে দক্ষিণ কলিকাতায় লেক টেরেসে তাঁহার নিজ বাসভবনে সহসা হৃদ্-রোগের (Coronary Thrombosis) আক্রমণে স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে কেওড়াতলার মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৮৭০ খৃঃ রাজসাহী জেলায় এক মধ্যবিত্ত জমিদারগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যদুনাথ ধাপে ধাপে ছাত্র-জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৯২ খৃঃ এম এ. পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষ ও সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করার পরই তিনি অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হন। অল্প কিছুদিন বেসরকারী কলেজে কাজ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে আসেন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করেন। অতঃপর কয়েক বৎসর পাটনা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯১৭ খৃঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তিনি নূতনতর ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। ১৯১৮ খৃঃ আই ই. এস (Indian Educational Service) এ যোগদান করিয়া তিনি কটক র‍্যাভেনশ কলেজে যান এবং ১৯২৩ খৃঃ আবার পাটনায় আসেন। এই বৎসরই তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২৬ খৃঃ আচার্য যদুনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইয়া আসেন। ১৯২৯ খৃঃ ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে নাইট উপাধি দেন। ১৯২৯-১৯৩২ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (M L A) ছিলেন, এবং একাধিক বার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি-পদে বৃত হন।

অধ্যয়ন ও গবেষণাই ছিল তাঁহার নীরব ও অনলস জীবনের সাধনা ও তপস্যা। দীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিভার স্নিগ্ধজ্যোতি দ্বারা পথহারা জাতিকে পথনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র এবং সার্থক অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও জাতিকে বুঝিবার জন্য তিনি ইতিহাসের গবেষণাকেই তাহার জীবন-সাধনারূপে বাছিয়া লন, এবং ভারতীয়দের মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণায় বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতি তিনিই প্রবর্তন করিয়াছেন। মুঘল শাসনকাল ছিল তাঁহার অনুসন্ধানের কেন্দ্রীভূত বিষয়, এই প্রসঙ্গে মারাঠা জাতি, শিবজী ও শ্রীচৈতন্য-জীবনও তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন প্রমাণস্বরূপ। এই সকল গবেষণার জন্য তাঁহাকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বারংবার বহু ভ্রমণ করিতে হইয়াছে এবং পার্শী, মারাঠী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষাও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ রচনা ও গ্রন্থই ইংরেজীতে, বাংলায় লেখা 'শিবজী' ও ইংরেজীতে 'আওরংজেব' প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার লিখিত আলোচনা ও সমালোচনা অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত।

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল, এবং মিশনের বিভিন্ন শাখার সহিত তাঁহার সহৃদয় যোগাযোগও দীর্ঘদিনের। ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখযোগ্য। ভগিনী যে সকল ভারতীয় সন্তানদিগকে বিভিন্নক্ষেত্রে মৌলিক ও স্বাধীন গবেষণায় উৎসাহিত করিতেন যদুনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ১৯৫২ খৃঃ নিবেদিতার প্রতি আচার্য যদুনাথ যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন তাহা ভাবে ও ভাষায় যেমন মধুর তেমনই গভীর।* বাগবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতি আজীবন তাঁহার সহানুভূতি ছিল। জীবনসায়াহ্নে তিনি ও তদীয় সহধর্মিণী সেখানে যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহা আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

সরস্বতীর বরপুত্র এই মনীষীর আত্মা চির-শান্তি লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

---

* উদ্বোধনের আগামী সংখ্যায় ভাষণটির অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

সমালোচনা

স্বাধিকার—লেখক : ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ; প্রকাশক : আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬৭নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩, পৃষ্ঠা—৩১৯; মূল্য—ছয় টাকা।

১৯৪৬ সালের পৈশাচিক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত একখানি উপন্যাস। মানবিকতার চরমতম দুর্দিনে বেদনাকম্পিত লেখনীতে ইহার সৃষ্টি। উচ্চ সামাজিক আদর্শবাদ প্রচার এবং মানুষকে তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার বলিষ্ঠ প্রয়াসই গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য। ভাষা সতেজ, কিন্তু ভাবের অতিশয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে উপন্যাসের ধারাকে ব্যাহত করিয়াছে, মনে হয়।

আদর্শমূলক এই উপন্যাসখানি মোটামুটিভাবে পাঠকপাঠিকাদের ভালই লাগিবে, তবে গ্রন্থকারের স্বলিখিত ভূমিকায় 'বাংলা সাহিত্যের শাশ্বত সম্পৎ' কথাগুলির তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক বহুগ্রন্থপ্রণেতা সুপণ্ডিত লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ ও অভিনন্দনযোগ্য।

—শ্যামাচৈতন্য

বিদ্যার্থী (৩৪শ বর্ষ, ১৩৬৪)—প্রকাশক স্বামী সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১২০।

এটি 'বিদ্যার্থীর' দ্বিতীয় মুদ্রিত সংখ্যা, সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত : হাতে লেখা হয়ে পত্রিকাটি ৩৪ বছর চলে আসছে। প্রধানতঃ গত তিন বছরের 'বিদ্যার্থী' থেকে সংগ্রহ-করা প্রবন্ধাদি এই সংখ্যায় সম্পাদিত হয়েছে। শুধু সাহিত্যচর্চা বা বিজ্ঞান-আলোচনা নয়, ছাত্র-জীবনের কিছু পাথেয়-সংগ্রহও এর একটি উদ্দেশ্য।

সুনির্বাচিত ও সযত্ন-সম্পাদিত প্রবন্ধগুলি সম্পাদকগণের কৃতিত্ব ও আপ্রাণ চেষ্টার উজ্জ্বল সাক্ষী। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের নানা বিষয়ক সুন্দর সুন্দর রচনা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। আশ্রমস্থ অভিভাবক-সন্ন্যাসিগণের লেখা-গুলিও উচ্চভাবোদ্দীপক; বার্ষিক সভায় পঠিত স্বামী সন্তোষানন্দজীর 'বিদ্যার্থী আশ্রম' প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবিকাশের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি সুচিন্তিত ইংরেজী প্রবন্ধে পত্রিকাটির মূল্য বাড়িয়াছে। উপনিষদ্ ও চণ্ডী হইতে দুইটি প্রার্থনা সন্বলিত হইয়াছে, অন্ততঃ একটি সংস্কৃত রচনার অভাব আমরা অনুভব করিলাম, উহা এরূপ পত্রিকার অলঙ্কার হইত। কয়েকটি চিত্র ও শিল্পপীঠের একটি প্ল্যান প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান কর্মবিস্তারের পরিচায়ক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গীতাঞ্জলি —শ্রীবিজয়চণ্ডী রায়। প্রকাশিকা : শ্রীমাধুরীলতা রায়, ২০, ভুবনধর লেন, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ২৩২, মূল্য টাকা ৪.২৫।

পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, মোটামুটি তিনটি ভাগে তাঁর 'সংক্ষিপ্ত জীবনী', 'কথামৃত' ও 'স্বভাব' কাব্যাকারে আলোচিত। দ্বিতীয় খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেতিহাস ও বাণী একটানা কবিতাকারে লিপিবদ্ধ।

লেখক একজন ডাক্তার—সভয়ে কি নির্ভয়ে অনুক্রমণিকায় নিজেই তিনি লিখেছেন—তাঁর এ প্রচেষ্টা 'মড়াকাটা হাতে দেবী সরস্বতীর নাভি-শ্বাস'—দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনেও লিখেছেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী নিয়ে কতকগুলি আবোল-তাবোল লিখে ধৃষ্টতা আমার বেড়েই চলেছে। লেখক কবি-যশঃপ্রার্থী কিনা জানিনা, তবে তিনি যে ভক্ত ও ভাবুক তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ছত্রে ছত্রে দিয়েছেন। ভাবগ্রাহী জনার্দনের উদ্দেশে তিনি যা নিবেদন করেছেন তা নিশ্চয় গৃহীত হয়েছে।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Swami Vivekananda in America – New Discoveries.—
by Marie Louise Burke,—published by Advaita Ashrama, (Mayavati, Almora, Himalayas) 4, Wellington Lane, Calcutta-13, Page 689 + xix, Price Rs 20/-

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ—নূতন তথ্যাবিষ্কার : শ্রীযুক্তা মেরী লুইস বার্ক প্রণীত, প্রকাশক : অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়) ৪, ওয়েলিংটন লেন কলিকাতা-১৩, পৃঃ ৬৮৯+১৯, মূল্য ২০৲

১৯৫০ খৃঃ লেখিকা নিউ ইয়র্ক ব্রুকলিন ও বোষ্টনের পাঠাগারে পাঠাগারে পুরাতন সংবাদ-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার অনুসন্ধানে রত হন। তাহার ফল এই বিরাট গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। চিকাগো ধর্ম-মহাসভার পূর্বে ও পরে স্বামীজীকে নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। সমসাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত সংবাদে সে সময়ের প্রতিক্রিয়া হুবহু লিপিবদ্ধ। ব্যক্তিগত পত্রাবলী ও স্মৃতিকথা হইতেও বহু তথ্য সংগৃহীত। তেরটি অধ্যায়ে অনেক নূতন তথ্য ভিন্ন প্রাথমিক কথা ও শেষ কথা-সহ পনেরটি অধ্যায়ের এই বিরাট গ্রন্থে আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচার-কার্যের সমগ্র রূপের একটি আভাস পাওয়া যায়।

অধ্যায় পরিচয় :

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্য-বিবরণী

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ব্রহ্মদেশে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানব-সাধারণের সেবারত।

অন্তবিভাগীয় হাসপাতালে ৮টি ওয়ার্ড আছে, মোট শয্যা-সংখ্যা ১৪৫ (৪৪টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত)। সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওয়ার্ড ছাড়া পৃথক ক্যান্সার, চক্ষু ও E. N. T ওয়ার্ড আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তবিভাগে প্রায় ৪০০০ রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ১ হাজারের উপর এবং শিশু প্রায় ৪০০।

বহির্বিভাগস্থ চিকিৎসালয়ের ছয়টি শাখা। আলোচ্য বর্ষে জাপান ডেণ্ট্যাল এসোশিয়েশনের দানে দন্তচিকিৎসা বিভাগে একটি নূতন ডেণ্ট্যাল ইউনিট স্থাপিত হইয়াছে।

আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ফিজিওথেরাপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করা হয় ৩১৬৩ জনের।

রেডিয়াম চিকিৎসা বিভাগে ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা লাভ করেন ২২০ জন।

ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১২৬৭৮টি নমুনা এবং এক্স-রে বিভাগে ১৭৬১টি রোগী পরীক্ষা

হয়। Deep X-Ray Therapy বিভাগের কার্যও প্রশংসনীয়।

দৈনিক উপস্থিতির তালিকা

অন্তর্বিভাগ	বহির্বিভাগ	মোট
১৪১	৫৩৭	৬৭৮

আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,০০,০৭৪

সেবাশ্রমে কম্পাউণ্ডিং ও নার্সিং শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় সরকার এই হাসপাতাল-টিকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে নার্সিং শিক্ষা-কেন্দ্র হিসাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

বিশাখাপত্তনম্ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯৪১ খৃঃ হইতে জনকল্যাণে রত। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত কার্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি।

আশ্রমের কর্মধারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: ধর্মপ্রচার, শিক্ষা-বিস্তার ও সংস্কৃতি-উন্নয়ন।

আশ্রমের পাঠাগার ও গ্রন্থাগারে পাঠকগণ বিনা চাঁদায় সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তকাবলী পাঠ করিতে পারেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ১১ জন বিদ্যার্থী অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৩ (ছাত্রী ২১ জন), তন্মধ্যে ৬১টি ফ্রি।

শিশুবিভাগে ভজন স্তোত্র ও গান শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শিশু-সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে। সময় সময় শিক্ষামূলক ফিল্ম দেখানো হয়।

জনসাধারণের সুবিধার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাবলী বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়।

আশ্রম-এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি হইতে জল-সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। জলাভাব দূরীকরণের জন্য আশ্রম-কর্তৃপক্ষ কূপ খনন করাইয়া তাহা হইতে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারিগণের পানীয় জলের অভাব অনেকাংশে দূর হইয়াছে। প্রধান প্রধান তিথিপূজা ও উৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বেলুড় মঠ: রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়: পীড়াগ্রস্ত ও অসহায় স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে সময়মত বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপন করেন। প্রথম বর্ষে ১০০০ রোগী চিকিৎসিত হয়। এখন বার্ষিক গড় ত্রিশ হাজারের উপর।

প্রথমে সাধারণভাবে স্থাপিত হইলেও হাওড়া জেলায় এই চিকিৎসালয় একটি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার জনপ্রিয়তা ও প্রসার দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের চিকিৎসা ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনানুযায়ী পথ্য শুশ্রূষা ও বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

গত কয়েক বৎসরের চিকিৎসিতের তালিকা

বর্ষ	নূতন	পুরাতন	মোট
১৯৫২	১৬,৩৩৬	১২,২৯৮	২৮,৬৩৪
'৫৩	১১,৯৪৮	১৬,৯৬৪	২৮,৯১২
'৫৪	১২,৯৬৬	২০,৩২৯	৩৩,২৯৫
'৫৫	১৩,১৫৭	১৯,৫৭৮	৩২,৭৩৫
'৫৬	১৩,১৩৩	১৮,২৮৬	৩১,৪১৯
'৫৭	১৩,৮২১	১৮,৭০৮	৩২,৫২৯

[এ পর্যন্ত মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা—১০,১১,৩১৯]

আমরা আশা করি সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিগণ পীড়িত জনগণের সেবাকল্পে দান করিয়া এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির সুপরিচালনা ও ক্রমোন্নতিতে সহায়তা করিবেন।

উৎসব-সংবাদ

জলপাইগুড়ি : গত ২৬শেও ২৭শে এপ্রিল দুর্যোগ সত্ত্বেও স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনের আলোচনা করেন। পরদিন রবিবার দ্বিপ্রহর হইতে প্রায় ১৫,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। তিন দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণলীলা-কীর্তন গীত হয়।

এতদুপলক্ষে স্থানীয় যোগেশ মেমোরিয়াল হলে স্বামী নিরাময়ানন্দ ২৮শে এপ্রিল 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' এবং ৩০শে এপ্রিল 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে বলেন। প্রথম দিন জেলা-সমাহর্তা শ্রীমুখার্জি সভাপতিরূপে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে ব্যক্তি-জীবনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র অপূর্ব শক্তির কথা উল্লেখ করেন।

বরাহনগর : গত ১৯শে হইতে ২২শে এপ্রিল বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব উপলক্ষে উৎসবের প্রথম দিবসে স্বামী বিমুক্তানন্দ মঞ্চোপরি স্বামীজীর বিরাট প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি, বৈদিক শান্তি-পাঠ ও ভজন শান্ত মধুর পরিবেশের সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গ লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুত শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রসভার উদ্বোধন করিয়া তাঁহার ভাষণ দিয়া গেলে পর স্বামী বিমুক্তানন্দ সভার কার্য পরিচালনা করেন। ছাত্রগণ বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করে। সাধারণ ধর্মসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালিদাস নাগ। অধ্যাপক হীরালাল চোপরা ও স্বামী অচিন্ত্যানন্দ স্বামীজীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ডাঃ নাগ বলেন : স্বামীজীর যে ভাব আজ জগৎকল্যাণে নিয়োজিত তাহার প্রথম প্রকাশ এই বরাহনগরেই। সভান্তে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

২০শে এপ্রিল বেলা ৩ ঘটিকায় কালীকীর্তনের পর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভার প্রারম্ভে স্বামীজীর রচিত 'একরূপ অরূপনামবরণ' গানটি মৃদঙ্গ সহযোগে গীত হয়। তৎপরে স্বামী ওঁকারানন্দজী তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় 'ধর্মের প্রয়োজন ও বর্তমান যুগে তাহার স্থান' বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। প্রচলিত প্রধান প্রধান মতবাদ উল্লেখ করিয়া যুক্তি দ্বারা দেখান যে জগতে একমাত্র ধর্মছাড়া মানুষ শান্তিলাভ করিতে পারে না। মানুষ খোঁজে আনন্দ, কিন্তু ঈশ্বর যে আনন্দস্বরূপ—তাহা না জানার ফলে প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পায না, ফলে নানা মতবাদের সৃষ্টি। সভান্তে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যেন ঘোষাল ও শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২১শে সন্ধ্যায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ করেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। রাত্রে সিঁথি অমৃতসংঘ কর্তৃক 'মহিষাসুর' নাটক অভিনীত হয়। ২২শে শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ-গানের পর বীরভূমের শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের বাউল গান সকলকে তৃপ্ত করে।

রহড়া : ১৬ই এপ্রিল প্রাতে আশ্রমিকদের সমবেত প্রার্থনা, বেদপাঠ, গীতা-আবৃত্তি ও কীর্তন প্রভৃতির পর গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে সপ্তাহব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষিত হয়। সকালেই পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা-অধিকর্তা মামুদ সাহেবের সভাপতিত্বে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর শ্রীমামুদ শিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

অপরাহ্নে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, দুর্গত মনুষ্যত্বের সেবায় ধর্মের যে সুর রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ তারই মূল উদ্গাতা। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর

উদার গম্ভীর ভাষণে বলেন, স্বামীজী ছিলেন দুঃস্থ ও পীড়িতদের সেবার মূর্ত বিগ্রহ। সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আশ্রমের শিশু-বিভাগের ছাত্রগণ কর্তৃক 'রাখালরাজা' অভিনীত হয়।

১৭ই এপ্রিল প্রাতে বেতারকথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরল ও সতেজ ভাষায় শ্রীশ্রীচণ্ডী ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'তরঙ্গ' সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, শ্রীযুত শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সরোদ' বাজনা ছিল এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

১৮ই এপ্রিল প্রাতে প্রভুপাদ শ্রীবিজপদ গোস্বামী মহাশয় ভাগবত পাঠ করেন। দ্বিপ্রহরে অজস্র নর-নারায়ণ আশ্রমিকদের সশ্রদ্ধ সেবা গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় কুলীনপাড়া প্রভাত-সূর্য ক্লাব কর্তৃক 'ধর্মবল' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

১৯শে প্রাতে ছাত্র-সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীএন সি ঘোষ মহাশয়। আশ্রমিক ছাত্রবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকেরা পর্যন্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। অপরাহ্ণে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সন্ধ্যায় রহড়া বি এম প্রোডাকসন কর্তৃক 'তরণীসেন' যাত্রাভিনয় সকলকে আনন্দ দেয়।

২০শে প্রাতে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতের ভীষ্ম-চরিত্রটির বিচার করেন আধুনিক কালের সমাজ ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। পরে কলিকাতার 'সুহৃদ ক্লাব' কর্তৃক কালী-কীর্তন দ্বিপ্রহর অবধি চলে। সমবেত ভক্তগণ সকলেই এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের পর সন্ধ্যায় শ্যামবাজার 'সুহৃদ সম্মেলনের' সভ্যগণ কর্তৃক 'নদীয়া-বল্লভ' যাত্রা অভিনীত হইলে উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সেণ্ট লুই : বেদান্ত-সোসাইটি—১৯৫৭খৃঃ কার্যবিবরণী : কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে পূর্বাহ্ণ সাড়ে দশ ঘটিকায় সারা বৎসর সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ও লিনডেনউড কলেজ হইতে শিক্ষকসহ ছাত্রগণ যোগদান করিতেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিখাইতেন এবং 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' ও 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের' অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

(৩) সাময়িক বক্তৃতা ও আলোচনা : স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে আহূত হইয়া হিন্দুধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন—

এক্সেলসিঅর ক্লাব (নারী সাহিত্য সমিতি)
ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ
কনকর্ডিয়া সেমিনারি (থিয়োলজিক্যাল কলেজ)। এতদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সমাগত ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

(৪) বিশেষ সভা : ১৫ই অক্টোবর অধ্যাপক হাসটনস্মিথ সোসাইটির উপাসনা-গৃহে তাঁহার সাম্প্রতিক ভারত-ভ্রমণ বিষয়ে সচিত্র বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শংকরাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব দিনে (যথা

দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান পূজা ভজন শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সকলে আনন্দপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে দিনগুলি অতিবাহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মদিনে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

(৬) গ্রীষ্মাবকাশ: এই সময়ে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ক্যালিফর্ণিয়ার বেদান্ত-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন এবং সমবেত ভক্তবৃন্দের সভায় ধর্মপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান করেন। গত ১১ই আগষ্ট রবিবার হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রে বিশিষ্ট অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি 'ঈশ্বরান্বেষণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

(৭) এই বৎসর সোসাইটিতে আগত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে স্বামী প্রভবানন্দজী অন্যতম।

(৮) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী ৮২ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(৯) সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

নিউ ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার, কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী অথবা সহায়ক স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি রবিবার বেলা ১১টায়—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন। [অন্যথা বন্ধনীতে উল্লিখিত]

জানুআরি: ধ্যানের সময় কি হয়? বিবেকানন্দ —ভারতে ও আমেরিকায়, ধর্ম-জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন, দুঃখজয়ের সাধনা।

ফেব্রুয়ারি: মানবের দেবত্ব, দৈব ও পুরুষকার, অতীত লইয়া কি করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণ ও এ যুগের সংশয়।

মার্চ: হিন্দুধর্মের ভাব, শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী, অন্তর্জীবনের সাধনা, তুরীয়ভাব, সাধু, প্রেরিত পুরুষ ও অবতার।

এপ্রিল: [Good Friday] মরণ। কই তোমার যন্ত্রণা? [Easter Sunday] অমৃতত্ব: ইহার অর্থ ও প্রাপ্তি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। বেদান্তের সারকথা [বক্তা—পুরীর শ্রীশঙ্করাচার্য] মানুষ কি? ভারতের বৈষ্ণব সাধুসন্ত।

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী ঋতজানন্দ গীতা ও প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ অধ্যাপনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

[উৎসব-সংবাদ-প্রেরকগণের প্রতি অনুরোধ: সরল ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে কর্মসূচীর বিশেষানুষ্ঠানগুলিই তাঁহারা পাঠাইবেন।—উঃ সঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

খড়িবেড়িয়া (বজবজ, ২৪ পরগনা): শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দাশ্রমে গত ৫ই এবং ৬ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডী ও কথামৃত পাঠ, উপনিষদ্ ব্যাখ্যা হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবানন্দ মহারাজ, স্বামী জীবানন্দ এবং শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ঠাকুরের জীবন-দর্শন বিবৃত করেন।

সাউথ বিষ্ণুপুর (২৪ পরগনা): গ্রামে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে প্রভাতফেরী পূজা ভজন ও জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

কালীঘাট: শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ২৯শে চৈত্র হইতে তিন দিন ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহ পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তনাদিতে আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল। ভজন-কীর্তনাদিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীরমণী-

কুমার দত্তগুপ্ত কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। প্রথম দিনের জনসভায় পৌরোহিত্য করেন পৌরপ্রধান ডাঃ ত্রিগুণা সেন, বক্তা ছিলেন শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। দ্বিতীয় দিনের সভাপতি ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এবং বক্তা ছিলেন ডাঃ রমা চৌধুরী এবং ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী। শেষদিন সভাপতি ছিলেন স্বামী পুণ্যানন্দ, প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

গোদাপিয়াশাল (মেদিনীপুর): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসদে গত ৩০শে চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা পাঠ হোম ও নরনারায়ণ-সেবা সুসম্পন্ন হয়। প্রায় সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। স্বামী অন্নদানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় ধর্মসভায় বক্তা ছিলেন বিশ্বদেবানন্দজী ও মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন। এই গ্রামে এরূপ উৎসব এই প্রথম।

টালিগঞ্জঃ গত ২৩শে ও ২৪শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে টালিগঞ্জে প্রথম দিন স্বামী জীবানন্দ মহারাজের মনোজ্ঞ ভাষণের পর বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় দিন স্বামী ধীরাত্মানন্দ মহারাজের বক্তৃতার পর কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ও দক্ষিণ কলিকাতা নবীন-সঙ্ঘের নাট্যাভিনয় সকলকে আনন্দ দান করে।

হৈঁড়্যা (মেদিনীপুর) : গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল কল্যাচক বিবেকানন্দ মিলনসংঘ ও বিদ্যাসাগর ছাত্রসংসদের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে পূজা ও স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, সন্ধ্যায় স্বামী গোপেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, মূলবেড়িয়া বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীতারাপদ মাইতি ও সংঘের সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বেরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন, শ্রীরাজকৃষ্ণগিরি ও শ্রীমেনকাগিরি কণ্ঠে ও যন্ত্রে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণলীলা কথকতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

কুলহাণ্ডা (মেদিনীপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, কথামৃত পাঠ ও প্রসাদবিতরণের পর বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। অন্য বক্তা ছিলেন ব্রহ্মচারী সারদাচৈতন্য। ১:ই বৈশাখ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক নিকটবর্তী গোপালনগরে সভা ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যকথা আলোচিত হয়।

অদ্বৈতানন্দ-জন্মোৎসব

দক্ষিণ জগদ্দল (২৪ পরগনা) : রামকৃষ্ণ-অদ্বৈতানন্দ-সঙ্ঘের পরিচালনায় গত ২১শে বৈশাখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মস্থান দক্ষিণ জগদ্দল (সোনারপুর) গ্রামে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে তৃতীয় বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি স্বামী জীবানন্দ, স্বামী বিশ্ববেদানন্দ, শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন। সংকীর্তন, পূজা, পাঠ, কালীকীর্তন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগানে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ধর্মসভা

বেথুয়াডহরি (নদীয়া): গত ১৭ চৈত্র বেলুড়মঠের স্বামী অন্নদানন্দ স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকমহাশয়েব অহ্বানে গ্রন্থাগারভবনে সন্ধ্যায় দুই শতাধিক নরনারীর এক সভায় দেড় ঘণ্টাকাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বভূতে একাত্মানুভূতি, বেদান্তের সাম্যবাদ, বৈদিক প্রার্থনা, স্বামী বিবেকানন্দের দুঃখীর জন্য অন্তর্বেদনা ও স্বামী অখণ্ডানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা প্রভৃতি আলোচনা করেন। অবশেষে তিনি বলেন—প্রত্যেক গৃহই যেন তপোবন হয়, ইহাই ভারতীয় আদর্শ। শেষে তিনি বিশেষতঃ ছাত্রদের বলেন, প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্যন্ত তাহাদেব কি ভাবে যাপন করা উচিত।

প্রায়শ্চিত্ত

আমেরিকায় ওয়াশিংটনের 'ক্যাথলিক ওয়ার্কার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মিঃ হেনাসী অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-ভবনের সম্মুখে ৪০ দিনের জন্য অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন, নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া মানুষ যে পাপ করিয়াছে—তাঁহার এই অনশন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত, অব্যর্থ ধ্বংসের কারণ আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার উন্মত্ত প্রতিযোগিতার জন্যও তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্ত। মিঃ হেনাসীর বয়স ৬৫, তাঁহার প্রচারিত একটি ঘোষণা-পত্রিকায় তিনি জানাইয়াছেন: আণবিক শক্তি কমিশনের (A E C.)এর উপর কোন চাপ দিবার জন্য বা তাঁহাদের বিব্রত করিবার চেষ্টায় তিনি এরূপ করিতেছেন না।

পুরাতত্ত্ব-আবিষ্কার

ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগ-পরিচালিত উজ্জয়িনীতে 'গড়' স্তূপে গত বৎসর খনন-কার্যের ফলে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে মালবে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত পর্যন্ত পর পর চারিটি বিভিন্ন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

বুদ্ধের সময়ে দুর্ধর্ষ নরপতি প্রদ্যোতের রাজত্বকালে অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীর রক্ষা-প্রাচীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য হস্তগত। একটি হস্তিদন্তের শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে এবং টেরাকোটার একটি ডালার ঢাকনায় ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রাপ্ত লিপি যথাক্রমে খৃঃ পূঃ তৃতীয় ও প্রথম শতাব্দীর।

নগররক্ষার ব্যবস্থা দৈর্ঘ্যে ১ মাইল ও প্রস্থে ¾ মাইলে সীমাবদ্ধ। চম্বলের উপনদী সিপ্রার ভাঙনের জন্য বাঁধ বারংবার নির্মিত হইয়াছে। ইহা হইতে সেই প্রাচীনকালে উজ্জয়িনীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। নদীর নিকট মাটির বাঁধ অধিকতর চওড়া ছিল; বাঁধের দুর্বল স্থানে কাঠের গুঁড়ি পোঁতা দেখা যায়।

প্রথম যাহারা বসতি করিয়াছিল তাহারা পরিখা খনন করে—পরবর্তীকালে প্রাচীর তোলা হইয়াছে। বেষ্টিত এলাকার বাহিরের খনন-কার্যদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—প্রথম সভ্যতার সূত্রপাত বাহিরেই হইয়াছিল, তাহাদের ঘরবাড়ী মাটির জিনিসপত্র ও লালমাটির গৃহোপকরণ সাধারণ ও সামান্য।

খনন-কার্যে দেখা যায় রাস্তার উপর আবার রাস্তা নির্মিত হইয়াছে, কাদার সঙ্গে নির্দিষ্ট আকারের পাথরেব টুকরার সাহায্যে নির্মিত পথ আজকাল পল্লীগ্রামে নির্মিত পথ অপেক্ষা অনেক ভাল।

খৃঃ পূঃ ৫০০—২০০ সালের একটি ইষ্টক-নির্মিত জলাধার অনাবৃত হইয়াছে, একটি খালের তলদেশে ও দুই পাশে ইট পাতা। লৌহশিল্প, হস্তিদন্তশিল্প এবং প্রস্তরশিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ ও চারুচিত্র-সম্বলিত শংখবলয়, টেরাকোটা এবং স্থানীয় তাম্রমুদ্রাও অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণা-নদীতীরে নাগার্জুনকোণ্ডা উপত্যকায় খনন-কার্যের ফলে নবপ্রস্তর যুগের (Neolithic period) তিনটি মাথার খুলি ও কিছু মাটির পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এখানে—একদা ইক্ষাকু-বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল, পরে মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

'তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ'

যতঃ সর্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানি চ।
যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥

জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং দ্রষ্টা দর্শন-দৃশ্যভূঃ।
কর্তা হেতুঃ ক্রিয়া যস্মাৎ তস্মৈ জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ॥

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥

—যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

সৃষ্টিকালে যাঁহা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি, বর্তমানে যাঁহাতে স্থিতি এবং পরিণামে যাঁহাতে বিলয় হয়, সেই সৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতেই জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়, দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য এবং কর্তা হেতু ও ক্রিয়া—সবপ্রকার তত্ত্বের স্ফুরণ হইতেছে, সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার।

যে পরিপূর্ণ বিশাল আনন্দসমুদ্রের আনন্দকণা আকাশে ও পৃথিবীতে অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে এবং যে আনন্দময়ের আনন্দ-কণিকা জীবগণের জীবন-স্বরূপ, সেই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।

যিনি স্বর্গে মহীমণ্ডলে ও অন্তরীক্ষে, আমার ও সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজমান সেই সর্বাত্মা ও সর্বাবভাসক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

কথাপ্রসঙ্গে

পরিকল্পনার মূল্যনিরূপণ

পরিকল্পনা লইয়া জল্পনা-কল্পনা শেষ হইয়া এখন সমালোচনা শুরু হইয়াছে, সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই লোকসভা-কর্তৃক 'মুল্যনিরূপণ কমিটি' (Estimates Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল।

সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন—এই পরিকল্পনা কি? কবে ইহার সূত্রপাত? কি ইহার লক্ষ্য?

ইতিহাস

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রুশ-বিপ্লবের পর অতি অল্পকাল মধ্যে পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-সহায়ে অনুন্নত অশিক্ষিত অন্নবস্ত্রাভাবপীড়িত বঞ্চিত অগণিত জনসাধারণের অভূতপূর্ব বিভিন্নমুখী উন্নতি—বিশেষতঃ শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কৃষিতে ও শিল্পে ক্রমোন্নতি সারা বিশ্বকে চমকিত করিয়াছিল। এতদর্থে ঐ দেশে অবলম্বিত উপায় সম্বন্ধে সকলের শ্রদ্ধা না থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্য যে মহৎ—এ কথায় কেহ সন্দেহ করেন নাই।

ভারতীয় নেতাগণও কতকটা মুগ্ধ চিত্তে, কতকটা দেশসেবার প্রেরণায় ১৯৩৮ খৃঃ একটি 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠন করেন, এবং বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি ও দেশসেবকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি খসড়া প্রস্তুত করেন—যাহা তাঁহাদের শুভেচ্ছার, বিদ্যাবুদ্ধির ও জাতীয় চেতনার এক অপূর্ব নিদর্শন।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া এ সকল শুভ-প্রচেষ্টাকে চাপা দেয়। তথাপি যুদ্ধকালে শুধু শিল্পপতিদের রচিত '১৫ বৎসরের জন্য একটি পরিকল্পনা' (Bombay Plan) বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁহারা কেন্দ্রীয় দপ্তরে একটি পরিকল্পনা ও গঠনমূলক বিভাগও স্থাপন করেন।

যুদ্ধশেষে এই সকলই যুদ্ধোত্তর গঠন-পরিকল্পনার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। তাহারই পরবর্তী ঘটনা—বৃটিশ-কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর। এতদিনে ভারতীয় নেতাগণ তাঁহাদের স্বপ্ন সফল করিবার সুযোগ পাইলেন। পরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের 'জাতীয় পরিকল্পনা' পরিবর্ধিত হইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকারে দেখা দিল।

প্রথম পরিকল্পনা

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে আংশিক স্বাধীনতা, তাহা অনুন্নত দেশগুলির সহিত শিল্পোন্নত দেশগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। অতএব ভারতের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজন—অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নয়ন, ইহা লক্ষ্য করিয়াই ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদের পরিচ্ছেদের প্রান্তে বাঁধা ভারতের অর্থনীতি ছিল একান্ত ভাবে কৃষি-নির্ভর এবং শাসনতন্ত্র ছিল শোষণ-যন্ত্র, সেখানে সামাজিক উন্নতি বা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আশা করা বৃথা। দেশের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যের চরম সীমায় বাস করিত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতে সংঘটিত না হইলেও সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-প্রয়োজনে ভারতের জনগণ নানাপ্রকারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, সর্বশেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছে স্থায়ী দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, স্বাধীনতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত উদ্বাস্তু-সমস্যা খণ্ডিত বাংলার দারিদ্র্য দুঃখ ও অভাব এখনও অভাবনীয় ভাবে বর্ধিত করিতেছে।

এ কথা খুবই সত্য যে ভারতের মতো বিরাট

একটি অনুন্নত সত্যোবিদেশীশাসনমুক্ত দেশ পাঁচ বা দশ বৎসরে তাহার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করিতে পারে না, তথাপি প্রচেষ্টার প্রথম স্তরেই তাহাকে পরবর্তী উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া কাজে হাত দিতে হইবে। কৃষির উন্নতি দ্বারা খাদ্যের অভাব দূর করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিতে হইবে, শিল্পের সাহায্যে হইবে কর্মসংস্থান, ভোগ্যপণ্য-উৎপাদন ও বিদেশী মুদ্রা-উপার্জন। জাতীয় জীবনে একটির সঙ্গে অপরটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাই পরিকল্পনাকে দেখিতে হইবে একটি সমগ্র দৃষ্টি লইয়া।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রধানতঃ খাদ্য-উৎপাদনের এবং কৃষির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়। মোট ২,০৬৯ কোটি টাকা সরকারী বিনিয়োগের

শতকরা অংশ	বিভাগে ব্যয়িত
১৭৫	কৃষি ও পল্লীসংগঠন
১৩	বাঁধ-নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ
৮	সেচ
৬	বিদ্যুৎ
৮৫	শিল্প
১৩	সমাজসেবা, পুনর্বাসন প্রভৃতি
২৪	যানবাহন ও যোগাযোগ

এই বিনিয়োগ (investment) হইতে আমরা প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। মোট বিনিয়োগের অর্ধেকের কিছু কম পল্লীর জন্য ব্যয়িত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা প্রধানতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা, সঙ্গে সঙ্গে ইহার ফল আশা করা যায় না। তথাপি খাদ্য-ব্যাপারে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কারণ দুইবার স্বাভাবিকভাবেই ভাল ফসল হয়। যদিও 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন যুদ্ধের সময়েই শুরু হইয়াছিল, এই সময় তাহা নূতন উদ্দীপনা লাভ করে।

নানাদিকে সাফল্যের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উৎসাহের সঞ্চার করে। হিসাবে ধরা হইয়াছিল—জাতীয় আয় বাড়িবে ১১%, কিন্তু শেষে দেখা গেল বাড়িয়াছে ১৭৫%, যদিও জনসংখ্যা ২'৫ কোটি বৃদ্ধির জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া দাঁড়ায় ১০%।

পরিকল্পনানুযায়ী পল্লীসংগঠন-কার্য ১৯৫২ খৃঃ শুরু হইয়া পাঁচ বৎসরে প্রায় ১০০০ কেন্দ্রে ১,৪০০০০ গ্রামে ৭৮ কোটি লোকের সেবা করিয়াছে। পরিকল্পনাকারীদের মতে ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কাজ, কারণ পল্লীর এই জাগ্রত জনগণের মাধ্যমেই প্রকৃত গণতন্ত্রী ভারত জাগিয়া উঠিতেছে, ভবিষ্যতে সমবেত স্বার্থে দেশের উন্নতির জন্য তাহারাই বদ্ধপরিকর হইবে।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগে: আগে অর্থনৈতিক সংগঠন, না আগে সামাজিক কর্মসূচী? দুইটির কোনটিকে উপেক্ষা না করিয়াই বলিতে হয় আগে মানুষ চাই, তাহার জন্য প্রয়োজন সমাজশিক্ষার কর্মসূচী—যথা: শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, স্বাস্থ্যবান্ শিক্ষিত দেশবাসীই যথার্থ কল্যাণকর অর্থনৈতিক সংগঠনের ভার লইতে পারে। নতুবা অর্থনৈতিক উন্নতি মাত্র কয়েকজনকেই স্ফীত করিবে, সম্ভবতঃ এখন তাহাই করিতেছে। মধ্যবিত্ত স্তর নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে, কারণ ১০০% দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির তুলনায় ১০% আয়বৃদ্ধি নিছক অঙ্কেরই হিসাব।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রাথমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে ২'২ কোটি হইতে ৩ কোটি, শিল্পশিক্ষার ক্রমপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে, স্বাস্থ্যবিভাগে রোগীর শয্যা-সংখ্যা ১১৩০০০ হইতে বাড়িয়া ১২৫০০০ হইয়াছে, ইহা ছাড়া পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির প্রচেষ্টায় ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া প্রভৃতি রোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা প্রায় সফল হইয়াছে।

জমিসংক্রান্ত আইন চাষীদের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। তথাপি স্বীকার করিতে হয় গ্রামেও বেকার-সংখ্যা (২৮ লক্ষ) শহরের বেকার-সংখ্যার (২৫ লক্ষ) মতোই বাড়িয়া চলিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই এই সমস্যা-সমাধানের জন্য শিল্পের উপর বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। এই দশ বৎসরে নূতন ১ কোটি বেকার আসিবে, আর পূর্বের রহিয়াছে ৫৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে অনেকে অত্যন্ত সাহসপূর্ণ পরিকল্পনা বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন—ইহার উদ্দেশ্য :

(১) ২০% আয়বৃদ্ধি ও সাধারণভাবে জীবনের মান-উন্নয়ন।

(২) দ্রুত শিল্পায়ন—মৌলিক ও ভারী (basic and heavy) শিল্প-প্রতিষ্ঠা।

(৩) ব্যাপক কর্মসংস্থান—(অন্ততঃ ৮০ লক্ষ লোকের)।

(৪) আয় ও সম্পদের অসাম্য দূরীকরণ।

পল্লীসংগঠনের অঙ্গহিসাবে কুটীর-শিল্প সম্প্রসারণ-কার্যও হাতে লওয়া হইয়াছে—যাহাতে বাকী কয় বৎসরে ভারতের বাকী সব গ্রামে উহা ব্যাপ্ত করা যায়—এইরূপই পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু অর্থাভাবে হয়তো এতটা সম্প্রসারণ সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের কার্য পর্যালোচনায় সর্ববিধ অবস্থা অনুকূল না থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় মোটামুটি কাজ অগ্রসর হইয়াছে। সহসা কতকগুলি বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে প্রধান—সুয়েজ-সঙ্কট এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়।

সমালোচনা

প্রথম পরিকল্পনার নব-উন্মাদনায় শাসক-দলের সমর্থকরা মত্ত ছিল, আর বিরোধীরা সমালোচনার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনাতেই সমালোচনা শুরু হয় প্রধানতঃ শাসকদলেরই পূর্বতন সহকারীদের পক্ষ হইতে। তাঁহারা বলেন এত ব্যাপক কলকব্জা ও শিল্পায়ন গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল না, ইহা দ্বারা দেশের শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক ও পল্লীবাসীর বিশেষ কোন উপকার হইবে না। তাছাড়া পঁচিশ বৎসরের উন্নতি পাঁচ বৎসরে করিতে গেলে জনসাধারণ অযথা কর-ভারে নিষ্পেষিত হইবে। ধীর স্থির ও নিশ্চয় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই ক্রম-বিকাশের পথ। এই পরিকল্পনা দরিদ্র ভারতের উপযুক্ত নয়। ইহা দ্বারা ধনী আরও ধনী হইবে, দরিদ্র আরও দরিদ্র হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আরম্ভের পূর্বে আবাদী কংগ্রেস অধিবেশনে বিঘোষিত হইয়াছিল ভারত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করিতে চলিয়াছে, কিন্তু সমালোচকরা বলেন, এই পরিকল্পনা উহাতে সাহায্য করিবে না।

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এই পরিকল্পনাকে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিকগণ 'too ambitious a plan' (অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ পরিকল্পনা) আখ্যা দেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি একথাও বলেন, 'জনবহুল ভারতে এত যান্ত্রিকতার (automation) প্রয়োজন নাই, উহা বেকার বাড়াইবে।' বিদেশীর এই উক্তি স্বার্থদুষ্ট মনে না করিয়া গান্ধীনীতির আলোকে ইহার সত্যতা যথাসময়ে না বুঝিলে ভয়াবহ বেকার-সমস্যা সকল পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিতে পারে।

আমরা বিরোধীদলের সমালোচনা এখানে তুলিব না, কারণ তাঁহাদের সমালোচনার উদ্দেশ্য বহুমুখী, তবে যাঁহারা দেশের কল্যাণে ও পরি-

কল্পনা-রূপায়ণে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া যদি শুধু পরিকল্পনার জয়গান করি, তবে তাহাও হইবে উটপাখির আত্মরক্ষার মতো।

গত ৭ই জুন Hindusthan Standard-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোক নিক্ষেপ করে :

Acharya Vinoba Bhave, Prime Minister Nehru and Mr. A. D. Gorwala are basically such dissimilar persons that their agreement on the Government's *failure to plan for the villages* is the most remarkable recent case of agreement which proves how easy it is to agree on a negative view. It is obvious, however, that the three leaders will fall apart the moment they attempt to agree on a positive substitute for the official method of planning and the contents of the Plan unless they are to agree on the doing away with planning altogether Whatever the imperfections of the Plan, the search for an agreed substitute is bound to prove slightly more futile than the present frustrations.

—আচার্য বিনোবা ভাবে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং মিস্টার গোর-ওয়ালা [Retired I.C.S] ব্যক্তিহিসাবে মূলতঃ এতই ভিন্ন যে গ্রামের উন্নতিকল্পে সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাঁহাদের একমত হওয়া সম্প্রতিকালের ঐকমত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। দেখা যাইতেছে নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে একমত হওয়া কত সহজ। ইহাও স্পষ্ট যে এই নেতা তিনজন যখন সরকারী পরিকল্পনার পরিবর্তে আর একটি পরিকল্পনা দিবার চেষ্টা করিবেন তখনই তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন, অবশ্য যদি তাঁহারা একেবারেই পরিকল্পনা করা ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হন। চালু পরিকল্পনা যত অসম্পূর্ণই হউক, একটি সর্বসম্মত বিকল্প পরিকল্পনা বর্তমান বিফলতা অপেক্ষা আরও একটু ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

সমালোচনা আজ আত্মনিরীক্ষার পর্যায়ে উপস্থিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সকলের উদ্দেশ্য দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ। উপায় লইয়াই যত বিরোধ। এতদিন আমরা বলিতাম বিদেশী শাসনাধীনে উন্নতি অসম্ভব, আজ আর তাহা বলিলে চলিবে না। এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে অগ্রগতি কেন ব্যাহত হইতেছে।

প্রথমে মনে করা হইয়াছিল—পরিকল্পনা আমলাতান্ত্রিক এবং দপ্তর-কেন্দ্রিক, তাই বুঝি জনগণের প্রয়োজনমত সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে না। আসলে তাহা নয়। জনগণ শিক্ষিত না হইলে এত বড ব্যাপার তাহারা কল্পনাই করিতে পারে না, তাহাদের পরিকল্পনা, মাটির দেওয়াল-ঘেরা তাহাদের সংসারটুকু ও তাহাদের চাষের জমিটুকু লইয়া, সমাজ বড জোর তাহাদের পল্লীটুকু লইয়া। প্রচলিত ভাবের পরিবর্তন না করিয়া দিল্লী হইতে হিন্দী বা ইংরেজীতে কোন খসডা লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রথমটা তাহারা কিছু বুঝে না, পরে মনে করে বাবুদের কোন মতলব আছে, আমাদের নিকট হইতে আরও কিছু আদায় করিতে চায়, অথবা ভোটের জন্য আসিয়াছে।

সরকার ও জনগণের মধ্যে আর এক শ্রেণীর আধা-সরকারী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—তাঁহারা গ্রামবাসীদের নিকট বড় বড় আদর্শের বুলি সরবরাহ করিয়া বলিয়া থাকেন, 'তোমরা পরিশ্রম কর, ত্যাগ স্বীকার কর, তোমাদের সন্তান-সন্ততি সুখে থাকিবে, আজ না হয় বিশ বছর পরে—সকলে সুখে ভাসিবে।' এ জাতীয়

আদর্শবাদ চাষী জেলে মাঝি বুঝে না, তাহাদের বাজেট বার্ষিক নয়, দৈনিক, চাষীর পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক নয়, অর্ধ-বার্ষিক। তাহাদের ভাষায় তাহাদের ভাব বুঝিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতে হইবে। তাহাদের অভাব বুঝিয়া রাজধানীতে পরিকল্পনার প্রস্তাব পাঠাইতে হইবে। পরিকল্পনার সৌধ গড়িয়া উঠিবে নীচে হইতে উপরে, পরিকল্পনা জলের স্রোত নয় যে উহা উপর হইতে নীচে নামিবে।

মুখরোচক শ্লোগান-প্রচারে ভোট সংগ্রহ হইতে পারে, জীবনগঠনে ইহাদের মূল্য কতটুকু? 'Destination : man—আমাদের লক্ষ্য মানব' অর্থ না বুঝিয়া এই প্রচারবাণী আওড়াইলে পল্লী-উন্নয়ন-বিভাগে কয়েকজন কর্মচারীর কর্মসংস্থানই হইতে পারে, মনুষ্যত্ব-লাভের পথে জাতির অগ্রগতি হইবে কি? প্রতিটি গ্রামে নিঃস্বার্থ সেবক-পরিচালিত একটি কল্যাণ-কেন্দ্র গ্রামবাসীর মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে পারে, গ্রামের কল্যাণে নবচেতনালব্ধ গ্রামবাসীর সহযোগিতা আপনা হইতেই আসিবে, বলিতে হইবে না। 'বাণী' অনেক আসিয়াছে, এখনও আসিতেছে। স্বরাজের অর্থ 'স্ব-রাজ' হইয়াছে, 'রামরাজ্য' এখন গ্রামরাজ্যের অভিমুখে। শুধু অপেক্ষা—কর্মক্ষেত্রে এগুলির যথার্থ রূপায়ণ।

'Destination : man—মানুষই আমাদের লক্ষ্য'—তবে মানব-কেন্দ্রিক পরিকল্পনাকে প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হইতে হইবে কারণ, 'জাতি বাস করে গ্রামে'—একথা বহু-উচ্চারিত বলিয়াই হেয় নয়, অতি সত্য। ভারতের মানুষ প্রধানতঃ গ্রামবাসী ছিল বলিয়াই সহস্র বৎসরের বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণের তরঙ্গ তাহাকে তত বিক্ষুব্ধ বা কেন্দ্রচ্যুত করে নাই, যত করিতেছে বর্তমানে শহরমুখী অভিযান, এবং কারখানা ও যন্ত্রশিল্পের প্রচলন। এ যুগের বিজ্ঞানলব্ধ সুখসুবিধা—যতটা সম্ভব অবশ্যই গ্রামে লইয়া যাইতে হইবে; কৃষির সহিত সমবায়-ভিত্তিক কুটির-শিল্প মিশাইয়া গ্রামের মানুষকে গ্রামে রাখিতে হইবে। অভাবের তাড়নায় তাহাদের শহরমুখী অভিযানে জাতীয় জীবনের কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবে।

উপসংহার

দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষে—তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলিতেছে, ইহাতেই প্রমাণিত হয় অনুন্নত বা অল্প-উন্নত দেশে সুদীর্ঘ ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। একবার আরম্ভ করিয়া আর মধ্যপথে থামা চলিবে না, ইহা চলিতেই থাকিবে।

গত আট বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে পরিকল্পনায় কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে: প্ল্যানিং কমিশনের সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সম্বন্ধ কি? রাজ্যসভাগুলির সহিতই বা তাহার কি সম্বন্ধ? পরিকল্পনার পদ্ধতির কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন—যাহাতে ইহার প্রচেষ্টা জনগণের সর্বাধিক কল্যাণকারী হইতে পারে?

লোকসভা কর্তৃক নিযুক্ত মূল্য-নিরূপণ কমিটি (Estimates Committee) কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: প্ল্যানিং কমিশন কার্যকারী সমিতি নয়, প্রধানতঃ ইহা উপদেষ্টা সমিতি, সকল দিক বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনা-প্রণয়নে তাঁহারা সাহায্য করিবেন এবং স্বাধীনভাবে ফলাফল বিচার করিয়া ইহার মূল্য নিরূপণ করিবেন। প্রথমে প্রয়োজন থাকিলেও এখন আর প্ল্যানিং কমিশনে প্রধান মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা পরিকল্পনা-মন্ত্রীরও উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। মন্ত্রীদের উপস্থিতি প্ল্যানিং কমিশনকে খর্ব করিয়া দেয়, তাঁহারা তাঁহাদের কাজ ঠিকমত করিতে পারেন না। প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীদের মন্ত্রণা তো সর্বদাই প্রাপ্তব্য।

বর্তমানে প্ল্যানিং কমিশনের কাজ—রাজ্য ও

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বার্ষিক কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া পরিবর্তন বা সংশোধন করা, ইহাতে মন্ত্রীসভাও ক্ষুণ্ণ হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্য অনায়াসেই মন্ত্রীসভার উপর নির্ভর করা চলে, এবং তাহাতে কাজও দ্রুত অগ্রসর হয়। প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান কাজ—দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা, তথ্য-সংগ্রহ, আসন্ন চরম সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত এবং রূপায়িত পরিকল্পনার ফলাফল বিচার।

শিল্পোন্নতি ছাড়াও অনেক কাজ বাকী, যথা: দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র অবাধে চলাচলের জন্য পথ ও যানবাহনের সুবিধা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য সেচ-ব্যবস্থা, পতিতজমি-উদ্ধার ও ভাল সার ও বীজ বিতরণ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দাবা-সরবরাহ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেন এখনও সর্বত্র প্রচলন করা সম্ভব হয় নাই—সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান, ক্রমবর্ধমানভাবে স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, এবং আর একটি পরিকল্পনা—যাহার অভাবে শহর-জীবন দুর্বহ হইয়াছে এবং গ্রামে জীবন অসহ হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে নগর-পরিকল্পনার সহিত গ্রাম-পরিকল্পনা না করিলে উভয়ত্র জীবনের ভরকেন্দ্র (centre of gravity) স্বস্থানচ্যুত হইবে এবং এক বিপর্যয় দেখা দিবে—তাহার আভাস আধুনিক জীবনে যথেষ্ট দেখা যাইতেছে। গতিশীল জীবনের একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল কেন্দ্র না থাকিলে উহার গতি উল্কা বা ধূমকেতুর মতই হইবে, ইহা অবশ্যই কাহারও অভিপ্রেত নয়। মনীষা ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত সহৃদয় পরিকল্পনাতেই জাতি তাহার হারানো ভরকেন্দ্র ফিরিয়া পাইতে পারে। দীর্ঘকাল অধঃপতিত এই বিরাট জাতির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা-রচনা একটা উন্মাদনা নয়, উদ্দীপনামাত্র নয়—শান্ত ধীর এক গভীর সাধনা।

* * *

ভারতের স্বাধীনতা লাভের একাদশ বার্ষিক শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা স্মরণ করি স্বামীজীর জলদগম্ভীর স্বদেশ-মন্ত্র:

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?

এই 'বীরভোগ্যা স্বাধীনতা' রক্ষা করিবার জন্য—দেশব্যাপী আলস্য ঔদাসীন্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, 'মা, আমাদের দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, মা, আমাদের মানুষ কর।'

বৈদেশিক সহায়তার উপর কখনও নির্ভর করিও না—ইহাই যথার্থ দেশাত্মবোধ। কোন জাতি যদি ইহা করিতে অপারগ হয়, বুঝিতে হইবে—তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার এখনও দেরী আছে। অপেক্ষা করা ছাড়া তাহার উপায়ান্তর নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কারা ডাকে ?

'অনিরুদ্ধ'

কারা ডাকে নানা স্বপ্নে অবিরাম মোরে
দিবালোকে দিনশেষে নিশীথে ও ভোরে ?
শুধু কি মানুষ রাখে প্রীতিতে টানিয়া
শুধু কি চেতন প্রাণী যায় ডাক দিয়া ?

আকাশ বাতাস মাঠ লতা ফুল ফল
নদী ও পাহাড় শুধু করে কি বিহ্বল ?
শুধু কি সুন্দর মোরে দেয় হাতছানি
শুনিনু কি শুধু এই পৃথিবীর বাণী ?

নাই নাই, সীমা নাই, অশেষ আহ্বান
অন্তহীন চরাচরে ধ্বনিতেছে গান।
ডাকিছে আলোক মোরে ডাকিছে আঁধার,
এপারের সঙ্গে ডাকে দূর পরপার।
আমারি আহ্বান কিরে ওঠে আমা হ'তে
আমারি স্বরূপ কি রে জাগে বিশ্বস্রোতে ?

তীর্থযাত্রী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দেবমূর্তি, দেবীমূর্তি, শিলাখণ্ড কিংবা শালগ্রাম,
যেই তীর্থে রোক—আর যাই হোক নাম,
ভগবান বলি কেহ
রহে যদি নিঃসন্দেহ—
তাঁরে ভক্তি অর্পণের রহে যদি দাম,
তবে অই তীর্থযাত্রী--
চলেছে যে দিবারাত্রি
শত যোজনের ক্লেশ সহি' অবিরাম,
চলিয়াছে কষ্টে হাঁটি
পঙ্গু পদে ধরি' লাঠি
আপনার ইষ্টদেবে একবার করিতে প্রণাম।
যোগী ঋষি জ্ঞানী যত
কেবা ভক্ত তার মত
তাহারি তো অধিগম্য যদি থাকে দিব্যানন্দধাম।

সন্ন্যাসীর মন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সন্ন্যাসীর মনের আদি ও অকৃত্রিম পরিচয়—বোধ করি জন্ম-সন্ন্যাসী শুকদেব গোস্বামীর আচরণের মধ্যেই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতেই সেই মন তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, অতএব পৃথিবীর শিক্ষা-দীক্ষার আর প্রয়োজন হইল না, ব্রাহ্মণ-কুমার—কিন্তু উপনয়নেরও পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিলেন না। কাহারও দিকে না তাকাইয়া কাহারও দাবি স্বীকার না করিয়া, না ডাহিনে—না বামে, সোজা চলিলেন। কিন্তু পিতা ব্যাসঠাকুরের মনটি তো আর সন্ন্যাসীর মন নয়। কত আশার, কত প্রতীক্ষার বুকের মানিক এমনি করিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে? বিরহকাতর বৃদ্ধ তাই ব্যাকুল হইয়া পিছু লইলেন—বাল-সন্ন্যাসীকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন,—পুত্র, পুত্র!

সন্ন্যাসীর মনে কাহারও প্রতি মায়িক সম্বন্ধ-বোধ নাই, অতএব পিতার সেই ডাক শুনিতে পাইলেও শুকদেব ফিরিয়া বলিতে পারিলেন না,—পিতা এই যে আমি। ডাকিতেছেন কেন? এদিকে বৃদ্ধ ব্যাসের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরও থামে না। সন্ন্যাসীর মন পাথরের মন নয়, মানুষেরই মন। সেই মানুষের মনে মানুষের হৃদয় বেদনা আঘাত করিল। শুকদেব থামিলেন। শোকার্ত ব্যাসকে একটু মিষ্ট কথা বলিয়া শান্তি দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। দিলেনও, কিন্তু কাছে আসিয়া নয়, যোগবলে বৃক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া, বৃক্ষের মর্মর শব্দে মানুষের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া সান্ত্বনা বাক্য শুনাইলেন। ইহা প্রতারণা নয়, করুণা। সন্ন্যাসী জানিতেন, মায়ার প্রতীকার মায়া নয়, বিবেক—তত্ত্বজ্ঞান। মানুষের দেহে কাছে আসিলে ব্যাসদেবের পুত্রমায়া আরও বাড়িয়া যাইত। বৃক্ষের ভিতর হইতে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুনি আশ্চর্য হইলেন, লজ্জা পাইলেন। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইল, তবে চিত্তনিবেশ করিয়া পুত্রের অবিলুপ্ত সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তা অনুভব করিলেন, শান্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন।

সন্ন্যাসী শুকের মন মায়ানির্মুক্ত, কঠোর—কিন্তু দয়া-বিগলিত, অতি-কোমল। সন্ন্যাসীর মনে মায়া নাই, দয়া আছে, দয়া থাকিতে বাধা নাই। সন্ন্যাসী শুক পরে—বেশ কিছুকাল পরে ব্যাসদেবের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধের হৃদয় হইতে পুত্রের দাবি কাটিয়া গিয়াছে, মায়ার উত্তেজনা নাই। শুকদেব আসিয়াছেন শিষ্যরূপে। ব্যাসদেব শাস্ত্রার্থ আলোচনা করিতেছেন। শাস্ত্রমর্ম শুকের জীবনে অভিব্যক্তিত, তাঁহার নিজের জন্য শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন নাই, তথাপি লোক-প্রয়োজনে শাস্ত্রশিক্ষায় কুণ্ঠিত হইতেছেন না। লোক-প্রয়োজনে আত্মব্যাপৃতি সন্ন্যাসীর মনে আসক্তি-প্রণোদিত নয়, দয়া-প্রণোদিত। সন্ন্যাসী মায়াকে বর্জন করিবার জন্য গৃহসংসার ত্যাগ করেন, কিন্তু মায়া জয় করিয়া বৃহৎ সংসারে ফিরিয়া আসেন, মানুষের সেবা করেন। সেই বৃহৎ সংসার তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। বন্ধন মায়াতে, দয়াতে নয়। সন্ন্যাসী যখন আত্মীয়-স্বজনের উপর মমত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করেন তখন তাঁহার মন বজ্রদৃঢ়, আবার সেই তিনিই যখন সর্বভূতে শ্রীহরি রহিয়াছেন জানিয়া নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য দিয়া আবালবৃদ্ধনরনারীর সেবায় লাগিয়া যান তখন তাঁহার মন পুষ্প অপেক্ষাও কোমল। মমত্ববুদ্ধির উপর দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মনের নাগাল পাওয়া যায় না। শ্মশানে বসিয়া শ্মশান-চারী সন্ন্যাসীকে দেখিতে হয়, তখন দেখা যায়

সন্ন্যাসী শ্মশানে মশানে বেড়াইলেও বুকের ভিতর লতাপল্লবশোভিত অতি সুরম্য এক পুষ্পবাটিকা লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন।

সন্ন্যাসী শুকের মনের আর একটি চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার বয়স তখন ষোড়শ বৎসর মাত্র। অতি মনোরম দেহাকৃতি। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু যাঁহার দেহ, তাঁহার মনে দেহের অস্তিত্ব-বুদ্ধিটা পর্যন্ত নাই, উহার সমাদর তো দূরের কথা। যদৃচ্ছাক্রমে সন্ন্যাসী শুক মূক ও জড়ের ন্যায় পৃথিবী পর্যটন করিয়া বেড়ান, একটি গাভী দোহন করিতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু পর্যন্ত এক জায়গায় থাকেন না। সংসারে তাঁহার চাহিবার কিছু নাই, পাইবারও কিছু নাই। আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত তাঁহার মন। কিন্তু সেই পরম নির্বিণ্ণ শুক একদিন গঙ্গাতীরে বিপুল এক উত্তেজনার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতসম্রাট্ পরীক্ষিৎ ঋষিশাপগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন। সাতদিন মাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে, ধার্মিক সম্রাট্ তাই রাজ্যসম্পদ এবং আত্মীয় পরিবার ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে অনাহারে তপশ্চর্যা করিতে বসিয়াছেন। সম্রাটের যমজয়ী মহাযাত্রা দেখিতে এবং তাঁহাকে কালোপযোগী সদুপদেশ দিতে ঋষি মুনি ও সজ্জনদের ভিড় লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি—যে যেখানে ছিলেন সকলেই উপস্থিত। আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন মুহুর্মুহু দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে। হর্ষ ও বেদনা, শোক ও পরিতৃপ্তি, আশঙ্কা ও শান্তির সংমিশ্রণে এক আশ্চর্য উত্তেজনাময় শুদ্ধ পরিবেশ। এমন সময়ে দৃশ্যপটে অবধূতবেশী শুকের প্রবেশ।

শত শত চোখ এক সঙ্গে তাঁহার উপর সন্নিবদ্ধ হইল।

দেবর্ষিরা বলিলেন,—চিনিয়াছি!

মহর্ষিরা বলিয়া উঠিলেন,—আশ্চর্য।

রাজর্ষিরা প্রতিধ্বনি তুলিলেন,—অহো ভাগ্যম্।

সন্ন্যাসীকে চেনা কঠিন তো বটেই। লোক-সঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী শুক অযাচিতভাবে ভিড় ঠেলিয়া ভিড়ে যোগদান করিতে আসিবেন,অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার বইকি। কিন্তু আসিয়াছেনই যখন, ধর্মপ্রাণ মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তিম কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়া যান। ঋষি মুনিরা তো কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। কেহ বলিতেছেন পরীক্ষিতের আশু কর্তব্য 'যাগ', কেহ উপদেশ দিতেছেন 'যোগ,' কেহ 'তপস্যা'ই কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন, আবার কেহ বা 'দান'-এর কথা কহিতেছেন। বহু মত—বহু উপদেশের মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুযাত্রী পরীক্ষিৎ মহারাজের মানসিক অস্থিরতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দেখা যাক সন্ন্যাসী শুক কি বলেন?

সন্ন্যাসীর পুঁজি তাঁহার জীবন-গ্রন্থ। বিচার-পটুতা, শাস্ত্রোদ্ধৃতি ও শব্দবিন্যাসে তাঁহার শক্তি নয়, তাঁহার শক্তি স্বকীয় জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যে। লোকানুরঞ্জন তাঁহার লক্ষ্য নয়, তাঁহার লক্ষ্য সত্য। সন্ন্যাসী কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া স্পষ্ট কথা বলিয়া যান। সকলের ভাল লাগে না, কিন্তু সন্ন্যাসীও নিরুপায়। মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকদেব প্রথম যে কথাগুলি বলিলেন তাহা আদৌ মিষ্ট নয়—গম্ভীর রূঢ় বৈরাগ্যবাণী।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—২।১।২-৫)

—'মহারাজ, পৃথিবীর শতসহস্র মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য মিলাইয়া আপনার নিজের করণীয় ঠিক করিবার সময় এখন নয়। সংসারী লোক কি লইয়া আছে?—আহার-নিদ্রা-মৈথুন। দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র-ধন-সম্পদের মোহে তাহারা আত্ম-সম্বিৎহারা। সম্মুখে মৃত্যু, কিন্তু তাহাদের হুঁশ নাই। দিবারাত্র কত কিছুর পিছনে তাহারা ছুটিতেছে, কত কিছু শুনিতেছে, কত কিছু বলিতেছে, কিন্তু সবই তাহাদের অকাজ, সবই নিষ্ফল। জীবনের পরমশ্রেয়ের পথে এক পাও তাহারা আগাইতেছে না। এই গৃহমেধীদের দলে নিজেকে ভিড়াইয়া আপনি প্রবঞ্চিত হইবেন না। সরিয়া আসুন, মহারাজ। মৃতের সংকার মৃতেরা করুক, আপনি সংসার হইতে মন তুলিয়া লইয়া সংসার-সার শ্রীহরির চিন্তায় নিমগ্ন হউন। বৈরাগ্যের আগুনে শাস্ত্রাচার লোকাচার ইহকাল পরকাল সব পুড়িয়া ছাই হোক।'

বৈরাগ্যের কথা বলিতে সন্ন্যাসী ভয় পান না, কুণ্ঠিত হন না। বস্তুত সন্ন্যাসীর সমগ্র মনটিই নির্বেদ-রঙে রঞ্জিত। তাঁহার এই বৈরাগ্য কিন্তু একটি নেতিমূলক ফাঁকা বস্তু নয়। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞান অথবা ভগবৎপ্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। যে ব্যক্তি পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে পশ্চিমদিক তো পিছনে রাখিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বাভিমুখী স্থিতিটাই তাহার প্রকৃত পরিচয়, পশ্চিমে পিছু-ফেরাটি নয়। সন্ন্যাসী যে পরমাত্মস্বরূপকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন—এই সত্য বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যায় সংসারী জন যে সব বস্তু পরম রমণীয় বলিয়া মনে করে তিনি সে সকল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। উহারই প্রচলিত নাম বৈরাগ্য। কিন্তু সরিয়া আসাটাই বৈরাগ্যের আসল রূপ নয়; বৈরাগ্যের প্রকৃত মূর্তি শ্রীভগবানে ঐকান্তিক প্রীতি।

সন্ন্যাসী যখন ভগবানের কথা বলেন তখন সেই কথার মধ্যে আগুন মিশাইয়া দেন। —বৈরাগ্যের আগুন। নতুবা ভগবৎ-কথা শুধু পোষাকী কথা হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসী পোষাকী কথা বলিতে জানেন না, বলিতে চান না। তাঁহার কথা শুধু মুখের কথা নয়, প্রাণের গভীরতম ব্যথা—যে ব্যথার দাহে লোক-লোকান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের সব আশা আকাঙ্ক্ষা অন্বেষণ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায় সেই ব্যথা।—আত্মার বিরহে তৃষিত আত্মার অনাদিকালের দুর্বার দুঃসহ অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার মূল্য নিরূপণ করা সংসারীর পক্ষে কঠিন বইকি। অবধূত তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়া পথেঘাটে বলিতেন না। চুপ করিয়া থাকিতেন। বেগুনওয়ালার নিকট জহরৎ বেচিতে যাইবার বিড়ম্বনাভোগে কি প্রয়োজন? কিন্তু মহারাজা পরীক্ষিতের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার হৃদয় সন্ন্যাসীর কথা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল। তাই অবধূত শুক ও ভিড় ঠেলিয়া গঙ্গাতীরের সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিড় সন্ন্যাসীর ভাল লাগে না, লাগিবার কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি উহাতে পশ্চাৎপদ হন না, নিজের প্রয়োজনে নয়, ব্যাকুল ভগবদ্‌বিরহীদের প্রয়োজনে।

* * *

ভগবানের জন্য আউল হইয়া যাওয়া শুধু ভারতবর্ষেই ঘটে নাই। সকল মানুষের যিনি এক ভগবান তাঁহার জন্য এই বিপুলা ধরণীর কোন্ কোণ হইতে কখন কোন্ মানুষের প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু কাঁদিয়া যে উঠে তাহা অত্যন্ত সত্য কথা। যাহার প্রাণ ঠিক ঠিক কাঁদে সে বহুক্ষেত্রে ঘরে থাকিতে পারে না। ঘরের বাহিরে প্রকৃত ঘর—চিরকালের ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়। ঘরের ভাষা তাহার কাছে নিরর্থক। শুকদেব ব্যাসঠাকুরের 'পুত্র' 'পুত্র' ডাকের অর্থ

খুঁজিয়া পান নাই। সুদূর গ্যালিলি হ্রদের (Sea of Galilee) তটে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর একজন জগৎ-পাবন ফকীরের কথা মনে পড়ে। তিনিও ঘরের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রভু, আপনার মা ও ভাইরা পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।

যীশুর উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

—মা? ভাই? কে মা, কারা ভাই? (হাত দিয়া নিজের ত্যাগী শিষ্যদের দেখাইয়া) দেখ, এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাই।

বালক শঙ্কর তিন বৎসর বয়সে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। মা ছাড়া শিশুকাল হইতে আর কোনও প্রিয়জনকে তিনি চোখে দেখেন নাই। জননী বিশিষ্টার সারা চিত্ত যেমন পুত্রের উপর পড়িয়া থাকিত, বালক শঙ্করও ছিলেন তেমনি একান্তভাবে মাতৃগতপ্রাণ—শাস্ত্রাভ্যাসের ফাঁকে ফাঁকে সর্বদা জননীর সেবা ও গৃহকার্যে সহায়তা করিতে উন্মুখ। দুঃখিনী ব্রাহ্মণী, বালককে ঘেরিয়া কতই না ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু বালকের ভিতর যে সন্ন্যাসীর মন বাসা বাঁধিয়াছে তাহা তো তিনি জানিতেন না। যেদিন জানিলেন সেদিন বিস্ময়ে, ক্ষোভে, বেদনায় স্তব্ধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়—নির্বাক্ না হইয়া তাঁহার আর অন্য কি উপায় ছিল? প্রখর মেধাবী শঙ্কর কি বুঝিতে পারেন নাই—অসহায় জননীর হৃদয়ে এই আঘাত কত প্রচণ্ড? কিন্তু তবুও তিনি ঘরে রহিলেন কি? ঘরের কোন্ ভাষা দিয়া সন্ন্যাসীর এমনতর মনের বর্ণনা করিব?

নির্মম? স্বার্থপর? বিবেকশূন্য? কাপুরুষ? দায়িত্বজ্ঞানহীন?

না, কোন শব্দটিই প্রয়োগ করা চলে না। আচার্য শঙ্করের সমগ্র জীবন বিচার করিলে কোন কটূক্তিই তাঁহাকে করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া গর্ভধারিণী জননী তাঁহার হৃদয়ে কি বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহার নিশ্চিত প্রমাণও লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য বেদান্ত-ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণান্তে শৃঙ্গেরীতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন শিষ্যগণকে বেদান্তের পাঠ দিতে দিতে জিহ্বায় মাতৃস্তন্যের আস্বাদ অনুভব করিলেন। বুঝিলেন জননীর অন্তিম সময় উপস্থিত, তাই তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। গৃহত্যাগ করিবার সময় শঙ্কর মাতাকে কথা দিয়াছিলেন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে দেখা দিবেন এবং ইষ্টদর্শন করাইবেন। বেদান্তালোচনা স্থগিত রহিল। শঙ্কর মৃত্যুশয্যাশায়িনী জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টা দেখিলেন, কই এ তো দিগ্বিজয়ী ভারতপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যতিরাজ শঙ্করাচার্য নয়, এ যে তাঁহার সেই মাতৃগতপ্রাণ অষ্টমবর্ষীয় বালক। যে কয়দিন বৃদ্ধা বাঁচিয়াছিলেন আচার্য তদ্গতভাবে তাঁহার সেবা করিলেন। ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে স্বরচিত শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিয়া জননীকে মহাদেবের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করাইলেন। বিশিষ্টার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। পুত্রের ভক্তি ও যোগশক্তিতে তিনি মৃত্যুর পূর্বে ইষ্টমূর্তিরও দর্শন পাইলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও আচার্য জননীর সৎকার নিজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

যে সন্ন্যাসীর মন একদিন 'পিতা নৈব মে, নৈব মাতা ন জন্ম' এই বৈরাগ্যভাবের প্রেরণায় জননীর স্নেহ সেবা ও সান্নিধ্য অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিল, সেই সন্ন্যাসীর মন কি অন্য কোথাও রাখিয়া শঙ্কর মাতৃসকাশে আসিয়াছিলেন? না। সন্ন্যাসীর মনে বৈরাগ্য ও বৃহৎ করুণার একটি আশ্চর্য সমন্বয় ঘটে। গৃহত্যাগকালে দ্বিতীয়টি প্রকাশের অবসর ছিল না, তাই আমরা প্রথমটিই শঙ্কর-চরিত্রে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই। কিন্তু এই অভিব্যক্তি রিক্ততাও নয়, নিষ্ঠুরতাও

নয়। পরে যখন অবসর আসিল সন্ন্যাসীর সমন্বিত মনের অপর পরিচয় তখন পাওয়া গেল। এই পরিচয়েও না ছিল আসক্তি, না ছিল এক-দেশিতা। সন্ন্যাসীর মন যুগপৎ বর্জয়িতা ও গ্রহীতা। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা সীমাবদ্ধ তাহারই বর্জন; কিন্তু ক্ষুদ্রতা ও সীমার পশ্চাতে যে সর্বাবগাহী ভূমা সত্য রহিয়াছে—তাহাকে সন্ন্যাসী উপেক্ষা করিবেন কি করিয়া? সন্ন্যাসী মায়িককে ভুলেন, চিরন্তনকে অনুক্ষণ হৃদয়ে রক্ষা করেন। শঙ্কর মায়িক জননীর নিকট হইতে দূরে গিয়াছিলেন, চিরন্তন জননীর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অথবা চিরন্তন জননী বরাবর তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন।

* * *

পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী এবং ওড়িয়া নরনারী নিমাই-সন্ন্যাস পালা শুনিতে বসিয়া হরিনামে যত না আলোড়িত হইয়াছে তাহার শতগুণ চোখের জল ফেলিয়াছে শচীমাতা এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য। কিন্তু যে মর্মবিদারী দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া নিমাই বৈরাগী সাজিলেন তাহা কি তাঁহার নিজের চিত্তকে একটুও স্পর্শ করে নাই? সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মন কোন্ ধাতু দিয়া গড়া ছিল? সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকাইলে হয়তো কিছু দিগ্‌দর্শন মিলিতে পারে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্য-লীলা' দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ হইতে কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি:

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা! ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'আহা' বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। * * *

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন—

কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো, অধম জনম বৃথা কেটে গেল
বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব,
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদ্‌গদ স্বর! গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। * * *

এইবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন। শচী মূর্ছিতা হইলেন। মূর্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন; কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে।

দেখা গেল সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন যেখানে শ্রীভগবানের নামের মহিমা ও প্রেমের অভিব্যক্তি হইতেছে কিন্তু সাংসারিক লোকের প্রসঙ্গে তিনি "অণুমাত্র বিচলিত" হইতেছেন না। "নয়নের কোণে"—মাত্র "এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে।" সংসারে যাহা দুঃসহ দুঃখের পরিবেশ সন্ন্যাসীর মন সেখানে দুঃখ দেখে না। যদি এক ফোঁটা জল চোখের কোণে আসিয়াই যায় উহা সেই দুঃখের জন্য নয়, পুত্র-কলত্র-আত্মীয়-বান্ধবের বহুপ্রকার আকর্ষণে মানুষ কিভাবে প্রতিনিয়ত বদ্ধ, উহা ভাবিয়াই সেই অশ্রুবিন্দু পড়ে। সন্ন্যাসীর অশ্রু শোকাশ্রু নয়, সমবেদনার অশ্রু, করুণার অশ্রু।

নীলাচলে বসিয়া সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের স্বীয় জননী শচীদেবীর কথা কত মনে পড়িত—তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁর মধুর বচন ॥

এই বস্ত্র মাতাকে দিও এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে, কৈল আমি নিজ ধর্মনাশ ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥

(মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদ)

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মনে উপরোক্ত মাতৃস্মৃতি নিশ্চিতই মায়া নয়। ব্যাপক অর্থে উহাকে 'দয়া' বলা যাইতে পারে। এই 'দয়া' সন্ন্যাসীর শ্রীভগবানের বিশ্বসত্তানুভবের নামান্তর মাত্র। এখানে অহঙ্কার বা মমত্ব-বুদ্ধির লেশমাত্র স্পর্শ নাই। শ্রীভগবানকেই তিনি মাতৃরূপে দেখিতেছেন। শচীমাতা এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য তাঁহার তত্ত্বালোক-প্রদীপ্ত যে শ্রদ্ধা ও প্রেম দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য লৌকিক বিচারে ধরা পড়ে না। লৌকিক বিচারে ধরা পড়ে শুধু এই দুই নারীর লৌকিক বিরহদুঃখ এবং সেই বিচারের পরিসমাপ্তি ঘটে নিমাই-সন্ন্যাসের আসর ঘটি ঘটি চোখের জলে সিক্ত করিয়া। মানুষের এই বিচার ও ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসীর যদি হাসি পায় তো তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ মাতার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া প্রকাশ্যে গৈরিক ধারণ করেন নাই, মায়ের কথা ভাবিয়া বৃন্দাবন-বাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন সহধর্মিণীকে জগদম্বাবুদ্ধিতে পূজা করিয়াছিলেন, শিক্ষাদীক্ষা দিয়া নিজের অসমাপ্ত কার্যের ভার তাঁহাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। আবার সেই শ্রীরামকৃষ্ণই এককালে কত বৎসর জননী চন্দ্রাদেবীকে ভুলিয়া ছিলেন, বালিকাবধূ সারদামণি সম্বন্ধে তাঁহার কোন হুঁশই ছিল না। সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা বা ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না, ছোট বড় সকল স্ত্রীমূর্তি তাঁহার দৃষ্টিতে জগদম্বার আকৃতি বলিয়া প্রতিভাত হইত, দিনের মধ্যে বহু ঘণ্টা তাঁহার মন সমাধিলীন হইয়া থাকিত। তবুও সেই শ্রীরামকৃষ্ণই ঠিকা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া সময়ে অসময়ে কলিকাতার পথে পথে বাড়ীতে বাড়ীতে ভক্তদের সহিত দেখা করিতে যাইতেন, নাচিয়া গাহিয়া অনর্গল কথা বলিয়া আনন্দের হাট বসাইতেন। লৌকিক ও অলৌকিক, একান্ততা ও সর্বাত্মতার চমৎকার সমন্বয় সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের মনে।

সন্ন্যাসীর সাধনা মনের রূপান্তরের সাধনা। যে মন একদিন জন্ম-জন্মান্তরের বিষয়সংস্কারের চাপে জগৎ ও জীবনের প্রকৃত সত্য ভুলিয়া ছিল সেই মনই এক পরম শুভ মুহূর্তে জাগিয়া উঠে। তখন শুরু হয় মনের সম্মুখযাত্রা। ধাপে ধাপে কত বাধা কাটাইয়া, স্তরে স্তরে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, কত দ্বন্দ্ব, কত আঘাত, কত ক্লেশ, কত ব্যর্থতা সহ্য করিয়া মনের রূপান্তর সাধন করিতে হয়। অবশেষে মনে গৈরিকবর্ণের ছাপ পাকা হয়। ক্ষণিকের পশ্চাতে যে চিরন্তন, উহাতে মন স্থায়ী আসন গ্রহণ করে, যাহা একদিন কালো ছিল তাহা আলোয় আলোময় হইয়া উঠে। তখন সন্ন্যাসী দেখেন—যাহা বৈরাগ্য তাহাই প্রেম, যাহা সংসার তাহাই সংসারের সার ভগবান। সন্ন্যাসীর মন তখন চরম রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই মন শ্রীভগবানের সাত্ত্বিক বিভূতি, তাঁহারই রূপ, তাঁহারই বিগ্রহ। সন্ন্যাসীর এই মন মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।